বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গল্প

সম্পাদিত

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা : ১৩৭১

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রুফ সংশোধন
রবি বসু

মুদ্রাকর :
গোপাল ঘোষ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

এই সংকলন বিষয়ে

ইচ্ছে ছিলো, বহুদিনের ইচ্ছে, পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক গল্প নিয়ে এক সংকলনগ্রন্থ বের করবো। বছর দুই আগে ও-বাংলার কবিতা নিয়ে একটি সংকলন তৈরি করেছিলুম। এবছর তার পরিবর্ধিত ও প্রামাণ্য 'দ্বিতীয় সংস্করণও বের হয়ে গেছে। গল্পের ব্যাপারে তরুণ লেখক হাসান আজিজুল হক এবং বিশেষ করে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আমায় প্রভূত সাহায্য করেছেন। বই-পত্র, গল্পের কপি পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন অতি তরুণ কবি দাউদ হায়দার। দীর্ঘদিন ধরে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, বেছে তাদের মোটামুটি একটি গ্রন্থাকৃতি দিয়েছিলুম।

সহসা সুসময়-দুঃসময়-মেশা এক ঝড়ে সীমান্তের কাঁটাতার উপড়ে গেল। এক ভাষার দুই বাংলাদেশের গল্প একত্র রাখার বাসনা প্রবল হয়ে উঠলো তখনই। গ্রন্থের সব কটি গল্পের মধ্যেই যে সাম্প্রতিক বাংলাদেশ প্রতীক হয়ে আছে, তা বলবো না এবং তেমন একটি বিশুদ্ধ সমসাময়িকতাকে বন্দী করে তুলে ধরার পরিকল্পনাও আমার নয়—কিছুর মধ্যে আছে এখন বাস্তবের সময়ের নির্ভরযোগ্য ছবি। আর কিছুর মধ্যে আছে মানুষের আবহমান ভালোবাসার কথা। এই নিয়ে দুই বাংলার, এক বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গল্পের বই। ইচ্ছে ছিলো, একটি ব্যাপক খণ্ডে একে ধরে ফেলতে পারবো। নানা কারণেই তা সম্ভব হলো না শেষ পর্যন্ত। অনেকের রচনাই চেয়ে কাছে রেখেছিলুম, অনেককেই বলে রেখেছিলুম তাঁদের গল্প এই সংকলনে যাচ্ছে। অনিবার্য কারণে, দু খণ্ডে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের গল্পসমূহ প্রকাশ করতে হচ্ছে। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি খণ্ডকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ করতে গিয়ে তাঁদের অনেকের রচনাই পরবর্তী খণ্ডের জন্যে হাতে রেখেছি। আশা করি, বাংলাদেশের গল্পলেখকগণের কাছ থেকে এই মার্জনাটুকু আমি পাবো।

সংকলন করার কাজে বিশেষ কোনো নিয়ম বা নীতি আমি মেনে চলতে শিখিনি। তবে, যাঁদের রচনা কোনো-না-কোনো সময়ে

আমার কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছে, এই বিস্তৃত সংকলনগ্রন্থের দুই খণ্ডে তাঁরা প্রায় সকলেই আছেন। ওপার বাংলাদেশ থেকে যে স বিখ্যাত লেখক-অধ্যাপক সাম্প্রতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এপারে আসতে পেরেছেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই বিস্তৃত আলোচনার পর বিশেষত, তাঁদেব দিককার গল্পসংগ্রহ, নির্দিষ্ট করেছি। তবু, ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। বিশেষত দুই বাংলার তরুণ-অতিতরুণ গল্পকার ক্ষেত্রে। কিন্তু সে বিষয়েও আমি মোটামুটি উন্মুক্ত চোখ নিয়ে আছি তরুণ রচনার অগ্নি আমাদের মতন তারুণ্যবর্জিত মানুষকে খু বড়োভাবেই স্পর্শ কবে থাকে

সবশেষে, প্রকাশক শ্রীব্রজকিশোর মণ্ডলকে এ ধরনের এক বিপুলায়তন এবং অপরিহার্য একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে সাধুবা জানাই। নমস্কার জানাই তাঁদেব, যাঁবা এই গ্রন্থের পরিকল্পনামাত্রে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ইতি—

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আবহমানের বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি-

গল্প-সূচী

সোনার ঠাকুর মাটির পা ॥ অন্নদাশঙ্কর রায় ১
দোসর ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩
আত্মজা ও একটি করবী গাছ ॥ হাসান আজিজুল হক ২৯
মল্লিকা বাহার ॥ কমলকুমার মজুমদার ৩৮
সরল সংসার ॥ জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ৫০
দুই রাত্রি ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ৬১
জলছলছল ॥ মাহবুব সাদিক ৮৫
গুহা ॥ আবু কায়সার ৯২
লাইনের ধারে ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১০৭
মনসা মাগো ॥ মাহমুদুল হক ১২১
বিনিদ্র রাত্রি, সোনালী পিপাসা ও একটি নারীমুখ ॥ মুহম্মদ সিরাজ ১৩৭
শহীদের মা ॥ সমরেশ বসু ১৪৩
দিনকাল ॥ রমাপদ চৌধুরী ১৬৪
পরাজিত খেলোয়াড় ॥ আহমদ বুলবুল ইস্‌লাম ১৭৮
সত্যশব ॥ শাহ্ নূর খান ১৮৩
বেহুলার ভেলা ॥ মতি নন্দী ১৮৮
পরী ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ২১৩
বিজিতের বংশধর ॥ শাকের চৌধুরী ২২২
চন্দনে মৃগপদচিহ্ন ॥ সাজ্জাদ কাদির ২২৮
বান্দা ॥ আবদুল মান্নান সৈয়দ ২৩৭
আজীবন শীতকাল ॥ কায়েস আহমেদ ২৪৫
মহাপৃথিবী ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৪৯
নোনাজল ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ২৬১
দিনমান ছায়াছবি ॥ মাজহারুল ইসলাম ২৭২
একটি মৃত্যুর জন্ম ॥ রশিউল আলম ২৮০
বিপ্রতীপ ॥ শেখ আতাউর রহমান ২৮৮

সৌদামিনী মালো ॥ শওকত ওসমান ২৯
ভালোবাসা ॥ আবু মহম্মদ আবদুল্লাহ ৩০৫
সহবাস ॥ বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ৩১
নইলে চাবুক ॥ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩
আলমারি ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ৩
মাছ ॥ হাসান হাফিজুর রহমান ৩
বৃষ্টি ॥ আলাউদ্দিন আল আজাদ ৩
পুঁইশাক ॥ আতোয়ার রহমান ৩৬৮
একটি তুলসী গাছের কাহিনী ॥ সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্ ৩৮২
জিবরাইলের ডানা ॥ শাহেদ আলী ৩৯০
বাঙলা দেশ ॥ মিহির মুখোপাধ্যায় ৪০৬
আগুন জ্বালাবার গল্প ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২
মাহমুদের গল্প ॥ শওকত আলী ৪৩
বলার আছে ॥ রমানাথ রায় ৪৪
উদ্বেগ ॥ শেখর বসু ৪৫
মধ্যবিত্ত ॥ আসাদ চৌধুরী ৪৫
দুজন মানুষ ও তিনটি গরু ॥ আবু জাফর সামসুদ্দিন ৪৬
সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ॥ আলমগীর রহমান ৪
শোণিতে শতধা ॥ জুলফিকার মতিন ৪

র সেইখানেই স্থির হয়ে বসেন। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায়। তাঁর বাড়ির কাছে। সেখানে তিনি কেবল খাদি তৈরি করেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে করেন টিনের কাজ। টিন কেটে লণ্ঠন, ল্যাম্প, কুপি। তার সঙ্গে যোগ দেয় লোহার কাজ। লাঙলের ফাল, দা, কাটারি, ছুরি। কাস্তে কোদাল। কাঠের কাজও সঙ্গে স চলে।

"তৈরি করা তত কঠিন নয়, বিক্রি করা যত কঠিন। হাটে হাটে পাঠাতুম, র দরে ছাড়তুম। ঘর থেকেই লোকসানের কড়ি জোগাতে হতো। বাবা ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। স্বদেশী যুগে উনিও রকমারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিস্তর টাকা ল দিয়েছিলেন।" দাদা বলেন।

"আমার মনে আছে তোমার আশ্রমের লণ্ঠন আমি রোহনপুরের হাটে দেখেছিলুম। তোমার সঙ্গেও দেখা হয় তার কিছুদিন বাদে। তুমি তখন সত্যাগ্রহ করে বেড়াচ্ছ। বেআইনী নুন তৈরি। তোমাকে গ্রেপ্তার করতে বলেছিল, করিনি। তুমিও আমাকে বিব্রত করবে না বলে অন্যত্র ধরা পড়েছিলে!" কবেকার সব কথা মনে পড়ে আমার।

"গ্রেপ্তার হলে তোর হাতে না হওয়াই ভালো। আমার তখন অর্জুনবিষাদ। তোরও তাই। ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের সংগ্রাম যেন তোর সঙ্গে আমার সংগ্রাম না হয়।" বদনদা আর একবার হেসে ওঠেন। হা হা হা হা হা!

"হাঁ, তোমার ট্রায়াল হতো আমারও ট্রায়াল। তোমার ভাগ্যে নুন অন্য জায়গায় পাওয়া গেল। আমারও ভাগ্যে বলতে পারি।" আসলে নুন নয়, নোনা মাটি।

আরো কতক্ষণ স্মৃতিচারণের পর বদনদা হঠাৎ চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলেন, "কিন্তু এত কাণ্ড করে শেষটায় কী লাভ হলো রে! সেসব অঞ্চল তো এখন পাকিস্তানে।"

দুজনেই চুপ করে থাকি। মোটর ততক্ষণে চৌরঙ্গী দিয়ে ছুটেছে।

"হা হা হা হা হা! তুই না আমাকে বলেছিলি স্বাধীনতার দিন যে, আমাদের নতুন রাজত্ব দুশো বছর টিকবে। বাইশ বছর যেতে এ কী দেখছি! চতুর্দিকে ফাটল। চতুর্দিকে ভাঙন। যেন মোগল রাজত্বের শেষ দশা। যে রেটে জল ঢুকছে হাজ ডুবতে কতক্ষণ! জোর দশ বছর।" বদনদার গলা কাঁপে।

"ও কী বলছ, বদনদা!" আমি ওঁর নৈরাশ্য সহ্য করতে পারিনে।

"না, না, হাসির কথা নয়। আমি বড়ো দুঃখেই হাসছি রে। গান্ধীকে খুন করে র গুণ গাওয়া হচ্ছে ইনিয়ে বিনিয়ে। একজনও বিশ্বাস করে না যে এ স্বাধীনতা

মিলিটারি ভিন্ন আর কেউ রক্ষা করতে পারে। অথচ বাপু বেঁচে থাকলে স বিশ্বাস করত যে মিলিটারি নয়, তিনিই পারতেন রক্ষা করতে।" বা আর্দ্রকণ্ঠে বলেন।

আমরা ফিরছিলুম গান্ধী শতবার্ষিকী সভায় যোগ দিয়ে। বদনদার কলক আসার উদ্দেশ্যও তাই। প্রবীণ গান্ধীবাদীরা দেশের নানা স্থান থেকে এসে হন। দেখেন দেশের লোক চলে যাচ্ছে তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। তাঁরা মুষলপ অর্জুনের মতো অসহায় দর্শক। দস্যুদের বিরুদ্ধে গাণ্ডীব তুলবেন যে, গাণ্ডী তাঁদের চেয়ে ভারী।

"মস্ত ভুল করেছি বিয়ে করে।" বদনদা হারানো খেই হাতে নিয়ে বলে "বাপুর বারণ ছিল, স্বরাজ না হওয়াতক বিয়ে কোরো না। তার মানে কি যে, স্বরাজ হতে না হতেই বিয়ে করতে পারো? তোর সঙ্গে শেষ দেখার পর চট বিয়ে করে ফেলি। মেয়েটি আমার জন্যে পার্বতীর মতো তপস্যা করছিল। আমার দরকার ছিল আশ্রমের জন্যে একজন লেডী ডাক্তার। বিয়ের পরেও অসিধার করে যাচ্ছিলুম, কিন্তু বিনতাকে তার মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত হতে না। অধর্ম হতো। তেমনি সুনুকেও জন্মলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক অন্যায় হতো। সুনু, সুবিনয়, আমাদের একমাত্র সন্তান। কলকাতায় ওর এম পড়ার একটা কিনারা করে দিতে পারিস?"

ভাগ্যিস গাড়ীর ড্রাইভার ছিল হিন্দুস্থানী নইলে শুনে কী মনে করত।

"বিয়ে করে তুমি ভুল করেছ, কেন ভাবছ? ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য, এই রকম তো শাস্ত্রে লেখে। বয়সটা অবশ্য বানপ্রস্থের। 'ভুল' বলছ সেইজন্যেই?" আমি শুধাই

"সেটাও একটা কথা বইকি। কিন্তু সেইজন্যেই নয়। বিয়ে যতদিন করিনি ততদিন দেশের ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কারো ভবিষ্যৎ ভাবিনি। বিয়ের পরে বাপ হ অবধি ছেলের ভবিষ্যৎই ভেবেছি। দেশের ভবিষ্যৎ নয়। তোর কাছে গোপন ক কী হবে, ছেলেকেই আমি আশ্রমের ট্রাস্টি করে যেতে চেয়েছিলুম। আশ্রমটা আমারি ব্যক্তিগত অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তা বোধ হয় জানিস।" বদন খুলে বলেন।

"ভালোই তো। সুনুরও একটা জীবিকা জোটে।" আমি মন্তব্য করি।

"সুনু কী বলে শুনবি? বলে আশ্রমে ওর বিশ্বাস নেই। অহিংসাতেও ন ওর মতে মহাত্মা তাঁর কাজ যা তা চুকিয়ে দিয়ে গেছেন, আর কারো জন্যে বাব রেখে যাননি।" বদনদা কাঁদো কাঁদো ভাবে বলেন।

কি ? তা হলে সুদূর ভবিষ্যৎ কোন্ পথে ?" আমি জিজ্ঞাসু হই।
, চাকরি। বিয়ে। গতানুগতিক পথে। নয়তো ছাত্র-রাজনীতি, তার
নিজন্ন, তার থেকে নকশালপন্থী। তোরা পাঁচজনে ওকে সৎ পরামর্শ
যে একদিন বোমা ছুঁড়বে না তাই বা কী করে জানব ? হিংসায় উন্মত্ত
? কি দুনিয়ার বার ?" বদনদা আমাব হাতে হাত রেখে থর থর
ন।

। দুই ।

কুকুর বিন্দি আমাকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে আসে। বদনদাকে দেখে
র পা তুলে সম্বর্ধনা জানায়।
ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। বলেন, "আমারও এ রকম একটি পাহাড়ী
ছ। একটুও হিংস্র নয় !"
আমার বোনটিকে দেখছিনে কেন ?" দাদা আসন নিয়ে বলেন।
ন অনেকদিন বাদে বাপের বাড়ী গেছেন। থাকলে কত খুশি হতেন
দেখে !" এর পর আমি তাঁকে চা অফার করি।
'না' বলব না। আশ্রম থেকে ও পাপ বিদায় করতে পারিনি। আমার
নে সাত আট কাপ খায়। লেডি ডাক্তার কিনা, চাঙ্গা হওয়া চাই। তবে
ান চাতাল করে তুলেছে। এখন ও কলকাতায় এসে চায়ের দোকানে
উসে আড্ডা দেবে তো। চা বাগানের কুলীর রক্ত চুষবে।" দাদা বিমর্ষ

কে কত বিদেশী মুদ্রা আসে খবর রাখো, বদনদা ? অত বড়ো একটা
বায় এই কি তোমার মনের ইচ্ছা।"
দেশী মুদ্রাই তোরা বুঝিস। শুনতে পাই বাঁদর চালান দিয়েও বিদেশী
়। এর একটা নৈতিক দিক আছে সেটা কেউ দেখবে না। দেখবে
ভৌতিক দিকটাই। অমনি করেই নাকি দেশ ধনবান হবে, বলবান হবে।"
র করেন।
ু ঢেলে দিই। বিস্কুট এগিয়ে দিই।
বিস্কুট ! কেন, মুড়ি ঘরে নেই ? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মুড়ি খেতেন ও

খাওয়াতেন। খেয়েছিস ওঁর সঙ্গে আত্রাইতে। মনে নেই?" দাদা ম
দেন।

"কিন্তু বিস্কুট তো এখন আমরা তৈরী করছি।" আমি আবার তর্ক করি।

"মদও তো আজকাল আমরাই চোলাই করছি। মৈশুরে আঙুর ফলছে। গরিব দেশবাসীকে বিস্কুট ধরিয়ে ওদের মাথা খাওয়া কি পাপ নয়? এর প ধরাব তো? একবার যদি ও রসের স্বাদ পায় তবে বঙ্গোপসাগর হবে মদ্যো সাগর শুষে ফেলবে অগস্ত্য ঋষির বংশধর আমাদের তৃষার্ত দেশবাসী।" দাদ ওঠেন।

মুড়িও ছিল বাড়িতে। দাদা বিস্কুট ঠেলে দিয়ে মুড়ি নিয়ে বসেন। বলে সবচেয়ে ভাল লাগে মোটা চালের ভাত, তারপরেই মুড়ি। পেটও ভরে মন

আমরা দুজনে ছাদে যাই। আরাম কেদারা নিয়ে বসি। দিকে দিকে চারতলা বাড়ি। সাততলা আটতলাও দেখা যায়। দাদা চোখ বুজে তোরা করছিস কী? এ যে সোনার ঠাকুর মাটির পা।"

কথাটা এককালে আইরিশ কবি জর্জ রাসেলের বইয়ে পড়েছি ছদ্মনাম এ. ই.। দাদা মনে পড়িয়ে দিলেন।

"তোদের সভ্যতা, তোদের সংস্কৃতি, তোদের রাষ্ট্র, তোদের সমাজ বছরে সোনার ঠাকুরের আকৃতি নিয়েছে। কিন্তু পা দুটি তো মাটির। সে আর সেই কৃষক। তাদের না আছে পুঁজি না আছে জমি। গ্রামে গে চড়া সুদে কর্জ করছে, যেটুকু আছে সেটুকুও বিকিয়ে যাচ্ছে। ধনী আরো গরীব আরো গরীব হচ্ছে। সোনার ঠাকুর একদিন দেখবেন যে তাঁ ধনি আর বইতে পারছে না। এমন মাথাভারি ব্যবস্থা কেউ কি পারে বইতে হবে জানিস? না আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে?" দাদা আমাকে হ. ক পেয়ে ভয় দেখান।

"সেইজন্যেই তো সোসিয়ালিজমের কথা উঠেছে।" আমি কাটান দিই বদনদ

"ওর মানে কী রজত? আমার অল্পবিদ্যায় এই বুঝি যে রাষ্ট্রই হবে স মালিক, যেমন সমস্ত অস্ত্রের মালিক। এক হাতে অস্ত্রের মনোপলি আর অ অর্থের মনোপলি নিয়ে রাষ্ট্রই হবে হীরের ঠাকুর। কিন্তু মাটির পা তো যা তেমন রয়ে যাবে। না পাথরের পা হয়ে যাবে?" বদনদা সংশয়ের স্বরে ভাব

"কে জানে? আমরা তো হাতে কলমে পরখ করে দেখিনি।" কাটাই।

"আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বলে যে অস্ত্র ও অর্থ কেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তার চেয়ে সর্বাধিক বিকেন্দ্রীকরণ শ্রেয়। কিন্তু সে যে কতদিনে হবে কেমন করে হবে তা আমার জ্ঞানগম্য নয়। মহাত্মা বেঁচে থাকলে তিনিই আলো দিতেন। তাঁর অভাব প্রত্যেকদিনই অনুভব করছি। বরং আরো বেশী করে।" দাদা বিলাপ করেন।

"কেন, তিনিই কি বলে যাননি আত্মদীপো ভব?" আমি সান্ত্বনা দিতে যাই।

"আত্মদীপ হতে চাইলেও পারছি কোথায়?" দাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, "এই ভাখ না কালের হাওয়া আমার আশ্রমেও বইছে। কর্মীরা ধর্মঘটের হুকুম দিচ্ছে। ভাগচাষীরাও রায়তি স্বত্ব দাবি করছে, না দিলে জমি জবরদখল করবে। আমার কি সহানুভূতি নেই? কিন্তু আমি হলুম প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। মজুরি বা মাইনে বাড়ালে বাড়তি দাম খদ্দের দেবে না, অগত্যা সরকারের কাছেই হাত পাততে হবে। তা কি পারি কখনো? আর জমিতে ভাগচাষীর রায়তী স্বত্ব স্বীকার করার পর ও জমি আর আশ্রমের থাকে না। তা হলে আশ্রমের চলে কী করে?"

"তা হলে তুমি এক কাজ কর, বদনদা। ওদের সবাইকে পার্টনার করে নাও। ওরা জানুক যে আশ্রমটা ওদেরি।" আমি পরামর্শ দিই।

"ও কথা যে কখনো মাথায় আসেনি তা নয় রজত। কিন্তু দক্ষ কর্মীরা যে যেখানে দুপয়সা বেশী পাবে সেখানেই চলে যাবে। এই ওদের রীতি। অদক্ষ কর্মীদের স্থিতিও কি সুনিশ্চিত? স্বাধীনতার পূর্বে যাদের পেয়েছি তারা আমাকে ছাড়েনি। সুখে দুঃখে আমার সঙ্গেই থেকেছে। তাদের অনেকেই মৃত। অনেকে আবার পাকিস্তানে চলে গেছে। নতুন লোক নিয়ে ভাঙা হাট চালিয়ে যাচ্ছে রে। এরা কী অংশীদার হতে চায় না অংশীদারি পেলে টিকবে?" বদনদা মাথায় হাত দেন।

ভাবনার কথা বইকি। আমি চুপ করে থাকি। কিছুদিন আগে আরেক বন্ধুর আশ্রম দেখতে গিয়ে দুঃখিত হয়েছিলুম। হাতীশালে হাতী আছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোক আছে, লস্কর আছে। তবু রাজপুরী খাঁ খাঁ করছে। ঘুমন্ত পুরী। কারণ বন্ধুটি নেই।

এ কাহিনী শুনে বদনদা বলেন, "একে একে নিবিছে দেউটি। আমিই বা আর কদ্দিন? আমার পরে আমার আশ্রমও ঘুমন্ত পুরী হবে। তাতে প্রাণসঞ্চার করবে কে? বিনতা আমার সহধর্মিণী। ওরই তো এ ভার বহন করার কথা। কিন্তু ও কী বলে শুনবি?"

আমি কান পেতে রই। বিন্দি আমার পায়ের কাছে শুয়ে।

"বিনতা বলে তোমরা এটার নাম রেখেছ সত্যাগ্রহাশ্রম। এটা তো সেবাশ্রম নয় যে আমিও চালাতে পারব। সত্যাগ্রহাশ্রম করেছ সাবরমতীর অনুকরণে। সেখানকার নিয়ম ছিল শান্তির সময় সংগঠন, সংগ্রামের সময় সত্যাগ্রহ। এখানকার নিয়মও যদি তাই হয় তবে একদিন না একদিন সত্যাগ্রহের ডাক আসতে পারে। তুমি থাকলে সত্যাগ্রহে নামতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু আমি কি তা পারি, আমার হাতে সব সময়ই একরাশ প্রসূতি ও শিশু। শুনলি তো, আমার নামকরণেই আমি জব্দ। তখন কি ছাই জানতুম যে সত্যাগ্রহের পাট উঠে যাবে?" বদনদা আক্ষেপ করেন।

"সত্যি উঠে গেছে নাকি?" আমি প্রশ্ন করি।

"সেকি সত্যাগ্রহ এখানে ওখানে হচ্ছে। যারা করছে তারা কেউ গান্ধীবাদী নয়। খাঁটি সত্যাগ্রহ এখন খাঁটি গব্য ঘৃতের চেয়েও দুর্লভ।" বদনদা হাসেন। কিন্তু হা হা হা করেন না। করলে হয়তো হাহাকারের মতো শোনাত।

আরো কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে আমরা দুজনে ছাদ থেকে নেমে আসি। নৈশ ভোজনের সময় হয়েছিল। আমি বদনদার জন্যেও রাঁধতে বলে দিয়েছিলুম। কিন্তু তাঁর অনুমতি নিইনি। এবার অনুমতি চাই।

"সে কি। আমি যে আমার শালীপতির অতিথি। ওঁরা যে আমার জন্যে অভুক্ত বসে থাকবেন। অ্যাঁ করেছ কী রজত।" তিনি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করেন।

"সেই মহাপ্রসাদ সেবা এটা তারই একটা অক্ষম অনুকরণ বদনদা। তোমার যেটুকু ইচ্ছা খেয়ো। ওঁদের ওখানকার জন্যে পেটে জায়গা রেখে দিয়ো।" আমি প্রস্তাব করি।

"না, না, তা কি হয়? তোর সঙ্গে বাইশ বছর বাদে খাচ্ছি। পেট ভরেই খাব। ওরা কিছু মনে করবে না।" তিনি ঠাণ্ডা হন।

। তিন ।

আহার করতে বসে বদনদা কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন। আশ্চর্য প্রার্থনা। কখনো কারো মুখে ও রকম প্রার্থনা শুনিনি। ঠিক যেন খৃষ্টানদের গ্রেস বিফোর মীট। আমিও মনে মনে উচ্চারণ করি। মুখ ফুটে বলতে চক্ষুলজ্জা।

"এই যে দুটি খেতে পাচ্ছি এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই বা ক'জন পাচ্ছে? এই বা কদিন পাব? আমার অন্নদাতাদের যেন আমি না ভুলি। যেন ওদের শ্রমের মূল্য দিই ওদেরই মতো শ্রমে আর স্বেদে। আর ওদের যেন সেবা করি অহেতুক প্রেমে?"

বদনদার ওই প্রার্থনা কার উদ্দেশ্যে নিবেদিত তা জানিনে। হয়তো ঈশ্বরের হয়তো মানবের। হয়তো ওটা প্রার্থনাই নয়, একটা সংকল্পবাক্য। অভিভূত হয়ে শুনি। তারপর আহার শুরু হলে জিজ্ঞাসা করি, "এটা কি খৃষ্টানদের মতো। গ্রেস বিফোর মীট?'

"যা বলেছিস। আমাদের হিন্দুদের প্রথা হচ্ছে ভগবানকে অর্পণ করে প্রসাদ সেবা করা। ওদের প্রথা হচ্ছে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাওয়া। আমিও ধন্যবাদ জানিয়ে খাই। কিন্তু কাকে? ঈশ্বরকে? না ভাই তাঁকে নয়। তিনি তো ঐশ্বর্যময়। আমার ঐশ্বর্যে কাজ কী। আমি চিনি দরিদ্রনারায়ণকে। ভুখা নারায়ণকে। নাঙ্গা নাবায়ণকে। যিনি লাঙল ধরে মাঠে মাঠে ফসল ফলান। যিনি তাঁত ধরে ঘরে ঘরে লজ্জা নিবারণ করেন।" বদনদা যেন তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন।

আমি এটা প্রত্যাশা করিনি। বলি, "বেশ তো, কিন্তু এর মানে কী? এই বা ক'দিন পাব?"

"ছাখ, রজত, আমার এ প্রার্থনা আজকের নয়। এটা আমি অন্তর থেকে পাই পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়। তখন আমি জেলে নয়, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। চোখের সামনে দেখি হাজার হাজার মহাপ্রাণী না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। আমিই বা কে যে দু'বেলা দু'মুঠো অবধারিতরূপে দিনের পর দিন পাব? মন্বন্তরটা কীভাবে হলো তোর মনে আছে নিশ্চয়। কলকাতার ব্যবসায়ী আর সরকারের ঠিকাদার গাঁয়ে গাঁয়ে লোক পাঠিয়ে যে-কোনো দামে চাল কিনে আনে। চাল তো নয়, মুখের গ্রাস। কেনা তো নয়, কাগজের নোট ধরিয়ে দিয়ে লুট। দেখে আমার গা জ্বলে যায়। জীবনে অমন কনফিডেন্স ট্রিক দেখিনি। সেদিন থেকেই আমার মন উঠে গেছে তোদের এই সভ্যতার উপর থেকে। শুধু ইংরেজ রাজত্বর উপর থেকেই নয়। এটা একটা কনফিডেন্স ট্রিক। এই যে টাকা দিয়ে চাল কেনা। যা তোরা প্রতিদিন করছিস। কেন, শ্রম দিয়ে কিনিসনে কেন? স্বেদ দিয়ে কিনিসনে কেন? প্রেম দিয়ে প্রতিদান হিসেবে নিসনে কেন!" বলতে বলতে দাদা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

আমি কেমন করে তাঁকে বোঝাব যে টাকা পয়সার উদ্ভব হয়েছে বিনিময়ের সুবিধার জন্যে। তাতে সকলেরই সুবিধা। চাষীদের কি কিছু কম? ওই একটিবার ওরা ঠকেছিল। পরে ওরাও চালাক হয়ে গেছে।

বদনদা খেতে খেতে বলেন, "দুনিয়া জুড়ে যে ইনফ্লেশন চলেছে তার থেকে চাষীরও কিছু ফায়দা হচ্ছে, তা ঠিক। কিন্তু ওই কনফিডেন্স ট্রিক আবার মন্বন্তর ডেকে আনবে। আর সেবারকার মতো গ্রামের লোকরাই লাখে লাখে মরবে। এ আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, রজত। আমি কেন পাপের ভাগী হতে যাই? আমি চাই সময় থাকতে এর প্রতিবিধান। কিন্তু কার কাছে গেলে প্রতিবিধান হবে? সকলেই তো পাপের ভাগী। এই কনফিডেন্স ট্রিক থেকে সকলেই লাভবান হচ্ছে। কেউ কম, কেউ বেশী। তা সত্ত্বেও আমি জানি এ খেলা চিরকাল চলতে পারে না। এর কুফল ফলবেই।" দাদা ওয়ার্নিং দেন।

আদি খ্রীষ্টানদের মতো তিনি ব্যাকুলভাবে বলেন, "যাও খেটে খাও। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাও। মাটির সঙ্গে আত্মীয়তা ফিরে পাও।"

এরপরে দাদা আবার হা হা হা হা হা করে হেসে ওঠেন। বলেন, "নিজের ছেলেকেই বোঝাতে পারলাম না। যে আমার নিজের হাতে গড়া। আমার সহকর্মীদের একজনও যদি শুনত আমার কথা! সকলেই বোঝে টাকা, আরো টাকা। মজুরি আরও বাড়াও। মাইনে আরও বাড়াও। আমার কি ছাই নাসিকের মতো একটা ছাপাখানা আছে যে যত খুশি ছেপে বিলিয়ে দেব? আর মেকী দৌলতের লহর বয়ে যাবে? অসত্যমেব জয়তে। হা হা হা হা! তবে এবার তোদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি রজত। লোকে এবার পড়ে পড়ে মরবে না। মারবে ও মরবে। বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ যা হবার তা হবে।" দাদার দু'চোখ জ্বলতে থাকে। তারপর আবার স্নিগ্ধ হয়।

"দেশকে তুমি অহিংস রাখতে পারবে না?" আমি অশান্ত বোধ করি।

"আমি কেন, স্বয়ং মহাদেবও পারবেন না।" তারপর কী ভেবে বলেন, "কে জানে পারতুম হয়তো। যদি ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ না করতুম। বেশীদিনের জন্যে নয় যদিও।"

"ব্রহ্মচর্য! ব্রহ্মচর্য দিয়ে কখনো বিপ্লব রুখতে পারা যায়!" আমি তো অবাক। বদনদার কি ভীমরতি হয়েছে? বাহাত্তরের আর কত দেরি?

"অহিংসা দিয়ে পারা যায়, যদি অহিংসার সঙ্গে থাকে ব্রহ্মচর্য। তেমন দু'চারজন সাধক এখনো রয়েছেন। সেইজন্যেই তো আশা হয় যে আমরা সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারব। কিন্তু তাঁরাই বা আর ক'দিন? আমাদের জেনারেশনটাই ঝরে

যাচ্ছে। একে একে নিবিছে দেউটি।" বদনদা করুণ স্বরে বলেন। বিলাপের মতো শোনায়।

নীরবে আহারপর্ব সারা হয়। একজনের বিশ্বাসের সঙ্গে তর্ক করে কী হবে?

আমি অন্য প্রসঙ্গ পাড়তে গেলে বদনদা আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, "রুশ বিপ্লবের সময় অভিজাত ঘরের অঙ্গনাদের দেখা গেল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে। একটুকরো হীরের বিনিময়ে একটুকরো রুটির সন্ধানে। তা হলেই বুঝতে পারছিস কোনটার চেয়ে কোনটার মূল্য বেশী? তোদের মূল্যবোধ যদি এখন থেকেই শোধরাত তাহলে বিপ্লব কোনোদিন ঘটতই না! বিপ্লবকে অহিংসা দিয়ে রোধ করার প্রশ্নও উঠত না।"

তর্ক করব না বলে মুখ বুজে থাকি! দাদা বলে যান, "তা ছাড়া সবাই তো একরকম সুনিশ্চিত যে, অহিংসার যুগ ফুরিয়েছে! তার আর কোনো ভূমিকা নেই ইতিহাসে। তাই যদি হয়, তবে বিপ্লবের দিন অহিংসার কাছে অত বড়ো একটা প্রত্যাশা কেন? সে প্রত্যাশা পূরণ করবেই বা কে, যদি বহুকালের ও বহুজনের প্রস্তুতি না থাকে?"

দাদা একটা লবঙ্গ মুখে দিয়ে বলেন, "মাটির পা দুটি গলে গেলে সোনার ঠাকুরটি টলে পড়বেন, এর মধ্যে এমন এক ভবিতব্যতা আছে যে আমরা ক'জন অহিংসক এর খণ্ডন করতে পারিনে। তা বলে কি আমাদের কোনো কর্তব্য নেই। আমরা সাক্ষীগোপাল?"

আমারও তো সেই একই জিজ্ঞাসা। "আমরাও কি সাক্ষীগোপাল?"

দাদা বাল্যকালে ফিরে যান। বলেন, "ক্যাসাবিয়াঙ্কার কাহিনী মনে পড়ে তোর?"

"The boy stood on the burning deck"—আমি আবৃত্তি করতে শুরু করি।

"আমিও সেইরকম একটা জলন্ত ডেকের উপর দাঁড়িয়ে। জাহাজের গায়ে গোলা পড়ছে। জাহাজের প্রতি অঙ্গে আগুন। জাহাজ ডুববে। অবধারিত মরণ। সকলেই পালাচ্ছে। আমাকেও বলছে পালাতে। আমি কিন্তু আমার পদতলভূমি থেকে ভ্রষ্ট হব না। একচুলও নড়ব না। বাপুজীর আদেশ, আমাকে স্বস্থানে স্থির থাকতে হবে। ক্যাসাবিয়াঙ্কাকে যখন বলা হয়, তোমার পিতা নিহত, বেঁচে থাকলে আদেশ ফিরিয়ে নিতেন, সে তা বিশ্বাস করে না। বলে, পিতার আদেশ আমাকে এইখানে দাঁড়িয়ে

থাকতে হবে। হাঁ, আমাকেও এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বাপুজীর আজ্ঞা।" দাদা দুই হাতে দুই চোখ মোছেন।

"তার মানে কি ভূগোলের বিশেষ একটি স্থানে?" আমি প্রশ্ন করি।

"তার মানে, জীবনের বিশেষ একটি পোজিশনে। আমরা বরাবরই গঠনের ও সংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। শান্তির সময় পাটাতন পরিষ্কার করি, সংগ্রামের সময় আগুনের সঙ্গে মোকাবিলা করি। দগ্ধ হবার ভাগ্য থেকে তো কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে না। ওই দগ্ধ হওয়াটাই আমাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা।"

বদনদার বদনে অপূর্ব আভা।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

দোসর □ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

'দুনিয়ার সবচেয়ে তাজ্জব চিজ—বুঝেছ, এই শুয়োর।' —রেল ইস্টিশনের বাইরে, নোংরা একফালি মাঠের ভেতরে, একটা মাদী শুয়োর কতগুলো ছানাপোনা নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিল, সেই দিকে তাকিয়ে—বাঁ চোখটা কুঁচকে আলতোভাবে কথাটা বলেছিল লোকটা।

তা—মানুষটাকে দেখলে কেমন যেন গা শিরশির করে, একটু ভক্তি-টক্তিও হতে চায়। সাদায় কালোয় মাথার চুল, সাদার ভাগটাই বেশি। মোটা মোটা ভুরু দুটোও পাক ধরা, তার নীচে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। মুখে খানিক এবড়োখেবড়ো সাদা দাড়ি দেখলেই বোঝা যায়, দাড়িটা নিয়মিত রাখে না—খেয়ালমতো কামিয়ে ফেলে মধ্যে মধ্যে। নাকের বাঁ-দিকে একটা শুকনো কাটার দাগ—মনে হয় সাঁওতালী তীর কিংবা বল্লমের ঘা লেগেছিল কোনোকালে।

প্লাটফর্মের বেঞ্চিতে গা এলিয়ে, পায়ের কাছে গামছার পুঁটুলিটা রেখে, আধঘণ্টা লেট লোক্যাল ট্রেনটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে, একটু দূরের শুয়োরগুলোকে দেখে, বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে লোকটা বলেছিল: 'হুঁ, যা বলছি। দুনিয়ার সব চেয়ে তাজ্জব চিজ হল এই শুয়োর।'

পাশে বসে ভক্তিমানের মতো শুনছিল জন দুই চাষী গেরস্ত। কয়েক হাত দূরে সুটকেস পেতে বসে আমিও শুনছিলুম, কারণ আধঘণ্টা লেট হয়ে যে ট্রেনটা আসছে তাতে আমাকেও যেতে হবে। সামনের ফাঁকা রেলের লাইন, মাথার ওপর রাধাচূড়োর পাতায় হালকা বাতাসের শব্দ, ওদিকের সাইডিঙে খান তিনেক কালো কালো পুরোনো ওয়াগন, মালগুদামের টিনের চালে চোখ ধাঁধানো খানিক রোদের ঝিলিক আর থেকে থেকে কাকের ডাক আমার সারা শরীরে একটা ক্লান্ত ঝিমুনি

নিয়ে আসছিল। লোকটার ভরাট আর ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজে আমি নড়ে চড়ে বসলুম।

ভক্তি সত্ত্বেও একজন চাষী অবাক হল একটু।

'এত জীব থাকতে শুয়োর সব চাইতে তাজ্জব হল কেন?'

'কখনো সুন্দরবনের তল্লাটে যাওয়া হয়েছে?'

'আজ্ঞে না।'

'নদীগুলো যেখানে রাক্ষুসে হয়ে সাগরে পড়ে—সে-সব মোহানার খবর জানা আছে কিছু?'

'আজ্ঞে জানব কি করে? যাইনি তো কখনো।'

'সেই সব নোনা গাঙের ভেতর চর জাগল। এলোপাথাড়ি গাছ-গাছলাও গজালো খানিকটা। কিন্তু মানুষ গিয়ে থাকতে পারে না। একে তো নোনা—তার ওপর জোয়ারের সময় সব ডুবে যায়, কিলবিল করে সাপ—একটা পানবোড়া একবার ঠুকে দিলে তো শিবের অসাধ্যি।'

'আজ্ঞে সে তো বটেই।'

'তখন সে চরে সবচেয়ে আগে কে যায় বলোদিকি?'

'জানি নে।'

'যায় শুয়োর।' —লোকটা এবার একটু হাসল, কুঁচকে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল বাঁ চোখটা।

'কোত্থেকে যায়?'

'অন্য চর থেকে, ডাঙা থেকে।'

'কী করে যায়?'

'কেন—সাঁতরে!'

'ওই গহীন গাঙ?'

'গহীন গাঙ বইকি। বাঘের অবধি সাহসে কুলোয় না—কিন্তু যাকে বলে শুয়োরের গোঁ। ওদের সাঁতরাতে দেখেছ কখনো? ঠিক কুকুরের মতো জলের ওপর নাকটা তুলে তুর তুর করে পেরিয়ে যায় দু-এক মাইল।'

'তা চরে গিয়ে কী করে শুয়োর?'—আর একজন চাষী একটা বিড়ি ধরাতে গিয়েও ভুলে গেল: 'সেখানে তো কচু-কন্দ নেই, খায় কী?'

'কেন—কাঁকড়া।'

'কাঁকড়া?' —এবার দুটি শ্রোতাই চমকালো এবং সেই সঙ্গে আমিও।

'বললুম না—দুনিয়ায় অমন আজব চীজ আর নেই? নোনা জলের অ্যাই বড়ো বড়ো কাঁকড়া দেখেছ তো? শুয়োর সেগুলো ধরে কড়মড় করে চিবিয়ে খায়।'

'শুয়োর কাঁকড়া খায়?' একজন তখনো অবিশ্বাসী।

'তেমন তেমন হলে বাঘে ধান খায় শোনোনি?'

'তা হলে পেটের চিন্তা নেই?'

'এক্কেবারে না। আর জোয়ারের জল এসে চর ডুবে গেলে কী করে জানো? বুনো গাছ জাপটে ধরে—মানুষের মতো সোজা হয়ে, জলের ওপর নাক ভাসিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।'

'খুবই তাজ্জব বলতে হবে তা হলে।' প্রথম চাষীটি একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করল: 'আপনি এত সব জানলেন কী করে?'

'খুলনা জেলার লোক না আমি?'—এইবারে লোকটি বিষণ্ন হল একটু: 'চোখেই তো দেখা এ-সব। কিন্তু পাকিস্তান হয়েই—' একটা ছোট নিশ্বাস পড়ল: 'চারদিকে বানের কথা বলছিলে না তোমরা? তাই শুয়োরগুলোকে মনে পড়ছিল আমার।'

বান-বান-বান। গ্রাম ডুবছে, শহর ডুবছে, মানুষ ডুবছে, ফসল ডুবছে। যেন রসাতলে যেতে বসেছে গোটা দেশটাই। সেই যন্ত্রণা আর দুর্ভাবনা সব ক'টি মুখেই ছড়িয়ে পড়ল এখন, বেলা এগারোটার সময়েও—রাধাচূড়োর হালকা ছায়াটার তলায় যেন একটুকরো বিষণ্ন অন্ধকার নামল।

মনে হল, গোটা তিনেক নিশ্বাস পড়ল একসঙ্গে। চুপ করে কাটল কয়েক সেকেণ্ড। যে চাষীটি তখন থেকে বিড়িটা হাতে নিয়ে বসেছিল, সে এবার সেটা এগিয়ে দিলে লোকটির দিকে। আমি দূরের চোখ-ধাঁধানো করোগেটেড্ টিনের চালটার দিকে তাকিয়ে থেকেও দেশলাইয়ের আওয়াজ পেলুম, বুঝতে পারলুম ওরা তিনজনেই তিনটে বিড়ি ধরিয়েছে।

আমাকে ওরা চোখ দিয়ে দেখেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু মন দিয়ে কেউ দেখছিল না। ওরা দূরের সুন্দরবনে ছিল, নোনা গাঙের দেশে ছিল, ওরা গহীন গাঙে সাঁতার কাটতে দেখেছিল বুনো শুয়োরকে, কড়মড় করে এই বড়ো বড়ো কাঁকড়া খেতে দেখেছিল। আমি সেখানে কেউ নই। ও-সব আমার দেখবার কথা নয়।

একটু সময় কেটে গিয়েছিল, তবু ওদের একজন মনে করে আগের কথারই জের টানল। এই সব সাধারণ মানুষের যেমন করে বলা উচিত, তেমনি বোকা-বোকা

ভঙ্গিতে বললে, 'তা বটে, শুয়োরের কথা মনে পড়ে যায় বইকি। মানুষ যদি শুয়োর হত, তা হলে অমন করে বানের তোড়ে তলিয়ে যেত না, নাক উঁচু করে সাঁতরাতে সাঁতরাতে যেখানে হোক পাড়ি দিত।'

'কিংবা'—যে লোকটাকে দেখলে গা-টা একটু শিউরে শিউরে ওঠে, সাধারণ গেঁয়ো মানুষের কেমন যেন ভক্তি করতে ইচ্ছে যায়, কথা বলতে বলতে যার বাঁ চোখটা কুঁচকে যায় বার বার, একটু মোটা আর ভাঙা যার গলার আওয়াজ, সেই খুলনা জেলার মানুষটা আবার বললে, 'কিংবা হাতের কাছে দু'চারটে বুনো শুয়োর পেলে বেঁচেও যেত কেউ কেউ।'

'বুনো শুয়োর পেলে? সে আবার কি রকম কথা?'

সে আবার কি রকম কথা—আমিও এটা জিজ্ঞেস করতে পারতুম। কারণ—এই সেদিন—উত্তর বাংলাব বন্যার সময় আমিও তো ছিলুম এক বন্ধুর বাড়িতে। শেষ রাতে জল এল, হুড়মুড় করে তলিয়ে গেল টিনের ঘর—কে যে কোথায় উধাও হল, আমি জানিও না। লাফিয়ে বেরিয়ে একটা গাছে উঠে পড়েছিলুম, জল নেমে গেলে এক কোমর পলি আর আতঙ্কে জমাট মৃত্যুর জগৎ ঠেলে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছি। বন্ধু, তার স্ত্রী—তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ের খবর নেবার সময় ছিল না, উপায়ও ছিল না। দিন সাতেক পরে—অনেক কষ্টে নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যাকে সামনে পেয়েছি—অনেক রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়েছি তাকে। আমি যদি একটা বুনো শুয়োর হতুম—এর বেশি কী আর করতে পারতুম আমি!

লোকগুলোর আলাপ-আলোচনায় আমার কেমন একটা অস্বস্তি হল, একবার ভাবলুম, আমার পকেটে 'ফ্রেশ-লাভার্স' বলে যে পেপারব্যাকটা আছে, সেটা বরং পড়ি—ট্রেনের তো এখনো চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। তবু ওদের কথাবার্তা আমার কানে আসতে লাগল, আমি ঠিক শুনতে চাইলুম না—তবু শুনে যেতে লাগলুম—করোগেটেড টিনের চালটা চোখের সামনে ঝকঝক করে চলল।

তারপর সেই লোকটার গলা আরো গভীর হতে থাকল, স্মৃতির ভেতরে ডুবে গিয়ে মানুষ যেমন করে কথা বলে—কখনো স্বপ্ন দেখে, কখনো জাগে, কখনো বাইরেটাকে আবছা করে দেখে—কখনো দেখে না, তেমনি স্পষ্ট অথচ ছায়া ছায়া ভঙ্গীতে ভাঙা মোটা আওয়াজে সে কথা কইতে লাগল। এখন তার স্বরে জোয়ারে ফেঁপে ওঠা রায়মঙ্গল নদী গম গম করতে লাগল, নোনা সমুদ্রের হাওয়ায় সুন্দরী-হেঁতাল-গোলপাতার মর্মর উঠতে লাগল। আমি এতক্ষণ কোথাও ছিলুম না—এবার ওই লোকদুটো, রেলের লাইন, রোদ-ঝলসানো টিনের চাল, রাধাচূড়োর ছায়া—সব

মিলিয়ে গেল। চারদিকের অন্ধকারের ভেতর শুধু স্মৃতি জড়ানো একটা স্বর জেগে রইল কুয়াশামাখা আলোর বৃত্তের মতো।

'দেশ-ঘর যখন গেল, তখন বউ আর দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি শেয়ালদা স্টেশনে। তারপর ক্যাম্পে। তারও পরে? বউটা মরল কলেরায়, ছেলেটা ভিক্ষুকের দলে মিশল। মেয়েটা একটু বড়ো হয়েছিল—সেটা যে কোন্ চুলোয় গিয়ে পৌঁছুল বোধ করি ভগবানও তা জানে না।

তা ভাই ছাড়ান দাও এ-সব কথা, এগুলো শুনে শুনে তো তোমাদের কান পচে গেছে। মোদ্দা—বছর না ঘুরতেই আমি হাত-পা ঝেড়ে সাফসুফ হয়ে গেলুম। তখন যেখানে যাই—যেথাই থাকি, আমার কিসের ভাবনা! ঘুরতে ঘুরতে চলে এলুম বাংলা দেশের আর এক মুল্লুকে।

কী না করেছি বছর দুই ধরে। সরকার থেকে লোন দিয়েছিল, ব্যবসা করতে গেলুম—ছ' মাসও টি^কল না। জাত চাষীর ছেলে, সাত জন্মে করেছি ও-সব, না বুঝি কিছু!

আসামের দিকে দল বেঁধে গিয়েছিলুম একবার—পাহাড়ের ঢালে বাস্তু বেঁধে জমিতে চাষ দিয়েছিলুম—বলব কী ভাই সোনা ফলেছিল; কিন্তু থাকতে দিলে না। প্রথমে এল সরকারী নোটিশ, কিন্তু বন-বাদাড় কেটে এত কষ্টে ফসল করেছি—ছেড়ে যাব? তাতে দিলে হাতি লেলিয়ে। ঘরদোর ভেঙে, আমাদের বুকের পাঁজরার সঙ্গে ফসল দলে-পিষে উৎখাত করে দিলে—হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিলে এরা পাকিস্তানের চেয়েও সরেস।

ও-সব কথা থাক দাদা—আমাদের ছোট মুখে মানায় না। কাঁদতে কাঁদতে কে যে কোন্ দিকে ছটকে পড়ল বলতে পারিনে, আমি আসাম ছাড়িয়ে আবার বাংলা দেশে এলুম।

পৌঁছেছিলুম একটা ছোট শহরে। জনমজুর খাটলুম কিছুদিন, কিন্তু চাষীর রক্ত যাবে কোথায়। কারো কাঁধে লাঙ্গল দেখলে, হাওয়ায় ধানের শীষ দুলতে দেখলে, এক পশলা বৃষ্টির পর ক টা লাউ-কুমড়ো-পালঙের পাতা সবুজ হয়ে লকলক করতে দেখলে যেন কান্না উছলে উঠত বুকের ভেতর।

সরকার থেকে তখন লোক পাঠাচ্ছিল আন্দামানে, জমি-টমি দেবে। কিন্তু সেই হাতির পর থেকেই আমার ভয় ধরেছিল, দাদা। সে তো কালাপানির দেশ—সেখানে আবার কী লেলিয়ে দেবে কে জানে। আমার আর কী আছে, মরি তো এই বাংলা দেশেই মরব।

চাষীর ছেলে—একটুখানি জমি চাই আমার। এক বিঘে না হয় দশ কাঠা, দশ কাঠা না জুটলে পাঁচ কাঠা। কিন্তু কে দেবে জমি—কোথায় জমি! এ তো আমাদের দেশ নয় যে বন কেটে আবাদ করব, বাঘ-কুমির-সাপ তাড়িয়ে মাটির দখল নেব।

তবু আবার জমি পেলুম।

শহরের বাইরে এক পাহাড়ী নদী। যত বড়ো নদী, চড়া তার চাইতেও বেশি। এই চড়া বোধ হয় সরকারী সম্পত্তি—কিন্তু তাতে এখন কাশ, শন আর ইকড়ার জঙ্গল। আগে বর্ষায় চডাটা তলিয়ে যেত, কিন্তু দশ-বারো বছর ধরে তার খানিক জায়গা অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে, আর ডোবে না—সেখানে ঘাস-পাতা পচে বেশ জমি তৈরি হয়ে গেছে।

মানুষজন কেউ থাকে না—কার গরজ পড়েছে ওখানে থাকতে। নদীর খেয়া পেরিয়ে রাত-বিরেতে যারা চর পেরিয়ে আসে, তারা হাওয়ার ঘাসবনের শাঁই শাঁই শব্দ শুনে মনে মনে রাম নাম জপে। তা ছাড়া ভয় দেখাবার জন্যে দুটো-চারটে আলেয়া তো আছেই।

বিশ্বেস করবে কিনা জানি না, জমির খিদে আমি আর সইতে পারছিলুম না, কিছুতেই থামতে চাইছিল না বুকের কান্না। একটা ধানের ছড়া দেখলে, দুটো শাকের পাতা দেখলে যেন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আমার।

শেষকালে খ্যাপার মতো আমি ওই চরে গিয়ে উঠলুম। হাতে যে দু-চারটে টাকা ছিল, তাই দিয়ে দা কিনলুম, কোদাল কিনলুম, খুঁটিনাটি আরো কিছু কিনলুম। আমার জমি আমিই গড়ব।

একাই? একাই। আমার আর কে আছে—তা ছাড়া আর কেই বা আমার সঙ্গে যাবে ওই ভূতুড়ে চড়ায় জমি গড়তে? কোন্ ফসলটাই বা ফলবে ওখানে? বালি জমি, ধান-পাট কীই বা হবে?

কিন্তু কিছু না হোক, ক'টা শাক তো তুলতে পারব। পটোল হবে নিশ্চয় দু-চারটে, ফুটি-তরমুজও কি ফলাতে পারব না?

আরো দশ ঘর উদ্বাস্তুর সঙ্গে আমারও একটা হোগলার ঝাঁপ ছিল শহরের এক টেরেয়। সেটা তুলে নিলুম।

সবাই অবাক হয়ে বললে, "কোথায় চললে?"

"নদীর চড়ায়।"

"সেখানে কী?"

"জমি গড়ব।"

"মাথা খারাপ? কী জমি হবে ওই কাশ আর শনের জঙ্গলে?"

"জানিনে। চেষ্টা করে দেখব।"

ঠাট্টা করে কী বিশ্বাস করে বলতে পারি নে, একজন বললে, "ওই চড়ায় পেত্নী আছে।"

বললুম, "দেশ ছাড়বার পরে মরে তো ভূত হয়ে আছি, পেত্নীতে আমার কী করবে?"

মরুক গে—সব কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যায়। আমি একাই বাস্তু বাঁধলুম নদীর চড়ায়। বয়েস অল্প ছিল, কব্জিতে জোর ছিল, মাথার ভেতরে খ্যাপামি ধরে গিয়েছিল। লেগে গেলুম জঙ্গল কাটতে। গোটা কতক সাপ-খোপ মেরে শেষতক বিঘেটাক জমি সাফ হয়ে গেল।

তোমরাও তো চাষী, জানোই তো ভাই—মাটিতে মন থাকলে মাটি তোমায় কক্ষনো ঠকায় না। কিছু সে তোমায় দেবেই। শাক-সব্জী হল, পটোল হল, ফুটি ধরল। তখন দিনের বেলা যারা চেয়েও দেখত না, আর রাত-বিরেতে চড়া পেরিয়ে যাওয়ার সময় রামনাম করত, তারাই দু-একজন করে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

"বাঃ, বেশ পটোল হয়েছে তো তোমার।"

"এ মাটিতেও তো শাক-টাক হয় দেখছি।"

এক-আধজন বলত: "এই চড়ায় একলাটি থাকো, তোমার ভয় করে না?"

"কিসের ভয়?"

"মানে—জন-মনিষ্যি নেই, তেনাদের যাওয়া আসা আছে—"

বলতুম, "তেনাদের তো কখনো দেখিনি। যদি আসেনই, আলাপ করে নেব।"

"তোমার সাহস আছে—বলতে হবে সে-কথা।"

"হুঁ। এখানে—এমন একলাটি থাকা—"

শুধু একজন একবার বলেছিল, "পাহাড়ে নদীর চড়ায় ঘর বাঁধলে হে?" সব নদীকে বিশ্বাস করতে নেই। ইচ্ছে মতো খাত বদলায়—একদিন এসে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে হয়তো।"

"বারো বছর যদি ঝাঁপিয়ে না পড়ে থাকে, আর পড়বে না।"

নদীকে আমার ভয় ছিল না, কিন্তু সত্যি বলতে কি—প্রথম প্রথম রাত্তিরগুলোকে তেমন ইয়ে লাগত না। অন্ধকার থাকলে চারদিকটা কেমন থমথম করত, বাতাসে

কাশ-শন-ইকড়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজে কেমন ভূতুড়ে কান্না শোনা যেত একটা। অনেক দূরে একটা শ্মশানঘাটা—তার চিতার আগুন দেখা যেত—আরো খারাপ লাগত তখন। অদ্ভুত আওয়াজ করে এক-আধটা পোকা ডাকত, অমন শব্দ এর আগে আর কখনো শুনিনি। যেদিন চাঁদ উঠত—সেদিন কেমন সাদা সাদা মরা আলোয় ভরে যেত সবটা, মনে হত সমস্ত চড়াটা জুড়ে চিতার ধোঁয়ার মতো কী যেন জমাট হয়ে আছে, বাদুড়ের ডানার আওয়াজ শুনলে পর্যন্ত কেমন একটা কাঁপুনি জেগে উঠত বুকের ভেতরে।

কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেল। তারপর এমন হল যে আঁধার রাতে এই চড়ায় আমি একলা মানুষ বসে আছি—এইটে ভাবতেই ভালো লাগত আমার। ভাবতুম—আমি সব পারি—সব বন-বাদাড় কেটে এই ভূতুড়ে চড়ায় সমস্ত জমি উদ্ধার করে আনতে পারি—ফসলে ফসলে ভরে দিতে পারি। এ চর কারো নয়, কেউ এর মালিক নয়—আমি একে দখল করেছি, এ আমার, শুধুই আমার।

তখন চাঁদের আলোরও রঙ বদলাতে লাগল। চিতার ধোঁয়া নয়—জ্যোছ্না রাত্তিরে যেন দুধের বান ডেকে যেত। আমি দেখতে পেতুম, সেই আলোয় আমার ফসলগুলো শ্বাসে আর স্বাদে ভরে উঠছে—টিপ টিপ করে ঝরা শিশিরে আরো দুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে উঠছে ক'টা বেগুন, ক'টি ছাঁচিকুমড়ো। আর তখন আমার মনে হত—এখন যদি বউ থাকত, আমার ক'টা ছেলেমেয়ে থাকত—

এমনি একটা জ্যোছ্নার সন্ধ্যায়, আমার একলা ঘরের দাওয়ায় বসে এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি একদিন ভয়ানক চমকে উঠলুম।

একটু দূরেই ছায়া ফেলে গোল মতো কী একটা দাঁড়িয়ে।

বাছুর?

আরে দূর—এখানে কার বাছুর আসতে যাবে? তা ছাড়া অমন চেহারা তার হতে যাবে কোন্ দুঃখে? এ অনেক মোটা, গোল, বেঁটে বেঁটে পা, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা, গায়ে খাড়া খাড়া বড়ো লোম, মুখের ডগাটা ছুঁচোলো, আর তার ওপরে ওলটানো নখের মতো বাঁকা দাঁত একটা। দেখেই বুক চমকে গেল, প্রকাণ্ড একটা মদ্দা বুনো শুয়োর।

অ্যাদ্দিন আছি এখানে—দেড়-দু বছর হয়ে গেল, এ মক্কেলকে তো এর আগে কখনো দেখিনি। গোটা চড়াটাই আমি ঘুরেছি, বন-বাদাড় ঠেঙিয়েছি, শন কেটে এনে ঘরে ছাউনি দিয়েছি—দু-চারটে খরগোস ছাড়া আর তো কিছু চোখে পড়েনি এর আগে। সাপ অবিশ্যি আছে, তা যে তল্লাটের মানুষ আমি—সাপ নিয়ে তো

নিত্যি ঘর করতুম। এ হতচ্ছাড়া তো এখানে আগে ছিল না—থাকলে নিশ্চয় দেখা হয়ে যেত অনেক আগেই।

এল কোত্থেকে?

কিন্তু সে ভাবনা পরে। এখন তো বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। মদ্দা দাঁতাল শুয়োর—জানোই তো কী বজ্জাত জানোয়ার। আচমকা মুখোমুখি হয়ে গেল তো আর কথা নেই—সোজা তেড়ে এসে নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। আমার এক পিসেমশাইকে শুয়োরে মেরেছিল—সে কথা মনে হলে এখনো গায়ের ভেতরে আমার ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে।

বেশ ছিলুম একলা চড়ায়—রাজার হালে। কোত্থেকে এই আপদটা এসে জুটল হে?

ঘরে একটা সাপমারা বল্লম ছিল। ভাবলুম, এনে তাক করে দিই ছুড়ে। তার পরেই মনে হল, যদি ফসকায়? প্রায় হাতির ছানার মতো চেহারা—তার ওপর যা বদখচ মেজাজ। একেবারে ঘর সুদ্ধুই উড়িয়ে দেবে আমাকে।

আমি যেখানে ছিলুম সেইখানেই রইলুম ঠায় বসে, আর শুয়োরটাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমার দিকে চেয়ে রইল। নড়া-চড়া কিচ্ছু নেই, যেন কাঠের পুতুল।

আমি দেখতে লাগলুম জ্যোছ্‌নায় ওর ক্ষুদে চোখ দুটো মিটমিট করে জ্বলছে—একটা গোলমতন ছায়া জমে আছে ওর পায়ের কাছে, আর আমার দিকে তাকিয়ে ও যে কী দেখছিল সে ওই-ই বলতে পারে।

একটু পরে ফোঁস করে গোটা দুই শ্বাস ছাড়ল, ঘোঁৎ করে যেন আওয়াজও তুলল একটু, তারপর আস্তে আস্তে খুট খুট করে বেরিয়ে গেল ঘরের সামনে থেকে। আমি দেখতে পেলুম, একটু এগিয়ে ঢুকে গেল ঘাস বনের ভেতরে।

আপদ এখন তো গেল, কিন্তু গোটা রাত্তির আমি ঘুমুতে পারলুম না। এ তো মহা জ্বালা হল দেখছি। আর তো আমি ইচ্ছেমতো এদিক-ওদিক ঘুরতে পারব না—বলতে পারব না, আমি এখানকার মালিক, এই চর আমার রাজত্বি। এ ব্যাটাচ্ছেলে কোন্‌খানে ঘাপটি মেরে থাকবে—কখন কে জানে এর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে—তারপর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাড়া লাগাবে—যাকে বলে শুয়োরের গোঁ। ঘাস-কাশের বন আর এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে আমি দৌড়েও পালাতে পারব না—ওই দাঁত দিয়ে একেবারে ফালা-ফালা করে ফেলবে আমাকে।

কোত্থেকে এসেছে এ-কথা ভেবে লাভ নেই। কোন্ দূরের জঙ্গল থেকে পথ

তুলে কিংবা তাড়া খেয়ে এই চড়ায় এসে নেমেছে সে ওই মক্কেলই বলতে পারে। কিংবা কে যে কোথা থেকে কোথায় যায়—ভগবানেরও কি জানা আছে সে খবর? আমিও কি জানতুম, সুন্দরবন, অথই গাঙ আর মেঘবরণ ধানের দেশ থেকে স্রোতের কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে আমি এই চরে এসে ঠেকব? আমি কি জানতুম এমন সন্ধ্যাও আমার আসবে যখন গাঁয়ের বিশালাক্ষীর মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ উঠবে না, নিমগাছের ছায়া কাঁপবে না আমাদের উঠোনে, হাওয়ায় উঠবে না বুনো ফুল-গাছগাছালির সঙ্গে ফুটন্ত ভাত কিংবা তপ্ত খেজুর গুড়ের পাকে চিড়ের গন্ধ, শোনা যাবে না কীর্তনের গান? আমিও কি ভেবেছিলুম, আমার একলা সন্ধ্যায় কেবল ঘাসবনে শন শন করবে হাওয়া, কেবল অদ্ভুত আওয়াজ তুলে পোকা আর ঝিঁঝি ডাকবে আর অনেক দূরের জ্বলন্ত চিতা থেকে কয়েকটা আগুনের পিণ্ড লাফাতে লাফাতে এসে আলেয়া হয়ে দপদপ করবে এখানে-ওখানে?

তাহলে ওর দশা আমারই মতো। ওরও আলাদা জঙ্গল ছিল, চেনা মাটি ছিল, বুনো ওল ছিল। হয়তো বা শুয়োরদেরও দেশ আলাদা হয়ে গেছে, তাড়া খেয়েছে সেখান থেকে। ও ব্যাটাচ্ছেলেও আমারই দলের—বাস্তুহারা।

বাস্তুহারা কথাটা মনে হতে একটু হাসি পেলো, কিন্তু বেশিক্ষণ হাসিটা থাকল না। বাস্তুহারা হোক আর নাই হোক—আদতে তো বুনো শুয়োর। মানুষের শত্তুর। যখন নিজের তালে আছে, বেশ আছে। কিন্তু যা মেজাজী জানোয়ার, একবার যদি ক্ষেপল তো—

পরদিন থেকে যা হোক একটা দা কিংবা বল্লম সব সময় রাখতুম হাতের কাছে। চলতে-ফিরতে বার বার নজর রাখতে হত চারপাশে। আর বলব কি হে—দেখাও হয়ে যেত শুয়োরটার সঙ্গে।

কিন্তু দেখা হলেই দাঁড়িয়ে যেত ওটা। দিনের বেলায় দেখেছিলুম—রাতে যা ভেবেছি, জানোয়ারটা তার চেয়েও বড়ো। গা ভর্তি ঝাঁটার মতন রোঁয়া—মস্ত দাঁতটা চকচক করছে শাদা, এখানে-ওখানে কাদার চাপড়া লাগানো ইয়া পেল্লায় শরীর। তেড়ে এলে মা বলতেও নেই বাপ বলতেও নেই। কিন্তু যেই মুখোমুখি হল কিংবা আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বোঁ করে—অমনি ঠায় দাঁড়িয়ে গেল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। নড়া-চড়া নেই—কিছুই না—খানিকটা কেবল মিটমিট করে চেয়ে রইল, তারপর যেন কিছুই হয়নি—এমনি করে গা দুলিয়ে তুর তুর করে কোন্‌দিকে চলে গেল।

অনেকবার ভেবেছি তুলি বল্লম—ধাঁ করে মেরে দিই, কিন্তু কিছুতেই হাত

উঠত না। কেবল মনে হত—ও যখন আমায় কিছু বলে না, তখন খামোকা ওকে আমি মারতে চাই কেন!

দিনের বেলা আমার ঘর-দোরের দিকে ওকে কখনো আসতে দেখিনি। আমি ভেবেছিলুম, এই এল শুয়োর—আমার ক্ষেত-টেত খুঁড়ে কিছু আর রাখবে না—যে কটা ফুটি হয়েছে খেয়ে একেবারে শেষ করে দেবে।

তা গোড়ার দিকে এক-আধটু খোঁড়াখুঁড়িও করেছিল বইকি, শুয়োরের স্বভাব যাবে কোথায়। একদিন বেশি রাত্তিরে আওয়াজ শুনে বেরিয়ে দেখি—ওই কাণ্ড! কী মনে হল, হাঁক পেড়ে বললুম, "এই মক্কেল, কী হচ্ছে ওটা?" দুড় দুড় করে ছুটে পালালো, তারপর থেকে আর ও-সব করতে দেখিনি।

হতে পারে—দাঁতাল হলেও শুয়োরটা ভীতু, ভালো মেজাজ, হাঙ্গামা-হুজ্জৎ পছন্দ করে না। মানুষ তো কত রকমের হয়, জানোয়ারেরই কি রকমফের হতে পারে না? তবু আমার মনে হতে লাগল ওটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেছে। এই নির্জন ভূতুড়ে চড়ায় ও-ও একা, আমিও একা। আমারও এক এক সময় বুকের ভেতরে হু হু করে—মনে হয়, সব ছিল, ঘর ছিল, ছেলেমেয়ে ছিল; তখন নিজের এই রাজত্ব—এই ক্ষেতটুকু—এই জমি গড়বার সুখ—সব ফাঁকা হয়ে যায়, মনে হয়—আমার কিছুই দরকার নেই, কিছুই না। তেমনি ওই শুয়োরটাও একা—ওরও চেনা জঙ্গলটা কোথায় হারিয়ে গেছে, ওরও আপনার জন ছিল তারা কেউ নেই—কোথাও নেই। আমি যখন ফাঁকা মন নিয়ে কোনো অন্ধকার রাতে—কোনো জ্যোছ্‌নার ভেতরে দাওয়ার ওপর চুপ করে বসে থাকি—তখন অন্ধকারটা এক জায়গায় আর একটু ঘন হয়, জ্যোছ্‌নায় কখনো একটা ছায়া পড়ে—ওই শুয়োরটা এসে দাঁড়ায়। তখন ওরও একা লাগে—ও-ও সঙ্গ খোঁজে। আলোয় হোক আর আঁধারে হোক—ওর চোখ দুটো চিকচিক করে জ্বলে। ও এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে—আমি ওর দিকে চেয়ে থাকি। তারপর ফোঁস করে যেন একটা নিশ্বাস ফেলে, ঘোঁৎ করে একটু আওয়াজ হয়। কী একটা বুঝে নিয়ে ভারী শরীরটাকে একটু একটু দোলাতে দোলাতে আবার চলে যায় ঘাসবনের ভেতর।

তোমাদের অবাক লাগবে শুনলে, এর পর থেকে আমার আর ওটাকে ভয় লাগত না। কতদিন ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে আমার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেছে, কতবার দেখেছি কোথায় একটু কাদা জল জমেছে—খুশি হয়ে গড়াগড়ি করছে তার ভেতরে, কোনোদিন দেখেছি মাটি খুঁড়ছে নিজের মনে। আর রাত হলে, যখন চরের ওপর

কেবল শাঁই শাঁই করছে হাওয়া, যখন দূরের শ্মশানে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে চিতার আগুন—এমন কি মড়া-পোড়ার গন্ধও ভেসে আসছে এক-আধটু, আর আমি ফাঁকা মন নিয়ে—বুকের ভেতরে একটা কান্না নিয়ে বসে আছি, তখন ও এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে, যেন বলতে চাইছে নিজের কথা, যেন সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

শেষে এমন হল, শুনলে হাসি পাবে তোমাদের, দু-একদিন ওটাকে দেখতে না পেলে আমার মন খারাপ হয়ে যেত। আমি চমকে উঠে ভাবতুম—যেমন নিজের খেয়ালে এসেছিল তেমনি করেই চলে গেল নাকি আবার? আর ভাবলেই আমার ভয় করত। যতদিন একা ছিলুম—বেশ ছিলুম। কিন্তু ওটা আসবার পরে কখন যেন দুজন হয়ে গেছি। ও আমাকে বুঝতে পারে, আমি ওকে বুঝতে পারি। তখন বেরোতুম খুঁজতে। হয়তো দেখতুম, অনেক দূরে, অনেকখানি জঙ্গলের ভেতর কোথাও খানিক জল কাদার ভেতরে হাত-পা মেলে শুয়ে আছে। তোমরা বলবে, আমাকে পাগলে পেয়েছিল। আমিও কি তা ভাবিনি? কিন্তু সেই চড়ায় সব অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল, একটা আলাদা মন হয়ে গিয়েছিল আমার—আমিও একটা আলাদা জীব হয়ে গিয়েছিলুম যেন।

জিজ্ঞেস করতুম, 'আসিস নি কেন?'

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ তুলে ছুটে পালাতো। যেন লজ্জা পেতো মনে হয়।

বলবে, আমার এ-সব মনগড়া। যাকে বলে বুনো শুয়োর, বোকা, গোঁয়ার, কচু-কন্দ খুঁজে বেড়ায়, যখন-তখন যাকে ইচ্ছে তাড়া করে—তার বয়ে গেছে তোমার মনের কথা বুঝতে। নিশ্চয়—নিশ্চয়, সব মানি। তবু দেখতুম, সেই রাত্তিরে কিংবা পরের রাত্তিরেই ওটা এসেছে। আমার দাওয়ার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, ছোট ছোট চোখ দুটো চিকচিক করছে জোনাকির মতো। কিছুক্ষণ থাকত ওইভাবে—যা হোক একটা কিছু বুঝে নিত—তারপর আবার আস্তে আস্তে চলে যেতো নিজের মনে।

শহরের বাজারে তরকারী বেচতে আমি নিজে নিজে যেতুম না, অন্য লোক এসে আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যেত পাইকারি দরে। তারা আসত হপ্তায় দু'চারদিন, তা ছাড়া একটু দূর দিয়ে খেয়ার লোকজনের যাওয়া-আসা তো ছিলই। তাদেরই কারো চোখে পড়ে থাকবে। একদিন হঠাৎ দেখি, শহর থেকে শোলার টুপি আর হাফপ্যান্ট পরে, কাঁধে বন্দুক নিয়ে দু-তিনজন ভদ্দরলোক এসে হাজির।

প্রথমটা ভেবেছিলুম—চরের ওদিকটায় এ-সময়ে দু-চারটে চখাচখি পড়ে, তাই মারতে এসেছে। কিন্তু চলে এল আমার ঘরের দিকেই।

"তুমি এখানে থাকো?"

"আজ্ঞে।"

"এ-সব তরি-তরকারি তোমার?"

"আজ্ঞে।"

"এ তো খাসমহল জমি। পত্তনি নিয়েছ?"

"আজ্ঞে না।"

"বে-আইনি। একদম বে-আইনি।"

কে জানে, কাকে বলে আইন, কাকে বলে বে-আইন! এই ভূতুড়ে চড়ায় সরকারের নজর তো কোনোকালে ছিল না—আমিই এখানে একা হাতে মাটি গড়েছি, ফসল ফলিয়েছি। কিন্তু আইন বে-আইনের ভাবনা আমি আর ভাবতে পারি না। যেদিন হাতি এনে আসামের পাহাড়ে ফসলের সঙ্গে আমাদের বুকের পাঁজর অবধি দলে দেওয়া হয়েছিল, সেদিন থেকে ও-সব ভাবনা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বাবুদের একজন ফস করে একটা সিগারেট জ্বাললেন। বললেন, "যাক্, সে-সব পরে হবে। এই চড়ায় বুনো শুয়োর আছে, তাই নয়?"

ধক্ করে উঠল আমার বুকের ভেতরটায়। আমি তিনটে বন্দুকের দিকে তাকালুম।

"কে বললে আপনাদের?"

"আমরা খবর পেয়েছি।"

তোমরা শুনলে রাগ করবে কিনা জানিনে, আমি দেখেছি, হারামীর দিকে জানোয়ারের চেয়ে মানুষেরই টাঁক বেশী। তক্ষুনি মনে হল, বলি: "যান ওদিক পানে—কাদার মধ্যে বসে আছে দেখেছি একটু আগে, দিন সাবড়ে।" আর তক্ষুনি কে যেন কানে কানে বললে, "ছি ছি হে, তুমি শুয়োরের চাইতেও ছোটলোক হয়ে গেলে। ও তোমায় বিশ্বেস করে, তার এই প্রিতিদান।"

বললুম, "বাজে কথা। আড়াই বচ্ছর ধরে আমি আছি এখানে। চরের জঙ্গল ভেঙে চলাফেরা করি। কোনো শুয়োর কখনো আমার চোখে পড়েনি।"

"কিন্তু একজন যে বললে—"

"ভুল বলেছে। শেয়াল-টেয়াল দেখে থাকবে হয়তো।"

"তুমি ঠিক জানো?"

"আজ্ঞে এই চড়ার আমি বাসিন্দে। আমি জানিনে তো অন্য লোকে জানবে?"

বাবুরা এ ও-র মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম, "তা খরগোস-টরগোস আছে দু-চারটে। খুঁজে দেখতে পারেন।"

"দূর, খরগোস অযাত্রা। আর সেগুলো খুঁজে কে সময় নষ্ট করবে—কেই বা টোটা খরচ করতে যাবে?"

বাবুদের দুঃখ হয়েছে মনে হল: "বাজে লোকের কাছে উড়ো খবর শুনে হাঁটা-হাঁটিই সার হল। চলো হে।"

শুয়োরটা সে রাতে এলো না, এল পরের রাতে। বললুম, "তোকে বাঁচিয়েছি, বুঝলি? তিনটে বন্দুক ছিল—কিচ্ছু করতে পারতিস না।"

নিঃসাড়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বললুম, "এবার ক'টা কচু লাগাব ঠিক করেছি। খুঁড়ে-মুড়ে যেন বরবাদ করে দিসনি। তাহলে ঠিক বলে দেব বাবুদের।"

তেমনি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল।

দিন কাটছিল, এইভাবে কতদিন কাটত জানি না। কিন্তু সেই সকালে সরকারী পেয়াদা এসে আমাকে নোটিশ দিয়ে গেল। কেন আমি খাসমহলের জমি জবর-দখল করেছি, কেন আইন-মোতাবেক পত্তনি নিইনি, হুজুরে হাজির হয়ে আমায় তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সেই যে তিনবাবু এসেছিল, তারাই কেউ ফিরে গিয়ে এই উপকারটা করেছে আমার।

নোটিশ নিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলুম ঘরের দাওয়ায়। আগের দিন থেকেই টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছিল, আজ আকাশ আরো ঘোলাটে, আরো অন্ধকার। ওদিকে নদীতে জল বাড়ছে, গোঁ গোঁ করে উঠছে তার ডাক। ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে—চারদিকের ঘাসবনে ঢেউ উঠছে।

জল আসছে নদীতে। চরের খানিকটা ডুবে যাবে। কিন্তু আমি যেখানে আছি সেটা ডুববে না—আজ চোদ্দ বছর ধরেও ডোবেনি। নদীর ভাবনা নেই, আমি মানুষের কথা ভাবছিলাম। এমনি একটা মেঘলা দিনেই যখন ধানের ক্ষেতে বাতাস ঢেউ দিয়েছিল, সেইদিনই ওরা হাতি এনে—

পত্তনি নিতে হবে, খাজনা দিতে হবে? কত চাইবে কে জানে? নাকি উচ্ছেদই করে দেবে? ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখলুম বৃষ্টিতে ভিজে চিকচিক করছে পটোলগুলো—হাওয়ার মাতন লেগেছে ঢলঢলে লাউয়ের পাতায়। চোখ জ্বালা

করতে লাগল। সারাদিন কিচ্ছুটি খেতে ইচ্ছে করল না আমার—ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে রইলুম।

শুয়োরটার ভাগ্যি ভালো আমার চাইতে। ওকে খাজনা দিতে হয় না, পত্তনি নিতে হয় না, ওর উচ্ছেদের ভয় নেই। ভয় নেই? আমি যখন থাকব না—তখন ওরও তো পালা মিটে যাবে। তখন আবার তিনটে বন্দুক আসবে, হয়তো লোকজন নিয়ে ঘেরাও করবে জঙ্গল—তারপর একটা মস্ত দাঁতাল শুয়োর মারবার আনন্দে বাবুরা—

সব বিশ্রী লাগছিল, সব ফাঁকা ঠেকছিল, অনেকদিন পরে বৌ আর ছেলেমেয়ের জন্যে আমার কান্না আসছিল। হাওয়া-বৃষ্টি-দুর্যোগের ভেতরে সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে যে কিভাবে কেটে গেল জানি না। তারপর রাতে ঘুমে এল, আর তারো পরে—

জেগে উঠলুম বানের ডাকে। ঝড়-বৃষ্টির প্রায় মহাপ্রলয় তখন। কিন্তু কিছু আর ভাববার সময় ছিল না। চর ভাসিয়ে ছুটে এল পাহাড়ী নদী—মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ঘর, আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছিলুম—এক ঝটকায় আমাকে কুটোর মতো তলিয়ে নিয়ে চলল।

ডুবতে ডুবতেও টের পেলুম আমার কাছেই কেমন একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ। তা হলে দুজনেই ভেসেছি—দুজনেই আবার একসঙ্গেই বাস্তুহারা। কী করে কী হল জানি না—আমি দু-হাতে শুয়োরটাকে জাপটে ধরে মাথা জাগিয়ে তুললুম। আর সেই প্রকাণ্ড জানোয়ারটা—যার স্বজাতেরা সুন্দরবনের গহীন গাঙ পেরিয়ে চলে যায়—যারা সমুদ্দুরের মতো রাক্ষুসে নদীকে ভয় পায় না—বাঘ-হরিণ পৌঁছুবার আগে যারা নতুন জাগা চরে গিয়ে বাস্তু বাঁধে, সে আমাকে টানতে টানতে—জলের ওপর নাক তুলে সাঁতার কাটতে কাটতে সেই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল।

আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে ক্ষ্যাপা স্রোত মরণ-সাপট দিচ্ছিল। সইতে পারলুম না—আমি জ্ঞান হারালুম।

যখন চোখ চেয়েছি, তখন সকাল। দেখি, জনতিনেক মানুষ আমায় সেঁকতাপ করছে। বললুম, "শুয়োরটা?"

তারা বললে, "কিসের শুয়োর? বানে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ডাঙায় ঠেকেছিলে, আমরা তুলে এনেছি তোমায়। কোথাকার লোক হে?"

'শুয়োরটা কোথায় গেল জানি না। হয়তো আমায় কোনোমতে ডাঙায় ঠেলে দিয়ে সে নিজে আর উঠতে পারেনি, ভেসে গেছে। তোমরা হাসবে, পাগল বলবে

আমায়—কিন্তু আমি ঠিক জানি, ও যদি বেঁচে থাকত কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ত না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার মতো ওঁরও তো কোন দোসর নেই।'

সেই ভাঙা গভীর গলাটা থামল। নিঃশব্দে বসে থাকল দুটি চাষী, আমি করোগেটেড টিনের চালটার দিকে চেয়ে রইলুম, আমার চোখ জ্বলতে লাগল, একটা ক্লান্ত কাক ডেকে চলল রাধাচূড়োর ডালে।

সেই লোকটা আবার বললে, "কখনো শুয়োর মানুষ হয়, বুঝেছ—কখনো আবার মানুষ—

চমকে আমি উঠে দাঁড়ালাম—আমাকেই বলছে ? স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে আমি এগিয়ে চললুম। ট্রেনের সিগন্যাল দিয়েছিল। আমি ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী—আমার কামরাটা থাকবে আর একটু ওদিকে। গাড়ী ফাঁকা থাকলে বসে বসে পড়তে পারব "ফ্লেশলাভার্স" বইটা; আর তেমন যদি সহযাত্রী পাই তা হলে বেশ রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়ে উত্তর বাংলার বন্যার গল্পও শোনাতে পারব তাদের। রেল স্টেশনের এই উদ্ভট বাজে গল্পটা ভুলে যেতে আমার সময় লাগবে না তখন।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আত্মজা ও একটি করবী গাছ □ হাসান আজিজুল হক

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

এখন নির্দয় শীতকাল, ঠাণ্ডা নামছে, হিম আর চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায়। অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায় একবার পিঠ দেখায়। ওদিকে বড় গঞ্জের রাস্তার মোড়ে রাহাত খাঁনের বাড়ীর টিনের চাল হিম ঝকঝক করে। এক সময়ে কানুর মায়ের কুঁড়েঘরের পৈঠায় সামনের পা তুলে দিয়ে শিয়াল ডেকে ওঠে। হঠাৎ তখন স্কুলের খোয়ার রাস্তার দু'পাশের বন-বাদাড় আর ভাঙ্গা বাড়ীর ইঁটের স্তূপ থেকে হু-উ-উ চিৎকার ওঠে। ঈশেন কোণ থেকে এখন ধর ধর লে লে শব্দ আসে, অন্ধকার—ভূত অন্ধকার কেঁপে কেঁপে ওঠে, চাঁদের আলো আবার ঝিলিক দেয় টিনের চালে। গঞ্জে রাস্তার উপর ওঠে আসে ডাকু শিয়ালটা মুখে মুরগী নিয়ে। ডানা ঝামড়ে মুমূর্ষু মুরগী ছায়া ফেলে পথে, নেকড়ের মত ছায়া পড়ে শিয়ালটার, যাবার দিকে মুখ তুলে চায় সে, রাস্তা পেরোয় ভেবেচিন্তে—তারপর স্কুলের রাস্তার বাদাড়ে ঢোকে। হাতে লাঠি চাঁদমণির বাড়ীর লোক ঠ্যাঙাড়ের দলের মত হল্লা করে রাস্তায় পড়ে—কোন দিকে গেল শালার শিয়েল, কোন দিকি ক দিনি। আরো হিম নামে।

বড় পুলের ওপর থেকে নীচের পানিতে আপন ছায়া দেখতে চায় নিবিষ্ট হয়ে সরদারের ছোট তরফের বড় ছেলে ইনাম। পানির রুপোলী মেঝেয় হাতড়ে বেড়ায় নাক-মুখ। হিম নামে যেন শব্দ করে, বাতাস আসে শির শির, খড়মড় উড়ে যায় বিকেলের বাদাম খোলা, পাগলীর নোংরা ন্যাকড়া চেক লুঙিতে সেঁটে থাকে। খাদের আসশ্যাওড়ার পাতা থেকে আলো চলকে ওঠে, কাঁঠাল গাছের পুবদিকের ডাল হাত নাড়িয়ে ডাকতেই থাকে বিচ্ছিরি। অজস্র খঞ্জনী বেজে ওঠে ঝনঝন।

ইনাম পুল ছেড়ে ধুলো ভেঙে শুকনো বিলের কিনারায় দাঁড়ায়। সেখানে

শঙ্খচূড়োর মত দেখায় যে ধবল পথটা এখন তা ত্রস্ত হয়ে এলো, আর ফেকুর বাঘের মতো শরীরটা দেখা গেল। তার পেছনে সুহাস। ওরা খুব গল্প করছে। যে জন্য এখানে এখন এত রাতে সে সম্বন্ধে কোন কথা নেই। কখন সুহাস মামার বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল, অমৃতের মত পুরী খেয়েছিল আর অঢেল মিষ্টি, সেই গল্প। ট্রানজিস্টারটা বেজেই চলছিল ফেকুর বগলে, ওরা কেউ শুনছিল না, কণিকা বিলের কিনারায় দারুণ ঠাণ্ডায় বৃথাই গাইছিলেন অন্ধকারে একা থাকার যন্ত্রণা। ইনিয়ে বিনিয়ে। আর আশ্চর্য একটা পাখিও ডাকছিল না। বিলটা চিৎপাত হয়ে পড়েছিল। রেডিওটা বন্ধ করে দে—ওদের দেখে ইনাম বলল। অসহ্য লাগছিল তার। আইছিস—দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা দুজনে। সুহাস হাসল, বিড়ির ধোঁয়ায় কালো দাঁতগুলো প্রায় মুখের বাইরে চলে এলো। ইনামের আবার অসহ্য লাগল। রেডিও বন্ধ করে দে—বলল সে। কেউ শোনপে না, শোনলেও এদিকি আসবে নানে কেউ, ফেকু বলল, সেজন্য বলতেছি না, খারাপ লাগতেছে গানডা। কণিকার গলা টিপে দিল ফেকু। এখন চল, দেরী করলি ঘুমিয়ে পড়বেন আবার, ফেকু বলল আর ট্রানজিস্টারটা সুহাসের হাতে দিল। সেটা নিতে নিতে সুহাস প্রশ্ন করে, কেডা? বুড়োডা আবার কেডা! সন্ধ্যে হলে ঘুমিয়ে পড়বে কেশো বুড়ো—থু করে থুথু ফেলে বলে ফেকু। যেতে যেতে বাতাস বেড়ে গেল একটু—ফাঁকা বিল থেকেই আসছিল বাতাসটা। শুকনো পাতার শব্দ হচ্ছিল। ঝপ্‌ করে মাছ লাফিয়ে উঠল কাজীদের পুকুরে। আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল খাঁদের বাড়ীতে ধান সেদ্ধ হচ্ছে উঠোনে। উনুনের আগুন দপ্‌ করে জ্বলে উঠে খাঁদের সুন্দর সুন্দর মেয়েদের মুখ একবারের জন্য ঝলসে উঠল। ইস্কুলি যাতিছিস না আজকাল—সুহাস জিজ্ঞেস করে। না—ইনাম জবাব দেয়। পড়বি না আর? না, পড়লি আমারে কেউ সিন্নি দেবে ক। চাকরি করবি। হয়, চাকরি গাছে ফলতিছে। সুহাস আর কিছু বলে না। ট্রানজিস্টারটা নিয়ে খুচরো শব্দ করে শুধু আর বেঢপ বুট জুতো দিয়ে ধুলো ছড়ায়। নাকে ধুলো এসে লাগতেই কুকুর গন্ধ পাওয়া যায়। ইনামের বিকালের কথা মনে পড়ে, হাটবারের কথা, মাছের কথা। মাছ থেকে নদী। নদী এখন প্রায় শুকনো, চড়া পড়ে গেছে। গরুর গাড়ীতে লোকে বালি এনেছে নদী থেকে। বাঁকের কাছে কাশ হয়েছে। এ পাড়ে স্কুল বাড়ী বড় সজনে গাছে ফিঙে, তার লম্বা লেজের দুলুনি। স্কুলের পেটা ঘড়ি ভেঙে গেলে এক টুকরো রেল ঝুলিয়ে লোহার ডাণ্ডায় ঘনাৎ ঘনাৎ আওয়াজ—হুড়মুড় করে হেডমাস্টার, শালার জোকার একটা, বই বগলে মাস্টার তারাপদ, তার পাকানো চাদর, আধভাঙ্গা দাঁত আর মুখে কথার ফেনা। এই

সব মনে পড়ল। ঝরঝর করে ছবিগুলো এলো, যেন দক্ষিণ বাতাসে শুকনো নিমের পাতা ঝরে পড়ছে, আর ছবিগুলো চলে গেল যেন ট্রেনটা যাচ্ছে পুল পেরিয়ে, মাঠের বুক চিরে ন্যাংটা ছেলেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। ছবিগুলো পেরিয়ে যেতেই খেয়াল হয় সুহাস সেই গল্পটা আরও তোড়জোড় করে বলছে, ছোটমামার বিয়ের বরযাত্রী যাবার গল্প। ওর একটা কথাও শুনছে না ফেকু, সে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল—চাঁদের আলোর মধ্যে দেশলাই-এর আগুনটা দেখালো ম্যাড়মেড়ে আর ফেকুর বিতিকিচ্ছি মুখটা দেখা গেল, কপালের কাটা দাগটা, মুরগীর মতো চোখ, নীচে ঝোলানো ঘোড়ার মতো কাল ঠোঁট। খাবি নাহি? ফেকু জিগ্‌গেস করে। সুহাস গল্প থামিয়ে সিগারেট নেয়, দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যাওয়ায় আর একটা জ্বালায় এবং আবার শুরু করে, লঞ্চে যাতি হয় তো, মধুমতী নদী দিয়ে—অন্ধকারের মধ্যে গেলাম—দুপাশে গেরাম না কিডা জানে—মনে হচ্ছিল সোন্দর বন। এমন অন্ধকার আর এমন জোঙগল বুজিচো। ইনামের মনে হলো সুহাস গতকাল থেকে গল্পটা বলছে আর আগামীকাল পর্যন্ত চলবে। নাপিত বেটা কমিয়ে কতি পারে না? একেবারে অসহ্য লাগলে এই কথা ভাবল ইনাম। সুহাসের গল্পে একশোটা পল্লব—ছোটমামার চেহারার বর্ণনা, বিয়ের সম্বন্ধ, পাত্রীর খোঁজ, পাত্রীর কাকার সঙ্গে ছোটমামার বাবার ঝগড়া, বিয়ের দিন ধোপাবাড়ী থেকে সিল্কের পাঞ্জাবী ভাড়া নিয়ে আসার ঝকমারি—কিচ্ছু বাদ দিচ্ছিল না সে—তাই ইনাম বলল, তোর ছোটমামা বিয়ে করতি গ্যালো ক্যানো ক তো? সুহাস কান দিল না; সকালে সূর্য উঠতি মধুমতী ঝকমক করতিছে, জ্যাঠামশাই ধপ্‌ করে কাদায় পড়িলো লঞ্চ থেকে নামতি গিয়ে আর মামীর বোনেরা যা সোন্দর সে আর কলাম না। তোর মামার বাড়ীডা কোয়ানে, শালিরা বেড়াতি আসলি কস আমাকে—ফেকু কথা না বললেই নয়, তাই বলে। সেটি হচ্ছে না, বুজিচো—চোখ বন্ধ করে মনের আরামে বলল সুহাস। ও, তাই তুমি মাসে পাঁচবার করি বেড়াতি যাচ্ছ, বুজিচি ওখেনে তো পয়সা কড়ি লাগে না—আরামেই আছ দেখা যায়—ফেকু চোখ মটকে বলে।

রাহাত খাঁনের টিনের চাল দেখা যাচ্ছে না আর, পুল কোথায়, বিল সরে গেছে কখন। চাঁদমণির বাড়ীর লোকজন চুপ করে গেছে এখন। একটা মুরগীর শোক আর কতক্ষণ থাকে! কাল হয়ত বসুবাবুদের ইঁটখোলায়, না হয় সরকারদের পড়োবাড়ীর ভেঙে-পড়া সিঁড়িঘরের মধ্যে বেচারির চকচকে পালক, হলদে ঠ্যাং কিংবা ঠোঁটের খণ্ডাংশ পাওয়া যাবে। চাঁদমণির লোকজন কাজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু বুড়িটা বসে আছে, ফাটা পায়ে তেল ঢালছে আর পিদিমটা কেন নিভছে না তা

পিদিম ছাড়া আর কেউ জানে না। কি ঠাণ্ডারে বাবা—বউ অ বউ আর একটা খ্যাতা দে, মরে গেলাম, হেই বউ। বউটা কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছে আর ছেলেটা বকছে বিড়বিড় করে, মরে যাচ্ছে না ক্যানো? বুড়ি আর একবার চেঁচায়, কিন্তু হঠাৎ হাওয়াটা ওঠে, সুমসাম শব্দ জাগে, বুড়ির কাঁপা গলা কেউ শুনতে পায় না। এইরকম জীবন চলতে থাকে।—ফেকু ঠোঁটে কুলুপ দেয়, সুহাস হঠাৎ ট্রানজিস্টারের চাবিটা ঘট করে খুলেই আবার বন্ধ করে দেয়—ইনাম মাথা নীচু করে ভাবতে থাকে।

রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর পা ঠুকে ধুলো ঝাড়ে ওরা। পাশের গলিপথটায় ঢোকার সাথে সাথে জাপটে ধরে অন্ধকার এবং সপাং করে চাবুক চালিয়ে দেয় কি একটা লতা। ফেকুর ঠোঁট খোলে, অতি জঘন্য একটি গাল দিয়ে ওঠে লতাটিকে। তারপর শান্ত হয়ে গল্প শুরু করে, শালা আজকাল এত বেশী ধরা পড়তিছি ক্যানে কতি পারিস? এই কথায় সুহাসের চোখ দুটি চকচক করছে কৌতূহলে, একটা কথা কই, কিছু কবি না ক। ফেকুর সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সে বলে, অত মার খাস কি করে, আমাকে বলতি পারিস? শালার দাদা এক চড় মারলি চোখে অন্ধকার দেহি। মার খাওয়াডা শিখতি হয় বুঝিচো বাপধন—ওস্তাদের কাছে শিখতি অয়। লেহাপড়ার জন্যি ইস্কুল যাতি হয় যেমন, তেমনি—ফেকু বলে। ইনামের আবার অসহ্য লাগে, ইস্কুলি লেহাপড়া বিয়োচ্ছে, বিটার শালার মাস্টাররা—ইনাম এমন কথা বলে যা মুদ্রণযোগ্য নয়। ফেকু তখন বলছে, ইস্টুপিট হলি আর মার খাতি না জানলি মান্‌সের পহেটের কাছে যাতি নেই। পহেট থে ট্যাহা বেরোয়ে থাকলিও না। টাকার কথা শুনে ইনাম অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল। টেণ্ডু ড্রাইভারের কথা শুনে ভীড়ে হাত দিয়েছিল বটিমুখো এক ভদ্রলোকের পকেটে—কাগজ খড়মড় করে উঠল আর এমন শব্দ হোল যে মনে হোল যে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। অ্যাও করে গড়র গড়র গর্জন করে উঠল লোকটা—কিন্তু আসলে ভদ্রলোক গলা ঝাড়ছিল। কাজেই ইনামের কাছে পয়সা নেই। নারকেল চুরি করে বিক্রি করলে হয়—কিন্তু ভাতের চালের অভাবে উপোস করে থাকতে বড়ো কষ্ট।

পথটায় অন্ধকার থকথক করছে। মাথার উপর বাঁ দিকে লতা ডান দিকে চলে গেছে জাল বুনতে বুনতে। গল্প করতে করতে ফেকু সুহাসের উপর এসে পড়ে আর সুহাস চীৎকার করে, উরে মরিছিরে বাপ। ফেকু বলে, দেহিস রেডিওডা ফালাস না, সেদিন কি হোল ক দিনি, এক বাস লোক—বাস যাচ্ছে চল্লিশ মাইল পঞ্চাশ মাইল স্পীডি, সামনের লোকটার পাঞ্জাবীর পহেট থে নোটগুলো বারোয়ে আছে—হাত দিতি খপ্‌ করে ধরে ফেলল। তারপর উরে মার ভাগাড়ে যেন গরু পড়েছে।

কপালি তার ঘা শুকোয়নি এহনও। এইবার গুণ্ডোটা শুরু করিছে ইনাম ভাবল। গল্প শুনতে শুনতে সুহাস ট্রানজিস্টারটা চালিয়ে দেয়, গর্জন করে ওঠে সেটা। আওয়াজটা কিম্ভুত শোনা যায় ঠাণ্ডা আর স্তব্ধ অন্ধকারে। সুহাস থুথু ফেলে বলে, শালা খ্যাল গাতিছে—বলেই চাবি বন্ধ করে এবং তুমি যে আমার জীবনে এসেছ ধরে দেয়। ভিটে থেকে একটা কুকুর উঠে এসেছে—ক্ষীণ চীৎকার করার চেষ্টা করছে। গলা যখন ফুটল না ইনামের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সমস্ত পাছাটা দোলাতে শুরু করে। নড়েচড়ে গরম হতিছ শালা—ফেকু মন্তব্য করল এবং কেন তার জীবন নষ্ট হোল, কে কে নষ্ট করল আর পকেটমারার কৌশল, তার নিজস্ব নৈপুণ্য, সাফল্য এবং পিটুনী খাওয়ার অভিজ্ঞতা বলেই যেতে লাগল। করবটা কি কতি পারিস? লেহাপড়া শিখলি নাহয়—। লেহাপড়ার মুহি পেচ্ছাপ—ইনাম বলল। আবার অসহ্য লাগল ওর। তাহলি—ফেকু ভেবেচিন্তে বলল, উঁচো জায়গায় দাঁড়ায়ে সবির ওপর পেচ্ছাপ। কাজ কোঁয়ানে, জমি নেই খাটি, ট্যাহা নেই ব্যবসা করি—কি কলাডা করবানে?

পাখীদের কোন গান নেই এখন। শব্দ শোনা যাচ্ছে চাপা। কুয়াশা আর হিম জড়িয়ে আছে ওদের। সামনে বিড়ালটা যখন পার হয়ে গেল, শুধু দুটি জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল তার। এখন সুহাস, ফেকু বা ইনাম কথা বন্ধ করেছে। সুহাসের বগলে ট্রানজিস্টার, ফেকু মাফলার মুখের উপর জড়িয়ে নিল—ইনাম হাতে হাত ঘষে একটু গরম করতে চেষ্টা করল। ডাইনে পালদের বাড়ী, মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈরী করে, পরিচয় জিজ্ঞেস করলে রাস্তা থেকে হেঁকে জবাব দেয় পাল মশাই; তাঁদের বাড়ীর পলস্তরা খসা-দেওয়াল, কারণ বাড়ীটা আসলে সেনেদের। ওরা চলে গেছে পঞ্চাশে। বাতাবি লেবু গাছটার পাশ দিয়ে যেতে চড়াৎ করে একটা পাতা ছেঁড়ে ইনাম আর ঠাণ্ডা উঠোনটার দিকে চেয়ে থাকে। পোড়ামাটির গন্ধ নাকে লাগে, কালো জালাগুলো ছড়িয়ে আছে দেখা যায়, ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘুমজড়ানো গোঙানো ভেসে আসে। সব ঘুমিয়ে পড়েছে—সুহাস বলে। ফেকু সায় দেয় ঘোঁৎ করে। আজ না আসলেই হোত—সুহাস অভিযোগ করতে থাকে, ভয় করতিছে আমার। ফেকু ভ্যাংচায়, ভয় করতিছে, কাঁচ ছ্যামরা, দুধু খাবা। সুহাস বলেই চলে, বুড়োরে দেখলি আমার ভয় করে। একবার মনে হয় মরে যাবেনে এহুনি, একবার মনে হয় আমাদের সব কডারে খুন করবেনে। বাড়ির মধ্যি ঢোহার সময় মুখডা দেহিছিস? দেহিছি—তুই থো, তাচ্ছিল্য করে ফেকু, পয়সা পালি মুখডা কেমন হয় দেহিস একবার। ফেকু হারামজাদাটারে খুন করতি পারলি হোত—ইনাম ভাবল। সুহাস পরে ফেকুর দলে মিশল। সে বলছে, এট্টু এট্টু সর হইছে এমন ভাবের মতো

লাগে মেয়েডারে। ঠিক কইছি না, ক। তোরেও খুন করতি পারলি হোত—ইনাম আবার ভাবল। ওরা এখন হাসাহাসি করছে, ঢলাঢলি করছে, কলবল করে আলাপ করছে। দু পা এগিয়ে ডাক্তারবাবু ভেতরে বসে আছেন—মোটা সাদা বিরাট শরীর, হারিকেন জলছে, তাই খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল আর পুকুরের বাঁধা ঘাটে একটি মাত্র শুকনো পাতা ফর ফর করে পাক দিতে থাকল। বাঁ দিকের খোলা জায়গাটা এসে গেছে এখন, কুয়াশার সঙ্গে মিশে ঘোলা দুধের মত চাঁদের আলো খুদে খুদে মরা ঘাসের ওপর পড়েছে। পেছনে জামগাছটা কালো—তার পেছনে সব কালো এবং নির্জনতা। আর এইসব ছাড়িয়ে যেতে আরও নিজনতা, পোড়ো জমি, জঙ্গল, পানের বরজটা, কাশ আর লম্বা ঘাস আর মজা পুকুর এবং বিল। এখন ডাইনে দড়ি দিয়ে ঝোলানো বাঁশের গেট। গেট পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জমি চিৎ হয়ে শুয়ে। কিছু ফলেনি সেখানে। ইনাম এখন পিছনে আছে, অনেকটা পিছনে, এমনকি ফিরে যেতে হতে পারে হঠাৎ এমন মনে হচ্ছে। লাল আলোটা আসছে কাঠের রড লাগানো জানালা দিয়ে, মজা পুকুরে শিয়ালের চকচকে চোখ ঝিলিক দিচ্ছে কিছু খুঁজে। ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি করে ডেকে ডানা ঝটপট করে পুরনো ডাল ভেঙে বাজ পাখিটা নড়েচড়ে বসল। ফেকু দড়ি ঝোলানো বাঁশগুলো তুলে ধরেছে, হাত নেড়ে ডাকছে সুহাসকে—সুহাস ট্রানজিস্টারটা হাতে নিয়ে অন্য হাতে ঠোঁট চেপে আছে, আর কিছুতেই এগোচ্ছে না। ইনাম চট করে সামনে এসে ফেকুর কাছে টাকা চায়, দুডো ট্যাহা দে—কাল দিয়ে দেবানে। বাঁশগুলো ছেড়ে দেয় ফেকু, অ, খালি হাতে মজা মারতি আইছ? মুহূর্তে সোনালী হাত সামনের আবছায়ায় ভেসে ওঠে নীল পানিতে সাদা মাছের পেটের মতো। সেই হাত মাথায় রাখে। চুল সমান করে দেয়। আঙুলে তেল আগলে আঁচলে মোছে। ইনাম নিজে কিনে দিলেও মিলের শাড়িটা খুলে নেওয়া যায় না তখন। ব্যাকুল হয়ে ইনাম বলে, দুডো ট্যাহা দে, কাল দেবানে, সত্যি কচ্ছি। ট্যাহা লাফাচ্ছে, মোডে দুডো ট্যাহাই আছে আমার কাছে—ফেকুর মুলোর মতো দাঁতগুলো কড়মড় করে ওঠে। তা হলি সুহাস দে—দে সুহাস, কচ্ছি কাল দেবানে, ঠিক কচ্ছি দে সুহাস, তোদের মা কালীর দিব্যি, কাল দিয়ে দেবানে—ছটফট করে ইনাম। সুহাস বলে ফেকুকে, কিছু কয়নি এতক্ষণ, কেমন গুডি গুডি আসতিছিল দেখছিস। উরে তুই কি ইস্টুপিট—সে হাসে, মাইরি কচ্ছি, পকেটে হাত দিয়ে ছাখ—দুডো ট্যাহা আছে মোডে, দাদার পহেট থে মারিছি, মাত্তর দুডো ট্যাহা। তখন ইনাম ক্ষান্ত হয়। গেটের কাছে ফেকু আর সুহাস গলাগলি

দাঁড়িয়ে। জানালার কাঠের রডে মুখ লাগিয়ে বুড়োটা চিৎকার করে, কে, কে ওখানে গো—অ্যাঁ। লাল আলোটা সরে যায় জানালা থেকে, হড়াম করে দরজা খোলে, হাতে হারিকেন নিয়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে গেটের কাছে আসে মানুষটা। সমস্ত উঠোনটায় বিরাট ছায়া, খাটো লুঙির নীচে শুকনো দুটো পা। এসে গেটের পাশে করবী গাছটার পাশে দাঁড়ায়। আলোটা মুখের কাছে তুলে ধরে লোকটা। বোশেখ মাসের তাপে মাটিতে যেন ফাটলের আঁকিবুকি এমনি ওর মুখ। ঠাণ্ডা চোখে ইনামকে দেখে, ফেকুকে দেখে, সুহাসকে দেখে, দেখতেই থাকে, বিঁধতেই থাকে, হারিকেনের বাতিটা তোলে কাঁপা হাতে, এসো তোমরা, ভাবলাম কে আসছে এত রাতে। কে আর আসবে এখানে মরতে। জেগেই তো ছিলাম। ঘুম হয় না মোটেই—ইচ্ছে করলে কি আর ঘুমানো যায়—তার একটা বয়েস আছে—অজস্র কথা বলতে থাকে সে—মানে হয় না, বাজে কথা বকবক করেই যায়। এসো, বড্ড ঠাণ্ডা হে, ভেতরে এসো। কিন্তু ভেতরে কি ঠাণ্ডা নেই? একই রকম, একই রকম। দেশ ছেড়েছে যে তার আর ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে। সবাই ভিতরে আসতে করবী গাছটার একটা ডাল ঝটকানি দেয়—পায়ের নীচে মাটি ঠাণ্ডা, শক্ত আর সেজন্যে ইনামের গোড়ালিতে ব্যথা করছে।

ভিতরে কালো রঙের চৌকিটা পড়ে আছে। ঘুমের মধ্যে মুরগীগুলো কঁ কঁ করে উঠল। আবার হু-উ-উ চিৎকার এলো। বিলে বাতাস উঠেছে শোনা গেল। ভাঙা চেয়ারে ভদ্রলোকটি বসে। হারিকেন মাটিতে নামানো। ওরা তিনজন চৌকিতে কাছাকাছি বসেছে। কেউ কথা বলছে না, বুড়োর অ্যাজমার কষ্টের নিঃশ্বাস পড়ছে। তুখোড় লোকটা এখন চুপ—ভসভস বাতাস ছাড়ছে মুখ দিয়ে। খোঁচা খোঁচা শাদা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। শিরওঠা আঙুল চেয়ারের হাতলে পড়ে আছে। নোংরা নখ দীর্ঘদিন কাটা নেই। গলার কাছে শ্লেষ্মা এসে জমলে বাতাস যাওয়া-আসা প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। ইনামের ইচ্ছা হোল একটা নল দিয়ে সাফ করে দেয় ফুটোটা। তারপর কি খবর, অ্যাঁ? সব ভালো তো? ঘড় ঘড় করে কথা এগিয়ে চলে। আক্ষেপ, বিলাপ, মরে গেলেই তো হয় এখন, কি বলো তোমরা? টক করে মরে গেলাম ধরো। তারপরে? আমার আর কি?—ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং, চলে গেলাম, বুঝে মরগে বুড়ি—ছানা পোনা নিয়ে বুঝে মরগে। এই তোমরা একটু আধটু আসো, যখন তখন এসে খোঁজ খবর নাও। সময় অসময় নেই বাবা তোমাদের। তোমরাই ভরসা, আমার পরিবার তোমাদের কথা বলতে অজ্ঞান। ফেকু ভয় পেয়ে গেছে এখন। বুড়োর মুখের দিকে বারবার চেয়ে

ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে আর সিঁটিয়ে যাচ্ছে। সুহাস চোখ দুটো গোল গোল করে চেয়ে আছে। বুড়োর মুখ এখন বহুরূপী। সুহাস ভাবছে, কেশো বুড়োটা খুন করবেনে মনে হতিছে আমার। আজ ক্যানো যে আলাম। না আসলেই ভালো হোত। তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হোত এই জংগুলে জায়গায়— বুড়ো বলছে, বাড়ীর বাগান থেকে অন্ন জোটানো আবার আমার কম্ম—হ্যাঃ। ও তোমরা জানো। আমরা শুকনো দেশের লোক বুইলে না—সব সেখানে অন্যরকম, ভাবধারাই আলাদা আমাদের। এখানে না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে, বাবারা। ছেলেমেয়েগুলো তোমাদের কি ভালোই না বাসে। এই দ্যাখোনা বড় মেয়েটা, রুকু এখন চা করতে যাচ্ছে তোমাদের জন্যে—একটা শ্লেষ্মার দলা শ্বাস-নালীটাকে একেবারে স্তব্ধ করে দেয় আর চোখ কপালে তুলে কাশছে। কথার খই ফুটছিল অথচ এখন মরে যাবে নাকি? আমরা চা খাবো না—চীৎকার করে ওঠে সুহাস আর ফেকু। খাবে না? বুড়ো সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলে, অ, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা এখন চা খাবে না—অ্যাঁ—আচ্ছা, ঠিক আছে।

বিল থেকে বাতাসটা উঠে আসছে। এখন অশ্বথ গাছটার মাথায় ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, এগিয়ে আসছে, খঞ্জনীর বাজনাও এগিয়ে এলো সঙ্গে, খোলের চাঁটি আর কি বিশাখার কথা, কি তমালের কথা—সব এসে আবার দূরে চলে গেল। সুহাসের চাদরের মধ্যে নোট খড়মড় করে, সেগুলো নিয়ে ফেকু নিজের পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে—দলা পাকায়, ভাবে, ভয় পায়, শেষে বুড়োর দিকে ঝুঁকে পড়ে, সুহাস আর আমি দিচ্ছি।

চেয়ারের উপর লোকটা ভয়ানক চমকে ওঠে। পড়ে যাবার মত হয়। খটাখট নড়ে পায়াগুলো, তোমরা দিচ্ছ, তুমি আর সুহাস? দাও। আর কত যে ধার নিতে হবে তোমাদের কাছে, কবেই বা শুধতে পারব এই সব টাকা। সুহাস থেমে গিয়েছিল, এখন উঠে দাঁড়ায়, চলে যাবে এখন? এত তাড়াতাড়ি? রুকু রাগ করবে—চা করতে দিলে না ওকে। ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে আর কোনদিন কথা বলবে না। দাঁড়াও—হারিকেনটা রেখে বুড়ো বেরিয়ে যায়—ছায়াটা ছোট হতে হতে এখন নেই। মুরগীগুলো আবার কঁ কঁ করে ওঠে, রাত কথা বলে ওঠে বয়স্কা বৃদ্ধা হয়ে, তীক্ষ্ণ গালাগালি অন্ধকারকে ফাঁড়ে। চুপ চুপ মাগী, চুপ কর কুত্তী—এবং সমস্ত চুপ করে যায়। বুড়োটা ফিরছে এখন—মাথা নামিয়ে, কাঁধ ঝুলিয়ে ঘরে এসে ফিসফিস করে, যাও তোমরা, কথা বলে এসো, উই পাশের ঘরে। ইনাম তুমি বসো, এখখুনি যাবে কেন? এসো গল্প করি।

বুড়োটা গল্প করছে, ভীষণ শীত করছে ওর গল্প করতে, চাদরটা আগাগোড়া জড়িয়েও লাভ নেই। শীত তবু মানে, শ্লেষ্মা কিছুতেই কথা বলতে দেবে না তাকে। আমি যখন এখানে এলাম, সে গল্প করেই যাচ্ছে, আমি যখন এখানে এলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম। তার এখানে আসার কথা আর কিছুতেই ফুরোচ্ছেনা—সারারাত ধরে সে বলছে, এখানে যখন এলাম—আমি প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই—তখন—হু হু করে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ীর শব্দ আর অনুভবে নিটোল সোনা রঙের দেহ—সুহাস হাসছে হি হি হি—আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে—বলে থামলো বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল—ফুলের জন্য নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে। আবার হু হু ফোঁপানি এলো। আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ—প্রথমে একটা করবী লাগাই বুঝেছ, আর ইনাম মনে মনে তেতো তেতো—এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আয়নায় এখন ; আঁচল দিয়েই মুখ সে মুছে, এবার যথাযথই প্রতিফলিত, এবং অতীব স্পষ্ট। যদিও সে ছোট এ আয়না ; তৎসত্ত্বেও আবক্ষ দেখা যায়, যখনই যেখানেই ঈষৎ ফাঁক সেখানে সেখানে দীনঘরের স্যাঁতসেঁতে ঘরের এটা সেটা। যথা তোরঙ্গ যথা ছেঁড়া মাতুর যথা পিতলের কাঁসার অকেজো তৈজসপত্র ; এসব আয়নায় আসে, আর আসে জানালার মুখোমুখি অন্য জানলাবহির্গত ঊর্ধ্বগামী বিপুল ধোঁয়ার চরিত্র,—আয়নার গভীরতা, আয়নার অন্তরীক্ষ শূন্যতাকে পরিপূরণ করেই ; এই সত্য। এমনও মল্লিকার আবক্ষ, সে আপনাকে আর এক ভবিষ্যৎ থেকে অন্য নিরীক্ষণ করে , কেমন ধারা মুখটা হয়ে আছে যে তার। অথবা পুরুষোচিত ক্লান্তি এখানে সেখানে। আয়নার সাক্ষাৎ নীচেই ব্রাকেট, ওটা পাউডার এটা কাজল এটা এসেন্সের শিশি তাতে শুধু স্বচ্ছতাই, তেল টসটস ফিতে, কিছু কাঁটা—এ সকলি সত্ত্ব মৃত কোনজনের ঔষধের সমারোহ বা , আর যে, পুরুষোচিত ক্লান্তির ক্ষেত্রে এসকল যে, ম্রিয়মান, নিষ্ক্রিয় !

এবার মল্লিকা আরবার সাহস সহকারে আয়নার প্রতি চাইল, সেখানেই সে যেন অন্য কেউ আর। এ যেন তার সে উবল বক্ষদ্বয় নয়, যেন এ কেশসম্ভার আর কারও, আর অন্য কারও। আজ সকালে, আজ খাবার পরে দুপুর বেলা যে, এই তো যে তুফান ছিল, সে তুফানের কণামাত্র কেন যেমন নেই। তার বাবার বাঁশচলা কাশির আওয়াজ এবং মায়ের শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড় এবং দুজনের অকাল বার্ধক্য যে তুফানকে ; অপরিসর উঠনের টোকো গন্ধ, বালিখসা দেওয়ালের ঝুল যে তুফানকে কোন ক্রমেই ক্ষুন্ন করতে পারেনি, এমন কিরূপে একভাবে তা যেমন ছিল না এমতই মনে হয়। মল্লিকা আয়নায় অথবা এও হয় যে আয়না মল্লিকায়। চিঠি

এলো। দুপুর বেলাকার ঐটুকু সময় সেইটুকু সময় অধিক মোহের ; বহু বহু দূরে প্রাক্তন সময়ের অন্তরে সহজেই নিমেষেই যাওয়া আসা এবং সে তদানীন্তন সময়ের সকল অস্তিত্বের সঙ্গ হয়, সেখানকার ফুল আজও তেমনই নবীনা, এমনও যে তেমনই গন্ধবহ, তারা গায় গায় লাগে। এবং যে ঘুমোয়নি সে হয় মল্লিকা, তখন যখন সে এমত একটি নিবিড় অনুভবের মধ্যস্থ, যে সে মল্লিকা এরূপ এক আরামের আধারে ; চোখের পাতা বন্ধ অন্ধকারের মধ্যে কে যেমন তার নাম স্বর করে পড়লো—এরপর তারই বুকে, আদখোলা বেশখোলা বুকে কিসের ঘা এমন লাগলো। মল্লিকা চেয়ে দেখলো, হরি। বুকের দিকে, কোনমতে চাইলো, আর যখন, অচেনা বস্তুর মধ্যে একটি গুরুধাম। এবার কোনমতে, একভাবে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে বসলো ; যখন তখন সে এইভাবে বসে ; তার বুকের কাপড কোলে, কোল বেয়ে সে কাপড় মাটিতে লুটায়। ইতিমধ্যে শুধু হাত দিয়েই চুলের গোছ অদ্ভুত করে ধরে অনায়াসে ফাঁস করলে, মল্লিকা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সম্মুখে চিঠি।

ইতোপূর্বে এমন যে সে চিঠি কখনও পায়নি। অবশ্য সেই সকল চিঠি অন্য, সেই সকলের ঠিকানার ছাদে চিঠির সকল পাঠ উপছে থাকেই চিঠি না খুললেই বা! প্রায় চিঠিই তার মায়ের নামে ফলে তখন সে পড়ে মা শোনে। বন্ধুদের চিঠি, চিঠিতে লেখা প্রায়, প্রায়ই 'এবার এটি (ছেলে) হতে কোন কষ্ট পায়নি', মল্লিকা সেই সূত্রে ভাবে সারাজীবন কষ্ট পাবে বলেই ভগবান ওই কষ্টটা আর দেননি। এ চিঠির খাম আর এক, রঙ আলাদা। টাইপছাঁদে লেখা নাম, যে এ সকল অক্ষরে ন্যাজে গোবরে জীবনের কোন পাঠ অস্পষ্টতও নেই কোন কিছু নেই। মল্লিকা এখন সন্তর্পণে চিঠিটা খোলে।

দু'হাতের উপরিভাগে চিঠি, যখন তার অক্লেশে অবহেলা বাঁধা খোঁপা আবার ধসে গিয়েছে, আর দু' হাতের মধ্যস্থে যা যেমন বিষপাত্রেই। তারের জাল দেওয়া জানালা ভেদ করে তিনটের রোদ। মল্লিকার এমন ধারা বসে থাকা কেমন যেমন, ক্রমাগত কি এক ভাবান্তর! একবাব এক আশ্বাস : দু' বেলার হেঁসেল, একটা ঠিকে ঝি রাখা যেতে পারে ; যে এমন, বাপের জন্য অন্তত ভাতের পর দুটো সিগারেট ; আরও রুই মাছের কালিয়া খেতেও সাধ আছে। ধোপাকে কাপড় দেওয়াও যাবে। এখন যেখানে এসেন্স সে দিকে চায়, মনে হয় এ প্রয়োজন মিটবে বা, কাতাদড়ির আলনার পাট উঠিয়ে নিশ্চিত একটা ব্র্যাকেট। এই আশ্বাসের পরই হতাশার ঝাপটা, কিসের কারণেই বা এ হতাশা তা তার ঠিক জানা নেই। তবু এ হতাশা।

তবে যে এই যথার্থ যে, সেই হতাশা—জীবনের যত অপ্রয়োজনীয় অহেতুক কোণ

বহি আসে, ক্রমে তার প্রতি আসে। এবুঝি, কভু বা মনে হয় উর্ধ্ব আকাশ থেকে, কভু বা কোন বাগানের মধ্য হতে; কিম্বা ফাঁকা রাস্তার নির্জনতার উপরে যখন বৃষ্টি হয় গাছের রঙ তখন আবছায়া—সেখান থেকেই হয়। মল্লিকা কখন যে এসকল কিছু দেখেছে তা সে জানেই না, অন্য লোকে তো নয়ই। লোকে ভাবে মল্লিকা এতকাল শুধু দাঁত সংস্কার করেছে, একারণে যে তার দন্তপাঁতি অতি মনোহর। ফলত এবং কখন যে তার রক্তে রসে এসকল দূরাগত-দৃশ্যগুলো মিশেছে সম্বন্ধ হয়েছে কে জানে। যৌবনের জীবনের অনেক যা কিছু ওই সকলের হাতেই সে জমা করে দিয়েছিল, ওখানেই হেতুহীন গোপনতার মধ্যেই ব্যাঙের আধুলি। হতাশ একারণে যে যৌবনের সবটুকু সব, নিশ্চিতই অযথা হবেই।

যদিও এপারের লঙ্কা গাছ রাঙা, দুপুরের রোদ ভারী মিঠে, ছাকড়া গাড়ীর শব্দ আর ফোড়নের গন্ধের সমঝদারী করার সময় যখন যেমন সে কখনই পাবে না; তেমনি অন্য-পক্ষে তাকে লক্ষ্য করার সময় নেই, সে আর আইবুড়ো মেয়ে থাকবে না কখনই, চাকরে হবে। ম্যাগো চাকরে। এতটুকু মান তাকে আর কে দেবে যেহেতু সে চাকরে সেইহেতু; তার আঁচলটা যদি দৈবাৎ কারো মুখে লাগে কতটুকু স্পন্দন জাগবে তাতে কার! হাতের খবরের কাগজটা দিয়ে সরিয়ে আবার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে লোকটি, যুবকটি। এরাই অন্যহাতের ইলিশের দিকে, অন্যহাতের ফুলকপির দিকে, এখনও সে অন্যহাতের ভাঁজকৃত খবরের কাগজের দিকে চাইবে, তবুও ভুল-ক্রমে চাকরে স্ত্রীলোকের প্রতি চাইবে না। তাকে, মল্লিকাকে কাল পরশু থেকে আর তেমন ভাবে কেউ আর দেখবে, যদি বা দৈবাৎ, তাহলে সেই চাহনির মধ্যে কোন সম্বন্ধযোগের চিহ্ন নিশ্চিত থাকবে না। গ্রাম্যরা যে চোখে পাথরেকোঁদা যক্ষিণী দেখে থাকে, এদেখা হয় সেই দেখা।

অদ্যই সেই শেষ দিন। যেহেতু কাল সে, এত সময়ে অফিসের কাজে ব্যাপৃত, সমস্ত সনাতন জাতি আর মল্লিকা কোথায়? বিদায় নেবার কাল এবার। তের চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আজ প্রায় ঐ দশ বছর যে অনুভব নিয়ে কাটিয়েছে সেই অনুভব সোজা ফেলে দিতে হবে, যেমন চিরুণীতে জড়ানো ছেঁড়া চুলের গতিই, তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পাকিয়েই, তিনবার থু থু করে এখন জানালা গলিয়ে ফেলে দাও। যে তার এত বুকভরা ভালবাসা তা অযথাই হয়, আগামী কাল থেকে আর কেউ একথাই যে, তাকে আর তেমনভাবে দেখবে না। অনেকেই বলে, সে শাড়ী পরতে জানে না, শুধু সে কেন তারই মত আর যাদের অবস্থা, তারাও জানে না; যদি সুযোগ হয় তবে দেখবো, শাড়ী যে গায়ে তোলা যায় একথা বিস্ময়ের, কেন না

যেহেতু সে শাড়ী হয় শতচ্ছিন্ন, জীর্ণ এবং আরো যে অতি অধিক তা নোংরা। সেই ভাবেই সেই শাড়ীর মধ্য থেকেও কত সুন্দর লাগতো তাকে তা বোধকরি অন্য অনেকেই জানতো, সে তো জানতোই। যদিও সে, হাতে আঁজলা করে নিয়ে আপন মুখ দেখার আর পাঁচটার মত বাতুলতা তার ছিল না; তবু সেটুকু সত্য সে জানতো। অন্য তার মনে হয় সেটুকু না জানলেই বা কি হতো চাকরিই যদি তার বরাদ্দ এখন তখন! এততেও তার মনটা কোনরূপেই সায় দেয় না, তার আপনকার এ ক্ষতি কোনক্রমেই মেনে নিতে ইচ্ছে হয় না, কেমনে বা সে-ভাবে যে আর কোন অর্থ নেই, সে শুধু চাকরেই, শুধু মাত্র জীবন-বীমা করা ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য কিছু করাব নিজের জীবনের কারণে থাকবে না। এ ব্যতীত সে আর কি করে।

তবু মন, আছে আছে করে করে উঠে এখনও। কুমারী বলে তাকে গ্রাহ্য করবে না, একথা প্রতিবার মনে হয় অথচ মন মানতে চায় না, কত ছেলেই তাকে ভালবাসতে পারতো সেও পারতো কিন্তু কোনক্রমেই হয় লজ্জা কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তা ঘটে ওঠেনি। এখন সকল কিছু কথা কোণঠেসা করছেই। ছি ছি কি ভুল হয়েছে। অন্তত শিশিরকে। বেচারা কি মার খেয়েছিল, শিশিরের বাপ শিশিরের হাড গুঁড়ো করে দিয়েছিল, প্রায় দুদিন খেতে দেয়নি। শিশির মল্লিকার সঙ্গে প্রায় খুনসুড়ি করতো, তখন মল্লিকার বয়স তের চৌদ্দ হবে, তখন ওরা দর্জিপাড়ায়। একদিন ঠিক দুপুর বেলা ছাদে; হঠাৎ শিশির মল্লিকার ছোট দুটি স্তনে হাত দিয়েছে, মল্লিকা চমকে উঠেছে, সে কথা স্মরণে সে চমকে উঠলো। ছাদের কোণে ছিল রাধুর মা, তার চোখ এড়ালো না। মল্লিকা রাধুর মাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠে অসভ্য বলেই, বসে পড়ে কাঁদতে লাগলো। এখন কোথায় বা শিশির। সে এম-এ পাশ করে, মাস্টারি করে, শরীর তার বড় খারাপ। আরও কত, তাদের কলেজের অঞ্জনার ভাই সেও তো তার প্রতি কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, অন্য পক্ষে সে শুধু ক্রমাগত ভয়ই পেয়েছিল, অভিজ্ঞতাবশত নয়, এমনি। এমন করে যদি বিশেষভাবে ভাবা যায় দেখা যাবে চার পাঁচজন এসেছে বেশ কাছে, আরো কাছে— যখন এমন সম্বন্ধ হতে পারতো যা আর কাছছাড়া করার নয়। তখন সে আপনকার অজানিতেই একথা ভাবে, তখনই যেমন তার খেয়াল হলো, হিসাব দেখলে অদ্যও সময় তার আছে।

সম্মুখে আয়নার সম্বন্ধ সে খোয়াবে একথা অসম্ভব মিথ্যা বৈ অন্য না। কতক-মানে এখনও এ মুহূর্তে সে দেবীরূপে আদরণীয়া নিশ্চিত। এ শুধু আয়নার সম্বন্ধযোগে সে জানে, যে সে মল্লিকা আর পিছনের অমরতার মধ্যে এতটুকু বৈষম্য

কোথায় বা। এ অমরতার যেমন সাক্ষাৎ সেই, শুধু মাত্র সত্য এই হয় যে; পোশাকের ভেদ, কালের ভেদ এছাড়া অখণ্ডই একই। তবে যখন অফিসের পথে যেতে চটি ছেঁড়ে,সেটি ঘাড়গোঁজা মুচির সামনে এগিয়ে দিয়ে দাঁড়াবে, মুচিটা একটা ঢাউস জুতো এগিয়ে দেবে—তাও ডান পায়ের জুতো বাঁ পায়ে পরতে! মল্লিকার এখন সাজ শেষ হয়েছে, এখন সে আয়নাটাকে মুছলো নিজেকে একটু দেখে নেওয়া।

মল্লিকার মা ইতিমধ্যে ছাদের কাপড়তোলার পথে পাঁচটা বৌঝিকে এ খবর দিয়েছে, দোতলার ফোকলা বৌটা এখন এসেই, সদ্য সাজা মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'খাওয়াতে হবে মাইরি।' এরপর তারপর মল্লিকার প্রতি দেখে বললে, 'এতেক ভাবনা কেনে গা! এত ঘটা করে বার হওয়া কোথায় গা, বন্ধুদের খবর দিতে বুঝি!'

'হু।'

'উঃ হু প্রাণনাথের ফেরে।'

ফোকলা মুখের প্রাণনাথ কথাটি বেশ মিঠে, মল্লিকা এ কথায় হাসলো। কিন্তু তাকে বলতেই হলো—'হ্যাঁ প্রাণনাথ আমার জন্য বাঁশীতে ফুঁ মেরে মেরে আর দিশে বিশে পাচ্ছে না।' এফাঁকে মল্লিকার মধ্যে খেলে গেলো; যদি আনা চারেক পয়সা চায়, ঠনঠনেতে পাঁচ পয়সা; এটা সেটা আর অফিসের ট্রাম ভাড়া। যখন সে একথা মনে গণে, ফোকলা বৌটা বলে উঠলো, 'চলি ভাই।'

যখন মল্লিকার কষ্ট হলো, কিন্তু আনন্দের যে সে হাঁফ ছাড়লো। মহাছেঁচড়া মেয়েটা,যে তার সাবান চুরি করেছে বলে কি নওলাদওলা করলে, সাবান মল্লিকা.চুরি করে নেয়নি, বরং সে চুরি করে রেখেছিল। অবশ্য তা দোষের, কিন্তু ভাববার যে চুরির সঠিক অপরাধ হয় কি। মল্লিকা যখন বৌটি চলে গিয়েছিল, তখন সে মনস্থ করে ঠনঠনেতে প্রণাম করেই আসবে। পরে পূজা হবে। সে ঘুরে আয়নায় আবার একবার এক্ষণে আপনাকে দেখলো। ঠনঠনেতে যখন সে দাঁড়ালো তখন মনে হলো,বাড়ী ফিরে যাই। সম্মুখে দেবী প্রতিমা অন্যদিকে আপনকার এমত মন আর পিছনে অথবা পার্শ্বেই হাজার চাকাচলা রাস্তা। এতাবৎ যে ক্ষমতায় এতদূর সে এসেছে সেটুকু দেখা গেলো সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর পরবর্তী যা ছিলো মনে অর্থাৎ আপনকার বাসনা, যে সেইকে সম্পাদনা করার মন যেমন আর নেই। এতদিনের তিল তিল না পাওয়ার, অভাবেরই দুঃখ দিয়ে সে চৌকাঠে মাথা ঠেকালো, সে ঘাড় ফিরিয়ে দূরে রাঙা চটি জোড়ার দিকে চাইলো, সে জোড়া সেখানেই তেমনি। ভগবানকে

মাথা নত করে ধন্য ধন্য করে, যে আর কসামাছ রসুন দিয়ে খেতে হয়তো হবে না। শাড়ীটা আবার মিলিয়ে নিলে, রাস্তায় আবার নামলে, নিজেকে যখন সে ছি ছি দেয় যখন সে ছেলেমানুষী ছাড়া আর কি বলে তখন তখন রাস্তায় চলে। তারপর চলতে চলতে এক বাড়ীর দরজায়।

কড়া নাড়ার শব্দ শ্রবণেই সে অসম্ভব মুসড়ে পড়লো, ঢেলে গায় যেমন জ্বর। যদিও সে কড়া সে নিজেই এখনও নাড়ছে। যদি এমত সম্ভব হতো তার মুখমণ্ডল ঠাওর করা যেতো, তখন তার মুখমণ্ডল আরক্ত চক্ষু পদদ্বয় কম্প্রমান আর সে বেপথুমতী। বাড়ীর ভেতর হতে গলার আওয়াজ এলো, 'কে—এ্যাঁ।'

'আমি' এ উত্তর দিতে তাকে যেমন হাতব্যাগ হাতড়াতে হবে এমত, এখন সে চুপ। কার্য পরম্পরা তার চোখে পড়ে ইতঃপূর্বে কখনও সে আপনাকে এভাবে লক্ষ্য করেনি, ভিতর থেকে খিল খোলা হয়, তার শব্দ আসে। এরপর দরজা দুইটি। একটি লোক। এ লোকটির গায় কোন মতে কোঁচার খুঁট, যখন হাতে একটা আধ খাওয়া রুটি যখন মুখেও খানিকটা আছে, লোকটি সেইভাবেই বললে, 'আরে এসো।'

দরজা খোলাই রইলো।

এখন ওরা ছোট একটা দালানে, একটি লণ্ঠন, তার আলোতে একটি বাটি এক গেলাস জল, লোকটি বোঁ করে গিয়ে উক্ত বাটির সামনে গিয়ে বসলো এবং মল্লিকাকে বলল, 'তুমি ঘরে বসো আমি আসছি। মা নেই।'

বেচারী মল্লিকা সে ঘরের চৌকাটের সামনে চটি খুলে ঘরে ঢোকার পূর্বে আবার ঘাড় ফিরিয়ে, রুটি ব্যাপৃত লোকটিকে দেখলো লণ্ঠনের আলো লাল, মুখটা তার কাঠবৎ নড়ে নড়ছে। রাত্রের ঘড়ির শব্দ যেমন কেমন এখানে লোকটির রূপও তেমনই। মল্লিকার আপন মুখমণ্ডলের যে রক্তিমতা তা ক্রমে থেমেছে, তবে বুকে তেমনই হিম অনুভব এক্ষণেও আছে। ঘরে সে প্রবেশ করলো, কিন্তু যেমন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, জানলা বরাবর ওখানে ইট তোলা খাট, কয়েকটি বালিশ, একটা বাজে কাঠের দেরাজ তার উপর নানা কিছু, ঘড়ি ক্যালেণ্ডার রকমারি ঝিনুক, একটি টিনের বাক্স। এপাশে আলনা, একটি চেয়ার কয়েকটি বাক্স ঢাকনা দেওয়া। অজস্র আসবাব। ঘরের চতুর্দিক দেখার পর মল্লিকা একটি চেয়ারে বসে পড়েছে। ফুলদেওয়া ঝালরদেওয়া হাতপাখা দোলাচ্ছে। এখন গরম কাল, ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যার হাওয়া। গলি পেরিয়ে পদশব্দ, কখনও ঘুঘনি আলুরদম। সহসা মল্লিকা বলে উঠলো, 'আমি উঠি—'

'এই যে হয়ে গেলো', বলে কোঁচার খুঁটে লোকটি মুখ মুছতে মুছতে এখন ঘরে ঢুকলে, দরজার মাথা থেকে গামছা নিয়ে আবার মুখ মুছলে, পরে বললে, 'তারপর— আমি আবার রাস্তায় কিছুটা খাই না বুঝলে, আর পয়সাই বা কোথায় তাই—তা তোমায় অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা হলো তো'—বলে বালিশের কোণে নভেলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাইলো, হাত দিয়ে বইটা টেনে আপনার কোলে আনলে।

মল্লিকা এবার বুঝলে সে অত্যন্ত অসভ্যভাবে লোকটির দিকে চেয়ে আছে যখন সে মাথা নামালে, মল্লিকা ক্ষণিকের অস্থিরতা ভেঙে আবার তার দিকে চাইলে।

লোকটি বললে, 'দেখো না মা আবার কোথায় গেছে, পাশের বাড়ীতে চাবিটা দিয়ে কোথায় যেন গেছে। পাড়া বেড়াতে আর কি!' বলে একটু হাসলে।

মল্লিকা পাখা একটু চালাবার চেষ্টা করার সঙ্গেই বললে, 'কোথায় গেলেন আশ্চর্য!'

'বলে কে, আবার নোতুন উপসর্গ হয়েছে, আমার জন্য মেয়ে দেখা' বলেই লোকটি হা হা করে হাসলে, লোকটি কথা বলছে যখন মল্লিকা তার দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে শুধু একথাই তার মনে হয়, এ লোকটি অনেক বদলে গেছে। একই ভাবে লোকটি অনেক কাল এ জগতে বাস করেছে অথবা,—ঠিক এমত সময় শোনা গেল।

'ভোঁদা বাড়ী এলি' বলতে বলতে কদমছাঁটা গিন্নী দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, তার মুখে চোখে দেরাজের উপরস্থ আলো কিয়ৎ পড়লো, এবার গিন্নী মল্লিকাকে দেখতে পেলেন, বললেন, 'ওমা বুড়ু কতক্ষণ—'

মল্লিকা গিন্নীকে দেখেই জড়সড়, তার মুখের রক্তিমতা আবার দেখা দিল, কেননা তার কিছু এক কপট অভিসন্ধি ছিলই তা যেমন বা আরও স্পষ্ট, ঘরের এ অল্প আলোতেও। মল্লিকা কোন ক্রমে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে, 'এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম আমার—'

'তা বেশ বেশ, তোমার মা কেমন, বাবা।'

'সবাই ভাল, অনেকক্ষণ এসেছি।'

'বোস বোস চা করি আগে' বলে গিন্নী তাকে নিয়ে দালানে একটা আসন পেতে দিয়ে বললেন, 'বস।'

মল্লিকা আড়চোখে দেখলে ঘরের অভ্যন্তর যেই লোকটি দেরাজস্থিত আলোটাকে নামালে, ঘরের আসবাবের ছায়ার ওলট-পালট হলো, কেউ কেউ এতে করে গাঢ় হলো, লোকের হাতের ছায়াটা, স্পষ্টই দেখলে, প্রকাণ্ড বিপুল। লোকটি শুয়ে

পড়লো এবার, 'আঃ' একটা আরামের শব্দ, এই বোধহয় চীৎকার! এমতই তারপর নভেলটা মেলে ধরলো, সুস্পষ্ট আর দেখা গেলো না। এমত দৃশ্যে মল্লিকা কোন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল, সে আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাইলো না। অনেক সময় সেও লোকটিকে দিয়েছিল, লোকটি যেমন কেমন ধারা হয়ে গেছে।

গিন্নী বলছেন, 'ভোঁদা আমার কোথাও যায় না, অফিস আর বাড়ী ব্যাস্।'

মল্লিকা তাকে বাধা দিয়ে তখন বললে, 'আর দেরী করবো না মাসীমা, দেরী হয়ে যাবে' বলেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো, একটু উচ্চ কণ্ঠে বললে, 'ব্রজদা চললুম।'

লোকটি, ব্রজদা তেমনই শুয়ে, বললে, 'আচ্ছা আর একদিন এসো…'

মল্লিকা অন্ধকার আর গ্যাসের আলোর মধ্য দিয়ে একটা একটু বড় রাস্তায় যখন পড়েছে এখন তার আপন মনের দিকে চাইবার ক্ষমতা, তার তিলেক ছিল না এমতই। মন তার এতে করে এত বেশী শুধু তা যাবৎ না স্পষ্ট আলোতে দেখা যায় তাবৎ বুঝবার উপায় তার নিজেরই ছিল না। অসম্ভব তীব্র এ অভিজ্ঞতা, ব্রজকেই তার ভাল লাগতো, আর সে কিনা এমন ধারা হয়ে গেছে, এ তার যদি কোনক্রমে জানা থাকতো তাহলে একটা নিশ্চিত যে সে কখনই সেখানে যেতো না। মল্লিকা কি চেয়েছিল, যে ব্রজ তাকে একবার দেখুক, ভাল করে দেখুক বা হাতের উপর হয়তো বা হাতখানি রাখতে পারতো। একথাও মল্লিকার মনে পড়লো আচ্ছা ব্রজদার মার কি কিছু তাকে দেখে মনে হয়েছিল! কে জানে!

কিছুই তো নয়, একটা লোক এবং তার দৈনন্দিন কার্য পরম্পরা আর এক মানুষকে কি ভাবে আঘাত করতে যে পারে তা মল্লিকার আপনারই ধারণার বাহিরে ছিল। ব্রজ, তার এই ধারণা ছিল তাকে ভালবাসতো বা ভালবাসতে পারতো। মেয়েমানুষকে যে ভালবাসতে হয় লোকটা যেমন এই সাধারণ কথাটুকুই জানে না।

মল্লিকা ব্রজর এমত উদাসীন ব্যবহারে অত্যন্তই আহত হয়েছে, সে নিজে যখন সকল কিছু ভাব প্রকাশ তো করছিল, এই হার তাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। এখন কোথাও মল্লিকা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে—তার চাই কাউকে কোন ব্যক্তিকে—। এখানে রাস্তায় একটা ছোট অন্ধকার সেখানে সে যেমন দৃপ্তভাবে দাঁড়াবার সাহস পেলো, একদিকে বাড়ীর রাস্তা অন্যদিকে আনন্দের বাড়ী, সে আনন্দ।

দরজাটা খোলাই ছিল, মল্লিকা দালানে ঢুকতেই দেখলে তোলা উনুনে টগবগ করে ঝোল ফুটছে, নূতন পটলের গন্ধ আর বাগদাচিংড়ির স্বাদ সমস্ত স্থানটি ভরে আছে। মল্লিকা দেখলে, ঘরে একটি লোক আয়নার সম্মুখে সবেগে চুল আঁচড়াচ্ছে,

পাশে একটা ছোট মেয়ে, ও পুঁটি। আনন্দর মা সেই ঘর থেকে দালানে আসতেই মল্লিকাকে দেখেই—'ওমা বুড়ু কি খবর রে—বোস বোস।'

'এই এলুম।'

এখন আনন্দ আয়না থেকে ঘাড় ফিরিয়ে মল্লিকাকে দেখে মুচকি হাসলে, বললে —'কি খবর—বসো।'

মল্লিকাকে বসতে দিয়ে, আনন্দর মা একটা কাঁসিতে ঝোলটা ঢেলে রাখে, হাত ধোয়, একটা কেটলীতে একটু জল চাপিয়ে দিয়ে এবার মুখ তুলে বললেন, 'বল শুনি—তোর মা কেমন আছে, বাবার হাঁপানি।'

মল্লিকা আনন্দর মাকে একবার দেখলে, তার ভাল লাগলো। ঠিক এমত গৃহিণী হতে তারও সাধ হয়, বেশ পরিপাটি, বেশ কর্মপটু, আদর যত্ন বাকি বকেয়া থাকে না। মল্লিকা আস্তে আস্তে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলে, এরপর আনন্দ তার সাজ হয়েছিল, সে এসে দাঁড়ালো, বললে, 'চলি মা।'

'সে কি রে চা খাবিনি, তোর জন্যেও তো চা চাপিয়েছি।'

'না দেরী হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা তাহলে যা, আর কাল সকালেই আসিস, না হলে উনি কিন্তু বড্ড রাগ করবেন, আর বৌমাকে হাওড়া থেকে একটা ফিটন করেই আনবি—'

'ট্যাক্সি—'

'না না ট্যাক্সির দরকার নেই।'

'আচ্ছা ফিটন এক টাকার মধ্যেই হবে।'

মল্লিকা এখন যেমন সে বেয়াকুফ। যে সে ভালভাবে আনন্দের দিকে চাইতে পারলো না, কবে তার বিবাহ হলো, কবে তার চাকরীই বা হলো! আশ্চর্য! তার আপনার প্রতি অতি ক্রোধ জন্মায়। বারবার বলছে, সে কি এতকাল মরেছিল। ব্রজর দাঁত বার করা হাসি আর আনন্দের কার্তিকবেশে শ্বশুরবাড়ী যাত্রা দেখার জন্যই এতকাল যৌবনের সকল সৌন্দর্য নিয়ে বসেছিল। সে বুঝতে পারলে যে অদ্যই সনাতন পৃথিবীর সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন হবে, নিজের কাছে আপনার একটি মূল্য সে ধরে দিতে চাইছে সত্য, কিন্তু একথাও বুঝলে বড় কাল বিলম্ব হয়েছে। যে অনুভবের দামে সে সারা জীবনটাকে পেতে পারতো, কল্য আর পাবেই না। ভাস, কিন্তু যে সাহস আজ, এমত সাহস তার ছিল কোথায়, গতকাল তো তার প্রেমের নামকে চমকে উঠে শোনাই তো ছিল তার ধারা। মানুষের চাহনি আর হিংস্রতাকে ভিন্ন করে দেখেছে কি!

অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটের রাস্তা, ছোট পার্কটা অনেক ভীড়, কাঠে কোঁদা ছবি এমত। মল্লিকা ভাবলে রাস্তার এই গাছটির তলে দাঁড়াই, সে দাঁড়ায়। আঁচলটা তার চোখে চাপতে ইচ্ছে করলো, এ কারণে যে তার হারটা সম্যক সে বুঝেছে। এও শুনেছে; লেখার মত সেও শ্যামবাজারের মোড়ে চপ ভালো, হ্যারিসন রোডে আগ্রার ডালমুট পাওয়া যায়, আমড়াতলায় ভাল লসীর খোঁজ রাখবেই। চপটি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নির্জন পার্কে দাঁড়িয়ে বা বেঞ্চে বসে গপাগপ করে খাবে, কোকিলের গান আসে, হাওয়া আসে, শীতলতা, সে সব ভ্রুক্ষেপ করবে না, চারিদিক চেয়ে একটু কাপড় তুলে সায়া, সায়াতে হাত মুছবে। অথবা বীণা যেমত স্বভাবের, কোথায় ব্রাসিয়ে (বডিস) পাওয়া যায় তার খোঁজ রাখে, হরেক রঙ, লাল, নীল কোনটা আবার 'একোয়া মারাইন'? সায়া আর তাই পরে সন্ধ্যায় আয়নায় অনেককাল কাটায়।

কি ভাবে একভাবে চেপে বসেছে যে, সব কিছু হারাচ্ছে, এ তার মনকে কেই বা বুঝায়! রাস্তায় এমন ঘটনা নেই, লোক নেই মুহূর্তেই তার মনে হতে পারে সব ভুল।

'ওমা বুড়ু—মল্লিকা না।'

'আরে শোভনাদি।'

'তুমি এদিক দিয়ে।'

'আমার এক আত্মীয়র বাড়ী এসেছিলুম, রাস্তাটা বেশ ফাঁকা তাই ঘুরে যাচ্ছি, কলেজ স্ট্রীট বাব্বা দম বেরোয়—আপনি?

'বাড়ী, চল না আমার···না না যেতেই হবে···।'

শোভনার চোখে অন্য এক আলো এসে পড়েছে, তার চোখমুখে দেখা যাবে পুরুষালী দীপ্তি, যে দীপ্তি, যে কোন রমণী, যে সে ঘাটের পথে, বাটের পথে, চিকের আড়াল হতে দেখুক, ভাল এ দৃষ্টি লাগবেই। শোভনা এখন মল্লিকার হাতটা ধরে ফেললে, যদিচ হাত ধরাটার কোন প্রয়োজন ছিল না। শোভনার স্পর্শের মধ্যে কেমন এক দিব্য উষ্ণতা, এ উষ্ণতা বহুকাল বয়সী বহুজন প্রিয়। মল্লিকার এ উষ্ণতা ভাল লেগেছিল, ভারী ভাল লেগেছিল। বললে, 'চলুন।'

'চল না ছাদে বসি একটা মাদুর পেতে।'

ভারতীয় চিত্রতে যেমত বিছানা তেমনই এ বিছানা, একটা বালিস, ওপাশে দেওয়ালে অন্ধকার। এখানে আজ আধছায়া আকাশে চাঁদ আছে। মল্লিকা ওপাশে বসে কি কথা কইবে ভেবে পায় না, দুঃখের কথা ছাই আর কইতে ইচ্ছে হয় না।

শোভনা আর একবার মল্লিকার দিকে চাইলো। মল্লিকা দেখা যেমন বা তার

ফুরাতে জানে না, গম্ভীর অতি। শোভনার কানে দমকা আওয়াজ এল 'বেলফুল…' শোনা মাত্রই শোভনা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এক বাটি।'

শূন্য ছাদ, চারকোণা, চারকোণা এক অনুভব, উপরে আকাশে রাত্রি তদউর্দ্ধে শ্যামনীলিমাই। মল্লিকার সমস্ত ক্লান্তিটা অথবা যে যাকে এতাবৎ আপসোস বলা হয়, ক্রমে এখন এই প্রতীয়মান যে যা তা আর নাই। এক্ষণে, আপনকার শাড়ীটা ঈষৎ আউরে দিয়েছিলই, এলো করেই দিয়েছিলই সেখানে যেখানে করার ছিল। মন তার সত্যই যথার্থ বাস্তব হয়ে উঠেছে, অন্য আর সময়ে—হয়তো এই মনই ফুলের গন্ধ কই জোনাকি কোথায় বলে ভারী অস্থির হয়ে উঠতই, এ সত্য তার জানা। এ কারণ এই, চিরকাল ভাল লেগেছে সোডা সাবানের গন্ধ অথবা ফোড়নের বাস, এর বড় ভাল লাগা তো তার আছে! যথা তার জীবন আছে, যথা তার অমরতার দাবি আছে। শোভনার এ ব্যবহার বড় আপন বলি মনে হয়, বহুদিনের শোভনাদি! না তা কেন, বহু যুগের শোভনাদি, গায়ে রঙ যার হালি মুগের মতন। মল্লিকার আজ কেমন হয় যে সে শোভনার জীবন জানার প্রয়োজন বোধ করে। এখন শোভনা দরজায়, দেখা যায় তার হাত দুটি পিছনেই, আবদ্ধ সম্ভবত। গায় তার ব্লাউজ নেই—শাড়ীটা হাওয়া হাওয়া, মল্লিকার তা নজরে পড়ল।

'ভাই বড্ড গরম আর গায়ে জামা রাখতে পাচ্ছি না, বুড়ু তোমায় আজ খেয়ে যেতে হবে।'

'সে কি, না না'—

'না না শুনবই না, যতবারই বলেছি ততবারই না না, আজ খেতেই হবে, বলা শেষ না হওয়ায় আগেই শোভনা বসলো, এবার কিঞ্চিৎ নিকটেই।

সদ্যফুলের বিনীতি গন্ধ এখন সমস্ত আবহাওয়া, এমনও যে বহু দূরে আকাশে নক্ষত্রে এবং গভীরতায় প্রভাব হানলে, আর এইখানে পুরাণের এক উদার স্বাধীনতার স্বাদ আনল যে সে ফুলের গন্ধ ছিল এমতই জোর। সে ফুলের শ্বেতরূপের সঙ্গে চন্দ্রালোক সম্ভব কৃষ্ণময় সবুজতা, অথচ কোন কাঠিন্য নাই অথচ কোনক্রমেই অশিষ্ট নয়, একটি নদী ঝটিতিই ব্যগ্রভাবে নিমেষেই নেমে সম্মুখে এলো— অঞ্জলিবদ্ধ, ফুল-সম্ভার এ কারণেই এর উত্তরে—যে নিশ্বাস প্রযুক্ত মহিমান্বিত মরজগত যে সে তা লক্ষগুণে বর্দ্ধিত হয়েই, যুবতী যৌবনার সম্মুখে উদোম স্পষ্ট হয়ে উঠলোই। এখন মল্লিকা এ ফুলের মাথায় থ, বেবাক। কোনক্রমে আপনকার চক্ষুদ্বয় তুলে শোভনার চোখের উপর ধরলে, সেখানে যে হাসি পাথর হয়েছে সে পুরুষেরই এমতই, বা হাতে, হাওয়াকৃত আন্দোলিত চুলগুলি যখন সে ঠিক করেছিল, আর আরও বিচক্ষণতা

সহকারে মনটা সে ঠিক করতে চাইলে, এ সময় শুনলে, 'তোমার জন্য' 'নাও না তোমার জন্যে' শোভনার গলা, রাতজাগা শেষরাত্রের গলার কিছু। অবশ্য অসভ্য অর্থ করা যেতে পারে। আবার সে বললে, 'পরো না খোঁপায় না গলায়…'

মল্লিকার বুক যেমন হিম শুধু আতিশয্যেই। আপনকার গলা পরিষ্কার করে বললে, 'আচ্ছা সে আচ্ছা শোভনা দি…না…থাক।'

'বল না বল না।'

'আচ্ছা আপনি কখনও কাউকে ভালবেসে……'

মল্লিকা, শোভনা তার হাত দুটো ধরে টেনে আপনার কাছে আনলো, কাঁচের চুড়ি ভেঙে টুকরো, ভাঙার শব্দ এতই অল্প যে লোক জড় করলে না অথচ বিজ্ঞরা বলবেন প্রয়োজন ছিল। শোভনা আপনার মধ্যে মল্লিকাকে এনেছে, সোহাগ করে মালা পরিয়ে দিয়েছে, সে মালা তার কণ্ঠে বিলম্বিত, চুম্বনে চুম্বনে চুম্বনে শোক ভুলিয়ে দিয়েছে। এবার শোভনা খাদের গলায় 'কই তুমি তো আমায় খেলে না। তুমি আমায় ভালবাস না?'

'বাসি!'

মল্লিকা শোভনাকে বিশেষ অপটুতার সঙ্গে গভীরভাবে চুম্বন করলে।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে, 'আগে কখনও কাউকে কখন এমনভাবে…'

'হ্যাঁ…আচ্ছা আপনি?'

'আমায় তুমি বল, আমি তোমার কে? বল?'

'আচ্ছা তুমি।'

'না' দৃঢ়কণ্ঠে শোভনা বললে। বোধহয় মিথ্যা। হেসে বললে, 'আমি তোমার স্বামী তুমি—'

'বউ।'

শুনে শোভনা আবেগ চুম্বন করলে। শোভনার মুখস্থত লালা মল্লিকার গালে লাগলো।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

সরল সংসার □ জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

সেনমশায় কৃতী পুরুষ।

কৃতিত্ব কি বস্তু, তা তিনি আসলেই জানেন। যেমন ধরা যাক, টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি অথবা বাড়ি-গাড়ির সমাবোহকে তিনি আদৌ কৃতিত্ব বলবেন না। কৃতিত্ব হচ্ছে নিজেকে সবলভাবে পাওয়ার মধ্যে।

তাঁর শ্বশুরমশায় সারল্যের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এইরকম: সুযোগ পেলে তাব ব্যবহার করা অসারল্যের লক্ষণ নয়। আসলে তুমি যখন ঠকে গেলে তখুনি সরে দাঁড়াচ্ছো, আর মন থেকে মুছে ফেলছো সবকিছু তখন তুমি সবল।

এইজন্যে আমাদের সেনমশায় সীমান্ত বরাবর পরিষ্কার একটি সরলরেখা টেনেছিলেন। কালক্রমে এই পথের অনুসারী তিনি সার্থকতার মুখও দেখেছিলেন, তবে অপরপক্ষে তা সন্দেহাতীত না-ও হতে পারে।

দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব মানুষেরই আলাদা। একের অভিজ্ঞতার স্বাদ অন্যে বোঝে না। তাই এই সব কিছুর সমন্বয়ে স্বতন্ত্র মানুষ গড়ে ওঠে। জীবন-বাবাজীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলার সময় সবাই আপন ঘর সামলাতে ব্যস্ত। সাধারণত দেখা যায়, এই মহাপ্রভুকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো শক্ত, তুমি যদি ডালে ডালে ফেরো তো তিনি পাতায় পাতায় ঘুরবেন। সেনমশায় বলেন, ব্যাপারটা উল্টে দিতে হবে। আমি এই সহজ আছি, দেখি তুমি কেমন করে ঠকাও।

সেনমশায় একটি দোকানের মালিক।

লোকে বলে সেনমশায়ের দোকানে গরু হারালে গরু পাওয়া যায়। অবশ্য একটু বাড়িয়ে বলে। গরু ঠিক তাঁর দোকানে পাওয়া যায় না, বাসায় যেতে হয়—দোকান থেকে খুব বেশী দূরেও নয়। ধাড়ি-গুঁড়ো মিলিয়ে গোটা সতেরো হয়েছে। ধবলী

নামক গাভীটি এই বংশলতিকার মূল এবং অদ্যাবধি জীবিতা। সেনমশায়ের ইচ্ছে ধবলী বেঁচে থাকতে থাকতে তার বংশের কোয়ার্টার-সেঞ্চুরি হয়ে যাক।

গরুর দরকার হলে দোকানে খবর নিয়ে বাড়িতে এসে দাঁত দেখা চলে। এরকম হয়েওছে। কিছুদিন আগে উকিল রিয়াজদ্দিন আহমদ যখন সেনমশায়ের দোকান থেকে তালমিছরি কিনছিলেন দুধ দিয়ে খাবেন বলে এবং খাঁটি দুধ পাওয়া কি পরিমাণ দুষ্কর তার ভয়াবহ বিবৃতি দিচ্ছিলেন, সেনমশায় তখন অন্ দি স্পট একটা দুধালো গাই অফার করে বসলেন। শেষটায় অবশ্য দরে বনে নি, আর উকিল সাহেবেরও বাসায় জায়গা নেই।

অতএব, সেনমশায়ের দোকানে গরুতক সমস্ত সামগ্রী পাওয়া যায়। ডিয়ারবর্ন-এর মার্কোলাইজ্ড্ ওয়াক্স থেকে ভাজা সোনা মুগের ডাল, নস্য, হজমীগুলি, ইস্তক গোল আলু। গরমের দিনে তালপাতাব পাখা এবং শীতের মুরসুমে পশমী বস্ত্রও অপ্রতুল নয়। ইঁদুরের উৎপাতে অতিষ্ঠ গৃহস্বামী নিশ্চিত বরাভয় লাভের জন্যে সেনমশায়ের আশ্রয় নেন। সেনমশায় তাঁর কাছে এক প্যাকেট র‍্যাটম অথবা একটা খাঁচাকল বিক্রি করতে উৎসাহী হন স্বাভাবিকভাবেই।

মোহনপুরের ঘি, তিল তেল, চুয়া এবং গোলাপজলের র‍্যাকটার উল্টো দিকের র‍্যাকেই শিয়ালকোটের ফুটবল ইত্যাদির 'বিপুল সম্ভার' সর্বদাই বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

সেনমশায়ের স্ত্রী শ্রীমতী নন্দরানী।

নন্দরানী সেনমশায়ের স্ত্রী হন প্রথমে অথবা সেনমশায় নন্দরানীর স্বামী হন প্রথমে বলা মুসকিল। তবে নন্দরানী বলেন, সেনমশায় ওঁর বাবার দোকানে কর্মচারী ছিলেন। বিবাহের পরে একটি গাভী (ধবলী), সামান্য কিছু নগদ টাকা এবং পরিশ্রমপটু শরীর নিয়ে তিনি সেনমশায়ের ভাগ্য গঠনে শরিক হন। বস্তুত, ভদ্রমহিলা এই বয়সেও যা পরিশ্রম করেন তাতে তাক লেগে যায়। চাকর সেনমশায়ের বাসায় থাকে না। বারোটি গো-পুঙ্গবের ময় পরিষ্কার করে, এক দিন, দু' দিন অথবা তিন দিন। পরেই সে আপন প্রস্থানের পথও পরিষ্কার করে নেয়। একবার কেবল এক বিশালদেহী পশ্চিমা চাকর এসেছিলো অভাবে পড়ে। সেনমশায় স-বংশে খুশী হয়েছিলেন—যদিও তার মেয়াদ মাত্র দশ দিন ছিলো।

অতএব সেনমশায়ের সাকসেস লিস্টে (১) নন্দরানী, (২) দোকান এবং (৩) ধবলীর নাম তোলা যাক।

কিন্তু সাকসেসন লিস্টে নাম মাত্র একটি: সেন-দম্পতির অবর্তমানে পাঞ্চিক্ষ

তথা আইনানুযায়ী গৃহীত পোষ্যপুত্র ননীগোপাল সেনই সমস্ত সম্পত্তির (গোগণ সহ) উত্তরাধিকারী।

নন্দরানীর ছোট বোন দেবকীরানী অপাত্রে পড়েছিলো। দু'টি মাত্র পুত্রসন্তান, কিন্তু তাদের মুখেও অন্ন উঠতো না। নন্দরানী করুণাপরপরশ হয়ে কনিষ্ঠটিকে নিজের কাছে এনে রাখেন। বয়স হওয়া সত্ত্বেও স্কুলে ভর্তি করে দেন। তারপর ধাড়ি ননীগোপাল যখন ক্লাস ফাইভে পড়ে তখন স্ত্রীর তর্জনে অতিষ্ঠ সেনমশায় তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

অবশ্য দোকানে সাহায্য করার জন্যে সেনমশায়কে একজন লোক রাখতেই হতো। সে-ই একাধারে দোকানের কর্মচারী, ব্যবসায় পরামর্শের সহকারী, গোগণের রাখাল এবং অবস্থা বিশেষে পাচক ও ভৃত্যের কাজ চালিয়ে নেয়। শ্রীমতী নন্দরানীর ভাষায়, বাড়ির ছেলের মতন থাকে।

সেনমশায়ের আরও অনেক গুণ আছে। প্রস্তুত-প্রণালী দেখে এবং হাতে-কলমে শিখে তিনি স্নো, টুথপাউডার, কেশতৈল, নস্য ইত্যাদি ইত্যাদি তৈরি করতে শিখেছেন এবং এটা এককালে বেশ ফলাও ব্যবসা ছিলো। দোকানে 'কর্মচারী' হিসেবে যে-ই আসে তাকেই অবস্থা বুঝে সেনমশায় এই বিদ্যাগুলো শিখিয়ে দেন।

ব্যবসার আগে খুব জোর ছিলো। ইদানীং মন্দা পড়েছে। দোকানে পণ্যের রকমারি বৃদ্ধির এ-ও একটি কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। এককালে বাইরে থেকে আসা মাল দোকানে সাজিয়ে বাসার ফিরতে রাত দুটো-আড়াইটে বাজতো। খেলার মাঠের শর্টকাট রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেনমশায় তৎকালীন কর্মচারী কার্তিককে বলতেন, এখন আমাদের বেগুন টাল। অর্থাৎ এক বেগুন গাছে অজস্র বেগুন ফলছে। আর এখন নিতাইকে বলেন, মুলো টাল—একটি উপড়োলে আর কিছু থাকে না।

ওঁর মাথার সুচিক্কণ কেশরাশি নির্লজ্জ শুভ্র। হেয়ার ডাই ব্যবহারে তাঁর আপত্তি। যদিও নিজ হাতে তিনি 'মর্নিং স্টার' হাজার হাজার ফাইল বিক্রি করেছেন। কিছু দিন মাথায় বিলিতী তেল ঢেলে কেশের শুভ্রতা হ্রাসের প্রয়াস পেয়েছিলেন, বর্তমানে স্বহস্তে প্রস্তুত মধ্যমনারায়ণ মাখেন।

এইবার একে একে সেনমশায় পরিচালিত ফার্মগুলোর (আণ্ডার ওয়ান রুফ) নাম করা যাক:

১। মনোহারী ও স্টেশনারী ডিপার্টমেণ্ট (কোনো নাম নেই)।

২। মুদী ও বেনেতি ডিপার্টমেণ্ট (ঐ)।

৩। ক্রীড়া সরঞ্জাম (সেন স্পোর্টিং কোং)।

৪। পারফিউমারি সেকশন (ইউনাইটেড কেমিক্যাল ওয়ার্কস)।

৫। কবিরাজী ডিপার্ট (আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিট্যুট)।

৬। অন্যান্য (ইনক্লুডিং তালপাখা, পা-পোশক, তামাক ইত্যাদি)।

কিছুক্ষণ আগে সকাল হয়েছে। শানবাঁধানো গোয়াল থেকে গোবংশের হুটপাটের শব্দ কানে আসে। তাদের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের গন্ধে বাড়ির বাতাস ভারী।

বাঁ পাশে বিচালির প্রকাণ্ড স্তূপ। সেনমশায় দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্ছেন। ডান পাশের জায়গাটা ক্রমে চার ইঞ্চির মতো করে কাটা বিচালির টুকরোয় ভরে উঠছে। সেনমশায়ের সামনে ছোটো একটা খাটো বাঁশের খুঁটির সঙ্গে কাঁচি গাঁথা। মাঝে একবার হাত দিয়ে তিনি তার ধার পরীক্ষা করলেন। ধার কমে এসেছে। সেনমশায়ের নির্দিষ্ট সময় উতরে যাচ্ছে। আরও তাড়াতাড়ি হাত চালাতে হয়।

ওদিকে ননী এবং নিতাই টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে জল আনছে বালতি ভরে। বড়ো বড়ো মাটির গামলা ভরে উঠছে আস্তে আস্তে। রাতের ভেজানো খইলগোলা এনে সেই জলে ঢালা হলো। তারপর কাটা বিচালি ঠেসে মেখে দেওয়া হলো।

ধবলী এবং তার বংশধরদের কাজ শুরু হয়। তারা হুটোপুটি করে মুখ চালাচ্ছে। খানিকটা কলাইয়ের ভুষি জাবনার ওপরে ছড়িয়ে দেওয়া গেলে তারা মচ্ছবের ভোজ মনে করতে থাকে।

কালো গাইটার সঙ্গে নন্দরানী কিছুতেই পেরে ওঠেন না। বাঁটে হাত দিতেই লাথি ছুঁড়ছে। অগত্যা নিতাই (দোকানের কর্মচারী-কাম-গোগণের রাখাল-কাম-পাচক-কাম-গৃহভৃত্য-কাম-গৃহশিক্ষক—সেনমশায় দুপুর বেলাটা একলা দোকান চালাবার কষ্ট স্বীকার করে তাকে স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়বার সুযোগ দিয়েছেন। শর্ত, সে ননীকে সময়মত পড়া দেখিয়ে দেবে।) নন্দরানীর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। দু' চার বাড়ির চাকরেরা এরই মধ্যে এসে পড়েছে। নন্দরানীর দুধের বিশুদ্ধতা নিয়ে কারো সন্দেহ নেই।

সেনমশায় হাতের কাজ শেষ করে উঠে পড়লেন। পরনের গামছা খুলে তেলধুতিখানা পরে নিলেন। মধ্যমনারায়ণ তেলের শিশিটা বারান্দায় তাকের ওপরে থাকে। সেনমশায় সেদিকে যান। স্নানের শেষে একটু তুলসী-ভজনা হবে।

(স্বামী-স্ত্রী দুজনেই "নমো তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী" বলে দৈনন্দিন আহ্নিক সেরে থাকেন— গানটা সেনমহিষী নবদ্বীপ থেকে শিখে আসেন।) তারপর জলযোগ শেষে নিতাইকে আসতে বলে সেনমশায় দোকানের উদ্দেশে পা বাড়ান।

কিন্তু আজ মধ্যমনারায়ণ বসাতে একটু বেশী সময় নিচ্ছে। হাতটা তেমন চলছে না। সেনমশায়কে দেখে সন্দেহ হচ্ছে, আসলে হয়তো কাঁচির ধার তেমন কিছু কমেনি।

এক সময় মধ্যমনারায়ণের হাতখানা থেমে পড়লো। তিনি আরও একটু থমথমে হলেন।

নিতাই, দোকান যাওয়ার পথে পরেশবাবুর বাড়ি হয়ে যাবি, বলে তিনি উঠলেন। ঘরের মধ্যে জামার পকেট থেকে একটা লম্বা ফর্দ বের করে এনে নিতাইয়ের হাতে দিলেন, উনত্রিশ টাকা ছয় আনা। বলবি আজই দিয়ে দিতে।

নিতাই চোখ তুলে তাকালো দেখে সেনমশায় বলেন, না, ভদ্রতা করে কি লাভ। টাকার কাজ আছে। সেনমশায় আরো গম্ভীর।

কিছু পরে তিনি দোকানে বেরিয়ে গেলেন। জাবনা দেওয়া শেষ হলো। ননীর দুটো অঙ্কও কষে দেওয়া হলো। এবার দোকান যেতে হয় নিতাইকে। নন্দরানী যেতে দিলেন না, গোবর জমেছে একগাদা, ছড়িয়ে দিয়ে যা।

কোমরে, গাঁটে কেমন একটা ফিকব্যথা। সকাল বেলায় ঠাণ্ডা জল গায়ে ছিটিয়ে ঘুম ভাঙানোর একটা অতৃপ্তি। নিতাই লাল চোখে নন্দরানীর দিকে তাকালো। সকালের রাগটা আবার সমস্ত শরীর কাঁপায়। নড়ে না। মনে মনে সেই গানটা আওড়ালো, 'ত্রিনয়নী দুর্গা।' রাগ হলে নন্দরানীকে তার ত্রিনয়নী মনে হয়। (ত্রিনয়নীব তিন নম্বর নয়নটা ভাগ্যে কাজ করে না।)

তবুও নন্দরানী মাঝে মাঝে বলেন, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি। বাবু নবাব সাহেব।

নিতাই নিজে কাক। অতএব জানে ভাতের লোভ কি বস্তু। বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হলো, গোবরের গন্ধ সহজে যেতে চায় না। বাজারের থলে নিতে হলো। দোকানের কাজ শেষ হলে বাজার করে বাসায় দিয়ে স্কুলে যাবে নিতাই।

অতএব, খেলার মাঠের মাঝখানটা হেঁটে পার হতে বুকের মধ্যে একটা কনকনে ব্যথা উঠলো তার।

(নিতাইয়ের জন্যে সান্ত্বনা : গত পুজোয় ননীকে এবং তোমাকে একইরকম জামা-প্যান্ট দেওয়া হয়েছিলো। এবং তাই পরে দুজন দোকানে এলে একজন

খরিদ্দার তু' ভাইয়ের খুব প্রশংসা করলো, মনে নেই ? নন্দরানীকে একবার বোনের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় এক সহযাত্রিনী বুড়ী এটি বড়ো ছেলে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, মাসতুতো বোনের ছেলে, মনে নেই ?)

যাই হোক, সেনমশায় বললেন, নাঃ, আর পারি না, লোকের সঙ্গে ভদ্রতা রেখে পারি না। সম্পর্ক রেখে পারি না।

মুখটা, চোখ তুটো, কান তুটো লাল হলো।

সন্ধ্যার দিকে তাঁর দোকানে অনেকে আসে।

গতকাল সন্ধ্যেয় পরেশবাবু দোকানে বসেছিলেন। এমদাদ আলী অফিস থেকে ফিরে বাসায় যান না। বাসা দূরে। সেনমশায়ের দোকানের তালমিছরি চুষে সান্ধ্য অবসরটুকু কাটান।

যেহেতু একই অফিসে চাকরি করেন, অতএব এমদাদ আলী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি, পরেশবাবুর লেটেস্ট রেজাল্ট কি ?

পরেশবাবুর পাঁচটি কন্যা ও একটি পুত্র, স্ত্রী বর্তমানে সম্ভাবনাময়ী।

পরেশবাবু একটু ক্লিষ্ট হেসেছিলেন। বলেছিলেন, দিন কয়েকের মধ্যেই বেরুচ্ছে।

দোকানে খরিদ্দার ছিলো না, সেনমশায়ও তাই আলোচনায় অংশভাগী হতে চান।

এমদাদ আলী চোখ তুলে বলেন, বিয়ে না করে ভালোই করেছি, কি বলেন মশাই ? দেখুন দেখি, চুল পাকেনি এখনো।

সেনমশায় পরেশবাবুর দিকে চেয়ে থাকেন। পরেশবাবু একটু হেসে বলেন, তা আমার মাথায় পাকা চুল পাবেন না। বড়ো মেয়েটার জন্যে মাথায় পাকা চুল রাখা যায় না।

সেনমশায় পরেশবাবুর দিকে চেয়ে থাকেন।

এমদাদ আলী আবার বলেন, তা পরেশবাবু, আপনাদের কিন্তু খুব উর্বরা।

সেনমশায় জায়গা থেকে উঠে তুই চারটে বাক্স ধরে টানাটানি করছিলেন। কিন্তু না, বলতেই হলো, এতে লাভটা কি ? শেষে তো হবে হাড়ির হাল।

পরেশবাবু এমদাদ আলীর দিকে চেয়ে বলেন, লাভটা আপনারা বুঝবেন কেমন করে ? মাথা থাকলে তবে তো মাথাব্যথা বোঝা যাবে।

মুখটায়, চোখ-কান তুটোয় গরম হল্‌কা লেগেছিলো সেনমশায়ের।

নিতাই এসে দোকানে ঢুকলো। বললো, পরেশবাবু বলেছেন, তু তারিখে সব মিটিয়ে যাবেন।

আরে রাখ রাখ দু তা।রখ। কতো দু তারিখ যাবে। সেনমশায় গরগর করেন, ব্যাটারা যেনো শূয়রের মতো—।

দোকান ঝাঁট দিয়ে, গুছিয়ে, বাজারের থলে এবং টাকা নিয়ে নিতাই বেরিয়ে গেলো। ফিরে এসে পাই-পয়সাটির হিসাব পর্যন্ত সে দিয়ে থাকে।

উনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে বসে আছেন। দোকান থেকে বেরুতে নিতাইয়ের কথা মনে এলো। আসলে 'তুষ্ণীভাব' কথাটা খুব স্পষ্ট নয়, হলে নিতাই বলতো না, 'শালার ব্যাটা তুষ্ণীম্ভার!'

কিন্তু সেনমশায় আমাদের অনেক জানেন, অনেক দেখেছেন। জীবনটাও অনেক দূর এগিয়েছে। বেগুন টাল মুলো টালে পরিণত তবুও তিনি স্বচ্ছ। ইউনাইটেড কেমিক্যাল ওয়ার্কস আজ লজ্জায় মুখ লুকনোর পথ পায় না, সেনমশায় জানেন! অয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিট্যুটের জায়গা ক্রমাগত ভাজা মুগের ডাল দখল করাতেও তাঁর মনে তুষ্ণীম্ভাবই জাগে। দুপুরে কাজলীদের গা-ধোয়ানোটা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

সেনমশায়ের দোকানে পুরনো ধরনের কেতা। চেয়ার আছে কয়েকখানা খরিদ্দারের জন্যে। নিজেদের বসা হয় গদিতে। এখন দুর্গাপুরের কথা মনে পড়তে তিনি গদির পিছনের র‍্যাকটায় হেলান দিয়ে বসেন। চোখের সামনে রোদের আয়নায় দুর্গাপুরের মাঠ ঝকমক করে। বাতাসগুলো হু হু। বাজে, বাজে, রাখাল বাঁশী বাজায়। সুখ।

কিন্তু এখন দুঃখ। এই দুঃখ কোথায় থাকে? সারা জীবন বেয়ে বেয়ে মাথায় ওঠে। নেয়ের কুকুর। সে এসে সব কাজে সামনে দাঁড়ায়। সে-ই সুখ। দুর্গাপুর, মাঠ, রোদ, বাতাস, বাঁশি, সুখ, দুঃখ, সুখ।

সেনমশায়ের বাসায় কাঠ কেনার কারবার নেই। ধবলী সবংশে সাহায্য করে কাঠ কেনার খরচ বাঁচিয়ে দেয়।

নন্দরানী আরও দু'খানা ঘুঁটে উনুনে গুঁজে বারান্দায় এসে ডালের কুলো নিয়ে বসলেন। হায় রে হায়, নন্দরানী, উদুখল নেই, যমল অর্জুন নেই, নাড়ুগোপাল নেই, ননী ননীচোরা নয়। সে স্কুলে।

এমন সময় ভদ্রমহিলা এসে ঢুকলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম কাপড়টি পরনে। ছোটো একটি পুঁটলি বগলে। চাউনির জবাবে বললেন, নন্দদিদি বুঝি আপনি? আমি শুনলাম, এই বাসায় বাঁজা মেয়েলোক আছে, তাই—

নন্দ সন্দেহ সন্দেহ করে তাকে বসবার আসন দিলেন। কে জানে, মানুষের কেরামতির কি শেষ আছে কিছু? বেশী সন্দেহ ভালো নয়।

আমার আর ঐসবে কি দরকার, পথটথ সব বুজে গেছে।

পথ কি আর বোজে ভাই! তিনি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞের হাসি হাসলেন, খালি মুখ আটকে থাকে, ছাড়িয়ে দিতে জানা চাই।

নন্দরানী বললেন, কতো দেখলাম, সারা জীবন দেখলাম। শেষ হতে চলেছি, এখন আর দেখে লাভ কি? কতোজন এলো গেলো।

যাদুকরী একটু উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, এখন আমি কিছু চাই না। এক পয়সাও না। যা যা করতে বলবো শুধু তাই করতে হবে। সময়মত এসে খোকার মুখ দেখে সোনার বালা নিয়ে যাবো।

নন্দরানী হাসবেন কিনা ভেবে চুপ করে রইলেন।

অতএব পাঁচটা ডিম বাজার থেকে আনতে হলো। নিতাইয়ের স্কুলে যাওয়া হলো না। 'ত্রিনয়নী' এবং 'তুষ্ণীম্ভার' উচ্চারণ করতে করতে সে বাসায় বাজার পৌঁছে দিয়ে আবার দোকানের দিকে চললো।

ডিম পাঁচটা মন্ত্রপূত হলে পর ভর সন্ধ্যেবেলায় নদীর পারে যে দুই মুখওয়ালা গর্তে সাপ থাকে, সেই গর্তে রেখে আসতে হবে। তবে সাপের গর্ত হওয়া চাই অবশ্য। শ্রীমতী এখন কিছু নেবেন না। মাত্র পাঁচ সিকে মন্ত্রদক্ষিণে লাগবে।

নিতাইয়ের মুখে শুনে সেনমশায় চটে গেলেন, আবার এই সব!

কিন্তু ভেবে দেখলেন, জীবনটা তাঁর একার হলেও ভোগে অংশীদার আছে। হঠাৎ পরেশবাবুর কথা মনে হলো। পরেশবাবুর পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে। আবার হবে হয়তো ছেলে কি মেয়ে। পরেশবাবু কাল সন্ধ্যায় দোকানে এসেছিলেন জিনিস নিতে আরও, অথচ আজ টাকাটা দেননি। অতএব তিনি পাঁচ ডিমের দাম ক্যাশবাক্স থেকে বের করে দিলেন। সেই সঙ্গে আরও কিছু টাকা দিয়ে বললেন, নস্যি ফুরিয়ে গেছে। র, পরিমল দুটোই। মতিহারী কিনে নিয়ে যা। একেবারে তৈরি করে নিয়ে আসবি বিকেলবেলা।

স্কুলে যাওয়া হয়নি। দু'বার করে বাজার করা। গায়ে জল ছিটানোয় ঘুম ভাঙলো। বাইশ বালতি জল টানলাম। র নস্যি। গন্ধওলা পরিমল নস্যি।

একটার জন্যে তামাকপাতা মুড়মুড় করে শুকিয়ে হামান দিস্তায় গুঁড়ো করতে হবে। পরিমলের জন্যে পাতা কালোমতন করে আঁচে শুকোতে হবে। হামানদিস্তা, শিলনোড়া, অ্যামোনিয়া, মেন্থল, পরিষ্কার চুনের জল ঢেলে সেগুলো মাখা হলে কালো হয়। কাজের শেষে নাক জ্বালা করে। সাবারাত মাথা ভার, ঘুম হয় না।

বুড়ী বেটীর ছেলের শখ! ছেলের আগে নিজেরা পটল তুলবে। শালার ব্যাটা তুষ্ণীম্ভার। ঠোঁট কাঁপতে থাকে। কিন্তু সে নিজে কাক, অতএব বাজারের পথে।

আর স্কুলে বসে আমাদের ননীচোরা নয়, ননীগোপাল তখন অঙ্কের ক্লাসে সিড়িভাঙ্গার মধ্যমসিঁড়ি কামড়ে ধরে পড়ে আছে। তারিণী মাস্টার ঠাট্টা করে বললো, সেনমশায়ের পোলা তুই, মাঝসিঁড়িতে আটকে গেলি!

হায় রে হায়, দেবকীর নয়, নন্দরানীর ননীগোপাল লাল চোখে তাকালো।

ব্যাটা সাপগুলো গর্ত করে কোথায়? কামড়ানোর সময় ব্যাটারা ঠিক হাজির কিন্তু নদীর পাড়ে গর্ত নেই।

আর একটু সময় গেলেই সন্ধ্যে হবে। ওপারের ধানক্ষেতের হলদে আভা মিইয়ে এসেছে। অড়হরের ক্ষেতের ফাঁক দিয়ে আর কিছু দেখা যায় না। জমাট অড়হর হচ্ছে।

গোটা কতক গর্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু দূরে দূরে। দু'টো মুখ কারোরই নেই। নিতাই মনে মনে বললো, বেটীর ছেলের শখ।

আর খানিক খোঁজাখুজির পর দুমুখ অল্প দূরে দূবে একটা গর্ত পাওয়া গেলো। নিতাই বললো, রাখ এখানে।

খি খি করে হাসলো ননীগোপাল, এ গর্ত কিন্তু শেয়ালের, তা রেখে যাই, শেয়ালভোগ!

কিন্তু নিতাইয়ের মনে হলো, এ গর্ত ইঁদুরের, নির্ঘাত ইঁদুরের! সাপগুলো বড়ো শয়তান। ইঁদুরের গর্তে ঢুকে থাকে। কোকিলগুলো বড়ো শয়তান, কাককে ঠকায়। সে নিজে কাক।

খাওয়া-দাওয়ার পর দোকানেই গিয়েছিলেন সেনমশায়। একটু তন্দ্রামতন, কাজটা গদির ওপরে বসে বসেই সারা গেলো। কিন্তু বেলা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বুকের

মধ্যে কেমন করে। সাপের গর্ত মেলা দুষ্কর। অন্ধকারে চেনা যায় না। ওরা কি এতোক্ষণে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে? যদি না বেরোয়!

অল্পক্ষণের জন্যে দোকান বন্ধ করতে সেনমশায় মাত্র দুটো তালা ব্যবহার করেন। তাই শেষে, দুটো তালা তিনি দোকানের পাল্লাগুলো টেনে দিয়ে তাতে আঁটলেন।

না, বাসায় গিয়ে লাভ নেই। একেবারে নদীর ধারেই যাওয়া ভালো।

চৌমাথা ছেড়ে নদীর দিকে এগোতেই নির্জনতার সঙ্গে অন্ধকার ঘন হয়ে এলো। বন্ধ আদালত পাড়ার পেছনে নদী। বিরাট অশ্বত্থ আর বটে অঞ্চলটা স্তব্ধ, গম্ভীর। জমাট অন্ধকার এখন অস্পষ্ট। বাদুড়-পঞ্চায়েত অশ্বত্থের শাখায় দিনশেষের হিসাব নিয়ে মহা কোলাহল শুরু করেছে। তাদের পরিপাকযন্ত্র থেকে নির্গত বটফলের কটু গন্ধে বাতাস ভারী।

শেষে নদীর পাড়ে আসা গেলো। নদী অনেক দূরে নেমে গেছে। অতএব তাঁকে খানিক নীচে নামতে হবে। শানবাঁধানো সিঁড়িটা দিয়ে নামা যাক। যদিও জল সিঁড়ির গোড়া ছেড়ে বিশ হাত তফাতে চলে গেছে তবু সেখানকার জল কালো হয়ে থিরথির করছে। ওপারের গাছপালায় জমাট অন্ধকার। একটা একলা পাখি, সেনমশায় ভালো করে দেখলেন, হ্যাঁ, একটা একলা পাখি, একটা অড়হরগাছের মাথায় বসতে গাছটা মাথা নামিয়ে দিলো, আবার তুললো, আবার নামালো। পাখির দোলনা। গাঙশালিক বোধহয়, টিটি করে ডেকে তখনই উড়ে গেলো।

আর তখনই তিনি শুনলেন খি খি করে হেসে ননীগোপাল বলছে, রাখ রাখ ওখানেই। শেয়ালের গর্তেই রাখ। ব্যাটার আজ মহাফুর্তি। পাঁচটা ছেলের ডিম খাবে।

সেনমশায় সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দু' পাশ উঁচু করে আলিসা দেওয়া সিঁড়ির খাড়া নীচ থেকে স্পষ্ট শোনা গেল ওদের কথা।

ওরা তা হলে তার আগেই এসেছে।

অন্ধকার আরও কালো হচ্ছে নদীর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তাঁর জলের ধারে যাওয়া হলো না। পায়ে পায়ে চুপি চুপি তিনি উঠে এলেন।

পা দু'টো বড়ো ভারী বোধ হচ্ছিলো। ওঠানো যায় না। কিন্তু এ-রকম কেনো? জলের ধারে যাওয়া হয় না এ তো জানাই। কবে কোথায় শুনেছিলেন গান, 'নীর ভরনে ক্যায়সে যাঁউ সখিরে।' অনর্থক গানটা বারে বারে মনে ঘুরতে থাকে। অন্ধকার অশ্বত্থের তলা পার হতে হতেই তাই তাঁর পা দু'টোর ভারও

কমতে থাকে। চৌমাথার আলো দেখা যায়। সব দোকানের আলো জ্বলে মেলার মতো দেখাচ্ছে।

সারা শহরে ধর্মঘট হলেও সেনমশায় বিকেলের দিকে এসে দেখেন দোকান খোলা যায় কিনা। সেই দিনটা তাঁর ভালো যায় না।

আর এখন সব দোকানে বাতি, আলো। তিনি অন্ধকারে একা, দোকান বন্ধ। দ্রুত পায়ে তিনি ফিরে চলেন।

ঝটপট তালা দু'টো খুললেন। পাল্লা গোটালেন। রইসউদ্দিন সাহেব মিঠা তামাকের বাঁধা খরিদ্দার। তিনি এই অনিয়ম দেখে হতভম্ব হয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেনমশায়কে দেখে পরম বিস্ময়ে শুধালেন, কি ব্যাপার ?

আর বলবেন না, দোকানের পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকে সেনমশায় বললেন, আর বলবেন না, বুড়ো বয়সে ছেলের শখ।

হা হা করে হেসে রইসউদ্দিন বললেন, কার ? আপনার নাকি ?

একটু চমকালেন সেনমশায়, মুখের কথা শেষ করে লাভ নেই ভেবে বললেন, না, পরেশবাবুর। বিকেলে শুনলাম তাঁর নাকি ছেলে হয়েছে।

বলে সেনমশায় সুইচটা টিপে দিলেন। উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে গেলো। মনে হলো, দোকানটা তাঁকে পেয়ে হাসছে। মনে হলো তিনি একটা অন্যরকম কিছু করছিলেন, জীবনবাবাজীর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হেরে যাওয়ার মতন।

খুশী হলে তিনি উর্দু বাত বলেন, তাই মনে মনে বললেন, কে ফাঁকি দেবে, এই তো হাম হ্যায়।

সেনমশায় গদিতে বসলেন। যেন আবার তিনি সরল রেখাটার ওপরে এসে দাঁড়ালেন।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

দুই রাত্রি □ সন্তোষকুমার ঘোষ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[এক রাত্রি]

"তোমার শীত করছে সুধা?" স্টিয়ারিংএ হাত রেখে নিরুপম আড়চোখে তাকিয়ে বলল। বলেই তার মনে হল, এ-কথা বললাম কেন। যদিও শেষ রাত, তবু মাসটা তো অক্টোবর, এখন গাড়ি চলছে বলেই সুধার শীত করছে এ কথা ধারণা করার কারণ কী। আসলে পৌর-সীমার শেষ চেক পোস্টটা পেরিয়ে যেতেই নিরুপমের মনে হয়েছিল চারদিক খুলে গেছে, সবুজ-সবুজ একটা গন্ধের ঝাপটা চোখে মুখে লাগছে। মনে হয়েছিল। দেখা যায় না, তবু সে যেন অনুভব করল রাস্তার দু'পাশে রাশি রাশি জলজ তৃণ ছেয়ে আছে।

সে একা এইরকম একটা আধা-ভৌতিক প্রতীতিও তাকে ভর করেছিল। সেই ছমছমে ভাবটা কাটাতে নিরুপম অহেতুক বলে উঠল, "সুধা, তোমার শীত করছে?"

জানালা ঘেঁষে যে বসে, অস্পষ্ট, অপার্থিব, একটি অবয়বের আভাস মাত্র, তার দিক থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। "সুধা!" নিরুপম একবার ডাকল নরম করে। "সু-উ-ধা।"—দ্বিতীয়বার প্রায় চিৎকার করে। জানালার পাশের মুখটা এদিকে ফিরল, তার চোখের পাতা কাঁপছে, ঠোঁট নড়ছে, সাড়া মাত্র ওইটুকু। কিংবা খুব ক্ষীণ "কী?" অথবা অনুরূপ একটা ধ্বনি, ন্যূনতম, শোনা গেল।

"কিছু না। এমনি। ডাকলাম।"

"অতো জোরে! ওভাবে তো লোকে দূরের লোককে ডাকে।"

"তাই তো। হঠাৎ মনে হয়েছিল কিনা যে, আশে পাশে কেউ নেই। তুমিও দূরে সরে গেছ।"

"পাগল," সুধা বলল সংক্ষেপে, মুঠোভরা ধুলো ঝুরঝুর করে ছেড়ে দেওয়ার মতো করে।

ড্যাশবোর্ডটা জ্বলছে ধূর্ত কোনও শৃগালের চোখ যেন, তার লাইটারে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিরুপম হাতঘড়িটায় সময় দেখে নিল। আকাশে লেশমাত্র মেঘ নেই, অসীম সৌভাগ্য, সেখানে এই শেষ প্রহরে রক্তাল্প একটা চাঁদ তখনও অবশিষ্ট। তাকে নিস্তেজ দেখে দু' চারটে তারা ইতস্তত ফুটি ফুটি করছে, নতুবা চরাচরে পরিব্যাপ্ত অন্ধকারই শুধু পরিদৃশ্য। হেডলাইটের খোঁচা খেয়ে চমকানো অন্ধকার কোথাও তড়াক করে লাফিয়ে উঠছে মগডালে, কোথাও আহত পশুর মতো নেমে পড়ছে নয়ানজুলিতে, ঘাসের সুবাসে মুখ ঘষে ঘষে বোবা ভাষায় গজরাচ্ছে।

তবু দমবন্ধ ওই গহ্বরটার বেড়াজাল থেকে যে বেরিয়ে আসা গেছে, এই ঢের। স্বভাবে শহরটা হিংস্র। গাড়ি নিয়ে অন্ধকারে কাউকে পাড়ি দিতে দেখলে বেশ খানিকটা পথ পর্যন্ত পিছু পিছু তাড়া করে আসে, গৃহস্থবাড়ির কুকুরের মতো। তারপর একসময় নিজেই থেমে যায়, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপায়, শ্বাস নেয় জোরে জোরে। অপলক চেয়ে থাকে, আক্রোশে নিষ্ফল ফোঁশে।

সুধা এসব কিছুই টের পায়নি। গাড়িতে উঠেই, ঘুম নয়, ঘুমের মতো। ঘুমের ভানটাই বেশি ভয়ানক, মৃত্যুর মতো।—"আমি যদি একটি শব বহন করে যেতাম, একাকী কোনও নিঃসঙ্গ অন্ধকার রাত্রে, সেই অনুভূতিও এইমতো হত," নিরুপম স্বগত বলল, "আশ্চর্য, শহরের রাস্তায় কতদিন দেখেছি, কিন্তু কোনও শব-শকটের চালকের মুখের দিকে কোনদিন তাকাইনি তো!"

শীত নেই, তবু ফিরে ফিরে সে শীতের কথাতেই চলে আসছিল।—"কাচ তুলে দাও সুধা, বুঝতে পারছি তোমার কষ্ট হচ্ছে।"

"না তো!"

তবে তুমি এত ঠাণ্ডা কেন। কথার পিঠে এই কথাটা মুখে এসে পড়েছিল, নিরুপম সামলে নিয়ে বলল, "তোমার চুল এলোমেলো হয়ে যাবে।"

"এখন নেই বুঝি?" সুধা ফিরে তাকাল, একেবারে সোজাসুজি, চোখ দুটি বিস্ফারিত, ফলে তার সম্পূর্ণ মুখটাই অতিকৃত বৃহদাকার দেখাচ্ছিল, "এখন নেই বুঝি?" সামান্য জিজ্ঞাসা, কিন্তু তার অন্য কোনও অর্থ আছে। সুধা এই কথাই বলতে চাইছে কি "আমার সবটাই তো এখন এলোমেলো অগোছালো", গত রাত্রির একটি কুঞ্চিত স্মৃতিকে মেলে ধরতে চাইছে এই প্রাক্-সকালে?

"চুলের কাঁটা-টাটা সবই পড়ে আছে সেখানে, ওই হোটেলে, ঠিকঠাক হবার সময় পেলাম কই, চটিটা পায়ে গলিয়ে কোনরকমে—"

সুধা আস্তে আস্তে বলছিল, কিন্তু ততক্ষণে নিরুপমের ভিতরে একটা প্রতিরোধ

প্রবল হয়ে উঠেছে, বলতে চাইছে "থামো," সেই সঙ্গে কাতর একটি অনুনয় "দোহাই তোমার, ওই হোটেলের কথা টেনে এনো না।"

কিন্তু এতক্ষণ নির্জীব ছিল যে, সে সহসা নিষ্ঠুর নির্লজ্জ হয়ে গেছে, নিরুপম সুধাকে বলতে শুনল "মনে পড়ছে ?"

উত্তর দিল না নিরুপম। তার নত দৃষ্টি লহমার জন্যে তার নিজেরই বুকের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সুধা যখন উত্তর না পেয়ে বলল "কী দেখছ," নিরুপম শুকনো হাসল "দেখছিলাম মন কোথায় থাকে।"

"মন তোমার আছে ?" সুধার গলা ক্রমে শাণিত হয়ে উঠছিল। "ছিল বলেই তো জানতাম," নিরুপম হালকা গলায় বলল, অথবা বলে হালকা হতে চেষ্টা করল। আমি কি ওকে হাসাতে চেষ্টা করছি, সে ভাবছিল, এই পাথরটাকে তাতাতে কিংবা মাতাতে ? আমার ভূমিকা কি অবশেষে এই, একটা কাতুকুতু-দেওয়া ভাঁড়ের ?

আত্মধিক্কারের ভাবটা ঝেড়ে ফেলতেই সে হঠাৎ জোরে বলে উঠল, "সুধা, দ্যাখো, দ্যাখো।"

সুধা টেরচা চোখে চাইল, যেন কৃপা করে। —"কী দেখব, তোমার গাড়ি চালানো ? সে তো অনেক দেখেছি।"

আর কিছু বলার নেই, বলে ফল হবে না। অথচ নিরুপম বলতে চেয়েছিল দ্যাখো, দ্যাখো, একটু পরেই সকাল হবে, ভোরের প্রথম পাখিটা এক্ষুনি উড়বে তাকিয়ে থাকো। বৃথা। সুধা দেখবে না। চোখ সে মেলে আছে ঠিকই ; সেই চোখ, যা কিছু দ্যাখে না।

এই চলবে, যতক্ষণ না সকাল হবে ? মরীয়া হয়ে নিরুপম আরও তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে রাতটা পার হতে চাইছিল। ইঞ্জিনটা উত্তপ্ত, থরথর, সামনের একটা ঘোড়ার নালের মতো বাঁক, সে অতিকষ্টে টাল সামলে নিল।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি ?" ফ্যাকাশে গলা, সুধা বলছে। সে-ই উদ্দিষ্ট বলে ধরে নিয়ে নিরুপম বলল, "কোথাও না। শুধু যাচ্ছি।"

"তার মানে পালাচ্ছি," সুধা বলল তিরস্কারের ঢঙে, কিন্তু কী আশ্চর্য, তাই মেনে নিয়ে নিরুপম কথাটার অবিকল প্রতিধ্বনি করে বলল, "পালাচ্ছি। মণ্ডপে আগুন লাগলে লোকে ছুটোছুটি করে বেরোবার পথ খোঁজে, বেঁচে থাকা থেকে পরিত্রাণ পেতেও আমরা তেমনই যে যেদিকে পারি ছুটছি।"

"কাল রাত্তিরে ওই হোটেলে কি আগুন লেগেছিল ?" সুধা জিজ্ঞাসা করল, নিরুত্তাপ কণ্ঠ, "আর তাই কি নিরুপম, আমরা ছুটে ছিটকে বেরিয়ে পড়েছি ?"

"সুধা," নিরুপম যেন প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, "বারবার হোটেলটার কথা তুলো না, কালকের দুঃস্বপ্নকে আজকের দিনটাতে টেনে এনো না। সকাল হচ্ছে, টের পাচ্ছ না যে, সকালের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে ?"

"সকালের একটা গন্ধ থাকে বুঝি ?" সুধা বলল আস্তে আস্তে "গন্ধটা কিসের, ফোটা ফুলের ?"

"সকালের নিজেরই একটা সৌরভ আছে তার জন্যে ফুল ফোটার দরকার হয় না।" নিরুপম বলল, প্রত্যয়ের সঙ্গে। গাড়িটাকে এক পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেন সেই সকালেরই অপেক্ষা করতে থাকল।

ঝিঁঝি ডাকছিল ঝোপে-ঝাড়ে। পাখির বাসায় বাসায় সাড়া পড়ে যেতেই ঝিঁঝিরা থেমে গেল। ফরসা ফ্যাকাশে একটা দিন, একটা দিন চোখ মেলছে, কাছের দূরের দৃশ্যপট লুপ্ত কায়া ক্রমশ ফিরে পাচ্ছে। পাশ থেকে সুধার মুখের একাংশ দেখা যাচ্ছিল, সেই মুখও ফরসা, ফ্যাকাশে। শেষ রক্তবিন্দুও যেন কেউ শুষে নিয়েছে। শুধু নিরুপমের মনে হল, সুন্দর। ওই সৌন্দর্যকে অধিকার করার বাসনা তাকে অকস্মাৎ আন্দোলিত করতে শুরু করল।

হাতটা ছাড়িয়ে সুধা বলল, "ছিঃ, এই বাসী মুখে ?" নিরুপম শুনতে চাইল না। তখন ধমক দিয়ে সুধাকে বলতে হল "ওরা দেখছে।"

"কেউ তো নেই। কারা ?"

এক ফালি জমির ওধারে একটা কুঁড়ে ঘরের বাইরে দুটো মুরগি চরছিল, সুধা ইশারায় তাদের দেখিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'জনে মিলে হাসল। মেঘ কেটে যাচ্ছে, ভারী হাওয়াটা হালকা হচ্ছে আবার। নিরুপম বলল, "দেখছে না। কারণ মোরগটা মুরগিটাকে নিয়েই এখন ব্যস্ত।"

"মুরগিটা খুঁটে খুঁটে ওকে কী যেন দিচ্ছে।"

নিরুপম সহসা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "তুমিও আমাকে কিছু দাও।"

প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকাল সুধা।—"কী দেব। সবই তো নিয়েছ কাল, এই তো কয়েক ঘণ্টা হ'ল মোটে। নাওনি ?"

"না না সুধা," নিরুপম অধীর গলায় বলে উঠল "নিইনি। নিতে পারিনি, অথবা পাইনি। তুমিও দাওনি।"

অচঞ্চল, স্তব্ধ সুধা কান পেতে শুনল। বর্ণহীন মুখে একটু-একটু রঙ, রক্ত যেন

ফিরে আসছে। নিরুপমের অস্থিরতাকে ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা দিয়ে স্পর্শ করে খুব নীচু স্বরে বলল, "ওর চেয়ে বেশি দেবার মেয়েদের আর কী থাকে?"

"আছে," নিরুপম পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, "নিশ্চয় আরও আছে। পাওয়ার চরম চেহারাটা কি অতো অগভীর হতে পারে? আমরা বেরিয়ে পড়েছি তাই তো।"

"যেখানে যাচ্ছি, সেখানে বুঝি সব পাব?"

প্রবল বিশ্বাসে স্থির কণ্ঠে নিরুপম বলল "পাব।"

এর পর তখনকার মতো আর কথা ছিল না। এক ঝাঁক বক শাদা পাখা মেলে তখনই হাসিতে হলুদ একটা বাবলা গাছের তলায় বসল।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করেছিল এবার অব্যস্ত গতিতে। পথের পাশের দূরত্বজ্ঞাপক প্রতিটি শিলালিপি পড়া যাচ্ছে। নিরুপম হেসে বলল "আমরা কালের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছি, কিন্তু এই মাইলের লেখাগুলো আমাদের স্থানের বাইরে যেতে দিচ্ছে না।"

"স্থান আর কাল," শুনে, সুধা বলল, "এই নিয়েই তো সমাজ?"

"এবং সংস্কার। আমরা যা পার হতে পারছি না।"

সীটে হেলান দিয়ে সুধা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনল, তার চোখ আবার বুজে এসেছিল, পা দুটি যত দূর মেলে দেওয়া যায়, দিয়ে সে শরীররটাকে ছড়িয়ে দিল। চোখ বুজেই সুধা বলল, যেন অন্য কাউকে, "নিরুপম আমাকে ক্ষমা কোরো। কাল তোমাকে বোধহয় শুধু কষ্টই দিয়েছি।"

"সুধা, কষ্ট তুমিও তো পেয়েছ।"

"কিন্তু তোমার সমস্ত আয়োজনটা নষ্ট হল। আমি—" সুধা সসংকোচে উচ্চারণ করল "কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না নিরুপম যে, আমাদের সম্পর্কটা নিষিদ্ধ।"

কী উত্তর দেবে নিরুপম, কী দিতে পারে। সাজানো কোনও সংলাপ?—'নিষিদ্ধ বলে কিছু নেই সুধা। যা নিষিদ্ধ তাই প্রসিদ্ধ হতে পারে, তার প্রমাণ বৈষ্ণব কাব্য।'—কিন্তু বানানো কথা দিয়ে সুধার দ্বিধাকে অপমান করতে ইচ্ছা হল না। বরং দায় আর দোষ নিজের কাঁধে নেওয়াই বেশি পুরুষোচিত। বলল, "ভুল আমারই হয়েছে সুধা। ওখানে, ওই হোটেলটাতে তোমাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। তবু বিশ্বাস করো, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম যা চাই, ওখানে তা মিলবে।"

"কী চাই ?" উদাস গলায় সুধা বলল, চোখ তেমনই নিমীলিত। —"তোমার দোষ নেই। আমরা আসলে সুখ আর আনন্দের তফাত বুঝি না।"

চুল অল্প অল্প উড়ছিল সুধার, একটি স্মৃতি ছোট ছোট কম্পন হয়ে একবার ওর সারা দেহে প্রবাহিত হয়ে গেল। সুধার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, কঠিন কয়েকটি পেশী, পরিস্ফুট কয়েকটি শিরা ওর ক্লিষ্ট মুখখানাকে মমতার যোগ্য করে তুলছিল। নিরুপমের লোভ হল, রুমাল বের করে তার মুক্ত হাতটি দিয়ে সন্তর্পণে সুধার কপালটা মুছিয়ে দেয়। ও কি ফিরে গেল গতরাত্রির ক্লিন্ন অন্ধকারে ? নিরুপমের মনে হল সে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্যাঁতসেঁতে সুড়ঙ্গের ঠিক মুখটাতে, আর সুধা টলতে টলতে, প্রাচীন পাথরে গাঁথা প্রাচীরে ধাক্কা খেতে খেতে প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভিতরে, নিরুপম চেঁচিয়ে ডাকছে "সুধা আর যেও না, হারিয়ে যাবে, ফিরতে পারবে না," কিন্তু তবু সুধা সম্মোহিত, আচ্ছন্ন, যেতে থাকল, কখন প্রকাণ্ড একটা কবাট ধস করে পড়ে গেল, আর দেখা যায় না, নিরুপমের নিজের গলাই প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল।

এখানে কী, এখানে কেন, সুধা প্রথমেই বলেছিল, বিস্মিত, আড়ষ্ট, সন্দিগ্ধ। ওর সমস্ত ভঙ্গিটাই একটা প্রতিরোধ হয়ে গিয়েছিল। যখন বাচ্চা ছোকরাটা ওদের বারান্দার পর বারান্দা পার করে দিয়ে একটা কামরায় বসিয়ে দিয়ে গেল, যাবার সময়ে টেনে দিয়ে গেল দরজাটা। ছোকরার মুখে একটু মুচকি হাসি ছিল হয়ত, নিরুপম লক্ষ্য করেনি, কিন্তু সুধার চোখে সেটা পড়ে থাকবে, পলকে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল সুধার মুখ, যেন আঁতকে উঠে বলল "এখানে কী ?"

"এখানে সন্ধ্যা, যেখানে আমরা এসেছি," নিরুপম থতমত খেয়ে এর চেয়ে সম্ভ্রান্ত কোনও উত্তর দিতে পারেনি।

"এ-খা-নে !" অত্যন্ত ক্লান্ত, আহত সুধা বলেছিল টেনে টেনে। দু'হাতে খানিকক্ষণ চোখ ঢেকে রেখেছিল।

কিন্তু সুধা তুমি এখনও কেন চোখ বুঁজে মাঝে মাঝে কাছে এসে দূরে চলে যাচ্ছ, এই লুকোচুরি এখন আর মানায় না, এখন, যখন চেয়ে ছাখো, গাড়ি ছুটছে, মসৃণ, সাবলীল, ইচ্ছে হলেই ওর গতি আমি বাড়াতে কমাতে পারি, একটু আগে চমৎকার রোদ ছিল, এখন হঠাৎ মেঘলা, সামনের কাচে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছে, জমুক ; টলটলে অশ্রুপ্রতিম, বেশ দেখাচ্ছে, ওয়াইপার চালাব না, সে-সময় এখনও আসেনি, কয়েকটা ফোঁটা তো মোটে, বাতাসে শুকিয়ে যাবে। —"এই, এই।" নিরুপম সুধাকে ঠেলা দিয়ে ডাকল। সুধা তাকাতে বলল, "চা খাবে ?"

সুধা বলল "মন্দ হয় না, কিন্তু পাব কোথায়, ফ্লাস্ক তো আনান।"

"রাস্তার ধারে, কোনও একটা দোকানে। মাঝে মাঝে ছোটখাটো বাজার আছে, এতক্ষণ নিশ্চয় ওরা তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছে।"

দোকান থেকে দুটি ভাঁড়ে ওরা চা নিল, কিন্তু গাড়িটা থামাল গঞ্জ ছাড়িয়ে। এখান থেকে রাস্তাটা হঠাৎ ঝাঁপ দিয়েছে। তার অনন্ত বনাতের আভাসটুকুও মেলে না।

ঠাণ্ডা খানিকটা জল নিরুপম ঢালল গাড়িতে, বাকীটায় সুধা চোখে জলের ঝাপটা দিল। ওর ভুরুতে, গালে, কানের কোণে জল চিকচিক করছে, একটা স্নিগ্ধ ভাব এসেছে। স্নিগ্ধতারও একটা সৌরভ আছে, নিরুপম মুগ্ধ হয়ে ভাবল।

"এই।" অবাক হয়ে সে শুনল সুধাও তাকে ডাকছে "এই!" জলের ছোঁয়া ওর ভিতরেও লেগেছে। সুধা বলছে "এই, এ-পথে আমরা আগে কখনও এসেছি?"

"কেন? তোমার মনে নেই? সেবার—সেবার অবশ্য উৎপলও সঙ্গে ছিল।" অবশ্য, নিরুপম ইচ্ছা করেই অবশ্য শব্দটা ব্যবহার করল (উৎপল তোমার স্বামী সুধা, সে তো অবশ্যই। বরাবর সে অবশ্যই ছিল)।

উৎপলের নাম সুধা শুনল কি শুনল না, অন্তত যেন শোনেনি এইরকম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সেবার বোধহয় রাস্তার দু'ধারে ফুল ছিল।"

"হ্যাঁ, পলাশ। সেটা মার্চ মাস ছিল যে।"

"এই ঋতুতে ফুল নেই?"

"আছে। অন্য ফুল। সেবার কিন্তু খুব গরম ছিল, একটু বেলা হতে না হতে সব তেতে উঠত, শুকনো হাওয়া আর ধুলো, টকটকে ফুলগুলোর চারপাশে বোলতা আর ভোমরা চক্রাকারে অবিরত ঘুরত।"

"তুমি আমাকে এক গুচ্ছ পেড়ে এনে দিয়েছিলে"; সুধা দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে বলল। —"মনে আছে। চুলে পরতে তুমি বলেছিলে, ঠিক সাঁওতালীদের মতো। শুনে উৎপল কী বলেছিল বলো তো?"

"মনে পড়ছে না।"

"রেগে উঠে বলেছিল আমার বউ বুঝি সাঁওতালদের মতো কালো?"

নিরুপম মনে মনে বলছিল, 'সুধা, উৎপলের কথা থাক।' কিন্তু মনে মনে বলা বলেই সে-কথা সুধার কানে গেল না। সে আস্তে আস্তে বলল, "উৎপল এই রকমই! চোখ নেই!"

হয়ত দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে, হয়ত শুধুই ওই কথাটা চাপা দিতে, নিরুপম আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

· ·সেই হোটেলে দুটি হাঁটুর মধ্যে ঘাড় গুঁজে অতক্ষণ বসে রইল, অথচ সুধা তো জানত। আমি ওর এই প্রতিক্রিয়ার, সত্যি বলতে কী, অর্থ বুঝিনি। মুহূর্ত-গুলো যেন কাতর তিতির পাখি, কোথাও বন্দুকের আওয়াজ হতেই ভয়ার্ত, পালাচ্ছে। আস্তে আস্তে ঘরটাই যেন মুছে যাচ্ছে, সবই লুপ্ত হয়ে যাবে নাকি, হে ঈশ্বর, অকৃতার্থ, অনির্দিষ্ট কোনও ধারায় অভিযুক্ত আমিও একটা চেয়ারের হাতল ধরে বসেছিলাম, ওই চেয়ারটাই কাঠগড়া আমার, হতভাগ্য এক আসামীর, যে বসে আছে, সে আর নিয়তি এক নারী, দু'জনকে মাঝখানে রেখে সময় আর একটা দ' তৈরী করে ঘুরে যাচ্ছে।

অথচ সুধা তো জানত। কী একটা ইণ্টারভিউ পেয়ে সে দিল্লি যাচ্ছে, খবরটা উৎপল আমাকে উৎফুল্ল গলায় দিতেই সুধাই তো ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে প্রথম আমার দিকে তাকিয়েছিল। সেই চোখ দুটি তাদের পাতায় পাতায় তালি বাজিয়ে বলছিল 'এত দিনে, এত দিনে।' উৎপল বলল 'যেতে আসতে সাতদিন। ওরা ফার্স্ট ক্লাস ভাড়া দিচ্ছে, খুব বড় একটা চান্স। দেখি, যদি আমার কপাল ফেরাতে পারি।' ঘাড় কাৎ করে সুধা শুনছিল, খরগোস যেমন ঝোপ-ঝাড়ে কান পেতে শিকারী প্রাণীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে কিনা মন দিয়ে শোনে। সুধার দৃষ্টি দ্রুত আমার সঙ্গে বৈদ্যুতিক বার্তা বিনিময় করছিল। 'বোকা', সেই দৃষ্টি বলছিল 'বোকা, ও ভেবেছে বড় চাকরি পেলেই ওর বরাত ফিরবে, ও তোমার সমান হবে।' আরও একটা অনুনয় আমি ওই নিবিড় করে সুর্মা-টানা চাহনিতে পড়েছিলাম, অনুনয় অথবা অনুমতি। —'এইবার', সেই চাহনি বলছিল 'এইবার। তুমি একটা ব্যবস্থা করো। এই বাড়িটা ছাড়া অন্য কোথাও। যেখানে তৃতীয় কেউ নেই, শুধু আমরা। কানামাছি খেলা, চুরি করে ছুঁয়ে এসেই বুড়ি ছোঁয়া, আর সহ্য হয় না।' কথাগুলো নিঃশব্দ বুদ্বুদের মতো ফাটছিল। আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

হাওড়া স্টেশনে উৎপলকে উঠিয়ে দিয়ে আসবার পর থেকেই সুধার মধ্যে পরিবর্তনের ভাব টের পেয়েছিলাম, সতেজ ধরনটা আর নেই। গাড়িতে ফিরে এসে ও চুপ করে ছিল। একবার বলল, "সারাদিন ঘোরাঘুরি, ক্লান্ত লাগছে।" তার পরেই বলল, "মনটা খারাপ লাগছে, জানো! উৎপলটা একা চলে গেল। ট্রেন ছাড়ার পর হাত বাড়িয়ে বলছিল 'ভাল থেকো, সাবধানে থেকো!'

বারবার বলছিল। তুমি শোননি?" একটু পরেই আমরা হোটেলটার বাইরে এসে থামলাম।

সুধাও নামল। অনিশ্চয়তা ওর প্রতিবারের পা ফেলায় অনুভব করছিলাম। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললাম, "কী হয়েছে সুধা, কী—কী?" সুধা বলেছিল "কিছু না। হঠাৎ যেন একটা ছবি মনে পড়ে গেল—বিশ্রী। বোধহয় বিলিতি কোনও সিনেমায় দেখেছি। একটা বাচ্চাকে কবর দিয়ে আসার পর তার বাবা-মা শোবার ঘরে ঢুকছে। ঘরে আলো জ্বলেনি। দুজনেই মুখ থুবড়ে ফাঁকা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। আরও অন্ধকার নামছে। দু'জনেরই পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। শেষে সেই অন্ধকারে হঠাৎ দু'জন দু'জনকে যেন ভয় পেয়ে আঁকড়ে ধরল, তার পরেই কেটে গেল সেই দৃশ্য। ভাবতেও কাঁটা দেয়—আমি আর ছবিটা দেখতে পারিনি।"

শুকনো গলায় বলেছি "তাই বুঝি। কিন্তু—কিন্তু সুধা, তার সঙ্গে আজকের মিল কী? উৎপল—আমরা তো শুধু ওকে বিদায় দিয়ে এসেছি।"

সুধা শান্ত স্বরে বলল "ঠিক। বিদায় দেওয়া আর কবর দেওয়া, দুটোকে ঠিক এক বলা যায় কি?"

একটা লোক-বোঝাই বাস এক দিকে, তার পাশ কাটিয়ে চলে আসছে ট্রাক, ভয়ংকর-গতি, দুটোর মাঝখান দিয়ে গাড়িটাকে অবলীলায় পার করে এনে নিরুপম একটু দম নিল। রাস্তার দু'ধার এখন নিষ্পাদপ, নিস্তৃণ। সুধাকে ঠেলে তুলে দেখিয়ে দিল।

দেখল সুধা, কিংবা দেখল না। একবার বলল "কিছু তো নেই। ধু-ধু করছে তো শুধু।"

নিরুপমের বলতে সাধ গেল 'সেইটাই তো দেখাচ্ছি। মাঠের পর মাঠ, দূরে দূরে কালো কালো বিন্দু। যত কাছে যাব, কালো ফোঁটাগুলো বড় হয়ে উঠবে। এক-একটা তালগাছ, এই সব প্রান্তরের নিঃস্বতার প্রহরী। প্রান্তরগুলো রিক্ত, নিজেদের জন্যে কিছু রাখেনি। রাখেনি বলেই ওরা আমাদের অনেক কিছু দেয়, দিতে পারে।' বলতে সাধ গেল, বলা হল না।

সুধা বলল, "সেবার যেন একটা অভ্রক্ষেতও দেখেছিলাম, কুঁচি-কুঁচি রুপো ছড়ানো সারা মাঠে। সে কত দূরে?"

নিরুপম বলল, "আরও বেশ কিছু গেলে। সবে আমরা পাহাড়ের একটা মহল পেরিয়ে এসেছি। মাঝে একটা লম্বা শালবন গেল, তার তলার মাটিতে ছায়া আর রোদে মিলে অনেক জেব্রা আঁকা। তুমি চেয়েও ছাখো নি।"

…এখানে কেন, এখানে কী, স্থধা বলে উঠেছিল। সে আরও কতক্ষণ পরে? ছোকরা চাকরটা মুচকি হেসে দরজা টেনে দিয়ে গেল। সে ফিরেও এসেছিল। কতক্ষণ পরে? গরম, দু' প্লেট পকোড়া আর চা রেখে গেল। চমকে উঠে স্থধা বলল "এ কী!" খানিকটা চা চলকে ফেলল। সব স্বপ্ন টুকরো হয়ে যাচ্ছে, আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, বিরক্ত গলায় বলে ফেললাম "স্থধা, তুমি এমন ভাব করছ যেন কিছুই জানো না। যেন—" ফুস করে বেলুনের বাতাস বের করে দেওয়ার মতো ভঙ্গিতে যোগ করলাম "কচি খুকি।"

স্থধা তখন ওর সম্পূর্ণ মুখ-পূর্ণিমা আমার মুখে স্থাপিত করে বলল "না, জানি। আমি খুকি নই। আমি বত্রিশ। তোমার প্রেমিকা। কিন্তু রক্ষিতাও কি?"

চিৎকার করে বলে উঠলাম "স্থধা!" দেওয়ালের কান থাকলে সেই বিকট শব্দে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

"তবে কেন," স্থধা বলে চলেছিল "তুমি এখানে আমাকে এনেছ?"

"স্থধা, তুমিও তো বলেছিলে আলাদা কোনওখানে, তুমি জানো না এর জন্মে আমার কত--"

"কত টাকা খরচ হয়েছে বলতে চাইছ তো?"

মরীয়া, ভাঙা গলায় বলতে থাকলাম "স্থধা, তুমি বলেছিলে, আজ বাড়ি ফিরতে চাও না, আজকের সন্ধ্যেটা আমাকে দেবে। পরে তোমার দিদির বাড়ী যাবে—শ্বশুর-শাশুড়িকে সেই কথাই বলে এসেছ।"

"তাই বলে এখানে?"

আবার আমার মাথা বেঠিক হয়ে গেল, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে "যাদের যাবার জায়গা নেই, যারা নিরুপায়, তারা আর কোথায় যায়? কোথায় যাব ভেবেছিলে তুমি? মন্দিরে?"

"না", স্থধা চেয়ে রইল একদৃষ্টে।—"আমারই ভুল হয়েছিল। এইখানেই তো, এই অপমানে। এই আধা-বেশ্যালয়ই আমার উপযুক্ত।"

তখনও থামেনি স্থধা, নেশাগ্রস্ত বা ভূতাবিষ্ট, কোনও দম-দেওয়া পুতুলের মতো

বলে গেলে, “কিন্তু তা হলে? তা-হলে ওই বেয়ারাটা টী-পট দিয়ে গেল কেন। ওকে ডাকো, গ্লাস-টাস আরও কী-কী সব আনুক, এখানে রাখুক?”

তখন আমি হাত তুলে ভীষণ জোরে সেই দম-দেওয়া পুতুলটাকে চড় মারলাম।

সেই চড়ে কাজ হল, চড়টা যেন জাদুর মত কাজ করল। ওর গালে রক্ত জমাট, কিন্তু চোখের মণিতে আর সেই হিংস্র দ্যুতি ছিল না, অতর্কিত আঘাতে ফণিনী বশীভূত। ঠাণ্ডা স্বরে তাকে বলতে শুনলাম, “একটু বোসো।” বলেই সে, খোলা দরজা দিয়ে সংলগ্ন স্নানের ঘর দেখা যাচ্ছিল, সেখানে ঢুকে গেল। জলের ঝাপটা, খস খস শব্দ, কিন্তু বোধহয় পাঁচ মিনিটও নয়, সুধা বেরিয়ে এল। সে এক ভীষণ বিস্ময়, আলগা করে শাড়ি-পরা, ওর হাতে কয়েকটা কাঁটা, চুল একেবারে খোলা, নগ্ন বাহুমূল আর কাঁধের উপর দিয়ে ঢালা, সুধা হাসছিল, কিন্তু অস্বাভাবিক সেই হাসি, হাসছিল, হাসতে হাসতেই বলল, ‘একেবারে তৈরী হয়ে এসেছি।’ কপালের টিপটা নেই, মুছে এসেছে, হাতের কাঁটাগুলো রাখল ড্রেসিং টেবিলে, ‘দেখছ তো যদিও কচি খুকি নই, রীতিমত বর্ষীয়সী, তবু আমার চুল পরচুলো নয়, দেখছ তো’, আমি বিকারের প্রলাপ শুনছি, নুয়ে পড়ে সুধা হাতঘড়িটা খুলল, ওর পিঠের আঁচল সরে গিয়েছিল, দেখতে পেলাম অন্তর্বাস নেই, আঁচল সরে গিয়েছিল বলেই, ছোট জামাটা নেই দেখতে পেলাম, পিঠের কাছে পর পর দুটো বোতাম শুধু, পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা অঙ্কের মতো, ‘তৈরী হয়েই এসেছি’ সে বলল আবার, এবার চাপা গলায়, হিস্ হিস্ হিস্ হিস্, পিচ্ছিল সাপ জড়িয়ে ফেলছে আমায়, আলো নেই, আলোটা পুট করে নেবাল কে, টের পাচ্ছি। সেই গলা যেন কারও গলা নকল করে করে, গলা, কার—কার, “এই তো চেয়েছিলে তুমি, এই তো চাও?”

কী চাই আমি, কী নেব, কী দেব, চাওয়া-পাওয়া দেওয়া-নেওয়া সব অন্ধকারে কাঠ ঠোকরানো, অন্ধ আর্ত দু’টি কাঠঠোকরা পাখি, শরীর মানে কি এক-খণ্ড কঠিন সাড়াহীন, সাড়াহীন কিন্তু জ্বলছে, রচিত চিতায় বিকট ফটফট যেন, তবু বারবার তাকে ছুঁচ্ছি, যত ছুঁচ্ছি তত আমার সব কিছু ঝলসাচ্ছে। যখন আলো জ্বাললাম তখন আমার পাশে পোড়া কাঠ ছাড়া কিছু পড়ে ছিল না।

এ-সব কথা গত রাত্রির না কত জন্ম আগেকার? মনে হচ্ছে বহু বহু বৎসর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত যেন, শত শত মাইলের কালো পাথর, কাঁকর আর রুক্ষ মাটি, মাড়িয়ে চলেছে তো চলেইছে, নিরুপম একবার মাথায় হাত দিল, এই দীর্ঘ সময়ে ওর সব চুল সাদা হয়ে যায়নি তো! যদি গিয়ে থাকে তবে সুধা কি তাকে চিনতে পারছে, ঘুম ভেঙে সকালে একবারও কি ভাবেনি, শীর্ণ, শিরা-ওঠা এই মানুষটা আমার পাশে কোথা থেকে এল, এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছেই বা বা কেন?

না, ওই একটা গুণ সুধার, বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করে না। হোটেলে প্রথমেই যা চেঁচিয়ে উঠেছিল। তারপর চুপ, সেই থেকে চুপ। ওই কামরাটায় আলো জ্বলে ওঠার পর ঠিকঠাক হয়ে এসে বলেছে "আর কী। এবার চলো।"

"তোমার দিদির ওখানে যাবে তো?"

"এত রাত্রে?" ঘড়িটা দেখে নিয়ে সুধা বলল, "ওখানে আর যাওয়া যায় না।"

"তবে কি তোমাদের, মানে উৎপলদের বাড়ি?"

"সে তো আরও অসম্ভব। তোমার—তোমার কোনও জায়গা নেই?"

নিরুপম বলেছে "আছে।" তারপর গাড়ি যখন শহরতলির পথ নিল তখন— "সুধা, তোমার ভয় করছে?"

"ভেঙে গেছে।"

কোন কিছু পাবার আশা, তাও নেই কি? নিরুপমের একবার মনে হল যে জিজ্ঞাসা করে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবল যে, না দরকার নেই। সুধা যদি বলে "ওই বিছানায় একটা শাঁখা ভেঙে পড়েছিল, দেখতে পাওনি? কখন পুট করে ভেঙে গেছে। আমার আশা-টাশা এখন ওই ভাঙা শাঁখাটার মতন। টুকরোগুলো কুড়িয়ে ওই ঘরেই একটা ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে এসেছি।" না, গত রাতের জের টেনে আর লাভ নেই। তার চেয়ে সুধা যেমন আছে, তেমনই থাকুক। শান্ত, সম্মত।

আশ্চর্য, *প্রতিটি* মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে, অপঘাতের পরও। নতুবা সেই গন্ধময় অন্ধ রাত্রির পর আমি একটি সকালে প্রসারিত হতে পারতাম কি, নিরুপম ভাবছিল। কলকাতায় কত বেলা অবধি ঘুমিয়ে কাটাই। সকাল, ঊষাকাল, কতকাল পরে প্রত্যক্ষ করলাম। কী অবাক ব্যাপার, সকালের তো বয়স বাড়েনি, সে অবিকল তেমনই আছে তাকে আমার শিশুকালে যেমন দেখতাম। পাহাড়

প্রান্তর, নদ-নদী অরণ্য, নিসর্গের কোনও কিছুর বয়স বাড়ে না। বাড়ে শুধু নর আর নারীর।

ক্রমাগত চড়াই ভেঙে ভেঙে নিরুপম ক্লান্ত হয়ে উঠছিল। পর পর অনেকগুলো মাইলফলক ভাঙা বা লেখা মুছে-যাওয়া, কতদূর এলাম, গাড়ির মাইলোমিটার ঠিকমত কাজ করছে তো! ঠিক তখনই ঝেঁপে বৃষ্টি এল, দৃষ্টিহারা বৃষ্টি, বাঁকের পর বাঁক, পিছলে যদি যাই কোথায় পড়ব। তু'পাশের ঘন পাতার ছাতায় টুপ-টাপ, টপর-টপর, একটানা, এক-একটা উপত্যকা হাঁ করা, তারা বলে দিচ্ছে কোথায় পড়ব। কিন্তু পার্শ্ববর্তিনী নিথর-নিশ্চুপ হে রমণী, তুমি কিছু বলছ না কেন। নিরুপম ঈষৎ ভীত বলেই ক্রমশ রুষ্ট হয়ে উঠছিল, কামনা, লোভ, ক্রোধ সব পাশাপাশি থাকে। রিপুরা সব সহোদরা। আর তুমি অবুঝ সুধা, কিছু বুঝছ না। কাল যদি অন্যায় করে থাকি, তুজনের জন্যেই করেছি। অথচ রত্নাকরের রমণী, তুমি এখন আলাদা হয়ে যেতে চাইছ। হতে পারে, স্থান হিসাবে ওই কামরাটা নির্বাচন—আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু সুধা তুমিও কি নিরালা একটি ঘর, একটু সঙ্গ, অন্তত একটি প্রহর কতবারই তো চেয়েছ, চাওনি? আমরা চুরি-করা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জুড়ে গাড়িতে গাড়িতে শুধুই তেল পুড়িয়েছি, একবার তোমারই অস্থির নির্বোধ টানাটানিতে গেলাম তোমার এক বান্ধবীর ওখানে, সুবিধে হয়নি। কখনও হন্তে হয়ে ময়দানে, ছিঃ, ময়দানে। এই শহরটার ইতিহাস কোনও দিন যদি রচিত হয়, তাতে এই কথাও লেখা থাকবে যে, এখানে প্রণয়ীযুগলের জন্যে সুচারু কোনও স্থান নেই, নির্দয় শহরটা শরণার্থী প্রেমের জন্যে কোনও আশ্রয় রাখেনি। তবে?

খানিক পরে বৃষ্টির শেষ, পাহাড়েরও শেষ পাওয়া গেল বলেই নিরুপম যেন একটু স্থৈর্য ফিরে পেল, নইলে তার উন্মত্ততা হয়ত বাড়তেই থাকত। দিগন্ত পরিষ্কার, রাস্তা এখান থেকে আবার ঢালু, কিন্তু এ কোন্ রাস্তা? পীচ কই, এ তো লালমাটি। জলের ধারায় সব চিহ্ন যখন লুপ্ত, সে কোনমতে সামলে সামলে গাড়ি চালাতেই ব্যস্ত, তখন কি ভুল কোনও রাস্তা ধরেছিল? মনে তো পড়ে না। হাইওয়ে থেকে কতদূর সরে এল? বোঝা যাচ্ছে না। তখন চারদিকে চেয়ে নিরুপম ব্যাকুল গলায় বলে উঠল "সুধা, কিচ্ছু চিনতে পারছি না। আমি বোধ হয় ভুল পথে চলে এসেছি।"

একটুও বিচলিত হয়েছে, ভাব দেখে বোধ হল না সুধার। যেমন অচঞ্চল ছিল

তেমন ভাবেই গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল। ঘুরে ওপাশে এসে হাত বাড়িয়ে বলল "এসো।"

লম্বা ভিজে ঘাস, ওরা আস্তে আস্তে খানিকটা পথ উঠে গেল। পাহাড়ের গায়ে থাক-থাক কাটা, পাহাড়ীরা বোধ হয় ওইভাবে পরিশ্রমী ফসল ফলায়, চাষ করে—সেই পথ ধরে আরও কিছুটা যেতে একটা বাঁধ, তার উপরে দাঁড়াতে দেখা গেল একটা ঝিল, পরিপূর্ণ। যেখানে দাঁড়িয়েছিল ওরা, সেখানে অনেকটা ঘাস পোড়া পোড়া, ফাঁকে ফাঁকে অর্ধগোলাকৃতি বেশ কিছু জমি, প্রাকৃতিক কোনও খেয়ালে গেরুয়া রঙের নয়, সাদা বালি-বালি!

"সুধা, আমরা কি কোনও শ্মশানে এলাম?" নিরুপম বলে উঠল ম্রিয়মান স্বরে।

"এ তা নয়," নিরুপম আঙুল দিয়ে মাটির হাঁড়ি, কিছু চেলা কাঠ আর গোটা দুই গর্ত দেখিয়ে দিল। সে একটা উঁচু মতন ঢিবি দেখে বসে পড়েছিল। সুধা এগিয়ে এল তার কাছে। ওর কাঁধে হাত রেখে বলল "তুমি আচ্ছা মানুষ তো। এইটুকুতেই ঘাবড়ে গেছ? আমরা জলে পড়েছি নাকি!"

অনুতপ্ত কণ্ঠ, দৃষ্টি বিহ্বল, নিরুপম মাথা নেড়ে নেড়ে বলল "সে-জন্যে নয়, সুধা, সে-জন্যে নয়, নেহাত ঝোঁকের মাথায় এত দূরে চলে এসেছি। কাল সব কিছু হিসেবের ভুল হল বলে মাথার ঠিক ছিল না আমার। রোখ চেপে গেল, যেভাবে পারি ফাঁকিটা উশুল করব। জেদের বশে এত দূর টেনে নিয়ে এলাম তোমাকে, বিপদে ফেললাম। তোমাকে বলেছি একটা কোথাও যাচ্ছি, কিন্তু কোনও বিশেষ জায়গা ঠিক করা ছিল না। সুধা, তোমাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছি।"

সুধা ওর একটা হাত তুলে নিল—"আমাকে নয়, মিথ্যে বলেছ তোমাকে।"—

নিরুপম বলল "সে তো ওই একই হল। কিন্তু আমরা আজ ফিরে যাব কীভাবে। আমার হাত-পা অবশ, এতখানি পথ ফের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া—আমার সাধ্যে কি কুলোবে?"

উত্তরে সুধা বলল, "স্টিয়ারিং এখন তো আমার হাতে।" রহস্যপূর্ণ ভঙ্গি, অল্প-অল্প হাসি, নিরুপম কথাটার মানে বুঝল না। থতমত খেয়ে বলল "সুধা, তুমি তো—"

"গাড়ি চালাতে জানি না, তাই বলছ তো? গাড়ি চালিয়ে যতটা আনা যায়, তুমি আজ চালিয়েছ। এখানে আজকের বাকীটা, নিরুপম আমাকে চালাতে দাও!"

"এখানে, এই শ্মশানে?"

"এই শ্মশানে। নিশ্চয় কোনও নিয়তি আছে, নইলে এখানে আসব কেন। বলা যায় না, নিরুপম, লোকালয়ে যা মেলেনি, আমরা এইখানে হয়ত তা পাব।"

"তুমি দেবে?" নিরুপম অবিশ্বাসী গলায় বলল।

উত্তরে সম্পূর্ণ দৃষ্টি সংস্থিত করে সুধা বলল, "তুমি দেবে না?"

"এখানে, এখানে", কিছুক্ষণ পর নিরুপমের আশ্বস্ত মন আবার প্রজাপতির মতো প্রলুব্ধ নৃত্যপর হয়েছিল। শুকনো কাঠ ঠেকেছিল যাকে মাত্রই দশ-বারো ঘণ্টা আগে, অলৌকিক জাদুতে সে কি পুনরায় সজীব, সতেজ? এ কি তার চোখের বিভ্রম, সে কি সত্যিই সেই কাঠখানি সবুজ পাতায় ছেয়ে যেতে দেখছে! এ-সুধা আলাদা, রূপান্তরিত জন্মান্তরিত।

"তবু", নিরুপম বলল, "সুধা তুমি কি ভেবে দেখেছ, আমরা থাকব কোথায়?"

ইঙ্গিতে সুধা ঘন বনের একটা দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করল। সেখানে সুঠাম-শরীর কয়েকটা গাছের ফাঁকে একটা কাঠের বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। সামনের দিকে ঝুঁকে চড়াই ভেঙে ভেঙে ওরা সেখানে উঠে এল। চারদিকে তাকিয়ে সুধা বলল "কেউ নেই। মনে হচ্ছে কেউ থাকে না। এটা তবে কী?"

"কাঠুরেদের কুটির" নিরুপম পর্যবেক্ষণ করে বলল।—"কেউ হয়ত কোনও দিন কোনও কারণে এটা বানিয়েছিল।"

"তা-হলেই হবে," সুধা লঘু গলায় বলে উঠল "রাত্রে কোনও হিংস্র প্রাণীর পেটে যাওয়ার ভয় আমাদের রইল না। নিরুপম, তোমার গাড়ির ক্যারিয়ারে অন্তত কিছু ফল, রুটি, ডিম, এসব আছে তো। খিদের চেয়ে হিংস্র প্রাণী কিছু নেই, মনে রেখো।"

সেই কথা শুনে নিরুপম বলল "সুধা, সব হিংস্র প্রাণীর খবর কি তুমি রাখো। তোমার হিসেবের বাইরেও কোন জন্তু যদি, তুমি জানো না, যদি—"

নির্বিকার গলায় সুধা বলল "সে দেখা যাবে।"

এতক্ষণে সময় হয়েছে, নিরুপম পেশ করল সেই কথাটা, যেটা সারা সকাল থেকে এ-পর্যন্ত বলি-বলি করেও বলা হয়নি। বলল "সুধা, এখন বলো তো কাল রাত্রে তুমি ওখানে চমকে উঠেছিলে কেন। তুমি ভেবেছিলে উৎপল আশেপাশে কোথাও আছে, হঠাৎ এসে পড়তে পারে, তাই নয়?"

সুধা বলল "না। অন্য কথা মনে হচ্ছিল। বড্ড নোংরা মনে হচ্ছিল আমার, পায়ের নখ দিয়ে খুঁচিয়ে কারপেটের ধুলো তুলছিলাম, তুমি দেখতে পাওনি? গা

ঘিন ঘিন করছিল। মনে হচ্ছিল এ সেই জায়গা, যেখানে খালি আমি না, ভাবছিলাম, যার-যার স্বামী ট্যুরে কিংবা ইন্টারভিউ পেয়ে দূরে যায়, এমন কতজনকে তুমি নিয়ে আস। উৎপলের ভয় নয় নিরুপম, তোমাকে ওখানে বড্ড বেশি স্মার্ট আর অভ্যস্ত মনে হচ্ছিল। যে স্মার্টনেস দেখে ভুলেছি, সেই স্মার্টনেসকেই ঘৃণা হচ্ছিল। খালি ভাবছিলাম, তুমি ওখানে আরও অনেক—অনেক-বার এসেছ।"

"তাই কি সুধা বিষ হয়ে গেল?" ধরা গলায় বলল নিরুপম।

"সুধা বিষ হয়ে গেল", সুধা সংক্ষেপে বলল।

নিরুপম বলতে গেল "কিন্তু সত্যি কথাটা এই—", হাত তুলে সুধা বলল "থাক। সত্যি কথা এখানে এনে কাজ নেই। রোজ তো সত্যি নিয়েই আছি। যা সত্য তা খুব ছোট্ট, পোস্টকার্ডের পিঠে লেখা চিঠির মতো। মিথ্যে যেহেতু কল্পনা, তাই তাকে পাতার পর পাতা জুড়ে ফেনিয়ে দিতে পারি। প্রেমপত্রের মতো।"

গাড়ির পিছন থেকে ওরা খাবার যা ছিল বার করে আনল। একটা শতরঞ্চিও ছিল, সেটা পাতা হল দীর্ঘতমা ঋষিসম কোনও বৃক্ষের তলায়, যার শাখা-প্রশাখা অসংখ্য পাখির কলরবে মুখরিত হয়ে ছিল। অতল ঝিলটা ঠিক সামনেই, যেখানে ঘাস পোড়া সেই ফাঁকা জায়গাটা একটু দূরে, পাশে।

"এই শ্মশানে" নিরুপম বলে উঠল, আর তৎক্ষণাৎ তার গলায় গলা মিলিয়ে সুধাও বলল "এই শ্মশানে। আশ্চর্য।"

বিকালের হঠাৎ হাওয়ায় বালি উড়ছিল তার সব ঔদাস্য নিয়ে। বিকালের নরম রোদে সুধার কর্ণমূল, গ্রীবা সব কমনীয় হয়ে উঠেছিল। একটা ঢিল তুলে নিরুপম ছুঁড়ল ঝিলের জলে, যেখানে নানা অজানা উদ্ভিদ জটলা তৈরী করেছে। নিরুপম বলল "রাত্রে এখানে বোধ হয় বিবিধ জন্তু জল খেতে আসে।"

শুনে সুধা ভয় পেল কি পেল না কিন্তু কাছে ঘেঁষে এল। মুখখানি একদিকে কাত করে তুলে বলল, "আমরা দেখতে পাব?"

সুধা কখন পা টিপে টিপে ঝিলের একেবারে ধারে চলে গেছে নিরুপম খেয়াল করেনি, তার একটু ঝিমুনি এসেছিল, দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ছুটে এল। সুধা ঠোঁটে আঙুল রেখে নিষেধ করল ওকে—"এখানে চিৎকার করতে নেই। সব কেমন চুপচাপ দেখছ না?"

নিরুপম দেখছিল। ঢালু জায়গায় একটু পিছনে যেখানে সে দাঁড়িয়ে, সেখান

থেকে দু'টি সুধাকে দেখা যায়: এক সুধা ঝুঁকে আছে জলের উপরে, অন্য সুধা জলের তলায়!—"মুখ দেখছ?" নিরুপম বলল, সুধা জবাব দিল "হ্যাঁ, আয়নায়। চেহারাটার কী চেহারা হয়েছে অনেকক্ষণ দেখতে পাইনি কি না।" বলেই সুধা পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে দিল জলে, পরীক্ষামূলকভাবে। ওর ছায়া ভেঙে ভেঙে আরও ছড়িয়ে পড়ে, তবু জলের নিচেই কম্পিত হতে থাকল।

দু'হাতে শাড়ির দুটি দিক আলগোছে তুলে ধরছে সুধা, ফলে শাড়িটা কতকটা ঘাঘরার ডৌল নিয়েছে, পায়ের গোছ অসংকোচে, নিষ্পাপত, উন্মুক্ত হয়ে গেছে, নিরুপমের পলক পড়ে না, কিন্তু সুধার খেয়াল নেই, আরও নুয়ে পড়ে সে যেন কী তুলে আনতে চাইছিল, নিরুপম বলে উঠল, "সুধা, আর যেও না", কিন্তু সুধা শুনলে তো। তরল গলায় সে বলছিল "আমি এইভাবে একটু একটু তলিয়ে বিসর্জনের প্রতিমা হয়ে যাই, নিরুপম?"

নিরুপম তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল। সুধার মুঠোয় তবু উঠে এসেছিল কয়েকটা পাতা সমেত একটি লতা, তাতে লালচে ছোপ ধরা দু'তিনটে ফুল ফুটে ছিল। সুধা ফুল ক'টিকে ওর নাকের কাছে ধরল। "গন্ধও আছে খুব মৃদু। আর পদ্মও আছে, ঝিলের মাঝখানে। পদ্মই তো, না? পদ্ম না শালুক?"

"পদ্ম", নিরুপম এমন স্বরে বলল, যেন ঘোষণা। "যদি বলো তুলে আনতে পারি। কাঁটা দেখেও ক্ষান্ত হব না।"

"ইস্।" সুধা অল্প হেসে বলল, একটা আঙুলে নিজেরই গাল ছুঁয়ে। "তবে আমার নিজেরই কিন্তু ইচ্ছে করছে নেমে যাই। যদি সাঁতার জানতাম। দ্যাখো, দ্যাখো, পাড় দিয়ে দিয়ে ছোট ছোট গর্ত কত। আর মাটির উপর দিয়ে সরু সরু যেন লাইন টানা—"

"কাঁকড়ার।" ওরা ওই রেখা টেনে টেনে জল থেকে উঠে আসে।

"জল থেকে উঠে আসা", সুধার মনে অন্য একটা ছবি মনে পড়ে গিয়ে সে ঈষৎ আনমনা হয়ে গেল। "মেয়েরাও উঠে আসে, না? কলসী কাঁখে নিয়ে গ্রামে, ছবিতে দেখেছি। চমৎকার লাগে।"

নিরুপম হাসছিল। "কলসী নিয়ে মেয়েরা কিন্তু—" সে কী বলবে যেন আন্দাজে ধরে নিয়েই সুধা বলল, "জানি। মেয়েরা ডোবেও!"

উপরে তখন আসন্ন সন্ধ্যায় যেন রাজসভা বসে গিয়েছিল। যত বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি, তারা দ্বিপ্রহরে যদি-বা নিরাসক্ত নির্বাক থাকে, যত বেলা পড়ে ততই, পরস্পরের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পর্কে লিপ্ত হয়। অনিশ্চিত কিছু কিছু পাখি আগে থেকেই

ফিরে আসে বাসায়, অথবা কেউ কেউ হয়ত বেরই হয় না, সারাদিন ডালে ডালে পাতায় পাতায় বসে, ফল ঠুকরে ঠুকরে খায়, চারদিকে ছড়ায়। যেখানে ওরা উঠে এল, সেখানে শালের মঞ্জরীও ছড়িয়ে ছিল। আর বহুবর্ণ একটি শব্দের বিমিশ্র বিচিত্র নকশা দৃশ্যপট হয়েছিল।

"এই, বলো তো এই বনটার নাম কী?"

কিছু না ভেবেই নিরুপম বলে দিল, "নন্দনকানন।"

টিপ টিপ জল চুঁইয়ে পড়ছে সুধার শাড়ির পাড় থেকে। সুধা নীচু হয়ে বলল, "চোখটা অন্যদিকে ঘোরাও দেখি। আমি জল নিংড়ে ফেলব।" ফলে দৃষ্টি আরও সকৌতুকে বিস্তারিত করে নিরুপম বলল, "ইভা, নন্দনকাননে কিন্তু লজ্জা ছিল না।"

"এই নন্দনকাননে আছে কী?"

"বিশ্বাস", তদ্‌গত কণ্ঠে উচ্চারণ করল নিরুপম!—"আর সাহস! সুধা, বোধ হয় সমর্পণও।"

"এখনও লোভ?" সুধা ভ্রুকুটি করে বলল।

"এই ঝিলটা", একটু পরে সুধা বলছিল নিজে-নিজেই। "আশ্চর্য, এত ওপরে, এই পাহাড়ের গায়ে—"

"সে এমন কিছু অবাক ব্যাপার কি? কৈলাসেও তো আছে মানস সরোবর, শোন নি? কৈলাস তো আরও উঁচুতে। পৃথিবীর সর্বত্র সব কিছুর সংস্থান থাকে।"

"আর এই ঝরনা? কোথায় গিয়ে পড়েছে?" তিরতিরে একটা স্রোত দেখিয়ে সুধা বলল। আর পরম জ্ঞানীর মতো উত্তর দিল নিরুপম "নিশ্চয়ই নিচে কোথাও। সমতলে।"

"আর ঝরনাটা ধরে ওপব দিকে যদি যাই? কোথায় গিয়ে পৌছব! হিমালয়ে?"

"বোকা মেয়ে" মৃদু তিরস্কার করে ভাঙ্গা গলায় নিরুপম বলল "হিমালয় এখানে কোথায়?

"আমি ভূগোল জানি না", সুধা বলল, অম্লানবদনে। তার পরেই সহসা জোরে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "এই—এই!" সে কাকে ডাকছিল। সেই ডাকে বাঁধের উপর দিয়ে দ্রুত পায়ে কে এগিয়ে এল। কাছে আসতেই দেখা গেল, একটি বালক। খালি গা, সে মাটিতে আস্তে আস্তে একটা ঝুঁড়ি নামিয়ে রাখল। তালশাঁস।

"এখানে এখনও শাঁস আছে? সব পেকে তাল হয়ে যায় নি?"

ছেলেটা কথা বলল না। সুধার চোখের ইশারায় অনুমতি পেয়ে খোলস ছাড়িয়ে

এক-একটা শাঁস সে তুলে দিচ্ছিল পদ্ম পাতায়। সবুজের তলাতেই অবারিত শুভ্র হৃদয়, ফেটে ফেটে ফিনকি দিয়ে কোন-কোনটা সুধার করতল ভিজিয়ে দিল। নিরুপম বলল, "সাবধানে দাঁত বসাতে হয়।"

এতক্ষণে, অনেক নীচে সমতল দিয়ে প্রসারিত দুটি লৌহরেখা ওরা লক্ষ্য করতে পেরেছিল। ছেলেটাকে পয়সা দিয়ে নিরুপম জিজ্ঞাসা করল, "ওই রেল লাইনটা কোথায় গেছে?" মাথা নেড়ে ছেলেটা বলল, জানে না।

"জানতে ইচ্ছে হয় না? কোনদিন রেলে চড়ে বসিসনি তুই? কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না?"

"যাব কেন।" বিস্মিত, তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন একটি উত্তর—"যাব কেন!"

"বা-রে ছেলে", অস্থির নাগরিক নিরুপম বলল, "দুনিয়ার কোথায় কী আছে, দেখতে ইচ্ছে হয় না?"

"যাব কেন", ছেলেটা বলল আবার, ওর হিন্দী-বাংলা মেশানো এক ভাষায় "এখানেই তো সব দেখি।" এক কথায় প্রশ্নটাকে খারিজ করে দিয়ে সে পয়সাটা কোমরে গুঁজে ধীরে ধীরে অপসৃত হল।

"আমিও জানি না", নিরুপম আস্তে আস্তে বলল খানিক পরে, "ওই রেল রাস্তাটা গেছে কোথায়।"

"জান না বলেই তো ভাল লাগছে বেশি। উধাও লাইনটাকে রহস্যময় ঠেকছে।" সুধা বলল, "জানা থাকলে সবটাই জানা হয়ে যেত।" সায় দিয়ে নিরুপম বলল, "ঠিক। আমি নিশ্চিত যে, এই লাইনে সবচেয়ে কাছের যে স্টেশন, তার নাম কোনও টাইম-টেবলে লেখা নেই।" সুধা আরও একবার বলল, "আমি ভূগোল জানি না।"

ঠক্‌ঠক্, ঠক্‌ঠক্, অনেকক্ষণ ধরে শব্দ হচ্ছিল বনের গভীরে, নিয়মিত যতিতে আর লয়ে, যতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল, ততক্ষণ ওরা শুনতে পায়নি, থেমে যেতেই ঐকতানের মধ্যে কী একটার অভাব ঘটছে, অনুভব করতে পারল। খানিকটা কান পেতে থেকে নিরুপম বলল, "কাঠুরেরা কাঠ কাটছিল বোধ হয়। চলে গেল।"

সুধা তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঘাসে ঘাসে। একটা কাঠি উঁচু করে ধরে কোথা থেকে পেড়ে আনল এক গুচ্ছ ফুল, পরল চুলে। "মানিয়েছে? কী ফুল বলো তো?"

নিরুপম চট করে বলে দিল, "নাগকেশর। কিন্তু এখানে জবা ফুল পরলেও

মানিয়ে যেত। এই পরিবেশে সবই মানিয়ে যায়।" এবার সুধা ছিঁড়ে আনল কয়েকটা লতা।—"কী লতা?"

ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরছিল সে, কী ফুল, কী পাখি, কী গাছ, কী লতা, প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুলছিল নিরুপমকে। শেষে ছায়া যখন ঘনিয়ে এল, তখন নিরুপম আর পারল না, আত্মসমর্পণের মতো আর্ত, বলল, "সুধা আমি কিছুই জানি না। কোন্ লতার নাম কী, কোন্ ঝরনা কোথায় গেছে, কিচ্ছু জানা নেই আমার। এত জেনে কাজই বা কী।"

যখন ছোট ছিলাম, সে ভাবছিল,তখন কেবলই হাত দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম এটা কী, ওটা কী। সব শিশুই করে। শিশু তো, ভাবে এই উপায়ে জগতের সব কিছু জেনে ফেলা যাবে। বড় হয়ে আর কথায় কথায় কৌতুহল প্রকাশ করে না। কারণ, ততদিনে বুঝে ফেলে, যতই জানুক, তার পরিমাণ না-জানা অংশের সামান্য ভগ্নাংশও না। 'আমিও তাই', নিরুপম নিজেকে বলছিল, 'আজ প্রশ্নকে নিরস্ত রাখি! ফুল, লতা, পাতা, পাখি—শুধু দেখি। সে-পাওয়াও অপর্যাপ্ত পাওয়া।'

প্রথম হিম পড়তে ওরা সেই কাঠের কুটিরের বারান্দায় উঠে এল। একটাই তারা উঠেছিল—আকাশের মল্লিকা বনে প্রথম ফোটা কলি—সেই তারাটিকে ওরা প্রথমে কিন্তু আকাশে নয়—দেখতে পেল ঝিলের জলে।

ঘরের ভিতরটা সুধা একবার দেখে এসেছিল। ফিরে এসে বলল, "কেউ নেই। মনে হল কেউ থাকে না। তবে কোনও কালে হয়ত কেউ থাকত। মাঝে মাঝে কেউ কেউ আসে। অল্প-স্বল্প আসবাব—ব্যবহারের চিহ্ন আছে। একটা চারপায়াও দেখতে পেলাম।"

অন্ধকার কখনও কখনও কালো কালো ফুলকির মত নামে, কালো অথচ তপ্ত, অজস্র, অজস্র, সেই অন্ধকারে নিরুপম বুঝতে পারল না, সুধার চোখের মণি জ্বলছে কিনা। নিজের বুকে হাত দিয়ে টের পেল, হৃৎস্পন্দ দ্রুততর। আরও একটা পরীক্ষার সম্ভাবনা সে প্রত্যক্ষ করল। কী ঘটবে, এই রাত্রি কী দেবে, প্রাপ্তি কিংবা পুনরপি বঞ্চনা, নিরুপম যন্ত্রণায় মাথায় হাত দিল, সে আর ভাবতে পারছে না। বিকৃত, ভাঙা গলায় বলে উঠল নিরুপম, "সুধা তোমার ভয় করছে?"

পা ঝুলিয়ে সুধা বসেছিল নীচের একটা ধাপে, দাঁতে শিকড়-টিকড় কিছু একটা কাটছিল, মুখ থেকে ফেলে দিয়ে সমতল গলায় বলল, "কই, না তো।" যেন নীড়ের পাখিদের ন্যায় ও নির্ভয় হয়ে ছিল।

বিশ্বাস, সমর্পণ, নিরুপম আরও একবার তাদের চাক্ষুষ রূপ প্রত্যক্ষ করল। অতঃপর কী, রোমাঞ্চিত হয়ে সে কল্পনা করতে চেষ্টা করছিল: সমাপ্তি আর উদ্‌যাপন? একটু ভালো হত সুধার মুখটায় কোন্ ভাবের খেলা চলছে দেখতে পেলে। নিরুপমের তখন মনে পড়ল একটা ছোট টর্চ তার পকেটেই আছে।

আর ঠিক তখনই কোটালের বানের মতো জ্যোৎস্না এল।

সেই জ্যোৎস্নায় তলিয়ে যাওয়া ঝিলটা আবার অপরূপ একটি সরোবরের রূপ নিয়ে উঠল ভেসে। নিরুপম অনুভব করছিল, তার চার পাশেই এমন কিছু ঘটছে, কোনও আলোড়ন, কোনও বিপুল উন্মোচন যার ব্যাপ্তি, ব্যাস, বেধ আর পরিধি ধরাতলের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর আবৃত করেছে, শুধু দৃষ্টি দিয়ে যার কূল মেলে না।

আর আছে কী? রাত জাগা অগোচর কোনও পাখি। এই মুহূর্তে তার সহচর লতা গুল্ম বৃক্ষ ইত্যাদি। আর? নিশ্চয়ই কোনও রমণীও, কিন্তু সে শরীরিণী কিনা, সে-বিষয়ে এই মুহূর্তে তার কোনও চেতনা ছিল না। শাখা-প্রশাখা বোধের অতীত কোনও আনন্দে নিঃশব্দে আন্দোলিত হচ্ছিল।

"কী ভাবছ?" কানের কাছে কেউ বলল ফিসফিস স্বরে।

হাত বাড়িয়ে নিরুপম একটি লতা স্পর্শ করল, দাওয়া ঘেঁষে, একটা সমর্থ থাম জড়িয়ে যেটা বিস্তারিত হয়ে ছিল।—"এই লতাটার কথা।"

"আশ্চর্য"। সেই ফিসফিস স্বর বলল, "আমিও তাই। অবাক হয়ে ভাবছিলাম ওরা মাটির কাছ থেকে সব কিছু শুষে নেয়, রস ইত্যাদি যা কিছু, অথচ নিজেকে খুলে দেয়, মেলে ধরে আকাশের কাছে। প্রতিটি লতা আর গাছ কি তবে প্রকৃতিগতভাবে অসৎ—অসতী?"

"মেঘের আচরণেও তাই", নিরুপম বলল, "গ্যাখো, একই রীতি। মেঘ আকাশে ভাসে, কিন্তু চেয়ে থাকে মাটির দিকে। সব ঢেলেও দেয়, এমন কী নিজেকে ভেঙেচুরে নিঃশেষ করে।"

"কিন্তু আমরা এসব কথা বলছি কেন", অতিপ্রাকৃত সেই সুরেলা গলায় বলল, "এ সবের কী অর্থ?"

"কিচ্ছু নেই", নিরুপম বলল, "তবু আমরা বলছি। যেহেতু আমরা এখানে বসে আছি, শুধু বসে আছি।"

"ভিতরে যাবে না?" প্রতীক্ষিত সেই প্রশ্ন এসেছে এতক্ষণে, নিরুপম সটান হয়ে বসল। সতর্ক গলায় বলল, "যাব। সুধা, তোমার ঘুম পেয়েছে?"

"পেয়েছে—হয়ত। কিন্তু আর একটু বসি?"

"বোসো। কিংবা চলো আমরা ওই ঝিলটাকে আরও একবার ঘুরে আসি।"

"না এখানেই।"

যেখানে পোড়া ঘাস, সেখানে অল্প অল্প বাতাসে বালি উড়ছিল। সোজা হয়ে বসে সুধা বলল "নিরুপম, ওটা তো শ্মশান? ওখানে, ধরো, আজ রাত্রেই কেউ যদি শব নিয়ে আসে?"

"ভয় নেই। যেই আসুক, জীবিত দুটি প্রাণীকে দেখবে জাগ্রত। তারা সরে যাবে।"

পা আরও ছড়িয়ে দিয়েছে সুধা, অলস, এলায়িত দেহের শেষ প্রান্ত মাটি ছুঁয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় কতগুলো পাতা কাঁপছিল শালের, সেগুনের বা অন্য কোনও বন্য বৃক্ষের। সেদিকে ক্লান্ত চোখে চেয়ে সুধা বলল, "ওগুলো কি ছায়া?".

"না। ওদেরও শরীর আছে।"

"অথচ" হাই তুলে সুধা বলল, "মনে হচ্ছিল যেন ছায়া ছায়া।"

"এই জ্যোৎস্নায়, সুধা, সবই তাই মনে হয়।"

তার পরেই গুরু গুরু শব্দে সেই কুটির, ছায়া, জ্যোৎস্না, সব যেন প্রকম্পিত হতে লাগল। "মেঘ?" নিজেকে গুছিয়ে সুধা উঠে বসল। খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে নিরুপম বলল "না। ট্রেন। রাতের রেলগাড়ি। দ্যাখো; দ্যাখো, চলন্ত একটা আলোর তীর ছুটে যাচ্ছে, চেয়ে দ্যাখো।"

"ওই নীচ দিয়ে, না? নিরুপম আমরা কতটা ওপরে আছি?"

"বেশ কিছুটা। এখানে হাওয়া হালকা, দেখছ না ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই, কিছু না?" নিরুপম নিজের কথার সমর্থনে বুক ভরে নিশ্বাস নিল।

"এভারেস্টে যারা ওঠে, তারা আর কতদূর ওঠে?"

"আরও ঢের ঢের ওপরে।

"ওই ঝিলের কাছে যেতে বলেছিলে। যদি যাই নিরুপম, যদি স্নান করি, উঠে এলে আমাকে কি জলকন্যার মতো লাগবে?"

নিরুপম বলতে চেয়েছিল, 'তারও দরকার নেই। এই উঠোনে নেমে একবার দাঁড়াও, তা হলেই স্নান হয়ে যাবে।' কিংবা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, 'সুধা, তোমার হাতে এখন একটা গ্লাস দিই, তুমি এখন ছুটে বাইরে গিয়ে এক গ্লাস জ্যোৎস্না ভরে নিয়ে আসতে পারবে?'

তার একটু পরেই প্রগাঢ় শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। পরিতৃপ্ত, প্রশান্ত। ওর কোলের কাছে মাথা এলানো সুধা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝুঁকে পড়ে নিরুপম ডাকল, "সুধা, সুধা!" একবার মাত্র কেউ বুঝি সাড়া দিল "উঁ!" সাড়া দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

সে একা, এই বোধটা তীরবেগে বিদ্ধ হল সত্য, তবু, কই কোনও বেদনা তো সে অনুভব করছে না! কোথাও একটা আশ্বাস অকৃপণ বৃষ্টিধারার মতো ঝরছে, নিরুপম সামনে চেয়ে দেখল—জ্যোৎস্না। ত্রয়োদশী? চতুর্দশী? অথবা আজ কি পূর্ণিমা? যে শহরে বাস করি সেখানে সব একাকার, শুক্ল অথবা কৃষ্ণ কোন্ তিথি কবে, আমরা মনেও রাখি না। সেখানে নষ্টচন্দ্র প্রত্যহ, সর্ব অর্থে।

আর এখানে? বাইরে যতদূর চাওয়া যায়, ধূ-ধূ জ্যোৎস্না শুধু। সব সত্যকে আবৃত করে দিয়ে সেই জ্যোৎস্না এক স্নেহক্ষীরা জননীপ্রতিমা।

মনিবন্ধে ঘড়িটা অবিরাম টিকটিক করে যদিও বলে চলছিল, 'আর কখন, আর কখন?' তবু কই কোনও তাগিদ সে তো টের পাচ্ছে না। এখানে শুধু বসে থাকা, নত হয়ে মাঝে মাঝে একটি করুণ কমনীয় মুখচ্ছবি দেখা, এ-ছাড়া সব অদরকারী ঠেকছে। সুধার মুখ অল্প একটু খুলে গেছে, শরীরের বাঁধন শিথিল, আলগা, বর্তুলতা, উত্তুঙ্গতা, মসৃণতা সব চোখে পড়ে, ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে। একবার যেন কেঁপে উঠল সুধা ঘুমের ঘোরে অস্ফুট। কী বলল। ওর কি শীত করছে? একটা চাদর নেই হাতের কাছে কোথাও? নিরুপম অসহায় বোধ করছিল। শেষে নিরুপায় সুধাকেই সন্তর্পণে পাশ ফেরাতে চেষ্টা করল। সুধা অস্পষ্ট স্বরে বলল, "কী?" নিরুপম—"তুমি ঘুমোও। তোমার গায়ের আঁচলটা একটু টেনে নিচ্ছি, তোমারই গা ভালো করে ঢেকে দিতে। সুধা, অন্য কিছু না।"

আরও প্রহর খানেক। নিরুপমেরও চোখ জড়িয়ে এসেছে, হঠাৎ ঝিলের জলে ঝুপ করে শব্দ হতেই সে চমকে উঠল। হাওয়া উতলা হয়েছিল হয়ত, শুকনো একটা ডাল পড়ে থাকবে জলে, তার অনুমান হল। এক দৃষ্টে তবু বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে স্থির করল, শুকনো ডালই। কোনও জন্তু ঝিলের ধারে জল খেতে আসে নি, সে নিশ্চিত জেনেছে, কোনও জন্তু আজ রাতে আসবে না।

সকালে ওরা আবার ফিরছিল। খানিকটা যেতেই রাঙা ধুলোর ভুল রাস্তা কাটিয়ে হাইওয়ে পাওয়া গেল। নিরুপম বলল, "সুধা, একটা কথা বিশ্বাস করবে? কাল ইচ্ছে করে কিন্তু রাস্তা ভুল করিনি।"

"জানি।"

"তাহলে এ-ও শোন। ইচ্ছে হলে কালই কিন্তু ফিরতে পারতাম। আমার ক্লান্তি আধ ঘণ্টার মধ্যেই কেটে গিয়েছিল।"

"আমি জানতাম।"

"কিন্তু—আরও শোনো—আমার লোভ হয়েছিল।"

"আমি বুঝেছিলাম।"

"পাওয়ার রেশ আমাকে পাগল করেছিল।"

"পাওনি?" দৃষ্টি আয়ত করে সুধা স্নিগ্ধ গলায় বলল।

নিরুপম বলল, "পেয়েছি। আশারও বেশি। তুমি জানো না।"

"তা-ও জানি।"

"পাওয়ার চেহারাটাই বদলে গেল। অথচ সব আমাদের নাগালের মধ্যেই ছিল। ছিল, কিন্তু ইচ্ছে হল না। আমরা পাহাড়ে উঠে গেলাম যে, অনেক ওপরে, যেখানে বাতাস পালকের চেয়েও নির্ভার। সুধা, তুমি কাল একবার এভারেস্টের কথা জিজ্ঞেস করেছিলে, না? মূলে একই ব্যাপার। প্রথমবার যারা ওখানে উঠেছিল সেই লঘু বায়ু, অকলঙ্ক, শুভ্র শূন্যতার একটা অশেষ কিছু দ্বারা তারা আক্রান্ত হল, সব হঠাৎ অদরকারী, জানো তাদের কেউ কেউ একটা সিগারেট পর্যন্ত মুখে দিতে পারল না। ইচ্ছেই হল না।"

অনেক পরে সুধা বলল "এখন আমরা ফিরছি তো? কখন পৌঁছব?"

"বিকেলের মধ্যেই। কিংবা তারও আগে।"

একটা লোকালয় এসে পড়ায় একাগ্র ভাবে চালাতে হচ্ছিল, তাই বাকীটা বলা হল না। নইলে নিরুপমের আরও কিছু বলার ছিল। কাল শেষ রাতে শিহরিত সেই স্বপ্নের কথাটা। কোনও মারণাস্ত্রে পৃথিবীটা ধুলো ধুলো হয়ে গেছে কিন্তু আশ্চর্য, তখনও জ্যোৎস্না আছে, আর সেই আলোয় ভালোবাসাও পরিব্যাপ্ত ভাসছে। প্রলয়ের পরেও প্রেম থাকবে, কোনও স্নেহ ক্ষরিত হবে অবিরত, এই দৃষ্ট সত্য নিয়েই সে চাঁদের বন থেকে ফিরছে বলা হল না।

কিন্তু ঘিঞ্জি বাজারের সংকীর্ণ সড়কে আর একটা সত্যও দেখা দিয়েই মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। সুধাকে সেটা হয়ত বলা যাবে। বারবার এখানে আসা যাবে না, কলকাতায় ফিরছি, ফিরবই তো হয়তো—এই সত্যটা একটু স্থূল—কখনও আবার কোনও হোটেলেও যাব। হঠাৎ তেষ্টা পেয়ে বসলে তাকে অসম্পূর্ণ ভাবে মেটাতে, হোটেলে; কিন্তু পরিপূর্ণ স্নানের জন্যে, এখানে। এখানেও ফিরতে হবে, মাঝে মাঝে ফিরব।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

জলছলছল □ মাহবুব সাদিক

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

সে আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলো মোর্শেদের কাছে যাবে না। যদিও সন্ধ্যা মাত্র উত্তীর্ণ এবং তেমন তাড়া নেই, তবু একজোড়া চোখ তাকে অনিবার্য তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাসার দিকে। ফুটপাতে চোখ রেখে জনারণ্যে তার মন তখন সেই পবিত্রতা এবং নিজস্ব স্বপ্নের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। 'আমি যাবো না তাকে ডাকতে' এ কথা নিজেকে অবিরাম বলেছে সে। কেননা তার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটছে। তবু প্রতিবার 'আমি যাবো না'—প্রতিজ্ঞ হবার সময় একজোড়া কঠিন চোখ তাকে বিদ্ধ করছে।

মোর্শেদ ছিলো না বাসায়; তার বাসা থেকে বেরিয়ে এসেই দূর অন্ধকার শূন্যে সে মেঘ দেখলো। সেই তখন সে চমকিত হেসে ফেললো। 'এই যৌবনবতী মেঘ আমাকে স্বপ্ন দেবে, স্বপ্নে ডুবিয়ে দেবে, ডুবিয়ে দেবে' এই কথা তখন এক লাখ বার হাতে হাতে লোফালুফি করতে করতে সন্ধ্যেয় সে ঘরে ফিরে এলো। স্বপ্নের বাহারী সম্ভাষণে আলিঙ্গনে বন্দী হয়ে দরোজা বন্ধ করে আনন্দিত হাসলো সে। অন্ধকার মণিময় চুমকিতে বিদ্ধ সেই হাসি স্বপ্নময় মনোরম ঘরটিতে সারারাত শিশির হয়ে জ্বলে। বস্তুত বৃষ্টিঝরা রাতে একটি স্বপ্ন তার মনোজ খাঁচাটিতে সুখে ডানা ঝাড়ে, নিশিবিহারে অন্ধকারেও আহ্লাদে সুনীল হয়। কিন্তু মেঘহীন রাতে তার সযত্ন লালিত স্বপ্নেরা পালায়, তখন মুখখোলা সেই খাঁচার গায়ে সে ব্যাকুল মুখ ঘষতো; সজোরে নাড়া খেয়ে বিহ্বল তাকাতো শুধু, ছলছল রক্তেরা চমকাতো; তখন এক একবার বিদ্যুত ঝলকের মতো মনে হতো কেউ যেন দরোজায় কড়া নাড়ছে, সে সাড়া দিতো, দরোজা খুললেই শুধু অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়তো তার মুখে, তখন তার স্বপ্ন খাঁচা উজাড় হয়ে কার কণ্ঠলগ্ন, সে কোন উদ্যানে ক্রীড়ারত। এইসব রাতে অচেতন সে দরোজায় পড়ে থাকে, মাতাল হাওয়ারা বিজন প্রান্তরে উদ্দাম ঘোড়া

ছোটায়; আর অবহেলিত চৈতন্যহীন নিমজ্জিত তাকে ঘিরে তারার চুমকি বসানো রাত বিদ্রূপে মাতাল হয়।

'এই তো বিষ্টি নামলো' বলে অন্ধকারে শরীর হাতড়ে সে, রুনু অসংখ্য লেপটানো স্বপ্ন অনুভব করলো। তার গা বেয়ে, চুলের সরু রেখায় হেঁটে এসে তারা মেঝেয় ঘরে অন্ধকার অচেনা আলোতে নৃত্যে তাকে ভরে দিলো। রুনু জামার খোলশ থেকে বেরিয়ে এসে দরোজা খুললো। আর সেই সব শরীরহীন অস্তিত্বহীন তারা রুনুর ভেতরে-বাইরে দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি করে ব্যস্ত করে তুললো। তার কণ্ঠ-লগ্ন মাতাল বিষ্টিকন্যারা মুখখোলা মনোজ্ঞ খাঁচার ভেতরে ঢুকলো। তারপর অশান্ত হাওয়া, তার কপালে চুলে জড়িয়ে থাকা স্বপ্নদের সুড়সুড়ি দিয়ে পাগল করলো। এমন দমকা হাওয়ার কাঁপন, এমন বৃষ্টি শিরশির রাতে কতোবার সে চমক খেয়েছে তার কণ্ঠ শুনে। বৃষ্টি রুনুর মুখে আঁচলের ঝাপটা মারলো; ঠোঁট চেপে ধরে চুপিচুপি হাসলো রুনু। 'আজ কেউ আসবে না, বৃষ্টি হলো আজ....আজ সারারাত বৃষ্টি থাকবে। আজ এসো হেনা খালা, তুমি আমার পবিত্রতম স্বপ্ন, তুমি পবিত্র হও, শুভ্র হও হেনা খালা।' চুপি চুপি বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে আউড়ে গেলো রুনু। কার কণ্ঠ বাজলো চুপি চুপি, 'রুনু মামা, আজ বৃষ্টি হলো, দেখো কেমন ভিজে গেছি রুনু মামা! জলের স্বাদ; সুতীব্র স্বাদ, দেখো কত জল ভেতরে বাইরে। চোখ খোলো রুনু মামা।'

তখন চোখ খুলেছে রুনু, হেনা অন্ধকার আলোতে। হেনা আলোছায়ায় জল, হেনা জল হয়ে গেছে, গলে গেছে, ঠোঁটেচোখেমুখে অজস্র বৃষ্টিকণায় হেনা তরল হয়ে গেছে। চুলের দীর্ঘ অরণ্যপথে কি নিটোল এক একটি স্বপ্নের ফোঁটা হেঁটে এসে, ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠোঁটের পাশে, হেনার ঠোঁট জল।

সেই ছলছল তরলতায় ডুবতো রুনু, এক ডুবে ছ'কুড়ি বছর সুনীল জলের স্বাদে কার বন্দী আত্মাকে উদ্ধার করতে বাক্য ভেঙে মনভ্রমরাকে ধরে আনতে যেতো।

'রুনু মামা, কাছে এসো, আমার গভীর তরলতায় ডুবতে এসো, এইখানে দেহের বুকের মাঝে কতো জল, রুনু মামা।'

তখন চারদিকে কি অদ্ভুত স্বপ্ন বিদ্যুতের ফোঁটা, সব তরলতার নেশায় একাকার; প্রতিটি কণা তখন অমূল্য হীরের অপরূপ ঝলকানি। সেই জল থেকে গন্ধ, সেই অতল থেকে ফিসফিস স্বর 'রুনু মামা, আমাকে দেখো, তুমি শুনছো না রুনুমামা, দেখো।'

। দুই।

নীলআলো বন্ধ ঘরে সে চিৎ হয়ে শুয়ে; নীল আলোর সঙ্গে সিগ্রেটের জ্বলন্ত অবশিষ্ট থেকে একটি শিখা তার নাকে ধাক্কা দিচ্ছে। পাশে সরিয়ে রাখা তার দেহাবরণের ওপর দিয়ে সে বিস্ফার চোখে তাকিয়ে; হেনার নিরাবেগ চোখ কিছুক্ষণ আগের সেই আবিল মুহূর্তের দিকে বেড়ালের মতো ক্রমাগত গুটি গুটি পায়ে এগুচ্ছে। একপাশে শুয়ে থেকে দেয়ালজানালাছাদ পরিক্রম করে এখন তার চোখ তীক্ষ্ণ নিবদ্ধ ঘরের কোণে রাখা একটা ছাতার উপর, যা এইমাত্র মোর্শেদ বৃষ্টিতে ভিজে যাবে বলে ফেলে গেলো। হেনার গায়ে সেই সুখ আবার সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তার স্বপ্নময় রক্তিম সড়কে কার চমকিত গতায়াত আগুন হচ্ছে। সে, হেনা উদ্ভাস হাসিতে ভরে গেলো, সারাঘরময় হাসির চুমকি ছিটিয়ে দিলো। ছাদদেয়াল-জানালায় ঠোকাঠুকি হয়ে সেই হাসি আবার ফিরে এলো তার কাছে। খোলা-চোখে বিস্ফারিত সে তাকিয়ে থাকলো সেই ছাতার বাঁটে। একবার নড়লো না, চোখ বুঁজে যেন অতল থেকে ফিশফিশ করছে তেমনি উচ্চারণ করলো, 'আমি আবার যেতে চাই, কেউ আসুক, কেউ, যে কেউ এসে আমাকে বিদ্ধ করুক।' তার শিরদাঁড়া বেয়ে কিছুক্ষণ আগের সেই উষ্ণ স্রোত ক্রমাগত তাকে সুড়সুড়ি দিলো; নাড়া খেয়ে মুচড়ে উঠে ভেঙে দুমড়ে যেতে থাকলো সে, ক্রমাগত মোচড়াতে থাকলো; কেউ যেন আগুন বুলিয়ে দিচ্ছে বুকে পিঠে, সারা গায়ে। সমস্ত বিছানাটা উত্তপ্ত স্পর্শ দিচ্ছে—উত্তপ্ত আদরে গলে তরল হচ্ছে হেনা। এই সন্ধ্যায় সে আর একবার নিবেদিত হতে চাইলো। দুই বাহু বাড়িয়ে চোখ বুঁজে কাউকে ধরতে চাইলো, গ্রাস করতে, আমূল বিদ্ধ হতে চাইলো, বাতাসে উধাও কোন সুরভিকে দুহাতে ধরতে চাইলো প্রাণপণে। ততক্ষণে সিগ্রেটের জ্বলন্ত অবশিষ্ট ভস্মীভূত হয়েছে, শেষ ধোঁয়াটুকু পাকিয়ে পাকিয়ে দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠে যাচ্ছে। হেনা পাশবালিশটাকে সজোরে আছড়ে ফেললো বুকের উপর, 'তুই কোন রন্ধ্রপথে পালিয়ে যাবি, পাখি তুই কোন সুদূরে যাবি।'

হেনা হাসিতে বঙ্কিম হলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো মেঝেয়, হেঁটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা তুলে এনে খাটের সাথে ঠেস দিয়ে একপায়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো। 'সে আবার আসবে আজ রাতে, আবার…আর একবার মোর্শেদ আসুক এখানে তার ছাতাটা নিতে, আর একবার আসুক।' হেনা দরোজা খুলে

শোবারঘর সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকলো, কিন্তু তখন জল ফুরিয়েছে। উঠে দাঁড়াতেই বাথরুমের ভাঙা শার্শিপথে তিন ফোঁটা যৌবনবতী বৃষ্টি তার চোখেমুখে ধাক্কা খেলো। তখন হেনার মনে পড়লো রুনুর কথা, বাইরে ইতিমধ্যে বাতাস মাতাল হয়েছে, বৃষ্টিকণারা তুমুল ছোটাছুটিতে হেনার উচ্ছ্রিত নগ্ন বুকে মাথা আছড়াচ্ছে। হাওয়া এবং বৃষ্টির তুমুল মাতলামী হেনাকে ঠেলে নিয়ে গেলো শোবার ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে উঠোনের অন্ধকারে, বৃষ্টির আলিঙ্গনে আবদ্ধ মাতাল হেনা উদ্ভাসিত হলো উঠোনে, ঊর্ধ্বমুখে নিবেদিত হলো হেনা, সর্বাঙ্গ গলে খণ্ড খণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো বৃষ্টিতে। ঊর্ধ্বমুখে সেই অগ্নিবৃষ্টিকে আলিঙ্গনে ধরতে থাকলো হেনা, সেই আগুন আবার জ্বললো তার বুকে, তার দেহে, সর্বাঙ্গ দগ্ধ হলো। বৃষ্টির নীচে নিবেদিতপ্রাণ সে একটি সর্বনাশা শিখায় জ্বলতে থাকলো।

। তিন ।

সন্ধ্যার আকাশে আজ মেঘ ছিলো। আকাশে বর্ষণবতী মেঘ দেখে অম্লান আনন্দিত হয়েছিলো রুনু। বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়ে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিতে মুখ ঘষতে তার ভালো লাগে, আসলে শুধু বৃষ্টিই তার ভালো লাগে না; ভালো লাগে বৃষ্টির রাতে হেনার কাছে কেউ আসে না, আসতে পারে না বলে। কেউ এসে কড়া নাড়ে না বৃষ্টির রাতে, তাকে চুপি চুপি বাইরের দরোজা খুলে দিয়ে ঘৃণিত শত্রুদের মুখ দেখতে হয় না এই সব রাতে। সে জানে নিরুপায় হেনা বৃষ্টির রাতেই শুধু আসে তার কাছে। আর এ জন্যেই বৃষ্টির রাতকেও রুনুর ভয়। হেনাকে সে পবিত্র দেখতে চেয়েছে, এখনও চায়। কিন্তু হেনার অবৈধ বন্ধুদের যেমন অনিবার্য গতায়াত এ বাড়িতে, তেমনি হেনাও যথেচ্ছাচারে লিপ্ত। রুনু তার শত্রুদের উপর শুধু ঘৃণিত দৃষ্টিই ছুঁড়ে দিতে পারে, তাদের তীক্ষ্ণ নখে ছিন্নভিন্ন করতে পারে না, আক্রোশে ফেটে পড়তে পারে না। 'আমি ওদের ঘেন্না করি হেনাখালা এবং নিজেকেও।' আকৈশোর এই ভাবনা রুনুকে ঘৃণিত জীবনে ঠেলে দিয়েছে।

রুনু তখন সবে কলেজে ঢুকেছে, হেনাখালা (দূরসম্পর্কের আত্মীয় হেনাকে তখন খালা বলতো রুনু, হেনা আদর করে ওকে রুনুমামা বলতো) তখন দু'বছর ওপরে পড়ে। একই বাড়িতে থাকতো, হেনাখালার ঘরের একটা ঘর পরে, মাঝের ঘরে হেনাখালার দাদু থাকতেন।

একবার কলেজের এক ফাংশন শেষে অনেক রাতে ফেরার পথে গা ঘেঁষাঘেঁষি

.করে হাঁটতে হাঁটতে হেনাখালাকে দেখে মন কেমন করে উঠেছিলো রুনুর। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে রুনুর গলা জড়িয়ে ধরে অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিল হেনা, 'উহ মাগো!'

'ভয় পেলে হেনাখালা?'

'হুঁ কেমন ভয় করছে।' হেনা আরো জোরে জড়িয়ে ধরেছে রুনুকে। হেনার সান্নিধ্যে রুনু তখন রোমাঞ্চিত, শরীরের ভেতরে সে টগবগ করে ফুটছে। রক্ত চমক খেয়ে উথাল পাথাল হুল ফুটাচ্ছে শরীরে। ঠিক তখন রুনু তার রক্তের এই মাতাল নগ্নতায় শিহরিত হলো। 'ভালবাসায় আমি পবিত্র বিশ্বস্ত থাকবো', প্রাণপণ শক্তিতে সে বলতে চাইলো 'ভয় কি হেনাখালা আমি তো রয়েছি।' সে কিছু বলতে পারলো না। তার চোখ বুঁজে এলো, কণ্ঠ বুঁজে এলো। হেনা তার ঠোঁটে চোখে মুখে অলৌকিক উত্তপ্ত ঠোঁট ঘষতে ঘষতে আগুন ছড়িয়ে দিলো। সে তখন প্রাণপণ শক্তিতে উচ্চারণ করলো, 'আমাকে ছেড়ে দাও হেনাখালা, আমি মরে যাবো।'

তখন একটা দূরাগত গাড়ি মোড় নিলো এ রাস্তায়, তার আলোতে হেনাখালার ভয় পালালো। হাঁটতে থাকলো সে। তার পাশে পাশে। একবার মাত্র হেনার চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে রুনু ঘাড় গুঁজে চলতে আরম্ভ করলো।

সেই প্রথম রুনু হেনাকে ভালবাসলো, ভালবাসলো এবং ঘৃণা করলো। সেই রাতেই রুনুকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়েছিলো হেনা। হেনার চোখের জাদুতে মুগ্ধ হয়েছিলো রুনু। সেই নীলকালোঅতলজলভারনত আদুরে চোখে ডুবতে ইচ্ছে করলো রুনুর। চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হয়েছিল সে কেঁদে ফেলবে। তখন হেনা তার চিবুকে হাত রাখলো, আর রুনু চোখ নামিয়ে ফিশফিশ করে বললো, 'তোমাকে ভালবাসি হেনাখালা।' সেই ফিশফিশ হেনার কণ্ঠেও ধ্বনিত হতে শুনলো রুনু। তারপর চেয়ার ঠেলে সে উঠলো, হেনা ডাকলো, 'শোনো রুনু।'

রুনু আর শুনলো না, নিজের ভেতর ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে যেতে নিজের ঘরে ঢুকলো। বেশ কিছুদিন ঘর পালালো রুনু, কলেজ পালালো, একটা পবিত্রতা তাকে শুধু পীড়া দিতে লাগলো। কিছু একটা অচেনা সুরভি হেনার চুল থেকে এসে তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যেতে থাকলো।

সেই হেনাখালা, হেনার সর্বনাশা গভীরে ডুবতে থাকা রুনু একদিন গভীর রাতে

হেনার দরোজায় টোকা দিলো। দরোজা ফাঁক করে হেনা তাকে দেখলো, তাকে দেখে ঘরে টেনে নিয়ে দরোজা বন্ধ করে দিলো।

উজ্জল আলোর নীচে হেনার বিস্ফারিত উলঙ্গ যৌবন দেখে রুনু কাঁপলো, প্রাণপণে পালাতে চাইলো। কিন্তু ততক্ষণে আলো নেভা ঘর। রুনু দুমড়ে ভেঙে গেলো, গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে গেল হেনার ঠোঁটের চাপে, হেনার আলিঙ্গনের চাপে নিজেকে নগ্ন আবিষ্কার করলো রুনু, প্রায় অচেতন রুনুকে হেনা বিছানায় ছুড়ে দিলো। হেনা তাকে নিপুণ ধারালো অস্ত্রে চিরে ফেললো, রক্তাক্ত রুনু সর্বাঙ্গে লাখ লাখ সূচের জ্বালা নিয়ে ডুবলো।

রুনুর সমস্ত কিছুকে—সমস্ত রুনুর অণুপরমাণুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলা করতে করতে আলো জ্বাললো হেনা। খাটের বাজুতে মাথা রেখে কান্নারত রুনুকে টেনে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো এবং ঠোঁটের কিনারে তীক্ষ্ণ হেসে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলো গালে, বললো, 'যাও, আর এসো না।'

। চার ।

জানালায় দাঁড়িয়ে হেনাকে উদ্বাহু উঠোনের অতলে ডুবতে দেখলো রুনু। সন্ধ্যের সেই বোধ সুরভি হয়ে, ধ্বনি হয়ে জলতরঙ্গ বাজাতে বাজাতে আবার ফিরে এলো তার কাছে। রুনু সুন্দর হাসলো, 'আজ সে আসবে, তার অতল সাগরে আমাকে ডুবিয়ে দিতে, ধ্বনিত করতে, চমকিত নৃত্যে মাতাল করতে। আজ অন্য কেউ আসবে না।' ফিশফিশ করে নিজেকে এই কথা শোনাতে শোনাতে রুনু বেদনাময় বিস্মিত হলো নিজের কাছে। 'কোন অবেলায় সে এসেছিলো, আমি তাকে দেখতে পাই নি, আর সে পরিপূর্ণ আমাকে না পেয়ে ফিরে গেছে মোর্শেদ, কবীরের কাছে, যারা পালাক্রমে তার নিত্য শয্যা-সঙ্গী। হেনার অমোঘ চোখ আমাকে দিয়েই এদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠায়।' রুনু নিজেকে নগ্ন বোধ দেখলো, 'আমি তাকে ছুঁয়ে দেখি নি, জ্বালাতে পারি নি তার কাছে সেই পবিত্রতম আলো।' রুনু যেন আছড়ে পড়লো আকাশ থেকে, 'আমি তাকে ডাকতে পারতাম', রুনু ঘর ছেড়ে উঠোনে নামলো। একটা স্থির কিছু আলো হয়ে জ্বলতে থাকলো তার সর্বাঙ্গে, হাত বাড়িয়ে সে ছুঁয়ে ফেললো হেনাকে। একটা সর্বনাশা সুনীল শিখাকে রুনু তুলে আনলো হাতের মুঠোয়। 'হেনাখালা আমি তোমার তরলতায় ডুবতে চাই, আমি জ্বলতে

চাই, আগুন হতে চাই।' বৃষ্টিবিদ্ধ কন্থু নিমজ্জিত হলো হেনার ঠোঁটে, ঠোঁট রাখলো হেনার উচ্ছ্রিত বুকে।

এমন সময় খোলা দরোজায় কার ছায়া হেঁটে এলো ঘরের মধ্যে। দীর্ঘ ছায়া দাঁড়ালো হেনার সামনে, তাকে ঢেকে দিলো, দেয়াল তুললো কন্থুর চোখে। রিনরিন বাজলো হেনার কণ্ঠ 'এ্যাতো দেরী করলে কবীর?'

কবীর একহাতে জড়ালো হেনার কণ্ঠ, তারপর অলস উচ্চারণ করলো, 'চলো তোমার ঘরে।'

একটি দীর্ঘ সরলরেখা বর্শা হয়ে আমূল বিদ্ধ হলো হেনার পাঁজরে, বিদীর্ণ তার মনোজ খাঁচার দরোজা খুলে স্বপ্ন-বিদ্যুতেরা পালিয়ে গেলো, একটি সুনীল শিখা ঘর ছেড়ে ক্রমাগত অন্ধকারের দিকে এগোলো কন্থুর আর্তনাদের ওপর পা ফেলে ফেলে।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

হারামজাদীকে পেলে হয়…

অন্ধকার ঠাণ্ডা-ক্যান্টিনের এক কোণে রাখা পাতলা কাঠের টেবিলটা যেন আর্তনাদ করে উঠল। চায়ের জন্যে বাড়তি চিনি রাখার সবুজ প্ল্যাষ্টিকের বাটিটা উল্টে পড়ল মেঝের উপর… হারামজাদীকে একবার পেলে হয়…আমি ভাঙ্গা ফ্যাস-ফেঁসে কর্কশ গলায় প্রায় হুঙ্কার ছেড়ে চেয়ারে বসলাম। সারাটা ক্যান্টিন থৈ থৈ করছে ভীড়ে, কিন্তু একটি বেয়ারা চোখের পলকে আমার টেবিলে হাজির হ'ল। এটি মধুদার চার-নম্বরী আমদানী—নামটা বড় দরবারী—বীরবল! টেবিলের কাঠে রীতিমত একটা চড় মেরে বললাম, গোটা চারেক কলা, একটা পেষ্ট্রি আর আইস্-কোল্ড ফান্টা এক বোতল! অর্ডার নিয়ে ছোঁড়া কাউন্টারের দিকটায় এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি আবার ওকে ডেকে বললাম, এই শোন্, পাঁচটা ক্যাপস্টান সিগ্রেটও আনিস সবার শেষে, বুঝলি?—বুঝলাম! এই রকম একটা অঙ্গভঙ্গী করে বীরবল চলে গেল—সম্ভবত ক্যান্টিনের ভাঁড়ার ঘরের দিকে।

গোলাপফুল আঁকা কভারের খাতাটা যেন দড়াম্ করে আছড়ে পড়ল টেবিলের ওপর। জুতোর সোলের তলায় প্ল্যাষ্টিকের সুগার-পটখানা পট্ পট্ করে গুঁড়িয়ে যেতে থাকল। ক'টা অশ্লীল কথা বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। মেজাজটাই আমার খিঁচ্ড়ে গেছে আজ। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্লাস থেকে একটা ছুঁড়ে মারা চাকুর মতই বেরিয়ে এসেছি। কান দু'টো ঝাঁঝাঁ করছে। খুলির ভেতরকার মগজটুকু যেন গলে যাওয়া সীসের মত টগবগ করে ফুটছে। যেন একটু পরেই দুই কানের দুটো ফুটো দিয়ে বেবাক মগজ হুড়হুড় ক'রে বেরিয়ে আসবে।

এত বড় সাহস ঐ খান্কির? ঐ ভরা ক্লাসের মধ্যে জ্যাঠা আঙ্গুল দেখায়

মন্নান মজুমদারকে। ছি ছি ছি। কী লজ্জার কথা, কী ঘেন্নার ব্যাপার। কে জানে কেউ এই বিশ্রী দৃশ্যটা দেখে ফেলেছে কি না!

জীনাত, মানে জীনাত সুলতানা আমার পাশের বেঞ্চের মেয়েদের অংশ বসেছে। কাজেই বাঁ দিকে সামান্য মুখ ঘোরালেই তার চোখ আমার মুখের ওপর পড়তে বাধ্য। হ'লও তাই। নতুন মাস্টারটা আধ ঘণ্টা ধরে রোল কল্ করে যাবার পর পরই পেছনের দিকে বসা ছোঁড়াগুলো হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কাজেই গোলমাল ক্লাসে প্রায় হচ্ছিলই না। জীনাতকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম আমি। সে তার গোলাপী গালের ওপর রং করা নখ ঘষছিল কেবল। স্যার তখন শুরু করে দিয়েছে ম্যালথেশিয়ান থিয়োরি অব পপুলেশন। আমার পাশে বসা নোয়াখালির মৌলবি আর জাম্বিয়ান ছোঁড়াটি টুকটুক করে নোট দিচ্ছে খাতায়। কথায় কথায় সভেরিং-সভেরিং করে বলে এই নতুন প্রফেসরের লেকচার আমার কাছে কুইনিনের মত তেতো লাগে। তাছাড়া আমি খুব শুদ্ধ করে ইংরিজি লিখতেও পারি না। তাই, স্যারকে দেখাবার জন্যে মাঝেমধ্যে ভান করছিলাম লেখার। যেন দারুণ ব্যস্ততার সঙ্গে সমানে লিখে যাচ্ছি। তা যাই হোক আমার নজর তখন আঠার মত আটকে আছে জীনাত সুলতানার ঘোর গোলাপী গালের চামড়ায়। জীনাত তা টের পেয়েছিল। কিন্তু টের পেলে কি হবে, এমন ভাব সে করছিল যেন কোথাকার কোন নবাবজাদী দয়া করে এসে মাজা রেখেছেন একরাশ বাজে ছেলেমেয়ের দঙ্গলে। কিন্তু রংবাজি সে যতই দেখাক, এই শ্রীমান, এই মন্নান মজুমদার জানে, চোরা চোখে তাকাবার ব্যাপারে দারুণ চৌকশ ঐ ধারাল মেয়েটি। তাকাচ্ছিল। মাঝে মাঝেই আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল জীনাত। ক্লাস শেষ হবার মিনিটখানেক আগে তৃতীয়বারের জন্যে ওর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হ'ল। আমি চোখ মারলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্রী ঘটনা। বই খাতা গোছাতে গোছাতে জীনাত সোজাসুজি আমার দিকে তাকাল। তারপর ভয়ানক খারাপ মুখভঙ্গী করে আমাকে জ্যাঠা আঙ্গুল দেখাল।

তার অর্থ এই যে, জীনাত সুলতানাকে চোখ মারবার রাইট নেই মন্নান মজুমদারের। আধা পয়সা দাম নেই। ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ল। আমি প্রায় বাহ্য-জ্ঞানশূন্যের মত বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেমাগটা জবর গরম হ'য়ে গেছে। অন্যদিন ক্লাস ফুরলে শেয়াল-ডাক ডাকি, শিস্ মারি অথবা করিডোরের মাল্‌মেয়েদের পাছার মাপ নিই। আজ আর কিচ্ছু ভাল লাগল না আমার। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে প্রায় চোরের মত পালিয়ে এসে মধুতে বসলাম।

টিফিন সেরে শূন্য ফান্টার বোতলের মধ্যে সিগ্রেটের ধোঁয়া ভরছি এমন

সময় কলিমুল্লা এল।—কী হীরো, বোতলডারে উড়াবা নাকি? বসতে বসতে বলল সে।

হারামজাদীটাকে একবার—আমি সোজা হ'য়ে বসে বলি—আচ্ছা ঠিকঠাক বল তো, বডিবিলডিং নিয়ে থাকি বলে আমার চেহারাটা কি ভিলেনের মত লাগে?

—ক্যান্? একথা ক্যান্ হঠাৎ! কলিমুল্লা অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকায়।

আমি এক সিগ্রেটের আগুনে আরেকটি ধরিয়ে অন্য একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে ধরি ওর দিকে। এক মুখ ধোঁয়া মাথার ওপর উড়িয়ে দিয়ে আবার বলে কলিমুল্লা—এনিথিং রং—আই মীন—সাংঘাতিক কিছু ঘইটা গেছে মালুম হইতেছে।...জবর উত্তেজিত মনে হইতেছে তরে?

—ইংলিশের জীনাত সুলতানা আমাকে ইন্‌সাল্ট করেছে। আমি এবার বললাম খুব আস্তে আস্তে।

—ইন্‌সাল্ট করছে!

—হুঁ!

—তরে!

—হুম।

—ক্যান্?

কলিমুল্লার সওয়ালের কায়দা দেখলে গা জ্বলে যায় আমার। কথায় কথায় কেবল ক্যান্—ক্যান্—ক্যান্!

আমি চুপ করে বসে সিগ্রেট খেতে লাগলাম। আমার মনের অবস্থা টের পেয়ে গেল কলিমুল্লা। এই নীরবতার গূঢ় অর্থ যে কি কলিমুল্লার তা অজানা নয়। আমি আচমকাই যে ওর যাত্রার রাজার মত চুলের ঝুঁটিটা ধরে বেধড়ক পিটুতে শুরু করে দিতে পারি তাতে বিন্দুমাত্র অসম্ভব নেই। আমার মত ও-ও তাই নীরব হ'য়ে গেল। এমনকি সিগ্রেটও যে খেতে লাগল তাও প্রায় নিঃশব্দে। আমি কি ভেবে ওর কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলব; ঠিক কোনখান থেকে আমার বক্তব্য শুরু করব তাই চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কলিমুল্লা। বলল, এক্‌সক্যুজ মী মন্নান, টিউটোরিয়াল এখন। বুঝবারই পারস। অল রাইট—আবার দেখা হইব।

কলিমুল্লা যেন প্লেন ফেল করছে—এই রকম তাড়াতাড়ি ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল। ক্যান্টিনটা ভীষণ ফাঁকা হ'য়ে গেছে এখন। আমি কি উঠব এখন? চিন্তা

করে দেখলাম—বসে থাকাই ভাল। ভীড় থাকলে মধুদার চোখ ফাঁকি দিয়ে ইজিলি কেটে পড়া যেত। কিন্তু টিফিন-পিরিয়ডের শেষে আবার শুরু হ'য়ে গেছে ক্লাস। সারাটা ক্যান্টিনে পাঁচ-ছজনের বেশী ছেলে নেই। আড়চোখে মধুদা আমায় দেখছে। জবেদ আলি আর বীরবল তাকিয়ে আছে শকুনের মত। নাঃ—টাকা দেড়েকের মত গচ্চা দিতেই হচ্ছে!—

এই মুহূর্তে, এই মধুর রেস্তোরাঁয় বসে মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল আমার। আরে ধেৎ, এর কোনো মানেই হয় না। ঠিক এই মুহূর্তে, নিজের ওপর, নিজের বাপ-মা ভাই বোনের ওপর দারুণ রাগ হ'ল আমার। আমাকে কেউ দেখতে পারে না, কেউ চায় না। কেউ না। আমার পোস্ট-মাস্টার বাপের ক টাকাই বা মাসিক মাইনে; তবুও গেঁয়ো কলেজ থেকে আমি যখন সেকেণ্ড ডিভিশনে আই. এ. পাশ করলাম—তখন সেই-ই খুশি হ'ল সব চাইতে বেশী। বলল—ব্যস্, এবার ইউনিভার্সিটিতে পড়বি ঢাকা গিয়ে। মেজ ভাই পশ্চিম পাকিস্তানে মিলিটারির চাকুরী করে। ছুটিতে দেশে এসেছে। বলল, কি দরকার ইউনিভার্সিটির? এখানকার কলেজেই বি. এ.-তে ভর্তি হ'য়ে যাক। ইউনিভার্সিটির খরচ না হাতির খরচ। এত টাকা কোথায়?—সেজ ভাই বি. এসসি. পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসে আছে—বলল—তোমরা সবাই বড় বাজে কথা বলতে পার। একটা ছেলে ভাল শিক্ষা নেবে, তার জন্যে তাকে উৎসাহ দাও। খামকা খরচার জন্যে ভেবে মাথা গরম করছ। আমি বলি—মন্নান সোশিওলজিতে অনার্স নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে অ্যাডমিশান নিক; হলে যাতে সিট পায় সে চেষ্টা আমি করব। মাসে ওকে একশ করে টাকা পাঠালেই তিনটে বছর ওর হেসেখেলে কেটে যাবে!—

বাবা খুশি হ'ল সেজ ভাইয়ের কথায়। বলল—ঠিক ঠিক। মাসে আমি দেবো পঞ্চাশ আর মেজ ভাইকে বলল—তুই দিবি পঞ্চাশ!—এই ভাবে বন্দোবস্ত করে তারা তো আমায় ঢাকা পাঠাল। কিন্তু কসম খেয়ে বলছি—ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে বিদ্যার জাহাজ হবার ইচ্ছে আমার কস্মিনকালেও ছিল না। ছেলেবেলা থেকে ডনবৈঠক করি, মুগুর ভাঁজি। ভোরে বাড়ির সবাই যখন মাখন রুটি সহযোগে চা খায়, আমি তখন খাই ভিজে ছোলা আর আখের গুড়। একটি কথা আমি গোড়া থেকেই বিশ্বাস করি যে, গতরে ক্ষ্যাপা মোষের মত তাগদ্ না থাকলে এই দুনিয়ায় আমার দাম নেই এক নয়া পয়সাও। বাচ্চু ওস্তাদ বলত: শরীরটাকে শানের মত শক্ত রাখবে, ডঙ্কা মেরে ঘুরে বেড়াবে তামাম দুনিয়া।

জলে-জঙ্গলে যেখানেই যাও কদর তোমার সর্বত্র। শরীরকে গড়ে পিটে লোহার মত শক্ত বানাব, এর চেয়ে গভীর পরিকল্পনা সত্যি আমি কখনো করিনি।

কিন্তু পাড়াগাঁয় কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রায় জোর করে ঢাকা পাঠান হ'ল পণ্ডিত বানাবার চেষ্টায়।

ঢাকা এলাম। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। কথা দু'টি শুনতে খুব সহজ লাগে তাই না? কিন্তু ইউনিভার্সিটির খাতায় নাম তুলতে গিয়ে আমাকে যে ঝকমারি পোয়াতে হ'ল—সে যাতনা বোঝাতে গিয়ে গর্ভ-যন্ত্রণা ছাড়া আর কোন জুৎসই শব্দ আমি আজও পর্যন্ত হাতড়ে পাইনি। যা হোক ঢাকায় এসে টি অ্যাণ্ড টি কলোনিতে বাবার বাল্যবন্ধুব বাসায় উঠেছিলাম। সেখান থেকে শুরু হ'ল ভর্তি হবার পাঁয়তারা। আই. এ-র সার্টিফিকেট তখনো দেয়নি। শুনলাম বোর্ডেব দপ্তর থেকে টেষ্টিমোনিয়াল আনতে হবে। যাহোক তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, টেষ্টিমোনিয়াল, ইস্কুলের হেডমাস্টার, কলেজের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে আবো প্রচুর হাবিজাবি এইসব জোগাড করতে প্রাণান্ত। এ সময়কার দু'টি মজার ব্যাপার আমার সারা জীবন মনে থাকবে। এক—বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্যে অপরিহার্য, নিজ এলাকায় যে চেয়াবম্যানের কাছে থেকে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট আনতে হল —তার মত চরিত্রহীন লোক আমি দুটি দেখিনি। দুই—ভর্তির আগে ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপকদের সামনে যে ইন্টারভ্যু দিলাম তাতে এক বেঁটে মোটা ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তোমার নাম মন্নান মজুমদাব না হয়ে যদি প্রাণনাথ মুন্শী হত তবে তুমি কি করতে?

আমাদের কলেজ থেকে আরো বেশ ক'জন ছেলেমেয়ে ভর্তি হল বিভিন্ন বিভাগে। ক'জন অনায়াসেই হলে সীট্ পেয়ে গেল। কি করে পেল তা তারাই জানে, কিন্তু আমি কোন সীট পেলাম না। কেন পেলাম না, তা আমি জানি না। তবে কয়েকটি আশ্চর্য হবার মত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম আমি ইউনিভার্সিটিতে। আগে জানতাম ফার্স্ট-ডিভিশন আর হায়ার সেকেণ্ড-ডিভিশানের ছেলেমেয়ে ছাড়া কোনো মতেই এখানে ভর্তি হওয়া যায় না। কিন্তু, দেখলাম, আমার চেনাজানা বেশ ক'টি ছেলেমেয়ে থার্ড-ডিভিশনে আই. এ. পাশ করলেও বেশ ডাঁটে ভর্তি হয়ে গেল। কেউ কেউ এদের মধ্যে আবার ভাল সীট্ও পেয়ে গেল—ফাউ।

ছাত্র হিসেবে আমি খুব যে একটা, কি বলে—মেধাবী—এমন বাজে কথা আমি কখনো বলব না। তবে জীবনে ফেল করিনি কোনো পরীক্ষাতেই। একবার একটা স্কুল-মাস্টারকে ঠ্যাঙানো ছাড়া আমার তেমন কোনো খারাপ রেকর্ডও নেই। কিন্তু

কি জানি কেন, একটি পুরনো হলের কদর্যদর্শন প্রভোস্ট আমার দিকে না তাকিয়েই ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল—সীট নেই !—অ্যাপ্লাই করে রাখো, পরে দেখা যাবে।

অথচ কী আশ্চর্য আমি জানতাম—তখনও বেশ কিছু সীট সে হলে খালি আছে। আরো জানতাম, ছাত্র নয়—এমন প্রায় এক ডজন লোক হলে বসবাস করছে বিনে ভাড়াটে হয়ে প্রায় আবহমান কাল ধরে। আরো অনেক খবরই রাখতাম সেই হলের ; কিন্তু সীট হলনা আমার।

তা যাই হোক, ক্লাশে যাতায়াত শুরু করলাম দারুণ ফূর্তির সঙ্গে। বাপরে, যা'তা কথা নয়,—ইউনিভার্সিটি স্টুডেণ্ট। রক্ত যেন টগবগ করে ফোটে। টি অ্যাণ্ড টি কলোনী থেকে যখন বাসে চাপি, সাংঘাতিক স্লো মনে হয় বাসগুলোকে। মনে হয়, মনে হয়, একটা জেটপ্লেনের মত শাঁ করে উড়ে চলে যাই নীলক্ষেতের মোড়ে। কলোনীর আঁটসাট সালোয়ার কামিজ পরা ইস্কুলের মেয়েগুলো আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সকালে-বিকালে। দেখতে খুব একটা উত্তমকুমার না হলেও স্বাস্থ্যটা তো আর ডাস্টবীনে ফেলে দেবার মত নয়। আর সতেরো থেকে সাতচল্লিশ বছরের মেয়েরা তো আগে দেখে পুরুষের বুক তার পরে মুখ। কাজেই সারা-কলোনীর রংবেরঙের মেয়েদের সাথে জান্‌লাবাজিটা আমার বেশ জমেই উঠল। একদিন এক ঘুঁষিতে এক রিকশাঅলার একটা দাঁত খসিয়ে দিয়ে পাড়ার রকবাজ ছোঁড়াদের সর্দারিও পেয়ে গেলাম। তিন মাসের মধ্যে পাড়ার এবং আরো তিন মাসের মধ্যে ইউনিভার্সিটির হীরো বনে গেল মহব্বত নগরের ছাবেদালি পোস্টমাস্টারের ছেলে মন্নান মজুমদার।

দেশ থেকে বাবা চিঠি লেখে—বাবা মন্নান, ভালভাবে পড়াশোনা করিও। রমজান ভাইয়ের সঙ্গে বেয়াদবি করিও না। বাবা আমার, তুমি সর্বদাই স্মরণ রাখিও যে তোমাকে মানুষ হইতে হইবে।—বাবার সব চিঠিই সেই এক ভাব আর এক ভাষায় লেখা। দিন-তারিখ বদলে দিলে তার আগের চিঠিকে পরের এবং পরের চিঠিকে আগের বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তাই, দেশ থেকে বাবার চিঠি এলে আমি তা পড়তাম না। বাবার ঐ এক বুলি হয়েছে—তোমাকে মানুষ হইতে হইবে।—মানুষ হইতে হইবে—এ রকম তাজ্জব কথা মাইরি আমি আর কখনো শুনিনি।

সবকিছু বেশ ভালই চলছিল ; কিন্তু মহব্বত নগর থেকে জাহাঙ্গীর নগরে এসে আমি বদ হয়ে গেলাম। ঢাকার বাতাস গায়ে লেগে ইতিমধ্যেই বদলে গিয়েছিলাম দারুণ। প্যাণ্ট-জামা আঁটো হতে শুরু করল ; চুলকে ছোট করতে করতে এমন

পর্যায়ে নামিয়ে এনেছি এখন, যে চিরুণীর দরকার হয় না। স্বাস্থ্যটি তো আগে থেকেই ভাল। এখন রাজধানীর জলে বাতাসে তাতে যেন আলাদা জেল্লা ধরতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগেও কথায়বার্তায় ছিলাম ভীষণ গ্রাম্য। এখন ঢাকার চলতি ভাষাকে মার্কিনি-স্ল্যাংএর সঙ্গে মিশিয়ে এমন মিক্শ্চার-জবান্ শিখে ফেলেছি যে নিজেই একেক সময় আশ্চর্য হয়ে যাই। জড়তার লেশমাত্র এখন আমার মধ্যে নেই। এখন আমি লাইব্রেরির ন্যাড়া-বাগানটার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে পেচ্ছাব করতে পারি।

আরো অনেক কিছুই আমি করতে পারি, কিন্তু তার দরকার হয় না। এমনিতেই সবাই বেজায় খাতির করে আমাকে। রোজকার বাসভাড়া ছাড়া আমার—বলতে গেলে—আর কোনো খরচার বালাই নেই। সীট যদিও কোনো হলেই মেলেনি কিন্তু সব হলেই আমার অবাধ গতি। ইয়ার গজিয়েছে এস. এম. হল থেকে শুরু করে জিন্না হল পর্যন্ত। বডির দৌলতে ঢাকা হলের ডাইনিং রুমে যখন ইচ্ছে খাই—কেউ কিছু বলে না। এফ এইচ হলের লণ্ড্রীতে কাপড় ধোয়াই—ফ্রী, জিন্না-হলের সেলুনে চুল কাটাই—সেখানেও পয়সা খরচ নেই।

অবশ্যি বলাকার মোড়ে কিংবা নিউ মারকেটে যখন ফিল্ডিং মারতে বেরোই, জুতো জোড়াটা তখন পলিশড্ না হলে জমে না। তখন পলিশঅলাকে দক্ষিণা দিতে হয় পাকির পনেরো নয়া পয়সা। সঙ্গে ইয়ার-দোস্ত যদি থাকে তবে পয়সাটা তাকেই দিতে হয়। কিন্তু সুবিধে শুধু এইটুকুই নয়; মাসল শো করে সাংঘাতিক রকমের ক'টা বড়লোকের ছেলের সাথে খাতির হয়েছে আমার। সকালে যদি কালো রঙের অস্টিনে করে ক্লাশে আসে তো বিকেলে আসবে টকটকে লাল ফোক্স ওয়াগেনে। মাঝে মাঝে হেথায় হোথায় লিফট দেয় অবশ্যি; কিন্তু ওসব দামী গাড়ির নরম গদিতে মাথা এলিয়ে ভুস করে পাঁচ দশ মাইল চলে যাওয়ার মধ্যে কোনো থ্রীল নেই। ইসপাহানী-হাউসের মালাঠি আমার নতুন বন্ধু। ওর ভেসপাটা যেদিন পাই সেদিন মনে হয়—হেঁটে চলা তেল চিটচিটে হাজার মানুষকে ধুলো ছিটিয়ে বেহেশতের দরজার দিকে উড়ে চলেছি আমি। তাছাড়া রশিদের বিলেত থেকে আনা বুশশার্ট, কাহারের গগল্স, সাঈদের টেট্রনের প্যান্ট আর আবুর দেড়শো টাকা দামের পুলোভারে দিনগুলো আমার প্রিন্সের মতই কেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু শাহ্ আমাকে ফাঁসিয়ে দিলে। ব্যাটা নিজে এক বিশ্ব-বদমাশ—; আমাকেও অল্পদিনে এক নম্বরের লম্পট বানিয়ে ছেড়ে দিল। ছেলেবেলায় যখন বাচ্চু-ওস্তাদের আখ্ড়ায় গিয়ে বুকডন দিতাম, দৌড়ঝাঁপ করতাম তখন ওস্তাদজী

বলত: হুঁশিয়ার। মদ আর মেয়েমানুষ—এই দুই জিনিস থেকে হুঁশিয়ার! এই দুই সর্বনেশে জিনিসকে হারাম করতে না পারলে কস্মিনকালেও তোমার বডি হবে না।—কিন্তু ঢাকায় এসে এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মদ আর মাগিতে পাকাপাকি ভাবে আসক্ত হ'য়ে পড়লাম।

মহব্বত নগরের বন্ধুরা, দেশে থাকতে কি যেন একটা নাম দিয়েছিল আমার? কি যেন,— ঐ যে হ্যাঁ—নারীবিমুখ। ঢাকা এসে, বিশেষ করে শাহরিয়ারের সাথে দোস্তি হয়ে একেবারে উল্টেই গেলাম। শাহ্‌র সঙ্গে চলাফেরা করে আমার কি হ'ল? না, কারো বাড়ির ছাদে—কার্নিশে মেয়েদের সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি-ব্লাউজ অথবা পেটিকোট ঝুলতে দেখলেই বুকের ভেতরটা গুড় গুড় করে ওঠে। মনে হয়, ইশ্‌—মনে হয় রোববার সন্ধ্যায় সারা জিন্না-অ্যাভিন্যুতে যতগুলো মেয়ে বেড়াতে বেরোয় তাদের সবকটাকে বগলদাবা করে নিয়ে বুড়িগঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। চিন্তা করি আমার কপালটাই খারাপ। এই যে তামাম ঢাকা শহরে লাখ লাখ টেডি মেয়ে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এগুলোর সবকটাকে কোনোদিনই আমি চুমো খেতে পারবনা। ফিউচারে বিয়ে-শাদী করলেও হালার একটা মাত্র মেয়েকে বউ বানিয়ে সংসার করতে হবে পুরো জীবন। অথচ, যেদিকে তাকান যায়, গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে, দঙ্গলে দঙ্গলে মেয়ে। ধুৎ! এর কোনো মানে হয় না। ভাবি আর ভাবি। আর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি। শাহ্‌র সাথে খাতির হবার পর এমন কত লক্ষ দীর্ঘশ্বাস যে আমার বাজে-খরচা হয়ে গেছে, তার হিসেব আমি রাখিনি।

মদ আর মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ আর মদ। ছেলেবেলায় একবার এক সাধুর আখ্‌ড়ায় গিয়ে গাঁজা খেয়েছিলাম। আট আনা পয়সা দিতেই সাধুবাবা পরম নিষ্ঠা সহকারে একটা সিগ্রেটের সব মশলা ফেলে দিয়ে তাতে গাঁজা ভরে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। বলে দিয়েছিল—কষে টানো। ধোঁয়া বের করে দিও না! বাড়ি গিয়ে এক বাটি গরম দুধ খাবে তাহলে খোয়ারি হবে জোর। কিন্তু কিসের নেশা কিসের কি? দিব্যি রোজকার মত বাড়ির সবার সঙ্গে রাত্রির খাওয়া সারলাম। সেজ ভাইয়ের দেরাজ থেকে ন্যাংটো-মেয়ে লোকের ছবিঅলা ইংরিজি পত্রিকা চুরি করে পড়লাম। নেশাও না, কিছুই না। গাঁজা ভাঙেও ভেজাল চলেছে নাকি কে জানে। যাহোক সেইদিন সেই গাঁজা খাবার পর থেকে ওসব জিনিসের প্রতি আমার রাগ বা বিরাগ কিছুই ছিল না।

শাহ্ একদিন আমাকে হেনরিয়েটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সে ধানমণ্ডির এক খান্‌কি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এবং হেনরিয়েটার ঘরে ঢুকেই বয়ে গেলাম আমি। শালি বাংলা মদের বোতল পেলে বাপ দাদার নাম ভুলে যেত। প্রথম প্রথম টাকাটা আশ্‌টা ধরে দিতাম হেনরিয়েটাকে। পরে কেবল এক বোতল দিশি মাল আর প্যাকেটখানেক পলমল সিগ্রেট দিলেই বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে করসেটের ফিতে খুলতে শুরু করত। মাগির চেহারাটা বেশ ডগ্‌মগানো? ফিগারটাও ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেবার মত নয়; কিন্তু ওর পা থেকে মাথা অব্দি এক রকম বোঁটকা গন্ধ ভুর ভুর করত। তবু চুমো খেতাম ওকে। চিৎ হয়ে শুয়ে বুকের ওপর রেখে আদর করতাম ওর উলঙ্গ শরীরকে। আদর করতাম আর মদ খেতাম। মদ আর খিস্তি।

কি করে যে কি সব হয়ে গেল আমি বুঝতেই পারলাম না। একদিন বাথরুমের খাটো আয়নায় নিজের মুখখানাকে দেখে আঁতকে উঠলাম আমি। চোখের নীচে আমার এত কালি জমেছে কবে? গালের ওপরকার ঐ ফুস্কুড়িগুলোই বা কবে গজাল? কিন্তু একটা কথা আমি বেশ ভালই বুঝতে পারলাম, ফেরার পথ আর আমার নেই। কারণ শাহ্ আমাকে নামার পথেই চলতে শিখিয়েছে—উঠবার পথের ঠিকানা দেয়নি। মনে করলাম, ফেরার পথ আর আমার নেই। দেখতে দেখতে সাব্‌সিডিয়ারি পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এল।

শাহ্‌কে বললাম—ওস্তাদ, পরীক্ষা তো এসে পড়ল। এখন উপায় কি? শাহ্ বলল, নোট বইয়ের খাতা কাটুম। আমি বললাম, ধুস্?—ধরা পড়লে লটকে দেবে। জিন্দেগী বরবাদ। শাহ বলল,—তাহলে ফুর্তি-ফার্তির খুরে স্যালুট মার্ কিছুদিনের লাইগা। কিছু স্টাডি-উডি কইরা দেখা যাউক। সাবসিডিয়ারিতে তিরিশ মার্ক উঠলেই তো পাস্; একটা ঘোড়াও বি-এ পাস করবার পারে। হেনরিয়েটার ঘরে বসে মদ খেতে খেতে একদিন আমরা ওইসব কথাবার্তা বলছিলাম। কিন্তু আমার মনে ছিল অন্য চিন্তা। শাহ্ আর যাই করুক—পার্সেণ্টেজে টাইট্ রেখেছে। আমার বোধ করি টেনে হিঁচড়েও চলিশের বেশী উঠবে না। অথচ পরীক্ষা দিতে গেলে কম্‌সে কম পঁচাত্তর পার্সেণ্ট থাকতেই হবে শতকরা। সেদিন সন্ধ্যায় ঝড়বাদ্‌লা মাথায় করেই টি অ্যাণ্ড টি কলোনীতে ফিরলাম। আস্তানায় এসে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা পাঠ্যপুস্তকগুলোয় হাত দিতেই গুড়-গুড় করে উঠল বুকখানা। কতদিন এগুলো ছুঁইনি!

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে গুলি মারো—ডিপার্টমেণ্টের কেরানিটা বদামি শুরু করল। ভেবেছিলাম চা-সিগ্রেট খাইয়ে ফায়দা ওঠাবো; কিন্তু ব্যাটা ভারি তঁ্যাদোড়। বলল—মাপ চাই। এতবড় অন্যায় আমি করতে পারব না। কত কাকুতি মিনতি, কত অনুরোধ উপরোধ। নরম হয় না তো হয়ই না। শেষে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। পকেট থেকে ড্যাগার বের করে বললাম—ওসব ছেঁদো কথা শিকেয় তুলে রাখ। পার্সেণ্টেজ মেকাপ করে রাখ—টাকা পাবে। বাড়ি যাচ্ছি তোমার টাকার জন্য। এসে যেন দেখি ঠিকঠাক নাম ঝুলছে বোর্ডে। নইলে—ড্যাগারটা আবার আমার হাতে ঝিকিয়ে উঠল।—কেরানী ব্যাটা ম্যালেরিয়ার রোগীর মত কাঁপতে লাগল সমানে। আমি ফৌজি-হাঁটা হেঁটে অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মহব্বত নগরে—মানে বাড়িতে এসে ভেবেছিলাম, নিশ্চিন্তে ক'টা দিন পড়াশোনা করে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ঢাকা ফেরা যাবে। কিন্তু পড়াশোনাতে মন বসাতে পারলাম কৈ। পার্সেণ্টেজের আতঙ্ক একটা অতিকায় মাকড়শার মত আমার মগজের মধ্যে এক ভয়ানক জাল বুনতে লাগল। অথচ কি নিদারুণ ব্যাপার ছাখো, বাড়িসুদ্ধ মানুষ জানে, আমি পরীক্ষার জন্যে খুব ভাল প্রিপারেশান নিচ্ছি। ঢাকায় পড়াশোনা বিঘ্নিত হ'তে পারে মনে করে আমি দেশগাঁয়ের নিরিবিলিতে চলে এসেছি নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করবার জন্যে।

বইপত্র সঙ্গে কিছু ছিল। ছিল কিছু নোট আর টিউটোরিয়ালের বাসি খাতাও। সকাল সন্ধ্যা সেই সব নাড়াচাড়া করি অকারণে। মন বসাতে পারিনা বইয়ে। বাবা একদিন বলল, কি হয়েছে তোর। মুখখানাকে সব সময় অমন গম্ভীর ক'রে রাখিস কেন? কেমন ঠাণ্ডা, ভেজা, চুপচাপ। আমি ম্লান হেসে তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় প্রায় ঘামতে থাকি। হয়ত, মা এসে আমার মুখ রক্ষা করেন হঠাৎ। বলেন, কিসের আবার গম্ভীর হয়ে থাকবে; সামনে এতবড় একটা পরীক্ষা তাই পড়াশোনার কথা চিন্তা করে। তোমার যত বেহুদা কথা গো!—

সামনে এতবড় একটা পরীক্ষা। ভালমন্দ একটু না খেলে এসময়টা চলবে কেন? তাছাড়া আরো কত খরচ। ঢাকা যাবার আগে মা চুপ করে ডেকে নিয়ে একশ' টাকার তিনটে নোট আমার প্যাণ্টের পকেটে গুঁজে দিল। বলল, নিত্যি ভোরবেলা এট্টু মাখন খাস, এট্টু ছানা খাস, মগজটা ঠাণ্ডা থাকবে। এ টাকার কথা যেন তোর বাবা জানেনা—! শেষের কথাটি মা উচ্চারণ করল প্রায় ফিসফিস ক'রে।

কিন্তু ঘাপলা ত্থাখো; ঢাকায় পৌছে প্রথমে টি অ্যাণ্ড টি কলোনীতে না গিয়ে ধানমণ্ডিতে গেলাম। তখন সকাল। হেন্‌রিয়েটা তখনও একটা কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। এইমাত্র, বাবুর্চি বোধকরি বেড্‌টি দিয়ে গেছে তেপায়ার ওপর। আমার জুতোর শব্দে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল হেনরিয়েটা।—গুডমর্নিং হেনরি!—আমি কাঁধে ফেলে রাখা ব্লেজারখানা চেয়ারের হাতলের ওপর রাখতে রাখতে বললাম।—মর্নিং! হেনরিয়েটা বিছানার ওপর জোড়াসন করে বসল। চোখ কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে বলল: তাহলে বেঁচে আছ দেখছি। আমি ভাবলাম গুণ্ডামী করতে গিয়ে কোথায় কার ড্যাগার খেয়ে ফিনিশ হয়ে গেছ!—

আমি হেনরিয়েটার হাত ধরতে গেলাম। সরে গেল সে। বলল—আমাকে ছুঁয়োনা ডারলিং—প্লীজ!— কেন, ছুঁলে জাত যাবে নাকি?—আমি হাসতে হাসতে বলি। কিন্তু আমার হাসির সমর্থনে হাসির রেখা ফুটে উঠল না তার কালো ঠোঁটে। বাবুর্চিকে ডেকে আমার জন্যে চা-নাশ্‌তা দিতে বলে হেনরিয়েটা আমাকে লক্ষ্য করে বলল—শাহ্‌ বলল তুমি বাড়ি চলে গেছ। তা কবে এলে?—আমি বললাম—এই তো মাত্র! —এইমাত্র? —হ্যাঁ, এই তো রেলস্টেশন থেকে সোজা আসছি তোমার এখানে। কথা শেষ করে আমি পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করলাম। একটা নিজে ধরিয়ে অন্যটা বাড়িয়ে ধরলাম ওর দিকে।—থ্যাংক ইউ, এখন সিগ্রেট খাবো না। হঠাৎ বিরস হয়ে উঠল হেনরিয়েটার মুখ। চায়ের খালি পেয়ালাটা পাশের তেপায়ার ওপর রাখতে রাখতে আবার বলল—ভাল ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেছ?

হো হো করে হেসে উঠলাম এবার আমি। নিশ্চয়ই এ রাত্তিরে কোনো কালো সায়েবের গলা জড়িয়ে ধরে পেগের পর পেগ্‌ খেয়েছে। নিশ্চয়ই বেশি গিলেছিল—সারা রাতেও তাই নেশা কাটেনি। আমি চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে হেনরিয়েটাকে ধরলাম। তারপর দু'হাত ধরে কোলে তুলে নিলাম ওর বোঁটকা গন্ধ ভরা হালকা দেহখানা। প্রাণপণে চুমো খেতে গেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে আমার কোল থেকে ছিটকে পড়ে গেল সে খাটের ওপর। তারপর চেঁচিয়ে বলল—তুমি কি কালা, তুমি কি কোনো কথা শুনতে পাও না?—বলছি যে আমাকে তুমি ছুঁয়োনা। কানে যায় না আমার কথা?

তার মানে?—আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবার। আরে, এ বেশ্যা মাগির আবার কি হল। ছুঁতে দিচ্ছেনা কেন? বাড়ি যাবার আগের রাত্রিতেও তো একদম ন্যাংটো হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল আমার কোমর জড়িয়ে ধরে। আজ আবার

এমন আজগুবি আচরণ কেন ? সিগ্রেটটা পর্যন্ত খাচ্ছে না। বললাম—এসবের মানে ? হেনরিয়েটা তখন বিছানা থেকে উঠে স্লিপিং গাউনের ফিতে বাঁধছে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে। আমার কথা ক'টা যেন তার কানেই যায়নি। কিছুক্ষণ পরে বলল—শোনো মজুমদার, বলি বলি করেও কথাটা এতদিন তোমায় বলিনি। বলিনি তার আরো কারণ—ব্যাপারটা বুঝতেও আমার দেরি হয়েছে। শাহ যেদিন খুলে বলল সেদিনই তো সব কিছু বুঝতে পারলাম! —কী বুঝতে পারলে ?—কী বলছ তুমি এসব ? আমি চায়ের কাপখানা সশব্দে টেবিলের ওপর রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমি তোমার আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনে।

আমার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হেনরিয়েটা বলল—তুমি আমার বন্ধু। চিরদিনই আমার বন্ধু। কিন্তু বন্ধু শুধু তুমিই, তোমার ঐ সর্বনাশা ব্যাধি আমার বন্ধু হতে পারে না! —কী এসব আবোল তাবোল বকছ তুমি ?—আমি প্রায় আমতা আমতা করে বলি।

—তোমার ঠোঁট, গাল আর দু'হাতের ফুস্কুড়িগুলো যাকে একজিমা বলে এতদিন চালিয়ে এসেছ, তা আসলে সিফিলিস্ ছাড়া আর কিছুই নয়।

: সিফিলিস্ ?

: হ্যাঁ!

: কে বলল ?

: প্রথমে আমার মন—তারপর তোমার বন্ধু—শাহ্।—শাহরিয়ার খাঁ!

একবার আমার মনে হয়েছিল—একটা প্রচণ্ড লাথি মেরে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বেশ্যাটার পাছা থেঁতলে দিই। কিন্তু কিছুই করলাম না। একটা বেত-খাওয়া ঘেয়ো কুত্তার মত বেরিয়ে এলাম বাইরে!

ধানমণ্ডি থেকে টি অ্যাণ্ড টি কলোনী—তারপর সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যেন কয়েকটা বছর পেরিয়ে এলাম আমি। ডিপার্টমেণ্টে এসে দেখি—কী তাজ্জব, কী তাজ্জব,—কেরানী ব্যাটা আমার পার্সেণ্টেজ মেকাপ করে রেখেছে টায়ে টায়ে। বেজায় খুশি হয়ে ওকে দশটা টাকা বের করে দিলাম। ঘুষ পেয়ে ব্যাটা এক গাল হাসল। কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারব—এ আনন্দ আমার মিলিয়ে গেছে অন্ত আতঙ্কে। আতঙ্কে আর ঘেন্নায়।

ঠোঁটের, গালের আর হাতের ফুস্কুড়িগুলো আমি ডক্টর করিমকে দেখিয়েছি তিন মাস আগে। কে না জানে ডক্টর বাসিতের মত চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ সারা দুনিয়াতেই এক ডজনের বেশি নেই। ও তো আমার পায়খানা, প্রস্রাব, থুথু, কাশি সব পরীক্ষা করে দেখে সাফ বলে দিল—এক্‌জিমা।—অথচ শাহ্‌, হেনরিয়েটা—দাঁতে দাঁত চাপলাম আমি তারপর প্রায় ভুল করেই পলিটিক্যাল-সায়েন্স ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। আগেকার অনার্স-এর জরুরী ক্লাস মিস্‌ করেছিলাম। এখন এই ক্লাসে এসে সেই খাবসুরত ছেমরিটাকে দেখতে পেলাম। দেখি—একেবারে আমার পাশাপাশি মেয়েদের এলাকা আলো হয়ে গেছে নাগির জেল্লায়।

নিজের চোখ দুটির মধ্যে পেচ্ছাব করে দিতে ইচ্ছে করল আমার। সত্যি, আমি একটা জানোয়ার হয়ে গেছি। ভাল জিনিস, সুন্দর জিনিস আমার চোখে পড়ে না। এই যে সারাটা আর্ট্‌স-বিল্‌ডিং জুড়ে হাজারটা মেয়ে মাজা নাচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এগুলো আমার নজরে পড়েনা কেন! শুনেছি,—না না শুনবো কেন—নিজের চোখেই দেখেছি—এদের মধ্যেও কয়েক ডজন ভাড়াটে মেয়ে আছে। একবার নয়, অনেকবার দেখেছি রোকেয়া হলের ক'টা ভূতুড়ে-চেহারার মেয়ে শাহর গাড়ীর মধ্যে হুটোপুটি করছে। টাঙ্গাইলের একটি বেঁটে মত মেয়েকে তো শাহ্‌ একদিন সন্ধ্যার সময় লাইব্রেরির বাগানেই জড়িয়ে ধরল। তারপর—; কিন্তু যাই বল না কেন, ঐ মেয়েটি মানে ঐ জীনাত সুলতানার মত মেয়ে কখনো নষ্টামী করতে পারে না। শুনেছি ডজন ডজন গুড্‌বয় নিজেদের গাড়ি নিয়ে রোজ ওর গাড়ির পেছনে পেছনে গেণ্ডারিয়া পর্যন্ত এগিয়ে যায়; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আসলে ঐ চশমা পরা ছোঁড়াগুলো একদিনও, একটু কথা পর্যন্ত বলতে পারেনি জীনাত সুলতানার সাথে।—ঠিক! ঠিক!—প্রেমেই যদি পড়—তো এই রকম ডাঁটের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা উচিত।

আর তাতেই তো আজ এতদিন পর ক্লাশে এসে টপাটপ চোখ মারতে শুরু করলাম জীনাত সুলতানাকে। ও আমার পাশের বেঞ্চের মেয়েদের অংশ বসেছে; কাজেই বাঁ দিকে সামান্য ঘোরালেই তার চোখ আমার মুখের ওপর পড়তে বাধ্য। হলও তাই।···নতুন প্রফেসরটি সাপের মন্তরের মত ম্যালথেশিয়ান থিয়োরি-অব পপুলেশন বোঝাচ্ছিল। আমার পাশে টুপিপরা নোয়াখালির মৌলবি আর জাম্বিয়ান ছোঁড়াটি টুকটুক করে নোট্‌ নিচ্ছিল। ও পাশে বর্শার ফলার মত রঙিন নখ দিয়ে গাল খুঁটছিল জীনাত সুলতানা। ক্লাশ ফুরোবার মিনিট খানেক আগে তৃতীয় বারের জন্যে ওর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হ'ল। ব্যাস্‌—আমিও চোখ

মারলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশ্রি ঘটনা।—জীনাত সুলতানা আমাকে তার জ্যাঠা আঙ্গুল দেখাল ভয়ানক খারাপ মুখভঙ্গী করে।

অর্থাৎ? অর্থাৎ জীনাত সুলতানার মত ধনী, রূপসী, মসৃণ মেয়েকে চোখ মেরে প্রেম নিবেদন করার রাইট্ নেই মহব্বত নগরের মন্নান মজুমদারের। অর্থাৎ তোমার বডি যত নকরাই হোক না কেন, জীনাত সুলতানার মত মেয়ের কাছে তুমি একটা ঘেয়ো-কুত্তা ছাড়া আর কিছুই নও।

কী তোমার দাম? কীসের তোমার অধিকার? হেনরিয়েটার মত বাজারে-মেয়েই যাকে খারাপ রোগের রোগী সন্দেহে ভিখিরির মত ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে, জীনাত সুলতানাকে সে চোখ মারে কোন্ অধিকারে!

বড় বড় পা ফেলে করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে পেছন দিকে মধুর ক্যান্টিনে চলে এলাম আমি। জীনাতের ধারাল, রংকরা নখঅলা জ্যাঠা আঙ্গুল দেখে রাগে দুঃখে লজ্জায় মধুর দোকানে বসেছিলাম। হাজারে হাজারে লাখে লাখে নষ্ট-চিন্তার ঘায়ে ফাটা বেলুনের মত চুপ্‌সে যাচ্ছিলাম। বিকেল হয়ে এসেছে। আর্টস-বিল্ডিংয়ের চারধার ভীষণ ফাঁকা। লাইব্রেরির পেছনে কুলি-বস্তীতে রান্নার ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে। ক'জোড়া ন্যাতানো, ঠাণ্ডা, নিরক্ত ছোকরা-ছুকরি তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে পিরিতের আলাপ করছে।—মধুদার রেস্তোরাঁয় আবার দু'জন চারজন করে খদ্দের আসতে শুরু করেছে এখন। এখন, এ বেলা ফার্স্ট-ইয়ার সেকেণ্ড-ইয়ারের কোনো ছাত্রই আর মধুতে আসবে না। এখন আসবে তারাই, যারা বছর দুয়েক আগে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেছে। নতুন কলেজের প্রফেসর, কোনো সাহিত্য পত্রিকার নবীন সম্পাদক, কবি, আঁকিয়ে—এমনি সব মানুষে একটু পরেই প্রায় ভরে যাবে সারাটা রেস্তোরাঁ।

সত্যি বলতে কি, এই রাইটার আব আর্টিস্টগুলোকে দেখতে পারিনে। কি সব মাথামুণ্ডু আওড়ায়—কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু আজ আমার কি হয়েছে, ক্যান্টিনের এক কোণে রাখা চেয়ার ছেড়ে একটুও উঠতে ইচ্ছে করছে না। কে যেন, কারা যেন, একটা প্রকাণ্ড গায়েবী শিকল দিয়ে—আমার সবল-শক্ত পা জোড়াকে মেঝের শাদা পাথরের সঙ্গে চিরতরে এঁটে দিয়েছে। আবার আরো এক পেয়ালা চা দিতে বলব কিনা ভাবছি, এমন সময় কলিমুল্লা ঢুকল—রেস্তোরাঁয়। কলিমুল্লার সঙ্গে এ কে?—কী আশ্চর্য।—কলিমুল্লার পেছনে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করল জীনাত সুলতানা আর—আসরার চৌধুরী। প্রায় পাশাপাশি হেঁটে আসতে আসতে তারা আমার তিন দিকে দাঁড়াল।—

ব্যাপার কিছুটা আঁচ করতে পেরে···ড্যাগারটা বের করবার জন্যে পকেটে হাত ঢুকিয়েছি···প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আসরারের লোহার পাঞ্চ লাগান মুঠোটা আমার ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানল। চাকুটা বের করে আনবার আগেই—আসরারের দ্বিতীয় ঘুষিতে—মনে হল—আমার সমস্তটা চোয়াল খসে পড়েছে।—দু-তিনটে চেয়ার সঙ্গে করে ফ্লোরের উপর লুটিয়ে পড়লাম আমি।

চেতনা লোপ পাবার সেকেণ্ড কয়েক আগে কলিমুল্লা, আস্‌রার আর জীনাত সুলতানার কয়েকটি সংলাপ আমার কানে এসেছিল :

কলিমুল্লা—হারামজাদার সাহস কত? বাঘের গর্তে মাথা ঢুকাইছে। এখন বোঝো। জীনাত দূর আসু ভাই। এত জোরেই মারতে হয়? মরে যাবে না ত? আসরার—আমার আর সময় নেই·জিমু—। আমাদের ক্লাবে আজ এক নিগ্রো বক্সার এসেছে। ওর সঙ্গে আমি ছাড়া আর কে লড়বে বলো। সি ইউ টুমরো।

—কী আশ্চর্য—কী আশ্চর্য—এ আমি কোথায় এলাম।···চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। মাঝে মাঝে কী দুর্ভেদ্য জঙ্গল? এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে—ভয়ংকর শব্দ করে যাচ্ছে এক তীব্রস্রোতা নদী। সে নদীতে কি বিরাট বিরাট কুমির, হাঙর, জলহস্তী···বাপরে—মাঠের দুর্বাঘাসগুলো দেখেছ?—কেমন তরোয়ালের মত ধার—ইস্! কী সর্বনাশ!—পাহাড়ের মত গিরগিটিটা আমার দিকেই এগিয়ে আসছে না!—গিরগিটি নয়, গিরগিটি নয়—ডাইনোসর। ডাইনোসরের গল্প আমি ছেলেবেলায় ভূগোলের বইয়ে পড়েছিলাম—ছবিও দেখেছিলাম।—ডাইনোসরটা আমার দিকে দৌড়ে আসছে।—একি?—আমার গা-ভর্তি এত লোম কেন?—নখগুলো কেন এমন পাগলা কুকুরের মত।···আমি ভেড়ার ছালের পোশাক পরেছি নাকি?—বাঃ বাঃ—আমার হাতে এই চমৎকার পাথরের বর্শাটা আবার কে দিয়ে গেল?···

···আমি প্রাণপণে দৌড়ে চলেছি এবার বরফে-ঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে।—পেছনে ছুটে আসছে সেই মূর্তিমান-বিভীষিকা,—সেই পর্বতদেহী-কদাকার ডাইনোসর।

হঠাৎ কখন জানিনা,—দেখি আমি বিরাট কাঠের কপাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। পাহাড়ের মধ্যে বার্নিশ করা শক্ত কাঠের পাল্লা। তাতে চকচকে দুটো পেতলের আংটা লাগানো।···আংটা ধরে টান দিতেই পাল্লাটা খুলে গেল।—অন্ধকার ঠাণ্ডা-স্যাঁতসেঁতে একটা গুহা। আমি সেই আঁধার গুহার মধ্যে ঢুকে—ভেতরে থেকে পাল্লা বন্ধ করে দিলাম ক্ষিপ্রহাতে।···

বাইরে সেই অতিকায়-ডাইনোসরের সে কি আস্ফালন।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

লাইনের ধারে □ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

এক এক সময় ঝিমোনি আসে বইকি। মনে হয় তখন, চরাচরে আর কোনো শব্দ নেই, কোনো কিছুর নড়াচড়া নেই। যেন কবে কারা পাথরের খোয়ার ওপর সারি সারি কাঠ বিছিয়ে পেরেক ঠুকে ঠুকে লোহার লাইন দুটো বসিয়ে দিয়ে গেছে, তারপর আর খোঁজখবর নেয়নি, তারপর রোদে পুড়ে পুড়ে জলে ভিজে ভিজে ঝকঝকে ইস্পাত ময়লা হতে হতে এখন লালচে রং ধরেছে। অথবা যেন শুকনো গাছের ডালের চেহারা, চমৎকার মুড়মুড়ে হয়ে আছে। পায়ের চাপ পড়লেই মট করে ভেঙ্গে যাবে।

এসব মনে হয়, যখন মাথার ওপর জবরজং ইলেকট্রিক তার লাগান কোনো খুঁটির আগায় চুপচাপ একটা ফিঙ্গে বসে থাকে, যখন ওপারের ঝাঁকড়ামাকড়া বেঁটে কুলগাছের ঝোপের ভিতর দুটো একটা শালিক বুলবুলি পাখা ঝাপটায় কি ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে একটা আর একটাকে আদর করে।

এসব মনে হয়, যখন আপ বনগাঁ লোক্যাল কি ডাউন কৃষ্ণনগর প্যাসেঞ্জার পেয়ালার মতন নিটোল চকচকে আকাশটাকে মুগুরের বাড়ি মেরে মেরে চুরমার করে দিয়ে বাতাস থেঁতলে দিয়ে ভূমিকম্পের শব্দ তুলে সাঁ করে চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার পরের বিরতি সাত মিনিটের অপার স্তব্ধতা, অর্থাৎ যতক্ষণ না আর একটা ট্রেন, হয়তো কল্যাণী লোক্যাল, আবার আকাশ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, কাগজের কুচির মতন চারদিকের বাতাস ওড়াতে ওড়াতে ঝড় তুফানের শব্দ করে চোখের পলক ফেলার আগে হু হু করে ছুটে আসে।

কাজেই এই মনমরা ঝিমোনি ভাবটার আয়ু অত্যন্ত কম। সাত মিনিট, পাঁচ মিনিট বা তিন মিনিট।

তাতেই মনে হয় কোনো কালে এ লাইনে গাড়ি আসে না। সব চুপচাপ-নিঝুম। ইলেকট্রিক খুঁটির আগায় ফিঙ্গে বসে রোদ পোহায়, কুল ঝোপের ভিতর শালিক শালিকনী সঙ্গোপনে রতিক্রীড়া সেরে নেয়। এপারের ধানক্ষেতে চাষীরা কাজ করে, ওপারের সরষে ক্ষেতে ফড়িং ওড়ে। মনে হয় একটা বিরাট আলস্য, প্রাগৈতিহাসিক মন্থরতা নিয়ে জায়গাটা ধুঁকছে, আকাশে রোদ থাকলে একটু যদি হাসে, মেঘলা দিনে বড় বড় হাই তোলে। কুয়াশা থাকলে অবশ্য আর চেনাই যায় না, তখন মনে হয় একটা অচেনা অনামা বালিয়াড়ি কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে আড় হয়ে শুয়ে আছে, কোথায় গেল এত এত থাম খুঁটি লোহা তার কাঠ পাথরের নুড়ি, সব ধোঁয়া হয়ে গেছে, পাক খেয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠছে, আর কিছু না।

সে যাই হোক, সেদিন প্রচুর রোদ ছিল, কাঁসার বাসনের মতন আকাশ ঝকঝক করছিল, হাওয়ায় একটা বসন্তের ভাব ছিল, মাঘের শেষ, মাঘের দুপুর, ফিঙ্গেটা নাচছিল, শালিক দুটো ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সরষে ক্ষেত ছেড়ে ফড়িংএর ঝাঁক রেল লাইনের ওপর এসে ওড়াউড়ি করছিল।

একটা বিশেষ দিনের ঘটনা, আর বেছে বেছে ব্যাপারটা কিনা ঠিক এখানটায় ঘটে গেল। এই জন্যই জায়গাটার এত ভূমিকা। ওদিকে পোল, পোলের নিচে খড়বোঝাই নৌকো ও একটা ভাঙ্গা লঞ্চ নিয়ে খালের জল বালির বিছানায় লেপটে গিয়ে ফিকফিক করে হাসছিল, রোদালো দিন বলেই এই ছেনালি হাসি, মেঘলা দিনে কি করত ঈশ্বর জানে। হুঁ, খাল, খালপোল আর বাঁয়ে ডালের বড়ির মতন একরত্তি স্টেশন, তা আকারে এইটুকুন হলে কি, ভয়ানক নামডাক উল্টাডাঙ্গা রেল স্টেশনের, মেলাই মালিমামলা ঘটনা অঘটনের সাক্ষী হয়ে তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

কিন্তু ঘটনাটা স্টেশনে ঘটল না, পোলের কাছেও না, ঘটল এই ফাঁকা লাইনের ওপর, হয়তো শালিক দুটো দেখেছে, ফিঙ্গেটা দেখেছে। আর—

আর কে দেখবে। যদি ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে থাকে তো ট্রেনের মানুষ?

গাড়িটা হয়তো দাঁড়ায়নি। খোলা দরজা দিয়ে একটা বোঁচকা পড়ে গেল কি একটা মানুষ পড়ে গেল আর সব যাত্রীদের তা জানতে বয়ে গেছে। যেমন সাঁ সাঁ করে গাড়ি ছুটে আসছিল, ছুটে চলে গেছে। হয়তো ভিতরে গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে ক'টি মানুষ তখন তাস খেলছিল, তাসের দিকে চোখ ছিল তাদের, কেউ টুপ করে পা ফসকে কি হাত ফসকে মাঝপথে খোলা দরজা দিয়ে গাড়ি থেকে পড়ে গেল কিনা তারা খেয়ালই করেনি।

'বা ওই বগীতে আর কোনো প্যাসেঞ্জারই হয়তো ছিল না, একলা এই মানুষটাই

ছিল—অফিস টাইম হলে তবু কথা ছিল, এখন ভরদুপুর, কত ফাঁকা ট্রেন হরদম যাচ্ছে আসছে।'

'কিন্তু কোন্ গাড়িটা ?' সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রশ্ন তুলল। 'এইমাত্র তো ডানকুনি চলে গেল, তার দু মিনিট আগে ডাউন শান্তিপুর লোক্যালটা ওদিক থেকে ছুটে এসেছিল।'

'মশাই, তার ঠিক এক মিনিট আগে নৈহাটি পাস করেছে।'

'কিস্সু খবর রাখেন না আপনারা।' তিনজন কথা বলছিল। আর একজন এসে তখনি কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াল। বয়স্ক মানুষ, কাঁচা পাকা চুল নিয়ে এক বুড়ো বলল, 'আপ ডাউন দুটো গাড়িই তো উল্টাডাঙ্গায় ক্রশ করল। শান্তিপুর দাঁড়ায়নি। নৈহাটি দাঁড়িয়েছে। আমি নৈহাটির ট্রেন থেকে টুপ করে এখানে নেমে পড়লুম।'

'ডব্লিউ টি নাকি।' পিছন থেকে এক ছোঁড়া টিপ্পনী কাটল। একটি না, তিনটি ছোঁড়া কোথা থেকে ছুটে এসেছে।

'এই, ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো।' বুড়ো চোখ লাল করার মতন করে ওদের দিকে তাকাল। কিন্তু ঘোলা চোখে তেমন একটা রক্ত জমল না, এই জন্যই বেশি করে কেবল মাথাটা ঝাঁকাল। 'দেখলেন, শুনলেন মশাইরা, এদের কথাবার্তার আগল আছে কিছু।' প্রবীণরা কিন্তু চুপ করে রইল।

'প্ল্যাটফরমের গেট দিয়ে না বেরিয়ে এদিক দিয়ে এসেছেন তো, তাই সন্দেহ হচ্ছে।' আর এক ছোঁড়া সঙ্গে সঙ্গে বলে বসল।

'শুনলেন, শুনলেন মশাইরা।' বুড়ো আবার তিনটি প্রবীণ ভদ্রলোকের দিকে ঘাড় ফেরাল। 'সল্ট লেকে আমার প্লট কেনা আছে, ভাবলুম গেট দিয়ে বেরোলে অনেকটা রাস্তা ঘুরতে হবে, তাই সোজাসুজি লাইনের ধার ধরে চলে এসেছি, এখন মাঠ পার হয়ে আমার জমিতে চলে যাব।'

'যান মশায়, আপনার জমিতে চলে যান।' একজন সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করল। 'একটা লোক কাটা পড়েছে, আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া শুরু করলেন!'

তাই তো, লোকটা কাটা পড়েছে, কখন কাটা পড়ল ? কখন আবার পড়বে এখনই পড়েছে, এই মাত্র তো ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছিল, এখন টিপটিপ করে ঝরছে, এখনও মানুষটা চেয়ে আছে, কালোয় খয়েরীতে মেশান চোখের তারা।

'শরীরটা এখনো নিশ্চয় গরম আছে, হয়তো শ্বাস পড়ছে।' ছোকরাদের একজন আর একজনের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল।

'দূর দূর, শ্বাস পড়বে কি, দেখছিস না বুকের পাঁজর থেঁতলে গেছে, একটা হাত উড়ে গেছে। এর পর আর শ্বাস পড়তে পারে!'

'ডানকুনি লোকাল থেকেই পড়ে গেছে।'

'শান্তিপুর থেকে পড়তে পারে।'

'উহুঁ উহুঁ, নৈহাটির গাড়ি থেকে মানুষটা পড়েছে।'

'না না, নৈহাটির গাড়িতে আমি ছিলাম।' সেই বুড়ো হঠাৎ গলা উঁচু করে বলল, 'বেলঘরিয়া থেকে আমি জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে এসেছি কখন উল্টাডাঙ্গা স্টেশন আসে, একটা প্যাসেঞ্জার দরজা দিয়ে গলিয়ে নিচে পড়ে গেলে ঠিক আমার চোখে পড়ত।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়াদের একজন মন্তব্য করল, 'আপনি হয়তো ওপাশটা দেখতে দেখতে আসছিলেন। লাইনের এপাশে লোকটা পড়েছিল, দেখতে পাননি।'

'মোটেই না, আমার চোখ ছিল ইদিকটায়। এ পাশের জানলা দিয়েই আমি বরাবর মুখ বাড়িয়ে ছিলাম।'

'মুখ বাড়িয়ে থাকলে হবে কি, চোখ ছিল মাঠের দিকে, কখন সল্ট লেক আসে, গঙ্গার বালি দিয়ে ভরাট করা জমি আসে, জানলা দিয়ে তাই তাকিয়ে দেখছিলেন। গাড়ি থেকে কেউ ছিটকে নিচে পড়ে গেল কিনা আপনার চোখে পড়বে কেমন করে।'

'দেখ, আমার সঙ্গে তক্ক করো না ছোঁড়া।' আবার চোখ লাল করতে চেষ্টা করল 'নৈহাটির ট্রেন থেকে কোনো প্যাসেঞ্জার পড়ে গিয়ে এই অ্যাকসিডেন্ট হয়নি, আমি হলফ করে বলতে পারি।'

'ঘোলা চোখ দিয়ে সব কি আর আপনি দেখতে পেয়েছিলেন দাদু, নৈহাটির গাড়ি থেকেই লোকটা ঠিক পড়েছে।' পিছনের ছোঁড়া তার সঙ্গীদের দিকে চোখ ফিরিয়ে ঘাড় কাত করল। 'কি বলিস জগা, কি বলিস হারু?'

'বটেই তো, বটেই তো।' জগা হারু একসঙ্গে মাথা নাড়ল, তারাও এক সঙ্গে তখন বলল, 'ঘোলা চোখে সব কিছু কি আর দেখা যায় দাদু, ব্ল্যাকের পয়সায় কেনা নিজের জমি ছাড়া আর কিছু নজরেই আসে না।'

'এঁ্যা, আমার ব্ল্যাক মানি, আমার ঘোলা চোখ, আমার···আমার আইসাইট এখনো যে কোনো যুবকের চেয়ে তেজী, আমি কালোবাজারী ব্যবসা করি না, আমি অ্যাডভোকেট, উকিল, সারা জীবন ওকালতি করে···'

'মশাই, আবার আপনি ছেলেছোকরাদের কথায় নাচানাচি শুরু করলেন, এখানে একটা জীবন নষ্ট হয়ে গেল, মানুষটা মরে পড়ে আছে, আর আপনি কিনা—'

উকিল বুড়ো চুপ। ছেলেছোকরারা আর কথা বলল না। সকলের চোখ লাইনের দিকে। কাটা মানুষটার মাথাটা স্লিপারের উপর, শরীরটা এ পাশের পাথরের খোয়ার ওপর, পা দুটো নিচে ঘাসের ওপর ছড়ান। পায়ের এক পাটি চটি ছিটকে এধারের তারের বেড়ার কাছে চলে এসেছে। আর একটা চটি পায়েই লেগে আছে। ডোরা-কাটা ছিটের শার্ট গায়ে, পরনে আধময়লা ধুতি, নাকের ছিদ্র দুটো বেশ মোটা, নস্যি নেওয়ার অভ্যাস থাকলে যেমন হয়, নাকের ভিতরের সাদা কালো চুল দেখা যাচ্ছিল, খুব একটা বড় শরীর না, বেঁটেখাটো, এখন কাটা পড়েছে বলে না, যেন আগে থাকতেই চোখে মুখে একটা ক্লান্তি, একটা ঘোর দুশ্চিন্তার ছাপ ঝুলছিল। অর্থাৎ চেহারা ছবি দেখে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল, আর্থিক অনটন মানসিক কষ্ট হতাশা আত্মগ্লানি শূন্যতাবোধ ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়ে যেন লোকটা ভুগছিল।

তাকিয়ে থেকে থেকে সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটা মৃত্যু সামনে নিয়ে ক'টা মানুষ স্থির নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে জায়গাটা যেন আরো নির্জন, শ্মশানের মতন ভয়াবহ মনে হতে লাগল। অথচ কয়েক পা এগিয়ে গেলেই উল্টাডাঙ্গা স্টেশন, সেখানে যাত্রীরা ছুটোছুটি করছে, চা পান সিগারেট নিয়ে ফেরিওয়ালারা হাঁকাহাঁকি করছে। এখানে এই ভরদুপুরেই যেন মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। ইলেকট্রিক খুঁটির মাথায় ফিঙেটা সরু গলায় একবার কিরকির শব্দ করে আবার থেমে আছে। মাঘের জলজলে রোদে ফড়িংগুলিই যা একটু ব্যস্ততা নিয়ে মাথার ওপর ঘোরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু তারা তো আর কথা বলতে পারে না। বোবা হয়ে শূন্যে পাখা নেড়ে নেড়ে নিচে লাইনের কাটা মানুষটাকে দেখছিল।

এদিকে দর্শকের সংখ্যাও বেড়েই চলল। একটা কিছু হয়েছে বুঝতে পেরে মাঠের কাজ ফেলে চাষীরা ছুটে এসেছে। দূরে পোলের কাছে কুলিরা কাজ করছিল। গাঁইতি শাবল ফেলে রেখে তারাও চলে এসেছে। উল্টাডাঙ্গার সড়ক ধরে যারা হাঁটছিল, লাইনের ওপর ভিড় দেখে ব্যাপার কি জানতে পড়িমরি করে রেল লাইনের উঁচু পাড়ের ওপর উঠে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। ছিল আটজন, তিন-চার মিনিটের মধ্যে একশ' মানুষের এক বিরাট জনতা একটাও কথা না বলে ফ্যালফ্যাল করে রেলের চাকায় কাটা পড়া হতভাগা মানুষটাকে দেখতে লাগল।

যেন সবাই ভাবছিল রেলগাড়ি আমাদের যেমন সুখসুবিধা দিচ্ছে, তেমনি কষ্টও কম দেয় না। বিশেষ, ইলেকট্রিক হবার পর, গাড়ির যেন পাখা মেলেছে। এমন সাঁই সাঁই করে ছুটে চলে—একটু অন্যমনস্ক হয়ে দরজায় দাঁড়িয়েছ কি হাওয়ার টানে তুমি

কখন যে বাইরে ছিটকে পড়বে টেরও পাবে না। আর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সড়াং করে চাকার তলায় চলে যাবে। এর মধ্যে আর কিন্তুটিন্তু নেই।

ভাবছিল তারা, হঠাং বাতাসের গুমগুম শব্দ তুলে ভূমিকম্পের মতন পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে ও-পাশের লাইন দিয়ে একটা গাড়ি, সবুজ সাদায় রং করা, উল্কার বেগে ছুটে চলে গেল। 'দার্জিলিং মেল', গাঢ় চাপা গলায় ভিড়ের মধ্যে একজন বলল, 'উল্টাডাঙ্গার মত ক্ষুদে ইস্টিশনে এ গাড়ি দাঁড়ায় না।'

কেউ শব্দ করল না। কেন না দার্জিলিং মেল নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না। সবাই ভাবছিল এই মানুষটার কথা।

'কোথা থেকে আসছিল কে জানে।' একজন মিনমিনে গলায় কথা বলল।

'যদি টিকেট কেটে গাড়িতে উঠে থাকে তো জামার পকেটে ওটা থাকবে।' আর একজন তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করল। 'টিকিট দেখলেই বোঝা যাবে কোথা থেকে আসছিল, কোথায় যাচ্ছিল।'

'তা তো আর আমরা পারছি না, সেটা পুলিশের কাজ।'

'পুলিশ এখনি এসে যাবে।'

'সঙ্গে টাকা পয়সা আছে কিনা কে জানে।'

'মনে হয় নেই, যেমন না খেতে পাওয়া চেহারা, যেমন জামা-কাপড়—'

'মাপ করুন মশাই, ওকথা বলবেন না। ওই চেহারায় ওই পোশাক নিয়ে হাজার টাকার নোট ট্যাকে গুঁজে চলাফেরা করে এমন বহু দেখা গেছে।'

'ঠিক বলেছেন দাদা, ওপর দেখে কিছু বোঝা যায় না। পকেটে একটা নয়া পয়সা নেই, গায়ে টেরিলিনের জামা, এমন গণ্ডায় গণ্ডায় বাবু চোখে পড়ে। কি বলিস জগা, কি বলিস হারু।' সেই উঠতি বয়সের ফচকে ছোঁড়াদের একজন তার সঙ্গীদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে হি-হি করে হাসল।

'আঃ, যেমন হাঁ করে আছে, মনে হয় প্রাণটা যখন বেরোয় জল খেতে চেয়েছিল।'

'মরবার সময় সকলেই জল চায়।' উল্টাডাঙ্গার সড়ক থেকে যে মানুষগুলি উঠে এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন মুখ খুলল। 'কথায় বলে না, শেষ সময়ে মুখে জল দিতে তার কেউ ছিল না।'

'হুঁ জল দেয়, কানের কাছে মুখ নিয়ে কেষ্টনাম শোনায়। কি বলিস তোরা?' জগা-হারুদের দলের সবচেয়ে ঢ্যাঙ্গা চেহারার ছোঁড়া, গোঁফের রেখা উঁকি দিলেও যার মুখের কচি ভাবটা এখনও ভাল করে কাটেনি, আগ বাড়িয়ে উকিলের সঙ্গে যে তর্ক করছিল, নতুন উৎসাহ নিয়ে এখন হো-হো করে হাসল।

উল্টাডাঙ্গার সড়ক থেকে যারা উঠে এসেছিল তারাও হাসল। চাষীর দল হাসল না, গম্ভীর হয়ে রইল। কুলিরা, যেন লাইনের ওপর এই জিনিস তাদের অনেক দেখা আছে, একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখা শেষ করে তখনি আবার কাজে ফিরে চলল, কিন্তু সকলের আগে যারা এসেছিল সেই প্রবীণের দলটা গুজগুজ করে নিজেদের মধ্যে কিছু একটা বলাবলি করতে লাগল। ধমক খেয়ে মুখ কালো করে উকিল বুড়ো দার্জিলিং মেলটা ছুটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে নেমে সন্টলেকের জমির দিকে চলে গেছে।

'কি দাদা, আমাদের সম্পর্কে কিছু বলছেন নাকি।' এবার জগা সকলের আগে ভদ্রলোকদের দিকে ঘাড়টা ঝুঁকিয়ে দিল। 'উকিল মশায় তো জমি দেখতে মাঠে নেমে গেলেন।'

'না ভাই, তোমাদের সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে না।' প্রবীণের দল হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে কথা বন্ধ করল।

'না, বঙ্কা বলল কিনা, মরবার সময় কানে কেষ্টনাম দিতে হয়, ভাবলাম এতে আপনারা কিছু মনে করলেন।' বোঝা গেল এদের দলের ঢ্যাঙ্গা ছোঁড়াটার নাম বঙ্কা। বঙ্কার সঙ্গে চোখাচোখি হতে জগা ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হেসে নিয়ে আবার প্রবীণদের দিকে ঘাড় ফেরাল। 'উকিল মশায় থাকলে অবিশ্যি এখনি ঝগড়া শুরু করে দিতেন।'

'না না, এতে ঝগড়া করার কি আছে, মনে করারও কিছু নেই', ভদ্রলোকদের একজন বেশ গম্ভীর গলায় বলল, 'সত্যি তো, এমন অজায়গায় অপঘাতে মানুষটা মরল, শেষ সময়ে মুখে জল দিতে কেউ ছিল না, একটু ঠাকুরদেবতার নাম শোনাতেও ধারে-কাছে কেউ ছিল না।'

'তবেই বুঝে দেখুন, মানুষটা কেমন কষ্টের যাওয়া গেল।' জগার মাথার পিছন দিয়ে এবার হারু গলা উঁচিয়ে ধরল। 'আর এমন একটা কষ্টের দৃশ্য চোখের সামনে দেখেও কিনা উকিলবাবু আমাদের সঙ্গে খামকা ঝগড়া করে গেলেন।'

'না না, বুড়োর ঝগড়া করা ঠিক হয়নি।' প্রবীণদের একজন মাথা নাড়ল।

'আমরা তাঁকে কী বলেছিলাম, বলা হচ্ছিল বিনা টিকিটে রেলগাড়ি চড়নেওয়ালা অনেক প্যাসেঞ্জারই চেকারের ভয়ে প্ল্যাটফর্মের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে এভাবে লাইন ধরে ধরে সোজা হেঁটে চলে আসে, তাতে কিনা তিনি ভয়ানক ক্ষেপে গেলেন—'

হারুর কথা শেষ না হতে বঙ্কা বলল, 'কেননা তিনি একটা উকিল, ভাল

জামাকাপড় পরে বেরিয়েছেন, সল্ট লেকে জমি কিনেছেন—এই গর্বে ফেটে পড়ছিলেন, কেমন ?'

'তিনি সুখে আছেন, মক্কেলের ঘাড় ভেঙ্গে পয়সা লুঠছেন—কাজেই', এবার দু হাত নেড়ে জগা বোঝাতে লাগল, 'সংসারে কিছু মানুষকে দুঃখে পড়তে হয়েছে—দুনিয়ার এই হাল, পাঁচটা সুখী মানুষ যেখানে আছে সেখানে দশটা দুঃখী মানুষ তৈরি হবেই—আপনারা লেখাপড়া জানা মানুষ, অস্বীকার করবেন কিনা জানি না।'

'না না, কথাটা ঠিক, খুবই সত্য।' এক সঙ্গে ভদ্রলোকেরা ঘাড় কাত করল।

বঙ্কা বলল, 'ব্ল্যাকমানি বলতেই তিনি খটাং করে রেগে গেলেন, গরীব মক্কেলের ঘাড় মটকে পয়সা উসুল করা কালোবাজারী ব্যবসার চেয়ে কম হল কি, বলুন আপনারা।'

'ঠিক কথা, ঠিক কথা।' উল্টাডাঙ্গার সড়ক থেকে উঠে আসা মানুষদের দুজন সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে দিল। 'উকিল মোক্তার ডাক্তার—সব বেটাদের চেনা হয়ে গেছে, গরীবের রক্ত চুষে সব পেট ফোলাচ্ছে—দেশের এই দুরবস্থার জন্য এরা কম দায়ী নয়।'

'কথাটা অবিশ্যি আমরা মুখে বলি, কারো ওপর দেখে কিছু বোঝা যায় না।' জগার পিছনে না থেকে হারান এবার ভদ্রলোকদের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখ পাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'গায়ে টেরিলিনের জামা—পকেটে একটা নয়া পয়সা নেই, আবার হাঁটু কাপড় পরা ছেঁড়া ময়লা জামা গায়ে—এমন মানুষের ট্যাঁকে হাজার টাকার নোট লুকোনো থাকে—কিন্তু কম, মশাই, খুব কম, পাঁচ শ' মানুষ খুঁজলে এমন একজন আজকের দিনে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আসলে এই মানুষটা দুঃখী ছিল, চোখ মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছেন না ? চটির তলটা ক্ষয়ে গিয়ে কত জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে দেখুন, এমন একটা জুতো পায়ে দিয়ে কেউ রাস্তায় বেরোয় ?'

কাটা মানুষটার পায়ের দিকে আর একবার চোখ রেখে সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আর যেন রক্তটা ঝরছে না।' মিনমিনে গলায় একজন বলল।

'কত রক্ত ছিল ঐ শরীরে বুঝতেই পারছেন।' আঙুল দিয়ে মরা মানুষটাকে দেখিয়ে বঙ্কা বলল, 'হাড্ডি চামড়ায় একশা হয়ে আছে। তিনি যদি উকিল হতেন ডাক্তার হতেন, দেখতেন আপনারা, এখনো পাঁইট পাঁইট রক্ত চুঁইয়ে পড়ত কাটা জায়গাগুলো থেকে।'

'না না দুঃখী ছিল, দেখলেই বোঝা যায়, খেতে না পাওয়া চেহারা।' উল্টাডাঙ্গার সড়ক থেকে উঠে আসা মানুষদের একজন ফোঁস করে একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলল। 'ঐ যেন একটা রেশনের ব্যাগ ওখানে পড়ে আছে।'

'রেশনের ব্যাগ, রেশন ধরবার থলে।' একসঙ্গে এতগুলি গলা শব্দ করে উঠল। একটু দূরে লাইনের গা ঘেঁষে পাথরের খোয়ার ওপর তিন জায়গায় তালি দেওয়া একটা ময়লা চটের থলের ওপর সবগুলি চোখের দৃষ্টি হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'তবে তো বোঝা যায় এখানকারই মানুষ। লাইন পার হয়ে ধারেকাছে কোনো রেশনশপের দিকে যাচ্ছিল।' যেন বেশ ভেবেচিন্তে ভদ্রলোকদের একজন মন্তব্য করল।

'তার কি মানে আছে।' বঙ্কা জগা হারু একসঙ্গে উত্তর করল। 'এখানকার মানুষ হোক, তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু মানুষটা যে চলতি গাড়ি থেকে টুপ্ করে পড়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।'

ভদ্রলোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর তাঁরা জগু ও হারানের দিকে ঘাড় ফেরাল।

'তোমরা কোথায় ছিলে তখন? তোমরা কি ধারেকাছে ছিলে?'

'আমরা ওই গাছতলায় বসে তাস খেলছিলাম।' আঙুল দিয়ে পোলের কাছে পাকুড় গাছটা দেখিয়ে দিল বঙ্কা।

'তা হতে পারে।' উল্টাডাঙ্গার ওদিক থেকে ছুটে আসা মানুষগুলির মধ্যে একজন মাথা ঝাঁকাল। 'হয়তো এখানকারই লোক, হয়তো টাকার অভাবে গেল হপ্তায় রেশন ধরতে পারেনি, বাইরে সস্তায় চালটাল কিনতে গিয়েছিল, কলকাতার চালের বাজারের যা অবস্থা, গরীব মানুষের খোলা বাজারে ওই জিনিস কিনতে যাওয়া আর জেনেশুনে আগুনে হাত দেওয়া এক কথা।'

'আমরাও এখন তাই অনুমান করছি।' জগাও মাথা ঝাঁকাল। 'হয়তো বাইরেও চাল কিনতে সুবিধে না পেয়ে খালি ব্যাগ হাতে নিয়ে ডাউন ট্রেনে মানুষটা ফিরে আসছিল।'

হাত নেড়ে বঙ্কা বলল, 'আর উকিল মশায় কিনা আমাদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে গেলেন, আপ শান্তিপুরের গাড়িতে ছিল মানুষটা, ডানকুনির গাড়িতেও থাকতে পারে। কিন্তু নৈহাটি ডাউনে নাকি কিছুতেই ছিল না।'

ভদ্রলোকদের চোখে চোখ রেখে হারান বলল, 'অথচ দেখুন, সেই সকাল থেকে তিন বন্ধু গাছতলায় বসে তাস খেলছি, কলকারখানা লক আউট হয়ে তিনজনই আজ

চার মাসের ওপর বেকার, কাজেই একটা কিছু করে তো সময় কাটান চাই, হুঁ, তিনজন ওই পোলের ধারের পাকুড়তলায় বসে খেলছিলাম। হঠাৎ যেন দেখলাম নৈহাটির গাড়িটা পাস করার সঙ্গে সঙ্গে লাইনের ধারে সাদামতন কিছু একটা পড়ে আছে। তখনি হাতের তাস ফেলে রেখে আমরা এখানে ছুটে এসেছি।'

'না না, তোমরা যখন নিজের চোখে দেখেছ, এটাই রাইট, নৈহাটির গাড়ি থেকে মানুষটা পড়ে গেছে।' ভদ্রলোক ক'জন একসঙ্গে ঘাড় নাড়ল। 'আমরাও অবিশ্যি তখন হেঁটে এ পথে আসছিলাম, প্রথমটা লাইনের দিকে চোখ ছিল না। পরে দেখলাম একটা মানুষ কাটা পড়েছে।'

'আমার তো মনে হয়।' হারান আবার বলল, 'উকিলমশায় যে-কামরায় ছিল, এই অভাগাও সেই কামরায় ছিল, অভাবে অনটনে এমনি তো মানুষটার মাথার ঠিক ছিল না, তা ছাড়া এক আধ কেজি চালের জন্যে কত জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল তার ঠিক কি, হয়তো গাড়িতে উঠে একটু বসতে চেয়েছিল, কিন্তু উকিল মশায়ের জন্য সুবিধা করতে পারেনি, তিনি একাই তিনজনের জায়গা দখল করে ছড়িয়েটড়িয়ে বসেছিলেন, হয়তো বেলঘরিয়া থেকে এইটুকুন পথ আসতে লাটসাহেবের শোবার দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'তাই তো', উল্টাডাঙ্গার রাস্তা থেকে উঠে আসা দলের মধ্যে একজন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল। 'এই জগতে যখনই একটা মানুষ ষোল আনা সুবিধা ভোগ করবে, তখনই বুঝতে হবে বাকি তিনটা মানুষ কষ্টভোগ করছে, হয়তো বসতে না পেয়ে বেচারা খোলা দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, অভাব নিয়ে দুঃখ নিয়ে রোগা শরীরের ক্লান্তি নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে জানা কথা, তারপর এক সময় গাড়ির একটু ঝাঁকুনি লাগল, আর টুপ করে নিচে পড়ে গেল।'

'ইলেকট্রিক ট্রেন'। তাদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করল, 'অসম্ভব স্পীড, কাজেই বাইরে ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার টানে মানুষটা চাকার তলায় চলে গেল।'

'চাকার তলায় চলে গেল।' জগা বক্সা উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'কাজেই আপনারাও এখন বুঝে দেখুন, যদি বলা হয় ওই শকুনিটা, স্বার্থপর উকিলটাই মানুষটাকে মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছিল তো কি ভুল বলা হবে।'

'মোটেই না, মোটেই না।' স্লোগান তোলার মতন আওয়াজ করে উঠল উল্টা-ডাঙ্গার রাস্তার মানুষগুলি।

হাতের বদ্ধমুষ্টি শূন্যে নাচিয়ে হারাণ বলল, 'অভাব নিয়ে দুঃখ নিয়ে মানুষটা হয়তো আরো কিছুদিন যুদ্ধ করে যেত, কিন্তু একটা শয়তান ষোল আনা নিজের সুখ দেখতে গিয়ে অকালে মানুষটাকে—'

ঠিক এই সময় হারানের গলার স্বর চাপা পড়ে গেল। ছেঁড়া কাগজের কুচির মতন হাওয়া উড়িয়ে উড়িয়ে, ঝড়ের শব্দ করে মাটি কাঁপিয়ে বারাসত লোকাল পার হচ্ছিল। গাড়ি অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার দু' মিনিট তিন মিনিট কি পাঁচ মিনিটের জন্য সেই ভয়ঙ্কর থমথমে ঝিমোনির ভাবটা ফিরে এল। কারো মুখে শব্দ ছিল না। যেন এত বড় একটা শক্তি, তার অবিশ্বাস্য উদ্দাম গতি দেখে সব কটা মানুষ বোবা বিমূঢ় বিষণ্ন হয়ে রইল।

ফিঙেটা আর একবার কিরকির করে ডেকে উঠল। ফড়িংগুলো মাথার ওপর থেকে সরে গেছে। যেন ঝড়ো হাওয়ায় বাড়ি খাবার ভয়ে তারা আগেভাগে পালিয়ে গেছে। দুটো মাছি কাটা মানুষটার কপালের কাছে ওড়াউড়ি করছিল। এর আগে মাছি ছিল না।

'আপনারা আর ভিড় করে থাকবেন না, সরে যান, পুলিশ আসছে।' ভদ্রলোক-দের মধ্যে একজনের চাপা গম্ভীর গলার স্বর শোনা গেল।

তাই তো, পুলিশ! সকলের চোখ একদিকে সরে গেল। স্টেশনের ওদিক থেকে সাদা পোশাকপরা ভুঁড়ি মোটা দুই মূর্তি লাইনের ওপর দিয়ে বুটের ঠকঠক শব্দ করে শ্লিপারের গায়ে হাতের লম্বা লাঠি ঠুকে ঠুকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

'চৌদ্দ ঘণ্টা পর কর্তাদের টনক নড়ল।'

'হুঁ', চাপা গলায় আর একজন বলল, 'আবার চৌদ্দ ঘণ্টা পার হলে ইন্সপেক্টার আসবে খাতাপত্র বগলে নিয়ে।'

'কেন খাতাপত্র কেন?' উল্টাডাঙ্গার দলটার মধ্যে একজন আর একজনকে প্রশ্ন করছিল।

'বাঃ, লোকটা কে, কোথা থেকে এল, কি নাম, কোথায় বাড়ি, কেউ চেনে কিনা বা গাড়ি থেকে পড়ে যেতে কেউ দেখেছিল, না কি শত্রুতা করে মানুষটাকে কেউ ধাক্কা দিয়ে চলতি ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছিল, না এঞ্জিনের মুখে নিজেই লাফিয়ে পড়েছিল, সব লিখেটিখে নিতে হবে যে।'

'তাই তো', আর একজন গম্ভীর হয়ে বলল, 'কতভাবেই তো মানুষ ট্রেনে কাটা পড়ে, কাজেই সঠিক খবর জানতে পুলিশকে সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করতে হয় বইকি।'

'হুঁ', নিয়মটিয়ম যা আছে সবই পালন করা হবে, নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে না—তবে কিনা গতি বড় মন্থর', বলতে বলতে একজন নাকের নিচে হাসল। 'সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় হবার পর আবার চৌদ্দ ঘণ্টা পার হবে, তারপর যদি লাস তুলে নিয়ে মর্গে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, মানে রোদটুকু আর থাকবে না, তখন আকাশে তারা উঠবে।'

'থাক, আপনারা আর ভিড় করে দাঁড়াবেন না, আমরা কেউ যখন কিছু জানি না, কিছু চোখে দেখিনি, সরে পড়া ভাল।' বলে ভদ্রলোক ক'জন সোজা একদিকে হাঁটা ধরল। উল্টাডাঙ্গার সড়ক থেকে যারা উঠে এসেছিল তারাও আর দাঁড়িয়ে থাকল না। লাইনের উঁচু পাড় ছেড়ে নিচে নেমে গেল। চাষীরা আগেই মাঠে নেমে গিয়েছিল, সেই বারাসত লোক্যাল যখন চলে যায়।

'আয়।' বঙ্কার হাত ধরে জগা টানল।

হারান বলল, 'বড্ড জলতেষ্টা পেয়েছে রে।'

লাইনের পাশের বনতুলসীর ঝোপ ঠেলে তিনজন পাকুড়গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল।

হারান ও জগা গাছের মোটা গুঁড়িটার ওপর বসে পড়ল। বঙ্কা বসল না। মুখটা ঘুরিয়ে রেখেছে, সেই লাইনের দিকে তার চোখ। চোখের পলক ফেলছিল না।

'এখান থেকেই হাত তুলে পেন্নাম কর, চলে যখন গেছে তুই আর করবি কি।' বঙ্কার দিকে চোখ তুলে জগা বলল, 'ওখানে বুড়োর পা ছুঁতে গেলেই কিন্তু লোকে টের পেয়ে যেত। কি বলিস হারান?'

'তাই তো।' হারান থুতনি নাড়ল।

কিন্তু বঙ্কা কপালে হাত ঠেকাল না। গুম হয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। যেন মনে হল একটা কান্না, কান্নার সঙ্গে রাগ, একটা আক্রোশ তার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠে গলার কাছে এসে ঠেকে আছে। চোয়াল দুটো শক্ত করে রেখেছে।

'বিড়ি খা, বঙ্কা।' হারান হাত তুলে তাকে বিড়ি দিতে গেল। বঙ্কা শুনল না। এদিকে মুখ ফেরাল না।

জগা হারানের দিকে তাকাল। 'এখন বুঝি বনগাঁ লোক্যালটা আসছে।'

'হু, শব্দ শোনা যাচ্ছে।' হারান কান খাড়া করে রাখল।

কিন্তু ট্রেনটা চলে আসার আগেই বঙ্কা এদিকে ঘাড় ফেরাল। তার চোখ দেখে

জগা ও হারান ঘাবড়ে গেল। জল ছিল না চোখে, জালের বাড়ি খাওয়া কাতলা মাছের চোখের মতন চোখ দুটো লাল হয়ে আছে, চকচক করছে।

'বুঝলি', তার গলার স্বর শুনে বোঝা গেল—কান্নার চেয়ে অভিমানটাই বেশী বুকের ভিতর জমা হয়ে আছে। কিন্তু কথা আরম্ভ করেও বঙ্কা থেমে গেল। বনগাঁ লোক্যাল তখন পার হচ্ছে, এখানের মাটি কাঁপছিল, গাছের গুঁড়ি নড়ছিল।

শব্দটা মিলিয়ে যাবার পর বঙ্কা বলল, 'এভাবে লাইনে গলা দিয়ে মরার কোনো অর্থ আছে? কিন্তু তুমি তো গেলে, আমার মুখে যে চুনকালি পড়ল, আমার যে নাক-কান কাটা গেল—এ আমি এখন কাকে বোঝাব তোরা বল।'

জগা কথা বলছিল না। একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে হারান কান চুলকাচ্ছিল।

'বুঝলি', বঙ্কা আবার বলল, 'যেন তিন চারদিন ধরেই জিনিসটা বুড়োর মাথায় ঘুরছিল। এখন আমি বেশ টের পাচ্ছি। পরশু রাত্রে আমায় বলছিল, ঘরের একমাত্র রোজগেরে ছেলে জোয়ান ছেলে, তুই আজ তিন মাস বেকার বসে আছিস, গোষ্ঠীসুদ্ধ উপবাস করছে, এদিকে পেটে আলসার নিয়ে আমিও এমন ঠেকা ঠেকে গেছি, না পারছি কোন কাজ করতে, না পারছি এক ফোঁটা ওষুধ খেতে—আর কষ্ট সহ্য হচ্ছে না, কোন্‌দিন হয়ত ট্রেনের তলায় গলা দিয়ে আমিই শেষ হয়ে যাব।'

'তো বুড়ো থলেটা সঙ্গে এনেছিল কেন?' ভুরু কুঁচকে হারান প্রশ্ন করল।

'কি করে জানব, কি করে বুঝব বল?' ভেংচি কাটার মতন চেহারা করে রেগে বঙ্কা চুপ করে রইল। তারপর একটু ভেবে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'হয়তো কারো কাছে ধারকর্জ করতে গিয়েছিল, ভেবেছিল দুটো একটা টাকা পেলে বাজার নিয়ে ঘরে ফিরবে, না পেয়ে সোজা রেল লাইনের কাছে ছুটে এসেছে।'

'তুই বেকার, জেনেশুনে বুড়োকে আর কেউ এখন ধার দেয়!' হারান একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'তবু তো তোর বাবা বুড়ো হয়েছিল', জগাও লম্বা করে নিশ্বাস ফেলল। 'আমি যে শালা বিয়ে করে আরো ঠেকে গেলাম। বাচ্চাগুলো কান্নাকাটি করে, বৌ বলছে, গলায় দড়ি দেব, পেটের সন্তান খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে, এ আর আমি চোখে দেখতে পারি না।'

'আমি তো শালা এই ভয়ে বাড়িতেই ঢুকি না', নাকের সামান্য শব্দ করে হারান হাসল। 'মা কান্নাকাটি করে, বাবা গালে হাতে দিয়ে বসে থাকে, কলাগাছের মতন বেড়ে উঠে দুটো বোন রাতদিন ছটফট করছে।'

জগা চুপ। বঙ্কা চুপ।

'অথচ গ্যাখ বঙ্কা', হারান আবার বলল, 'যদি উল্টাডাঙ্গার ওই দলটা টের পেয়ে যেত, ভদ্দরলোক ক'জন জেনে যেত যে, এই তোর বাবা—তখন কত বক্তিমা আরম্ভ হয়ে যেত। হুঁ, সিঁদ কাটতে পারতে বাপু, পকেট মারতে পারতে, গতর ছিল, রিক্সা টানতে দোষ ছিল কি—না হয়, ওয়াগান ভাঙ্গিয়েদের দলে ভিড়ে যেতে, তবু তো বুড়োটা এভাবে বিনি আহারে বিনি চিকিচ্ছেয় কষ্ট পেয়ে এঞ্জিনের তলায় গলা দিতে আসত না।'

'ওপর থেকে এসব বলা সহজ।' চোখ তুলে জগা গাছের পাতা দেখল। 'বাইরে থেকে সব ব্যাটাই এমন উপদেশ দেয়।'

হারানের পাশে বসে বঙ্কা বিড়ি টানছিল। গুমগুম শব্দ করে লালগোলার গাড়িটা যাচ্ছিল। হঠাৎ পিঠ টান করে হারান মাঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

'গ্যাখ গ্যাখ, কে আসছে!'

'শকুনটা, উকিলটা।' জগা ঘাড় সোজা করে ধরল। 'জমি দেখে ফেরা হচ্ছে।'

'যাব নাকি ছুটে? গিয়ে টুঁটি টিপে ধরব? পকেট হাতড়ে ত্ব পাঁচ টাকা যা পাওয়া যায়।' হারান হি-হি করে হাসল।

'যা না', অল্প হেসে জগা একদলা থুথু ফেলল। 'মনে হয় কিচ্ছু নেই সঙ্গে, ফতো উকিল, ওপরেই যা একটু ভড়ংভাড়ং।'

'তা হলেও হাতে একটা ঘড়ি আছে।' হারান চোখ টিপল। 'কি রে বঙ্কা, যাব?'

'পারবি না পারবি না।' হাতের পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে বঙ্কা বড় করে নিশ্বাস ফেলল। 'এসব আমরা মুখেই বলি, কাছে গিয়ে যখন হাত মুখ চেপে ধরব, আর চোখ ঘোলা করে বুড়ো মানুষটা মুখের দিকে তাকাবে, তখন একটা মায়া এসে যাবে, তখন তোর বাবার চেহারাটা তোর মনে পড়বে, আমাদের ঘরের বুড়োটাকে আমার মনে পড়বে, বুঝলি, এসব তোর আমার কম্ম নয়। ঠিক কিনা জগা?'

'তা ছাড়া কি।' গাছের গুঁড়ির সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে জগা আর একটু ঢিলেঢালা হয়ে বসল। চোখ বুজে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'এই জন্যই আমাদের কিছু হবে না, আমরা মরে যাচ্ছি।'

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আনোয়ার আলি সহাস্যে বললে—অ্যাকটিংটা থুয়ে দে শালা, পিছন ফেরালেই তো জানোয়াব আলির মুখে কালি বলে গাল পাড়বি। আমি যা বলবো সাফ সাফ মুখের ওপর, ওসব তোমো তোমো কথা আমার দ্বাবা কখনো হবে না। তোরা গুলতানি মেরে নরক গুলজার কর, আমি ডেরায় চললুম!

আমার সঙ্গীর নাম কানা সাড়ে তিন পাঁট। কানা এবং সাড়ে তিন বোতল দেশীমদ একাসনে পান করতে অভ্যস্ত বলে লোকটি ওই নামেই বিখ্যাত। আনোয়ার আলিব সঙ্গে তার সম্পর্ক বা যোগাযোগের সূত্র আমার অজানা, যতোদূর মনে হয় দুজনের পরিচয় বহুদিনের এবং বহু কীর্তির সঙ্গে উভয়ে জড়িত। কানা সাড়ে তিন পাঁট জিভ উল্টে নাকের ডগা চেটে উরুর উপর একটা হালকা থাবড়া মেরে দুলতে দুলতে বেশ একটু তোষামোদের সুরে বললে—অই শোনো, তুমি চলে গেলে এঁড়ে বাছুরের মতো বাঁ বাঁ করতে করতে গলা দিয়ে খুন ঝরবে যে। দোহাই তোমার ওস্তাদ, একেবারে আঁধারে চুবিয়ে মেরে রেখে যেও না—ধর্মে সইবে না!

আনোয়ার আলি কি মনে করে আবার বসলো। মনে হলো আমাকে কিছু বলবে। পরক্ষণেই ভাবান্তর মুখে খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। বললে, শালার সারা গতরটা যা টাটান টাটাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এক হপ্তা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবো না!

কানা সাড়ে তিন পাঁট রসিকতার সুরে বললে—ওসব ভালো করেই বুঝি। মাদুরে শোওয়া গা ডবল তোশক পেলে টাটাবে না তো টাটাবে কিসে। ইস্ শালার যাকে বলে একদম ফেটে পড়া স্বাস্থ্য, উথলে ওঠা স্বাস্থ্য, চলকে পড়া স্বাস্থ্য, থমথমে টাটানো যৌবন!

—বেশী কপচে কাজ নেই, থাম! কারো গতর টাটানি কারো চোখ টাটানি! আবে শালা কানা, তোর নোলা দিয়ে বুঝি নাল ঝরছে, না রে? মাল ছেড়ে দেখ না, তোর গলাতেই যদি ওই জান্নাতি কবচ লটকে না দিয়েছি তো একবাপের বেটা নই।

—এহ্, একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেলুম আর কি।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বগল চুলকাতে চুলকাতে বললে,—মুফ্‌তে হলে একবার টেস করে দেখতে পারি!

আনোয়ার আলি মুখ ভেংচে বললে,—ওরে আমার লাত জামাইরে! শালার ব্যাটা শালা কানা বলে চক্ষুলজ্জাটাও কি ধুয়ে খেয়েছিস? তবে শোন্ তিনটে জিন্নামার্কা পর্যন্ত দাম উঠেছে, আমি পাঁচটার কমে ছাড়বো না, তার চেয়ে বরং দোলাই খালে ভাসিয়ে দেব। ভেবেচিস মুফতের মাল, ভাগাড়ের শকুন কোথাকার! এ রকম খাঁটি জিনিস তু' দশ বছরে এক আধটা শিকে ছিঁড়ে পড়ে! আবে শালা কানার মরণ, রা কাড়ছিস না কেন?

সাড়ে তিন পাঁট বিমর্ষ হয়ে বললে,—তোমার মুখের ট্যাকসো থাকলে আর এভাবে বলতে পারতে না। যাই বলো তুমি ওস্তাদ বড্ড স্বার্থপর। সাধ্যে কুলায় তোমার এমন কোন কাজটা না করে দিয়েছি বলো, অথচ আমরা কিছু আবদার করলে অমনি ষোলো আনা হিসেব কষতে বসবে। এমন নয় যে নিকে করা বউ, কোথাকার পাখি কোথায় চলে যাবে। আমরা চিরকাল নামেই ইয়ার-বন্ধু থেকে গেলাম!

—ওপ্, তুঃখে একেবারে পেটের পিলে ফেটে যাচ্ছে বুঝি! আজ কি সাড়ে তিন পাঁটের বেশী হয়ে গিয়েছে?

খালি বোতলটা দূরে ঘাসের ওপর সজোরে ছুঁড়ে দিয়ে কানা সাড়ে তিন পাঁট তিরিক্ষি মেজাজে বললে—যাও যাও, নিজের ধান্দায় যাও। বেশী ফ্যাচোর ফ্যাচোর করো না। তোমার কথাগুলো মনের ওপর পেট্রলের টিন উপুড় করে দিয়েছে।

তুলনাটা ভালো লাগলো আমার। কানা সাড়ে তিন পাঁটের মুখে বলেই ভালো লাগলো। আনোয়ার আলি পকেট থেকে একটা রেশমী রুমাল বের করে যত্ন করে মুখটা মুছলো তারপর পেশীবহুল হাত তুটো ওপরের দিকে তুলে আড় ভেঙে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—তাহলে উঠলাম হে, একটা বৈঠক আছে আবার

—বিদেয় হও না, কে তোমায় পাঁজাকোলে করে ধরে রেখেছে।

তারপর প্রকাণ্ড আনোয়ার আলি চলে যেতেই আমার পাশে আরো খানিকটা সরে এসে বললে,—শালার জানোয়ার আলির মুখে কালি। দেখলেন তো কেমন অখাদ্য!

আমি বললাম—ঠিক বুঝলুম না।

—কেন গুরু, অন্য জগতে বিচরণ করা হচ্ছিল বুঝি?

বললাম,—কোনো একটা কিছু ভাবছিলাম নিশ্চয়ই, আবার তেমন কিছু না। তোমার কথা বলো, চুপচাপ ভালো লাগছে না।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে—নির্লজ্জ বেহায়া কি আর গাছ থেকে পড়ে। হনুমানটার কথা শুনলেন, শালার ব্যাটাকে আচ্ছামতো দুরমুশ করা যেতো। কতো জায়গায় যে টিট হয়েছে তার হিসেব নেই, একটা জ্যান্ত শয়তান। মেয়েমানুষ বেচে শালা লাল হয়ে গেলো।

আমি তার মন রক্ষা করার জন্যে বললাম—লোকটাকে আমারও খুব অসহ্য ঠেকেছিলো। তুমি যে রকম তোয়াজ করছিলে প্রথমটায়।

কানা সাড়ে তিন পাঁট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে বললে,—ইস আপনার চোখ একেবারে লাল জবাফুলের মতো হয়ে গিয়েছে, রক্ত ফেটে পড়ছে, বরং স্টপ করে দিন।

আমার বলতে ইচ্ছা করছিলো, এখন ও দুটো আর চোখ নয় ও দুটো আমার টুকরো করা হৃদপিণ্ড, কিন্তু লোকটা বুঝবে না, সুতরাং চুপ থাকতে হলো। আমার মনে যা তোলপাড় করছিলো তাকে পাত্রে ধরে রাখা যায় না, কেননা মধ্যরাত্রির শিকার ভাটিখানার নিঃসঙ্গ এক মাতাল দুমড়ে মুচড়ে একাকার শীৎকার চীৎকার··· গলিত শবের মাংসভক্ষণ এবং কাফন সংগ্রহ শেষ করে ধূর্ত শৃগাল ও নির্বিকার তস্কর কবরখানার বাইরে শীতরাত্রির কৌমার্যে আগুন ধরাবার তুঙ্গ অভিপ্রায়কে উসকে দিয়েছে। কেননা মৃত্যুর মতো ভালোবেসে, দুর্দান্ত দস্যুর মতো উপভোগ করে গুটিকতক জন্মান্ধ খল অবিশ্বাস ও কান্নার মতো স্নিগ্ধ আচ্ছন্ন এবং মুক্ত নগরে গম্ভীর দুর্ভাগ্যের বীথি দুপাশে ফেলে জ্বলন্ত বাদুড়ের মতো প্রকীর্ণ চিহ্নে নিশ্চিহ্ন। কেননা পৃথিবীতে সব মোৎশার্টই মৃত, প্রত্যহের আটলান্টিক ডাকাতিয়া নদী, বিজ্ঞান বিমর্ষ, ঠিক তেমনি ভ্রষ্টা ইহুদী রমণী আজ কোথায় যেমনটি জান হ্যাভাল! কোথায় কোন অনিশ্চিতেই না ভাসমান রুগ্ন আবিষ্কারের স্রোতে। আর পাপের যন্ত্রণা চীৎকার আর্তনাদ দংশনে হন্যে কুকুরের স্বজাতি তথাপি চন্দন কাঠের মূল্যবান প্রাচীন শ্বেত কৌটায় সাজিয়ে রাখতে বলো কি রহস্যময় তোমাদের যাদুঘরে কাঁচের স্বচ্ছ কফিনে।

পাপে দগ্ধ আমার সর্বাঙ্গ। পাপে দগ্ধ আমার—দগ্ধ দগ্ধ দগ্ধ। দগদগে শরীর ছাল ছিলে অর্ধ-উন্মাদের মতো নিজেই খাই। তারা যখন কালো পাপের, অতি অন্তরঙ্গ অতি সুস্বাদ স্তূপের—রক্তপ্রবাহী চিহ্নগুলো কালো কালির আচড়ে লিখে নেয় তখন অতি স্বার্থপর নিঃসঙ্গ এবং স্তম্ভিত শয়তানও চীৎকার করে ওঠেন, আমাকে অন্ধত্ব দাও, আমাকে অন্ধত্ব দাও, আমাকে অন্ধত্ব দাও।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে,—তুমি গুরু দেখে নিও, ও শালা বাঁদরমুখো জানোয়ার আলির মোষের মতো শরীর আমার ট্রাকের তলায় পড়ে একদিন ছাতুছানা না হয়ে যাবে না। শালার যে সে ট্রাক নয় একেবারে সাতটনি মার্শেলাইজ বেনচি! গুরু একটা কথা বলি কিছু মনে কোরে বসো না যেন আবার, আমি কিন্তু তোমাকে তুমি বলেই বলছি—আচ্ছা তোমরা তো সব লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক, এ সব নোংরা আস্তাকুঁড়ে পা রাখতে তোমাদের সংকোচ হয় না?

আমি বললাম,—শিক্ষিত লোকদের ওই একটা মস্তবড় গুণ, দুনিয়ার সব জায়গাই তাদের চেনা হয়ে যায়, সহজে সব জায়গাতেই গা ছেড়ে বসতে পারে। তোমাদের দুনিয়ার বাইরে তোমরা অচল!

—তা যা বলেচ গুরু। একবার চ্যাং চ্যাং চ্যাং হোটেলে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলো তোমারই মতো একজন, আমার সে কি কাঁপুনি ভিতরে ঢুকে, কিছুতেই আর মুখ তুলে বসতে পারিনে। তা গুরু চলো উঠি। হারামখোরের ব্যাটারা পাততাড়ি গুটোতে শুরু করে দিয়েছে।

আমি অনুনয়ের সুরে বললাম,—এখনই ঘরে ফিরতে চাই না, আরো কিছুক্ষণ থাকো না আমার সঙ্গে। অন্য কোথাও চলো যেখানে সারারাত কাটানো যায়, খরচ আমি দেবো।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে—আজ অনেক খসেছে, আবার কেন?

—ওসব কিছু নয়।—আমি বললাম,—এই যে তুমি আমাকে সঙ্গ দিচ্ছ, আমার কাছে কিন্তু এটাই বড়, আর কাছে আছে বলেই ওড়াচ্ছি, যখন থাকবে না তখন আসবো না।

—যাই বলো গুরু, তোমাদের বুঝতে যাওয়াটা একটা মস্ত ফ্যাসাদ। চলো কোথায় যাবে।

সব দৃশ্যকে তখন চাঁদ গিলে খাচ্ছে। সুখ নামক অদ্ভুত এক রোগের মড়কে সারা ঢাকা শহর উজাড় হয়ে গিয়েছিলো বহু আগেই। ল্যাম্পপোস্টের গোড়ে গোবর লেপটে যাওয়ায় মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো বুঝিবা পৃথিবীর কাঁচা মাংসের ওপর দিয়ে হেঁটে

চলেছি। রসালো রাত্রিটাকে কারা যেন নিংড়ে তার সবটুকু রস বের করে নিয়ে চারপাশে ছত্রাখান করে রেখে গিয়েছে শুধু নীরস আঁশ।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বগলার ধোঁয়া ছেড়ে বললে,—বুঝলে গুরু, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে শালার হাড়-হাবাতে জানোয়ার আলিটার কলজে বের করি। কাফেরটার ধর্ম বলে কিছু নেই, পয়সা তো রাস্তার হাজা মজা হুলো ভিখারীগুলোও রোজগার করে, অমন পয়সায় আমি মুতে দেই। গাঁ-গেরামের মেয়েমানুষকে গায়েব করে বেমালুম দু'একশো টাকায় বেচে দিচ্ছে, লাখ টাকা দিলেও আমরা বাপু অতোটা নিচে নামতে পারবো না, হ্যাঁ।

কানা সাড়ে তিন পাঁট এই ভাবে অনর্গল বলা শুরু করলো। আনোয়ার আলিকে নিয়ে তার কথার তুবড়ী যেন আর ফুরোতেই চায় না। আমি ভাবছিলাম সন্ধ্যাবেলার কথা যখন আমার ভিতরটা এমন ভাবে গুমরে উঠেছিলো যে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। মনে হয়েছিলো কষ্টের একটি করুণ শীর্ণ নাম-না-জানা নদী আমাকে ভয়ংকর অনিশ্চিতের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, আমি এমন অসহায় এমন নিরুপায় এমন রুগ্ন যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি তেমন শক্তি নেই। কি করবো, কোথায় যাবো, যেন বিদীর্ণ হতে চাই, যেন এক খাবলা আকাশ ছিঁড়ে নিয়ে কারো মুখে ছুঁড়ে মেরে শান্তি পাবো, এই সব মনে হয়েছিলো। সন্ধ্যাদেবী দরোজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি বের হতেই রহস্যময় আবরণের ভিতর থেকে তার অপরূপ হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, মুখে কিছু না বলে আকাশের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলতে চাইলেন এক একটি তারার এক একটি স্বতন্ত্র অর্থ আছে, ওই সব অর্থ জানতে যেও না। তারপর আমাকে ভাঁটিখানায় পৌছে দিয়ে নিঃশব্দে নিজের পথে চলে গেলেন। তখন কানা সাড়ে তিন পাঁট, আনোয়ার আলি, ফৈজুদ্দিন কাওয়াল কেউই সেখানে ছিলো না। আমার কি যে মনে হয়েছিলো, মনে হয়েছিলো—আমাদের দাদীমারা নিকোনো উঠোনের কোণে প্রাচীন পিঁড়িতে উপবেশন করে গনগনে উনুনে চেলাকাঠ প্রবেশ করিয়ে জাড় ভাঙছিলেন আর ফিসফিসিয়ে ভয়ংকর শিরা-উপশিরাগুলিকে কিছু বলছিলেন, হাসছিলেন অর্থহীন, উদোম রাত্রি, কি মাংসল তার শরীর, পিষ্ট হতে চায়, আগুনের চঞ্চল শিখা থেকে থেকে কাঁপছে রাত্রির নরম মসৃণ সুগোল বাহুতে, ভাষা দাও! আমাদের দাদীমারা নিকোনো উঠোনের কোণে প্রাচীন পিঁড়িতে, হে রূপসি তাড়না তোমার আনাজ কোটার কি শেষ নেই? গলে পড়া চাঁদ, গলে পড়া অন্ধকার, গলে পড়া বাতাস,

গলে পড়া আকাশ, গলে পড়া বয়স, গলে পড়া অবসাদ, গলে পড়া হিম, গলে পড়া স্বর্গ—গভীর থমথমে নাভীর গায়ে জমা লবণ জলের সৌন্দর্যে নিহত যে, ভাষা দাও ভাষা দাও! আমাদের দাদীমারা সব মৃত। প্রাচীন মসৃণ পিঁড়ি, অলস উপবেশন, নিকোনো উঠোন, তাঁদের অর্থহীন প্রলাপ—স্বর্গীয় স্বগতোক্তি বৃষ্টির বিত্তের মতো স্মৃতির অতলে, ভাষা দাও!

—শালার ব্যাটা শালা বাস্তুঘুঘু, তোমায় একদিন ঘুঘুর ডিম খাইয়ে ছাড়বো, না হলে কান কেটে কুকুরের পায়ে ঝোলাব।—কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে—বুঝলে গুরু, ওই একটা কথা আছে না বেশী বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে, শালার ঠিক তাই হবে। একদিন শালাকে নর্দমার পানি না খাইয়ে ছেড়েছি তো নামই বদলে দেব। চিরতে জানলে একটা ধান দিয়েও কারো পেট চেরা যায়। তা গুরু কাছাকাছি একটা তিন তাসের আড্ডা আছে, যাবে নাকি সেখানে, রাত কাবার করার জন্যে খুবই যুতসই।

আমি বললাম—ওই ব্যাপারটা আমার দুচোখের বিষ। চলো নদীর দিকে যাই, এই সময় খুব আশ্চর্য মনে হবে নদীটাকে।

—অ্যাই মেরেছে। তোমার যতো সব অনাসৃষ্টি কথা গুরু, ওখানে ঘোরাঘুরি করতে গেলে সেপাইরা সন্দ করে টানা-হ্যাঁচড়া জুড়ে দেবে, ভাববে আমরা জানের খারাবি করতে গিয়েছি। তার চেয়ে চলো যে যার নিজের ঘরের দিকি ফিরি, আমার আবার কাল সকাল সকাল থ্যাপ মারতে যেতে হবে সেই কড্ডায়।

বললাম—সেই ভালো, আমি তাহলে চলি, আবার দেখা হবে।

। দুই ।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সারা শরীর অদ্ভুত ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। মনে গ্লানির আঁচড়টুকু পর্যন্ত উধাও। সবকিছু ভালো লাগল। দুদিন পর সময়মতো অফিসে ছুটলাম। সারাদিন যেন নেশার ঘোরেই বুঁদ হয়ে থাকলাম কাজের চাপে।

তারপর অফিস থেকে নিজের আস্তানা। আবার সেই সন্ধ্যা। আবার মন খারাপ হয়ে যাওয়া। আবার বেরিয়ে আসা ছুটে। একটা রাস্তা ধরে পাগলের মতো শুধু হাঁটতে লাগলাম। মনে পড়ে, এক এক সময় নিজের অস্তিত্বকে মনে হতো শ্বেত পাথরে মোড়ানো মসজিদের একটি প্রাচীন চৌবাচ্চা যার ফোয়ারা অকারণে

স্তব্ধ হয়ে আছে। যেখানে সহজে পোষমানা, আমার রক্তের লাল আর সাদা মাছেরা নির্লিপ্ত সুখে হাঙরের হাঁ, বঙ্গোপসাগরের গভীরতা আড্রিয়লর্থার বুকে মেঘের উদাস খাঁ খাঁ ছায়ার কথা অনন্তকালের জন্যই বিস্মৃত হয়েছে। প্রতিদিন নির্বিকার অভ্যস্ত শিকারীর দল সন্তর্পণে শেষ করে দশ আঙ্গুলের চাঞ্চল্যে বলে গিয়েছে, ফিরিয়ে নাও ফিরিয়ে নাও তোমার লবণাক্ত সমুদ্র, ফিরিয়ে নাও তোমার অরণ্য দীঘির করুণ জল আর শোকার্ত নগ্ন আকাশ, দাও সোনার হরিণ। তারপর সাইরেনের আতঙ্ক স্তব্ধ হয়ে শোনে ক্ষয়িষ্ণু জিজ্ঞাসা। প্রয়োজন হয়েছে জানাজার। আবার আমার স্বচ্ছ শরীরে ছায়া পড়েছে তাদের করুণ ম্লান সংকল্পচ্যুত ভয়ংকর বীভৎস সারি সারি মুখের। কখনো নিজের অস্তিত্বকে মনে হয়েছে ক্রুর উল্লাসে ফেটে পড়া ভূমধ্যসাগরীয় ঝড় কবলিত একজন নিঃসঙ্গ নাবিক—জলাতঙ্ক আক্রান্ত, স্মৃতি বিস্মৃত বিকৃতমুখ দংশন-লোভী, যার ভিতর নেই কোনো আটলান্টিক, নেই কোন আলোকস্তম্ভ, কোনো প্রবালদ্বীপ, দিকচক্রবাল। মনে হয়েছে জনহীন বিশাল এবং নির্দয় পৃথিবীতে আমি পতিত আদম—নিঃসঙ্গ, নির্বোধ এবং নীরোগ, যার চোখে স্বর্গের স্মৃতি, নিসর্গ ভয়ংকর।

এখন ঠিক কি মনে হয় তা জানবার আর উপায় নেই। খোলা পাত্রে স্পিরিট ঢেলে রাখলে যা হয় ঠিক তেমনি করেই যেন যাবতীয় চিন্তাধারাগুলি চিরকালের জন্যে উঠে গিয়েছে। এক বোতল যৌনক্রীড়া পান করে যারা নিশ্বাসের মনে অসংখ্যবার কামারশালার হাপর হবার জন্যে জন্মেছে তাদের বিকৃত ও আক্রান্ত চিন্তা-গুলি নিদ্রার চেয়ে মূল্যবান নয়।

এখন আমি কোথায় যাবো। পৃথিবীর বাইরে কোনো নির্বাসনই সুনির্দিষ্ট নয়। মনে হয় আমি অন্ধ বধির। কোনো শব্দ আমার কর্ণপটহে স্পর্শ করে না। আমার চোখের সামনে নেই কোনো খোলা মাঠ, নেই কোনো নদী, আমাকে ডাকে না একটি দরোজাও, পৃথিবীতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সব জানালা।

এক সময় আমাকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়াল একটা, লম্বা যন্ত্রদানব, আগে থেকেই ঘন ঘন হর্ন বাজছিল, ড্রাইভারের আসন থেকে কানা সাড়ে তিন পাঁট চেঁচিয়ে বললে—উঠে এসো গুরু, উঠে এসো।

আমি উঠে তার পাশে বসতেই বললে—তুমি অনেকদিন বাঁচবে গুরু, এইমাত্র তোমার কথা মনে হয়েছিলো। আজ তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

বললুম—কি ব্যাপার কি ?

—পরে সব বলবো, আগে ফ্রী হয়ে নেই। শালার এই মার্শেলাইজ বেনচি আমায় না ডুবিয়ে ছাড়বে না। তোমাদের দোয়ায় যা বাঁচা বেঁচে গেছি আজ।

পথে আর কোনো কথা হলো না। কানা সাড়ে তিন পাট মুখ অন্ধকার করে গাড়ী চালিয়ে সোজা তার গ্যারেজে ঢুকলো। তারপর গাড়ী থেকে নেমে কপালের ঘাম মুছে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, শালার নিকুচি করি আমি ড্রাইভারীর, কি খারাবি যে লেখা আছে তিন তক্কোই জানে।

তারপর কি মনে করে বললে—গুরু তুমি ততক্ষণ বাইরের চৌকিটার ওপর বসো, আমি গাড়ীটার চাকা ধুয়ে সাফ করে নেই।

কানা সাড়ে তিন পাটকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন খুব সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটিয়ে এসেছে লোকটা। আমার যথেষ্ট কৌতুহল হচ্ছিল, কিন্তু জোর করে পেটের কথা আদায় করা স্বভাব নয় বলেই কিছু জানতে চাওয়ার সাহস হলো না। গামছা দিয়ে মুখ হাত মুছতে মুছতে একসময় সে এসে বললে—চলো গুরু।

তারপর যেখানে নিয়ে হাজির করলো সে জায়গায় আর কখনো আসি নি। খুব অচেনা জায়গা, গলিগুলোও গোলকধাঁধার মতো। আমরা দুজন একটু আলগা হয়ে ছাদের এক কোণে বসলাম। বোতলের ফরমাস দিয়ে কানা সাড়ে তিন পাট বললে—সত্যি বলছি গুরু, আজ তোমার সঙ্গে দেখা না হলে দুঃখে মরে যেতুম। ফিরতে ফিরতে শুধু ভাবছিলুম গ্যারেজে গাড়ীটা রেখেই তোমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজবো। একটা কথা গুরু, আজ কিন্তু আমাকে সাড়ে তিনের বেশিতে কিছুতেই যেতে দিও না। সাংঘাতিক কিছু ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। বেসামাল অবস্থা হয়ে গেলে অগোচরে সব বলে ফেলতে পারি। তুমি আমাকে একটু সামলে রেখ।

সাহস করে বলেই ফেললাম—ব্যাপারটা কি কোনো মতেই বলা চলে না?

—কোন মতেই না।—এই বলে আমার কানের পাশে সরে এসে ফিসফিস করে বললে—কিন্তু তোমাকে সব বলবো, সেই জন্যেই তো তোমাকে নিয়ে আসা। বিশ্বাস কর গুরু, খোদার কসম বলছি, যতক্ষণ না তোমার কাছে ব্যাপারটা বলতে পারছি ততক্ষণ ভিতরের পাথরটা কিছুতেই সরছে না।

তারপর এক নিঃশ্বাসে পুরো একটা গ্লাস সাফ করে বললে—আজ দু'দুটো মানুষ সাবাড় করে এসেছি, একটা অসাবধানে অপরটা ইচ্ছে করে।

আমি চমকে উঠে বললাম—তুমি বলছো কি!

—যা বলছি ঠিকই বলছি। আজ সারাদিন ফুরসত ছিল না, ভোর থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত মাল টেনেছি, পঞ্চবটি থেকে কড্ডা আবার কড্ডা থেকে পঞ্চবটি, শালার ইঁট বওয়ার নিকুচি করি আমি।

জানতে চাইলাম—তা মানুষ মারলে কি করে?

—কুকুর বাঁচাতে গিয়ে একটু সাইড নিয়েছি অমনি একজনের গায়ে লাগল ধাক্কা। এ তো শালা আর বৃটিশ আমলের তিনটনি ঝরঝরে ছ্যাকড়া ফোর্ড নয়, যার নাম মার্শেলাইজ বেনচি, চাকার তলায় পড়ে একেবারে চিড়ে চ্যাপটা। মরেচে এখন কি করবো। সটকাবার ফন্দি করছি, এমন সময় দেখি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে এক শালা পাতিবাবু ঝুঁকে ঝুঁকে লম্বর দেখছে। তক্ষুনি সাব্যস্ত করে নিলুম এই আপদ-টাকে শেষ করে রেখে না গেলে নসিবে অনেক মন্দ ঘটবে। ব্যাস, সিধা এসে একেবারে গায়ের উপর চাপিয়ে দিলুম, ব্যাটাচ্ছেলে কেটে পড়বার মতলবে ছিলো, চলে গেল পায়ের ওপর দিয়ে। ভয় হলো যদি কোনোমতে ধুঁকতে ধুঁকতে কিছু-ক্ষণ টিঁকে থাকে তাহলে নির্ঘাৎ কাউকে না কাউকে লম্বর বাতলে যাবে। মানুষ-জন তখন কেউ কোথাও নেই, ব্যাক করে অনেকটা পিছনে এসে এবারে একেবারে চড়া স্পীডে নাড়িভুঁড়ি, মাথামুণ্ডু সব কিমা বানিয়ে রেখে সোজা ঢাকার দিকে চলে এলাম!

আমি বললাম—কিন্তু খুব বড় রকমের অন্যায় করলে এই শেষেরটা!

—কি করবো গুরু, ওটা আমার ওস্তাদের হুকুম। মানুষ খুন করে দোজখে যাওয়া ঢের ভালো কিন্তু আইন-আদালত, ভুলেও ও পথে পা বাড়িয়েছ কি তোমার রক্ত চুষে একেবারে গরম পানিতে চোবানো ফ্যাকাসে হাঁস বানিয়ে ছাড়বে।

আমি আর কোনো প্রশ্ন না করে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ বসে থাকলাম। গোটা দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। একবার মনে হলো কি ভয়ংকর এই মানুষটা, কি ঘৃণ্য। কি জানি, এরকম কতো মানুষের ভিতরে যে মানুষ নেই কে তার হিসেবের ধার ধারতে যায়।

—গুরু তুমি নিশ্চয়ই আমাকে মনে মনে গাল পাড়ছো, কিন্তু বিশ্বাস করো গুরু, সেই থেকে আমি নিজেও ছটফট করছি না। ভিতরে যে কি রকমের অশান্তি তার আর কি বোঝাবো। যাহোক একটা ভালো কাজ করে ওটার শোধ দিয়ে দেবো একদিন।

আমি বললাম,—এইসব অন্যায়ের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই, বুঝলে!

এরপর সাড়ে তিন বোতল হবার অনেক আগেই সে ছটফট শুরু করে দিলো। বার বার একই কথা—না হে গুরু, আজ আর বেশীদূর এগুবো না, গতরটাও যেন মানা করছে, কতো হলো আমার?

আমি বললাম,—সবে দেড়!

—বাকিটা তুমিই মেরে দাও!

আমি বললাম—এতো ঘাবড়াচ্ছো কেন?

—কি যে বলো! ঘাবড়ালুম কোথায়। রোজ কি আর একরকম যায়।

কানা সাড়ে তিন পাট কিছুতেই আর গ্লাস ছুঁলো না। ভাবটা এইরকম যে আমি যেন তাকে ইচ্ছে করেই সাড়ে তিনের ওপর নিয়ে যাবো এবং সে ভয়ংকর রকমের একটা বিপদে পড়বে। কোনো পীড়াপীড়িই শুনলো না সে। বললে—না গুরু, আজ আমাকে জোর কোরো না, আমার গতরে যেন ঘুণ ধরেছে, যদি বলো সারারাত তোমার সঙ্গে থাকতে হবে তাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু ওইটে হচ্ছে না—হ্যাঁ!

তারপর রাত্রি অনেক দূর গড়ালো। একটা অস্বস্তি সারাক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছিলো আমাকে। কানা সাড়ে তিন পাটকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলুম না, মনে হচ্ছিলো লোকটার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাই। কিন্তু থুথু না দিয়ে এমনি পালানোরও কোনো সাহস আমার ছিলো না। কেবলই ভয় হচ্ছিলো যে কোনো অজুহাতে আমি উঠলেই কানা সাড়ে তিন পাটের সন্দেহ-প্রবণ চরিত্র একটা জান্তব কোপ নিয়ে ছায়ার মতো আমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করবে। মাঝে মাঝে সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলো যার অর্থ আমার কাছে দুর্জ্ঞেয়। ভয়ে ভয়ে স্থাণুর মতো ভাসতে থাকলুম, যেন আমি এই ক্ষীণকায় নিস্তব্ধ মানুষটির কেনা দাস, সে হুকুম না করলে আমার উঠবার কোনো উপায় নেই। সে যদি আমাকে তার পা-ও চাটতে বলে প্রাণভয়ে আমি তাতেও অমত করবো না। একটু সহজ হবার জন্যেই আমি বললাম—আজকের রাত্রিটা কিন্তু চমৎকার লাগছে। একটা গান ধরো দিকি।

কানা সাড়ে তিন পাট খুশীতে গলে গিয়ে বললে—গুরুর যেমন কথা। আমি গান শোনাবো কোথা থেকে।

এর মধ্যে ছায়ার মতো দুটো মানুষ তার পাশে এসে বসলো। তারপর একজন কানের পাশে ঠোঁট এনে ফিসফিস করে কি কোথায় সব বললো। আমার কানে গেলো শুধু এইটুকু যে সন্ধ্যে থেকে তাকে গরুখোঁজা করা হচ্ছে।

কানা সাড়ে তিন পাট খুশীতে ভেঙে পড়ে লাফ মারার মতো ঠিকরে উঠে বললে—বলিস কি, এই ব্যাপার?

—তবে আর বলছি কি।

—আমি কিন্তু একা যাবো না, আমি যদি যাই সঙ্গে আমার গুরুও যাবে। গুরুকে ছেড়ে আমি একা যেতে পারবো না।

—নিয়ে চলো না, বাদ সাধছে কে। বরং ভালোই হলো, আরো একটা লোক বাড়লো।

লোক দুটি চলে যাবার উপক্রম করতেই কানা সাড়ে তিন পাঁট তাদের আটকালো। বললে,—সবুর করো, একসঙ্গে যাই মিলেমিশে।

তারপর গড়গড় করে পয়সা-কড়ি যাবতীয় মিটিয়ে দিয়ে আমার একটা হাত ধরে টেনে তুলে বললে—চলো হে গুরু, আজ তোমায় ভুরিভোজ দেবো, একেবারে এক লম্বর জিনিস।

বললাম—একটু খোলাসা করে বলো না, ব্যাপার কি?

—রাস্তাঘাটে ওসব আলাপ না করাই ভালো। চলোই না, গিয়ে চক্ষু একেবারে ছানাবড়া হয়ে যাবে, হ্যাঁ।

পথে আর কোনো কথা হলো না। খুব তাড়াহুড়ো করে সে বেবি ট্যাক্সি নিলো। আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাতে উঠে সিগ্রেটে ঘন ঘন টান মারতে মারতে বাইরের আবছা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো মুখ বুঁজে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আমার মাথা দুলছে, হাত-পাগুলো আলগা হয়ে গিয়েছে, যে কোন সময় বমি করে ঢাকা শহর এবং মহান রাত্রিটাকে ভাসিয়ে দিতে পারি।

আমরা যখন গন্তব্যস্থানে পৌছলাম তখন রাত্রি বারোটা থেকে একটা হবে। কানা সাড়ে তিন পাঁট আমার হাত ধরে নামতে সাহায্য করলো। বললে,—খানিকটা হাঁটতে হবে সামনে, পারবে তো?

বললাম—খুব পারবো। আর তেমন কিছু হলে তুমি তো আছোই।

—তা আর বলতে। গুরুর জন্যে জানও হাজির আছে, আমি থাকতে একটা আঁচড়ও লাগতে দেবো না তোমার গায়ে।

কতোগুলো এলোমেলো গলিঘোঁজ ঢুঁড়ে সে আমাকে যেখানে নিয়ে তুললো সে দিকটায় মানুষজনের বসতি খুবই কম। এমন একটা রহস্যময় অন্ধকার সেখানে হিংস্র প্রাণীর মতো ওঁৎ পেতে আছে যা শহরের আর কোথাও নেই।

একটা বাড়ীর ভিতর ঢুকে, উঠোন পার হয়ে সে কড়া নাড়লো। জানালা খুলে কে একজন দেখলো, তারপর দরোজা খুলে দিয়ে বললে—সঙ্গে কে?

—আমার নিজের লোক।

—চলে এসো।

ভিতরে বড় রকমের দুটো তক্তপোষ ও ঢালাই বিছানা। ইতোমধ্যে প্রচুর বোতল ভাঙা হয়েছে বোঝা গেল। সব মিলে এগারো জন মানুষ যাদের সবাই

একটা বিশেষ শ্রেণীর। কারো চোয়ালের পুরু শক্ত হাড় বিশ্রীভাবে ঠেলে উঠেছে কারো মুখে তারের বুরুশের মতো দাড়ির জঙ্গল, ডুবে শামুকের মতো কারো চোখ কারো পুরু ঠোঁট ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। এক নজরেই খুব একরোখা এব মারমুখী ধরনের মানুষ বলে সনাক্ত করা যায় তাদের।

কানা সাড়ে তিন পাঁট খ্যাক খ্যাক করে হেসে একজনকে জিজ্ঞাসা করে,— শালার ব্যাটা শালা বোধহয় ঘরে ছিলো না সে সময়?

—ঘরে থাকলে কি আর রক্ষে ছিলো।

একজন বলতে থাকল—এইবার শালার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছি।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে—কজনের হলো?

একজন বললে—এখন ছ নম্বর চলছে।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে—আমার গুরুকে কিন্তু সিরিয়ালে ফেললে চলবে না, এর পরের বারেই ওকে চান্‌স দিয়ে দাও।

এবং কিছুক্ষণ বাদে পাশের ঘরের দরোজা খুলে হাসতে হাসতে ওদের একজন ফিরে আসতেই কানা সাড়ে তিন পাঁট আমাকে গুঁতো দিয়ে উঠিয়ে বললে—যাও গুরু যাও, সিধা ঢুকে গিয়ে খিল দাও। সিগন্যাল দিয়েছে।

আমি ভিতরে ঢুকে প্রথমে দরোজাটা ঠেলে দিলাম, তারপর চেষ্টা করলাম খিল দিতে, কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কিছুই খুঁজে পেলাম না। শেষে পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালতেই সবকিছু নজরে পড়লো। খিল আটকে দরোজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে বাতি জ্বেলে দিলাম, এক কোণে মাদুরের ওপর তালগোল পাকানো শাড়ী কাপড় চোপড় ইত্যাদির পাশে সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে। শুয়ে আছে না পড়ে আছে বুঝবার উপায় নেই। সাহস সঞ্চয় করতে একটু সময় লাগলো। প্রথমে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর উবু হয়ে বসলাম, তারপর চেষ্টা করলাম চুমু খেতে। আমার পা টলছিল। আমার মাথা ঘুরছিলো; ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো আমি তার পা থেকে মাথা অবধি বারবার চাটলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে মাথার ধাক্কায় ঠেলতে ঠেলতে তার নগ্ন দেহটাকে মাদুর থেকে মেঝেয় নিয়ে গেলাম। কতোগুলো অসংলগ্ন প্রলাপের স্রোতে ভাসমান আমার শরীরটা এক সময় অতল রক্তাক্ত আর্তনাদে তলিয়ে গেল।

ঠিক কখন বেরিয়ে এসেছিলাম হিসেব করে বলতে পারবো না। আমার মাথার ঠিক ছিলো না। বেরিয়ে এসেছিলাম প্রচণ্ড শব্দে দরোজা খুলে। কানা সাড়ে তিন পাঁট হেসে বললে—গুরু আমার মতো থার্ড গিয়ার পছন্দ করে দেখছি!

আমি বললাম—আমি চলে যেতে চাই, তুমি একটু এগিয়ে দাও।

—সেকি কথা। একা তো যেতেও পারবে না, যে রকম টলমল করছো!

বললাম—খুব পারবো। তুমি শুধু একটু এগিয়ে দাও। আর কিছু চাই না।

রাস্তায় নেমে বললে—কেমন জিনিস বলো দিখি এখন?

বললাম—ভালো। সকাল পর্যন্ত টি঳কলে হয়।

—না টেঁকে না টিঁকবে, আমাদের কি। বাজ পড়লে পড়বে শালা ওই জানোয়ার আলির মাথায়।

তারপর এক সময় আমি একা হয়ে গেলাম। কানা সাড়ে তিন পাট ফিরে যাবার জন্যে খুবই উদগ্রীব দেখে তাকে ছেড়ে দিলাম। মনে হলো তার মন থেকে দুটো মানুষ খুন করবার গ্লানি এক অদ্ভুত রসায়নে সবটুকু উবে গিয়েছে। কিন্তু আমি? কানা সাড়ে তিন পাট সন্ধ্যায় মনে যে গ্লানি নিয়ে দু'হাতে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলো এই মধ্যরাতে সেই একই গ্লানিতে আক্রান্ত হয়ে আমি কাকে জড়িয়ে ধরবো। সারাপথ হেঁটে, বারবার পুলিশের কাছে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিয়ে প্রায় শেষরাতে ঘরে পৌছলাম। আমি আগের মতোই আবার সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, সবকিছু শুনতে পাচ্ছি, অথচ আমার সবকিছু হারিয়ে গিয়েছিলো। ঘরের বাধ্য দেওয়ালগুলো আমার গায়ে যেন কিসের একটা গন্ধ পেয়ে থমকে আছে।

'আমার নাম হেনা।'

'হাসনা হেনা।'

'আমার বিয়ে হয়নি। আমার বিয়ে হয়নি।'

'আমাকে মেরো না এমন করে।'

'আমাকে চুরি করে এনেছে।'

'আমার দেশ বিক্রমপুর।'

'আমি কোনো অন্যায় করিনি।'

'আমার ওপর অত্যাচার করেছে অনেকগুলো মানুষ।'

'আমি উঠতে পারি না।'

'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'

'আমাকে তুমি মেরে ফেলো।'

'আমার ভাই আছে।'

'আমার ভাই পড়ে।'

'তুমি আমার ভাই।'

'তুমি আমাকে মেরে ফেলো।'

'তোমরা হাসনা হেনাকে মেরে ফেলো।'

'তোমরা হাসনা হেনাকে জ্যান্ত কবর দাও।'

'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'

'তুমি আমার ভাই।'

'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'

'তুমি আমার ভাই।'

'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'

'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'

'রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত।'

আমি বিছানার ওপর বসে পাশের টেবিলে মাথা রাখলাম। বধির হয়ে জন্মাইনি কেন। কেন স্মৃতিভ্রষ্ট হয়না আমার শ্রবণ। আমি কাউকে চিনিনা, কাউকে চিনতেও চাই না। আমি জানি আমার কোনো বোন নেই, না কোনো হেনা, না কোনো হায়েনা। আমি চাইনা কারো রক্তাক্ত পায়ে শোকের নদী হয়ে বয়ে যেতে। আমি জানি আমার শরীরেও ছ'জনের অত্যাচারের রক্ত লেগে গিয়েছে, কিন্তু রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত বলে হেনার মতো ছ'বার তা উচ্চারণ করতে চাই না। মনে হলো আর একটু পরেই সূর্যোদয় হবে, আমি মাথা তুললাম টেবিল থেকে, নিজ হাতে জানালা খুলে দিলাম, ভোরের অপেক্ষমান অদ্ভুত বাতাস হুড়মুড় করে ঢুকলো। আমি জানালার ঠাণ্ডা লোহার শিকে কপাল ছুঁইয়ে বললাম,—'হে প্রভাত, তুমি আমার জনক হও, যেহেতু আমি জারজ, গোত্র পরিচয়হীন, আমি চাই তোমার পরিচয়ে সন্তান হতে। হে প্রভাত, হে আমার পিতা, আমাকে আলোড়িত হতে দাও, আমি জানিনা কি করে উন্মথিত হতে হয়, ভাষা দাও ভাষা দাও ভাষা দাও!'

'মাগো।'

'আজরাঈল তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছ?'

'মাগো।'

'আমাকে শেষ করে দাও, আমাকে শেষ করে দাও তোমরা।'

'মাগো।'

'তোমাদের হেনা যে মরে গেল মাগো।'

'মাগো।'

'এরা মানুষ নয় এরা শকুন এরা শকুন এরা শকুন।'

'মাগো।'

'আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।'

'মাগো।'

'মা—আমার মা—মা, মা, মা, এসে দেখে যাও রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত।'

আমি আমার টেবিলের পাশে আবার এলাম। মনে হলো আজ বছরের প্রথম দিন, স্বচ্ছন্দে অনেক কিছুই বাদ দিতে পারি, ইচ্ছে করলে সূর্যোদয়ের পর থেকে হিসেব করতে পারি নিজের। আমি ভুলতে চাই হেনার কথা। মুছে ফেলতে চাই মন থেকে। আসলে হাসনা হেনা এমনই একটা ফুল যার সৌরভে শুধু ভ্রমরই আসে না, আসে কালসাপও। মনসা, মাগো।

তারপর সূর্যোদয় হলো ১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারীতে। বাসিমুখে একটা বগলা ধরাবার পর সন্তর্পণে খুব নরমভাবে আমার মনে হলো—এক একদিন আমার চলে যেতে ইচ্ছে করে। সব ছেড়ে, সব ফেলে, সব মুছে দিয়ে এক একদিন আমার ইচ্ছা করে চলে যেতে অনন্তকালের জন্যে। এক একদিন আমার কানে বৃষ্টির তাণ্ডব, জলের উচ্ছল কলরোল, চোখের নিস্তব্ধ ক্লোরোফর্ম, সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো নিভৃত প্রেম কি দুঃসহ যে হয়ে ওঠে। আর একদিন হৃদয় চিরে হৃদয়কে আবিষ্কার করার পাপাসক্ত আয়োজন সারি সারি কষ্টের ফলক ছড়ানো কবর-খানা মনে হয়। মনে হয় যা কিছু দেখেছি—খোলা চোখে কিম্বা স্বপ্নে, যা কিছু অনুভব করেছি—রক্তের বিনিময়ে অথবা স্বভাবের তাড়নায়, তার সব কিছুর অন্তরালেই আছে আমাকে প্ররোচিত করা, চলে যেতে। একদিন আমার ভিতরে আলো জ্বেলে দেয় ভয়াবহ অন্ধকার। একদিন আমার ওপরের চামড়া হিংস্র সূর্যালোকে পুড়ে কালো হয়ে যায়। এক একদিন আমি ময়ূর সিংহাসনে সমাসীন কাপুরুষ অথচ লম্পট সম্রাটের মতো ভয়াবহ দিবাস্বপ্নে শিউরে উঠি, যেন মরকত খচিত বিশাল প্রাসাদ অতর্কিত বিস্ফোরণে বিপুল নীলিমায় নিক্ষিপ্ত। এক একদিন শিউরে উঠি পেখম মেলা ময়ূর দেখে, মনে হয় তার পায়ে পাক খেয়ে জড়িয়ে আছে বিষধর সোনালী সাপ। এক একদিন মনে হয় চলে যাই, মনে হয় বঙ্গোপসাগরীয় বাতাসে, বিশাল বিস্তৃত আকাশের কোথাও, কিম্বা সুবিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেতে মৃত্যু তার নাম লিখে গিয়েছে চুপিসাড়ে। মনে হয় গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত আকাশের গা থেকে ভয়াবহ আলো খসে পড়ছে, মনে হয় পৃথিবীর সব আগ্নেয়গিরিই সচল আর তাদের গায়ে নাক ঘষে পাক খেয়ে খেয়ে হু হু করে মানুষের দিকে তেড়ে এসেছে বাতাস,

জলান্তীর্ণ ধানক্ষেতের গোপনে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত কোন শিল্পীর ভাসমান লাশ ভয়ংকর স্ফীত। এক একবার মনে হয় চলে যাই যখন অতিরঙ্গ মুখগুলোও শাণিত বন্য কৃপাণ হয়ে ওঠে, যখন সত্যের নাভি থেকে স্খলনে অভ্যস্ত মায়াবী বসন জলপ্রপাতের মতো ভূমিতে আছড়ে পড়ে। ইচ্ছে করে চলে যেতে যখন আমার কষ্টের অ্যাসিডে মৃত থরপড়া চোখে ধর্ষিতা হেলেন বিধ্বস্ত ট্রয়ের স্মৃতি রোমন্থন করে আর সমুদ্রের নীলরক্ত ক্রূর উল্লাসে শুব্ধ নীলিমার দিকে ফিরিয়ে দেয় বজ্রনিনাদ, চলে যেতে ইচ্ছা করে, চলে যেতে ইচ্ছা করে। আর সেদিন চলে যেতে ইচ্ছে করে যখন সারা দেশকে মনে হয় ক্ষত জর্জর মৃত আমার পাগলিনী মায়ের মতো নিরুত্তর পড়ে আছে, যেদিন আমি আক্রান্ত হই শকুনের—রক্তের এবং চীৎকারের ভয়ে, যেদিন ভিতরের সব নদী অকস্মাৎ স্তব্ধ পাষাণে পরিণত, সেদিন ইচ্ছে করে আমি আমার সব নাম নিজের হাতে মুছে দিয়ে চিরকালের জন্যে আমার কঠিন পিতা সরল পিতামহ নির্বোহ প্রপিতামহ ও ন্যুব্জপিঠ পলায়নপটু একটি জাতির মতো—তার সভ্যতার মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বিনিদ্র রাত্রি, সোনালি পিপাসা ও একটি নারীমুখ □ মুহম্মদ সিরাজ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ইদানীং আমি খুব স্মৃতিবিলাসী হয়ে উঠেছি ; নানান রকম সুখ-সমৃদ্ধির কল্পনা করতে ভালো লাগে ; এভাবে আমার সময় বেশ কেটে যায়। এখন রাত্রি, ঘড়িতে আটটা বাইশ, আমি নিজের ঘরে, বিছানায় শুয়ে আছি। আজকাল মাঝে মাঝে আমি অফিস থেকে ফিরেই বিছানায় শুয়ে পড়ি, ক্রমে এটা আমার মজ্জাগত অভ্যেস হয়ে দাঁড়াচ্ছে ; কেন না অফিস থেকে ফিরে বেশীক্ষণ মেরুদণ্ড সোজা করে বসে থাকতে পারি না, শরীরে ক্লান্তি আসে, আমি বিছানায় লুটিয়ে পড়ে চোখ বুঁজে অনেক দেখা-অদেখা মুখ প্রত্যক্ষ করি, এসময় এলোমেলো সুখ কল্পনা আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে।

এখন আমার মনে পড়ছে জিনাত আরাকে। জিনাতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল প্রায় বছর তিনেক আগে আজিমপুরায় এক বন্ধুর বাড়ীতে। কী যেন কাজে ও ঢাকায় ছিলো। সেই পনেরো দিনের পরিচয়ে আমাদের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিলো। জিনাত তখন কুমিল্লায় থাকতো। ওখানে ফিরে যাওয়ার পর সে হঠাৎ আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলো। কোনো মেয়ের কাছ থেকে চিঠি পাওয়া জীবনে প্রথম। আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিলো, জিনাতকে একটা দীর্ঘ চিঠি দিই। কয়েক দিন আচ্ছন্নের মত কাটিয়েছিলাম। কিন্তু জিনাতকে আজও কোনো চিঠি লেখা হয়নি। আমার মনে হয়েছিলো, ও হয়তো উত্তর না পেয়ে একটা রিমাইণ্ডার দেবে। রোজ পোস্টম্যানের অপেক্ষায় থাকতাম। কিন্তু আজো জিনাতের বা অন্য কোনো মেয়ের চিঠি আমার কাছে আসেনি। এখন আমার মনে জিনাতের সেই প্রথম ও শেষ চিঠির অনেক শব্দ জেগে উঠছে। আমার ভালো লাগছে ওর নধর শব্দগুলি, যা পৌনে তিন বছর আগে লেখা হয়েছিলো, নিয়ে খেলা

করতে। আমার ভালো লাগছে ওর স্নিগ্ধ শ্যামল মুখ স্মরণ করতে। আমি অনুমান করছি, ওর বিয়ে হয়ে গেছে, যুবতী এখন সহজ সুখ ও শান্তির খোঁজ পেয়ে গেছে। জিনাত, আজো তোমার চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। তুমি কি এ ব্যাপারে মনে আঘাত পেয়েছিলে? কিন্তু আমি কেমন করে জানাই, এই পৌনে তিন বছরে মনে মনে কতোবার তোমাকে চিঠি লেখা হয়েছে! আমি কেমন করে জানাই এই মুহূর্তে দীর্ঘ স্মরণ-বিস্মরণের পর আবার তুমি স্মৃতিময় জেগে উঠেছো! তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে? তুমি কি এখন স্বামীর সংসারে? কোন্ শহরে আছো তুমি? এখন আমাকে দেখলে চিনতে পারবে?

অফিস থেকে ফিরে দু'টুকরো বাটার টোস্ট খেয়েছি, এখনো চা খাওয়া হয়নি; এতক্ষণ চা না খাওয়ার জন্যে এখন কপালে মৃদু যন্ত্রণা বোধ করছি। নীচে গিয়ে চা খেতে হবে, কিন্তু শরীরে বড়ই আলস্য, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। কয়েকদিন আগে রাহাতের কাছ থেকে খান-চারেক বই এনেছি, মুসা ভাইয়ের অনেক পত্র-পত্রিকা টেবিলে দীর্ঘদিন ধরে জমে আছে, এখনো একটিও পড়া হয়নি। বই-পত্রগুলো যথাযথ ফেরত দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু সে ব্যাপারেই এত আলস্য! কেন দিন দিন এত অলস হয়ে উঠেছি! এই মুহূর্তে এইসব প্রশ্ন আমাকে বিপন্ন করে তুলছে। এখন টেবিলের দিকে চেয়ে থাকার মাঝেই আমার তৎপরতা খোঁজা হচ্ছে, আমি কী এখন 'করুণার আমি' পড়তে পারি!

এখন আর কবিতা ভালো লাগবে না। কিন্তু রবিবারের সকালে মাশুকুর রহমান চৌধুরী আসবেন, ওঁর প্রথম কবিতার বই 'করুণার আমি' সম্পর্কে ঐদিন নিজস্ব মতামত জানানো উচিত। আজ শুক্রবার, মাঝে একটা দিন। কী করা যায়! বইটা পড়বো? কিন্তু আমার যে কিছুই পড়তে ভালো লাগছে না। আজকাল গল্প উপন্যাস সব সাজানো কাহিনী মনে হয়, কবিতাও যেন অর্থহীন প্রলাপ! এক-কালে এইসব গল্প উপন্যাস কবিতা আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অন্তর্গত ছিলো। ক্রমে যেনো সব কিছু থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে সব ব্যাপারেই এক রহস্যময় নিস্ক্রিয়তা আমাকে গ্রাস করেছে! এই স্থবিরতা অসহ্য হয়ে উঠছে। কতোদিন আমি খোলা গলায় গান গাইনি! কতোদিন আমি খোলা গলায় গাইনি! কতো-দিন আমি বর্ষার নদীতে সাঁতার কাটিনি। সব কিছুই যেন গতজন্মের। অথচ সবই একদিন রক্তের অন্তর্গত ছিলো। কেন আমার পুরনো স্বভাব আর ফিরে আসে না! কেন ওই গান গাওয়া নদীতে সাঁতার কাটা বুকের আড়াল ঝরে; হায়, নিঃশেষে হারায়!

ভাবতে ভাবতে বিরক্ত নিজের উপর, অ্যাসট্রেতে আধ খাওয়া সিগারেট গুঁজে দিলাম। এসময় নিজের ওপরই ভীষণ রাগ হচ্ছিলো; ইচ্ছে করছিলো, নির্মম আঘাতে নিজেকে জর্জরিত করি; ইচ্ছে করছিলো, তেতলার ছাদ থেকে রাস্তায় ঝাঁপ দেই; ইচ্ছে করছিলো, গোটা গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন জেলে দেই···।

কিন্তু কিছুই না করে পাশ ফিরে শুয়ে ক্লান্ত চোখ বুঁজলাম।

আমি একটা আধা সরকারী অফিসে চাকরি করি। সামান্য মাইনে তবু রোজ দশটায় অফিসে যাওয়া আর পাঁচটায় ফিরে আসা—আর ভালো লাগে না ছাই। আমি এক নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিকতায় ক্রমেই জড়িত হয়ে যাচ্ছি। আমি যেদিকে তাকাই শুধু অচেনা মানুষ; সকলেই যেন ঠিকঠাক বেঁচে বর্তে আছে শুধু আমিই যেন নিজের শবদেহ কাঁধে নিয়ে উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো হাঁটছি; কেন আমাকে এভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে! আমি কী নিজের জীবন থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি?

আমাকে যেন আরো দূরে কোথায় যেতে হবে। কিন্তু কোথায়? কোথায়? তুই কোথায় যাবিরে ভাই? কোথাও তুই স্বীয় সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রাভিলাষে যথাযথ পৌঁছে যেতে পারিস না, তুই মহাকাল নিয়ন্ত্রিত, তুই অসহায় সমর্পিত আপন ভবিতব্যে —যেখানে গূঢ়তম অন্ধকার গহনে আপনাপন ভবিষ্যত রচিত হয়, তুই সেই অসীম শক্তির অধীনে—যে চিরদিন প্রতিটি মানুষ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে, এবং অদৃশ্য শক্তি তোকে এক রহস্যময় অজানায় নিয়ে যাচ্ছে, এবং একদিন তুই অন্তিমে পৌঁছে যাবি। সেই মহাশূন্যে অনন্ত অন্ধকার, অন্ধকারে তোকে আর আলাদা করে চেনা যাবে না, সেখান থেকে আর তোর ফিরে আসা হবে না, অনন্ত অন্ধকারে তুই অণুতম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি···

তবে তো দু'দিনের জন্যে এই পৃথিবীতে আসা। অনন্ত মহাকালের বুকে কতো সামান্য সময় আমরা এই পৃথিবীতে আছি! একদিন চলে যেতে হবে; চলে যেতে হবে বলে কেন সব কিছু নিরর্থক হয়ে যায়! কেন সহজ আনন্দে জেগে উঠতে পারি না! কেন সব কিছু নিরর্থক, কেন সব কিছু উদ্দেশ্যহীন—কেন সব কিছু আমাকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে! কোন কিছুই আমি সঠিক ভেবে উঠতে পারি না, শুধু মনে হয়, একদিন চলে যেতে হবে···

আজ আমার মনে পড়ে, তিতাসের জলে সেই প্রথম অস্ফুট যৌনচেতনা বালক বয়সে—তিতাসের জলে সাঁতার কাটছি—সেই আমার প্রথম—সেই প্রথম—আমি বোধহীন অসীম রহস্যে—আমি তিতাসের জলে সন্তরণ কালে সহসা জীবনের চরমতম পুলকে—তারপর থেকেই আমার সর্বনাশ—ক্রমাগত যৌন প্রহার আমাকে

তিলে তিলে অসুখী করতে থাকে—আমি জানি, তুই-ই আমার সর্বনাশের মূল, তুই ক্রমশ আত্মার কাছে থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিস, আমি তোর কাছ থেকে—শরীরের অধিকার থেকে উর্ধ্বে চলে যেতে চাই; কিন্তু ক্রমাগত যৌনপ্রহার—এবং এখন আমি নদীর জলে—সন্তরণকালে প্রথম অস্ফুট যৌনচেতনা—তখন আর বালক বয়সে —অসহ্য পুলকে আমি তখন সমগ্র শরীরে—বিবশ হতচেতন—আজ আমার মনে পড়ে, নদীর জলে সন্তরণ কালে—আজ সকালে আমি কিঞ্চিৎ মুডে ছিলাম, মোরাভিয়ার একটা গল্প গতরাত্রে শুরু করেছিলাম, সকালে, ঘড়িতে সাড়ে সাত আট হবে, শেষ করেছি; একটি কিশোর, সমুদ্রের ধারে বিধবা মার কাছে থাকে সেই বালক, তার প্রথম যৌনচেতনা, মায়ের সঙ্গে অন্য এক পুরুষের রহস্যময় আচরণ, একটি যুবক ও ধীবর বালকদের সঙ্গে ওই কিশোরের আলাপ ও মেলামেশা, জীবনের এক গূঢ় রহস্য ক্রমে স্বচ্ছ হচ্ছে, ব্রথেল—মা, আমি তো আর সেই ছোট্ট শিশুটি নেই, আমি যে বড় হয়েছি; তুমি কেন তা মানতে চাও না। তুমি কেন আজো—আজ আমার মনে পড়ে, তিতাসের জলে—তখন আমার বালকবয়সে—তীব্রতম পুলক—মনে পড়ছে—সন্তরণকালে—মনে পড়ছে—হায়, তারপর থেকেই আমার সর্বনাশ, তারপর থেকেই আমি তিলে তিলে অসুখী, তারপর থেকেই আমি তিলে তিলে গহন নিঃসঙ্গতায়—অথচ আমি জীবনকে উপভোগ করতে চাই।

আসলে অনেক কিছুই এখনো আমার করনীয় আছে, অনেক কিছুই বাকী থেকে গেছে, কোনো অসম্পূর্ণতা আমার আর সহ্য হবে না, এবার আমাকে প্রতিটি কাজ নিপুণ ভাবে সমাধা করতে হবে, আমার হৃদয়ে কুয়াশা ও তুষার ও মৃত্যু ও অন্ধকার জমে আছে, রৌদ্রে সব কিছুই সম্পূর্ণ ঝরে যায়, মুছে যায়, প্রচুর সূর্য চাই—সূর্য চাই…

একদিন কুমিল্লায় যাবো। সেখানে জিনাতের খোঁজ করতে হবে। ও এখন কেমন আছে, বিয়ে হয়েছে কিনা, না কী কুমারী জীবনে এখনো লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে, কতোদূর পড়াশোনা হলো, বি. এ. পাশ করেছে কিনা—সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিতে হবে। দেখা হলে ওকে বলতে হবে, একদিন রাস্তার ভিড়ের মধ্যে তোমার মতন একটি আশ্চর্য সুন্দর মেয়েকে দেখে চমকে উঠেছিলাম, আমি ডাক দিতে উদ্যত, সহসা দেখলাম, অন্য মেয়ে; তখন তোমাকে খুব বেশী করে মনে পড়ে গিয়েছিলো, তখন আমি শুধু তোমার কথা ভাবছিলাম।

কিন্তু কোনোদিন জিনাতকে এসব কথা বলা হবে কি! আমি তো কত

জায়গায় যাওয়ার কথা ভাবি, শেষ পর্যন্ত প্রায় কোথাও যাওয়া হয় না। হয়তো কুমিল্লায়ও যাওয়া হবে না, হয়তো আর কোনোদিন জিনাতের সঙ্গে দেখা হবে না। যা কিছু এতোক্ষণ ভাবলাম—সবই অলস ভাবনার জন্ম, একদিন সব স্মৃতিহীনতায় চলে যাবে, এই সব শব্দ কোনোদিন স্নিগ্ধ উচ্চারিত হবে না, শুধু জনতায়, মানুষের ভিড়ে মাঝে মাঝে ভিন্ন নারীর মুখে জিনাতের ইম্‌প্রেসন দেখে চমকে উঠবো, আমি ডাক দিতে উদ্যত হবো, কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখবো, অন্য মুখ উদাসীন সুদূরতায় ভেসে যাচ্ছে। অথচ পরমুহূর্তে আমি সেই নারীর শরীর দেখে উত্তেজিত হবো, শুধু শরীর—শুধু যুবতী শরীর তখন আমাকে সমগ্র অধিকার করবে, নিমেষের মধ্যে জিনাত ও যাবতীয় স্নিগ্ধ অনুভব বিস্মৃত হয়ে আমি তখন শরীরময় সেই যুবতী শরীরে ; অসহায় মনে হবে, ওই যুবতীর কাছে সুখ ও শান্তির খোঁজ পাওয়া যাবে, আমি সুখী হবো ; কিন্তু হায়, স্থির জানি, দেহের প্রতি উপর্যুপরি আঘাত ও অগ্নিদহনে রক্তাক্ত প্রতিদিন ঝরে যাওয়া ছাড়া আমার কোনো ভবিতব্য নেই, শরীরের হাত থেকে আমার আর কোনো উদ্ধার নেই , অথচ উদ্ধার চাই, শান্তি চাই, অথচ প্রতিদিন সমগ্র শরীরে নিঃশেষে ঝরে যাই, কোনো উদ্ধার নাই…এ প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগের স্মৃতি মনে আসছে,—বিকেল বেলা আমি রাস্তায়, এলোমেলো এমন হচ্ছে, চারপাশে অনেক লোকের যাওয়া আসা, আমি সকলের মুখভাব লক্ষ্য করছিলাম। এ সময় লক্ষ্য করলাম, একটি যুবতী, তন্বী শরীর, আমি ওকে পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি, প্যাসোনেটলি হেঁটে যাচ্ছে। ওর ওই গমনভঙ্গি ভীষণ উত্তেজক, আমি মোহাবিষ্ট, তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। অতঃপর আমি অসহায় অনুসরণে, কোনোমতেই বিপরীতে চলে যেতে পারছিলাম না। বিকেলে আমি সাধারণত ছুটির দিনে, বাসার আশপাশেই ঘোরাফেরা করি, প্রয়োজন না থাকলে দূরে যাই না। কিন্তু সেদিন মেয়েটিকে অনুসরণ করে অনেক দূরে চলে এসেছি, এতো দূরে—বাড়ি-ঘরগুলো, এই রাস্তা—সব আমাকে ভিন্ন অনুভবে—এক অপরিচয়ের মুখোমুখি টেনে আনছিলো। তখন বিকেলের শেষ আলোটুকুও নিভে আসছে, আমি মেয়েটিকে অনুসরণ করে একটা নির্জন গলিপথে এলাম। তারপর সেই গলি পার হয়ে আরেক গলিতে, তারপর আবার ভিন্ন গলিতে বাঁক ; তখন সেখানে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে, অথচ রাস্তায় আলো জ্বলছে না, শুধু নক্ষত্রের রহস্যময় মৃদু আলোয় আমার দু'চোখ ওই অস্পষ্ট নারীদেহে সমর্পিত অনুসরণ করছিলো। গলিতে কোনো আলো জ্বলছে না! কেন আশপাশের বাড়িগুলো এত অন্ধকার! আমি অবাক ভাবছিলাম। আমার ইচ্ছে করছিলো, মেয়েটিকে ডেকে বলি, তোমাকে

এখন আমার ভীষণ প্রয়োজন; আমি সহজ আনন্দে যেতে চাই, তুমি আমাকে সুখ ও শান্তির পথ নির্দেশ করে দাও। কিন্তু কিছু না বলে আমি, অন্ধকারে ওর শরীর ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, চলার গতি দ্রুত করলাম। তখন আমার একমাত্র বাসনা, যুবতীর খুব কাছে যেতে হবে; যেন কাছে গেলে ওর আত্মার সৌরভ পাওয়া যাবে, যেন কাছে গেলে ওর শরীরের অনেক খবর পাওয়া যাবে; অসহায় আমি দ্রুত হাঁটছিলাম। ক্রমে ব্যবধান কমে এলো, তখন আমি এতো কাছে—হাত বাড়ালে ওর শরীর স্পর্শ করা যায়। আমার ইচ্ছে করছিলো, প্রচণ্ড আলোয় ওর সম্পূর্ণ অবয়ব দেখি। কিন্তু গলিপথে অন্ধকার, নক্ষত্রের মৃদু আলো ছাড়া আর কোনো স্পষ্টতা নেই। এ সময় খুব অসহায় বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিলো, ওই রহস্যময় অন্ধকার পার হয়ে যুবতীর মুখ কোনোদিন স্পষ্ট দেখা যাবে না। দারুণ ক্ষোভ হচ্ছিলো। কী করা যায়! কী করা যায়! যুবতী এখনি হয়তো আরো গহন অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে; হায়, কী করা যায়! এ সময় আমি প্রায় আত্ম-বিস্মৃত, সহসা টের পেলাম, বাসা থেকে বেরোনোর সময় হাতে একটা টর্চ নিয়ে এসেছি। বস্তুত সত্যিই তখন আমার হাতে টর্চ, বোতাম টিপতেই নিমেষ মধ্যে প্রবল আলো, সেই আলোয় যুবতী মুখ ফেরাতেই দেখলাম, বীভৎস এক মুখ—যেন পৃথিবীর যাবতীয় রোগ ওই মুখে বাসা বেঁধেছে, অমন ভয়ঙ্কর মুখ আমি আগে আর কখনো দেখিনি; হাত থেকে টর্চ পড়ে গেছে, আমি নিদারুণ আতঙ্কে দু'হাতে মুখ ঢেকেছিলাম।

এ ঘরে আমি একা। এলোমেলো স্মৃতিতাড়িত; সেই ভয়ঙ্কর মুখ এখন আবার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তবু সেই অন্ধকার গলি পথের স্মৃতি থেকে সরে আসার মানসে উঠে দাঁড়ালাম। টেবিলের কাছে আসতেই নজরে পড়লো, ঘড়িতে দশটা সাতাশ। অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন আমাকে স্টোভ জ্বালিয়ে রাতের খাবার তৈরী করে নিতে হবে। একথা মনে পড়তেই আমি ভীষণ বিরক্ত বোধ করলাম। ঘরের বাইরে এসে টের পেলাম, বায়ু চড়ে গেছে, আজ আর আমার চোখে একটুকুও ঘুম আসবে না। সারারাত জেগে কাটাতে হবে, সারারাত আমি সেই ভয়ঙ্কর নারীমুখ, জিনাত—বালক বয়সে তিতাসে সন্তরণ, যৌনপ্রহার, মোরাভিয়ার সেই বালক, সহস্র সুদূরতম মুখ ইত্যাদি সমর্পিত ক্রমেই অপ্রকৃতি উন্মাদ হয়ে উঠতে থাকবো। কেন না কিছুক্ষণ আগে আমি আবিষ্কার করেছি, গতকাল আমার স্লিপিং ট্যাবলেট ফুরিয়ে গেছে।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

শরীরের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল। বিমলা চোখ বুজলেন। তাঁর যেন স্পষ্ট মনে হল, পেটের মধ্যে কী একটা নড়ে উঠল। চোখ বুজে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, পেটের মধ্যে নড়ে ওঠাটা অনুভব করতে চাইলেন। সামনের উনোনে তরকারি চাপানো, চড়বড় করে শব্দ হচ্ছে। জল নেই, এখুনি কড়ায় লেগে পুড়ে যাবে। বিমলা তথাপি নডতে পারলেন না। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে নিজের গর্ভে যেন কান পেতে রইলেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বাজতে লাগলো, 'বাদল! বাদল রয়েছিস?' …পরমুহূর্তেই তাঁর শরীরটা আর একবার কেঁপে উঠল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো। চোখ খুলে উনোন থেকে কড়াটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যাকুল অস্থিরতা। বাইরের দিকে কান পেতে কিছু যেন শুনতে চাইলেন। তারপরে দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তরকারিটা ওভাবে ফেলে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। উনোনের কাছে নামানো কড়াটার দিকে একবার তাকালেন। কিন্তু বিমলা স্থির থাকতে পারলেন না। নষ্ট হয় হোক। কাঁচা থাকুক, ছাই হয়ে যাক। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের বাইরে এলেন।

আকাশে ঘন মেঘ। পুবে বাতাস বইছে। উঠোনের এক ধারে টগর গাছটা বাতাসের ঝাপটায় নুয়ে পড়ছে। এক বছরের শিউলি গাছটাও মাটিতে নুয়ে পড়তে চাইছে। বাড়িটা নিঝুম। কাঠের ফ্রেম, টিনের দেয়াল, মাথায় টিনের চাল। মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই। তথাপি বিমলা যেন পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এলেন। পাশের বাড়িতে কণার মা যেন কাকে কী বলছে। বিমলা ফণিমনসার বেড়া ডিঙিয়ে সেদিকে একবার দেখলেন। কণাদের বাড়িটা দেখা যায়। লোকজন দেখা যায় না। তিনি চোখ ফিরিয়ে আবার ঘরের দরজা খোলা বাড়িটার দিকে

তাকালেন। কারোর কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাতাসে তাঁর মাথার চুল কপালে পড়ছে। দূর থেকে দেখলে কাঁচা চুল বলে মনে হয়। কিন্তু পাক ধরেছে। চওড়া সিঁথের বাসি সিঁদুরের দাগ। হাতে শাঁখা নোয়া আর বিবর্ণ কয়েক গাছা সোনার চুড়ি। শেমিজের ওপরে খয়েরি পাড়ের সাদা শাড়ি। ময়লা হয়েছে, হলুদের দাগ লেগেছে। প্রৌঢ় বয়সেও শরীর বেশ শক্ত। মুখের রেখাতেই বয়সটা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখলে মনে হয়, অল্প বয়সে সুশ্রী আর সবল ছিলেন। এখন তাঁর চওড়া শরীর যেন শক্ত আর কঠিন।

বিমলা কয়েক মুহূর্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে সামনের দিকে না গিয়ে রান্নাঘরের পিছনে গেলেন। ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে বাড়ির পিছন দিয়ে এগিয়ে চললেন। ঘরগুলোর পিছন দিকের সব জানালাই বন্ধ। ঘর যেখানে শেষ, কোণে একটা জবা ফুলের গাছ। বিমলা দাঁড়ালেন। সামনে রাস্তা, উত্তর দক্ষিণে লম্বা। কলোনির রাস্তা, পাকা না, ঘেঁস ছাইয়ের রাস্তা। বিমলা উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। উত্তর দিকে রাস্তা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেই দিকে তাকালেন। যেখানে মোড়ের এক পাশে কয়েকটা ইঁট এক জায়গায় এখনো জড়ো হয়ে পড়ে আছে সেইখানটা দেখলেন। ওখানে শহীদ বেদী হয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ভাঙতে ভাঙতে গোটা কয়েক ইঁটে এসে ঠেকেছে। কেউ তুলে নিয়ে গেলেই আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। কারা বেদীটা ভাঙলো, ইঁটগুলো কোথায় গেল, কেউ জানে না। বিমলা দেখছেন, প্রথম প্রথম পাড়ার একটা কুকুর বেদীটার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকত। এখন থাকে না। গোটা কয়েক ইঁট ছাড়া এখন আর কিছু নেই।

বিমলা আপন মনে মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট নড়লো। না, বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানেই দাহ করা হয়েছিল। মাস তিনেক আগে, বেদীটা যখন তৈরী হল তখন ওরা বিমলাকে ডাকতে এসেছিল। বাদলের মা বিমলা, শহীদের মা। তাই ওরা ডাকতে এসেছিল, বাদলের বন্ধুরা, পার্টির ছেলেরা। শুধু বিমলাকেই ওরা ডাকতে এসেছিল। এ বাড়ির আর কাউকে না। বাদলের বাবাকে না, বাদলের দুই দাদাকেও না। বাদলের বাবা হরপ্রসাদ অন্য পার্টির লোক। দুই দাদা কৃপাল আর দয়াল, দুজনেই দুটো আলাদা আলাদা পার্টির মেম্বার। চারজন চার পার্টির লোক। বাদলের দলের ছেলেরা কেবল বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল। শহীদের মাকে।

বিমলা গিয়েছিলেন। ওইখানে, ওই একটু দূরে, পশ্চিমের মোড়ে, রাস্তার ধারে এখন যেখানে কয়েকটা ইঁট জড়ো হয়ে পড়ে আছে। শহীদ বেদীর শেষ চিহ্ন। কেন

গিয়েছিলেন বিমলা জানেন না। বাদলের পার্টির ছেলেরা এসে বলেছিল, 'মাসীমা আপনি একবার চলুন।' বিমলা গিয়েছিলেন যেন ঘোর লাগা আচ্ছন্নের মত। তার দুদিন আগে, আঠাবো বছরের বাদলকে ওইখানেই কারা পিটিয়ে মেরেছিল। বিমলার চোখেব সামনে এখনো স্পষ্ট। ক্ষতবিক্ষত বাদল। মুখে মাথায় শরীরের নানান জায়গায় রক্ত জমাট নিথর বাদলকে এ বাড়ির উঠোনে ওরা নিয়ে এসেছিল। বাদল সব থেকে ছোট ছেলে। বিমলার শেষ সন্তান না। তারপরেও দুটি হয়েছিল, বাঁচেনি। বাদলের পরে আর কেউ ছিল না।

নিহত বাদলকে দেখে বিমলা চিৎকাব করে কেঁদে উঠেছিলেন। উঠোনে পড়ে বাদলকে একবার জড়িয়ে ধরেছিলেন। আপন মনেই কেঁদে উঠে বলেছিলেন, 'কে তোকে এমন করে মারল। ওরে বাদল।'··উঠোন জুড়ে মানুষের মেলা। কিছুক্ষণ পরে চালিতে করে ফুল ছড়িয়ে মালা জড়িয়ে ওরা বাদলকে নিয়ে গিয়েছিল। হরিবোল ধ্বনি দেয় নি। স্লোগান দিয়েছিল। 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ! খুন কা বদলা খুন।'···কিন্তু বিমলা আব ভাল কবে কাঁদতে পারেন নি। ডাক ছেড়ে কান্না যাকে বলে, তেমন কবে কাঁদতে পারেন নি। সময়ে অসময়ে, কাজে অকাজে, হঠাৎ চোখে জল এসে পডেছে। জল মুছেছেন।

দু দিন পরে ওই বেদীটা তৈরী হয়েছিল। বাদল যেদিন খুন হয়, সেদিন কলোনির স্কুলের মাঠে একটা সভা হচ্ছিল। অন্য কোন দলের সভা, বাদলদের না। সেখান থেকেই কী একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠেছিল। সঠিক কথা কেউ কিছুই বলতে পারে নি। সন্ধ্যের ঘোরে বাদলকে নাকি কারা তাড়া করেছিল। বাদল বাড়ির দিকে দৌড়েছিল। কিন্তু মোড় পেরিয়ে আসতে পারে নি। কেউ বলে, বাদল একলা ফিরছিল। ওর খুনীরা আগে থেকেই মোড়ে অপেক্ষা করছিল। আরো অনেক রকম কথা। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা, বিমলা বুঝতে পারেন না। বাদলের চিৎকারে লোকজন ছুটে গিয়েছিল। যখন গিয়েছিল, তখন সব শেষ। রক্তাক্ত নিহত বাদল ছাড়া, সন্ধ্যের ঘোরে সেখানে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় নি। পুলিশ এসেছিল। বাদলের পার্টির লোকেরা নাকি কার কার নাম বলেছিল। তাদের কাউকেই কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। হত্যাকারী বলে যাদের নাম করা হয়েছিল, তাদের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তারা এখন সকলেই জামিনে খালাস পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেস চলছে। কেস চলছে অথচ যেন ব্যাপারটা কিছুই না।

বাদল খুন হবার দুদিন পরে শহীদ বেদী তৈরি হয়েছিল। এই দু দিনের মধ্যেও

ছোটখাটো সজ্ঘর্ষ হয়েছে। একটা দোকানঘর পুড়ে ছাই হয়েছিল। কেন, তা বিমলা জানেন না। বিমলা কেন শহীদ বেদীর কাছে গিয়েছিলেন তাও জানেন না। গিয়ে একবার দাঁড়িয়েছিলেন। পনের যোলটা ইট ধাপে ধাপে সাজিয়ে চুনসুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। চুন দিয়ে লেপে সাদা বেদীর গায়ে বাদলের নাম লেখা হয়েছিল। বিমলাকে ঘিরে বাদলের পার্টির ছেলেরা সেই একই স্লোগান দিয়েছিল, 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন' ইত্যাদি। কে একটি ছেলে যেন বাদলের নাম করে কী সব বক্তৃতা করেছিল। সব কথা বিমলার কানে যায় নি। তিনি আচ্ছন্নেব মত দাঁড়িয়েছিলেন। আবাব আচ্ছন্নেব মতই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে বসেছিলেন। বাড়িতে আর কেউ নেই। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল খাবে, রান্না না করলে চলবে কেন। যেমন আচ্ছন্নের মত গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই এসে রান্নার কাজে লেগেছিলেন। কিন্তু কারোর সঙ্গে কথা বলেন নি। কৃপাল দয়ালের সঙ্গে না, হরপ্রসাদের সঙ্গেও না। হরপ্রসাদ নিজে এসে রান্নাঘরের দবজায় দাঁড়িয়েছিলেন। যেন খানিকটা আপন মনেই বলেছিলেন, 'কত দিন বলেছি, ওই দলটার সঙ্গে মিশিস না। কথা শুনলে তো।'

বিমলা কোনো জবাব দেন নি। হরপ্রসাদ তবু দাঁড়িয়েছিলেন। একটু থেমে, একটা নিশ্বাস ফেলে আবার বলেছিলেন, 'এখনকার এ সব পার্টি, খুনখারাপি ছাড়া কিছু জানে না। কিন্তু যার গেল তার গেল, কেউ দেখতে আসবে না। বাদলকে তো আর ফিরে পাব না।'

হরপ্রসাদ চুপ করেছিলেন। বিমলা কোনো জবাব দেন নি। উনোনের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন। হরপ্রসাদ যেন একটা নিশ্বাস ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'যাই হোক, মনকে শক্ত কর। এ ছাড়া আর কী করবার আছে। আমার দেরি হয়ে গেছে, অফিসে চলে যাচ্ছি। খাবার একদম ইচ্ছে নেই।'

হরপ্রসাদ চলে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কোন কথা হয় নি। তবে এই তিন মাসে মাঝেমধ্যেই ওই কথাটা বলেছেন, 'মনকে শক্ত কর। বাদলকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না।'

বিমলা সে কথার কোন জবাব দেন নি। সংসারের কথা বলেছেন। দৈনন্দিন জীবনে, কী দরকার, কী আনতে নিতে হবে, এই সব কথা। কিন্তু বাদলের বিষয়ে কোনো কথা বলেন নি। কৃপাল দয়াল কোনো কথাই বিমলাকে বলে নি। কৃপাল চাকরি করে। দয়াল বেকার। ওরা ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক। বাড়িতে ওরা নিজেদের মধ্যে কম কথা বলে। গামছা তেল সাবান চান করার কথা বলে, সিনেমা

থিয়েটারের কথাও বলে। দলের কথা একেবারে না। খিদে পেলে বিমলার কাছে শুধু খেতে চায়। দোকান বাজার করে দেয়। কী আনতে হবে না হবে, জিজ্ঞেস করে। বাদলের বিষয়ে কোনো কথা হয় না। যেন ওদের ভাই মরে নি। অন্য পার্টির একটা ছেলে মরেছে। হয়তো নিজেদের পার্টির লোকের সঙ্গে কথা হয়। বাড়িতে কোনো কথা নেই।

বিমলা জবা গাছের গা ঘেঁষে ভাঙা বেদীর দিকে দেখছেন। বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল। কিন্তু বাদল আজ বিমলার সারা শরীরে জেগে রয়েছে। আজ উনিশে শ্রাবণ। আজ সেই দিন। এখন এগারোটা বাজে। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এই সময়ে বাদল পৃথিবীর মুখ দেখবার জন্য বিমলার পেটে অশান্ত হয়ে উঠেছিল।

বাড়িতে তখন কেউ নেই। বিমলা একলা। পূর্ণ গর্ভ, যে কোনো সময়েই বাদল ভূমিষ্ঠ হতে পারে। এ সময়েই ব্যথা উঠেছিল। ডাক্তার কবিরাজের দরকার ছিল না। বিমলা নিঃশঙ্ক। তিনি সবই বুঝতে পারছিলেন। অভিজ্ঞতা তার শরীরের প্রতিটি অনুভূতির মধ্যে। ব্যথা উঠতেই বুঝতে পেরেছিলেন, সেটা নিষ্ফল ব্যথা না। সময় আসন্ন। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এই সময়ে, উপরঝান্তি বৃষ্টি পড়ছিল। একেবারে একলা থাকা উচিত না। বিমলা কোনো রকমে পাশের বাড়িতে কণার মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ব্যথায় রুদ্ধ চুপি চুপি স্বরে বলেছিলেন, 'দিদি, আর সময় নেই।'

কণার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সব কাজ ফেলে বিমলার সঙ্গে চলে এসেছিল। কণা তখন ছ' সাত বছরের মেয়ে। তাকে পাঠিয়েছিল মেঘুর মা বিধবা বুড়িকে ডাকতে। আজকালকার মত ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিমলাদের প্রসব হত না। মেঘুর মা-ই খালাস করাত। মেঘুর মা বুড়ি এসেছিল। বিমলাকে দেখেছিল। বলেছিল, 'হ্যাঁ, আসল ব্যথা। আর বেশি দেরি নেই।'

কণার মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর খালি করে দিয়েছিল। সেই ঘরেই বাদল হয়েছিল। তখন এ বাড়ির চেহারা অন্যরকম ছিল। টিনের দেওয়াল ছিল না। পাকা মেঝে ছিল না। ছেঁচা বেড়ার দেওয়াল। মাথায় তখনো টিনের চাল, কাঁচা মাটির মেঝে। বিমলা রান্নাঘরে মাদুরের ওপর শুয়ে বসে ব্যথার তীব্রতা সহ্য করছিলেন। কণার মা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তারও যেন ব্যথা উঠেছিল। বিমলা

নিশ্বাস বন্ধ করে ব্যথা খাচ্ছিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে স্থির থাকবার চেষ্টা করছিলেন। তার মধ্যেও ভেবেছিলেন, কী আসছে। ছেলে না মেয়ে। হরপ্রসাদের সাধ ছিল, মেয়ে হয় যেন। হরপ্রসাদের সাধ, বিমলারও সাধ। দুই ছেলের পরে একটি মেয়ে। কিন্তু তাঁর শেষ গোঙানির সঙ্গে যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সে ছেলে। মেঘুর মায়ের হাত বিমলার পেটে চেপেছিল। তখনো ফুল পড়ে নি; আর একটি ব্যথার অপেক্ষা। তার মধ্যেই, বিমলা লহমায় দেখে নিয়েছিলেন। রক্তে আর লালায় মাখানো একটি ছেলে। তখনো গলায় কান্না ফোটে নি। ছোটখাটো এক আধটা গোঙানি মাত্র। ফুল পড়ার পরে, প্রথম গম্ভীর স্বরে কেঁদে উঠেছিল, 'ওঁয়া, ওঁয়া।'

মেঘুর মা নাড়ি কাটতে কাটতে বলেছিল, 'কত বড়। যেন পেট থেকেই এক বছরের ছেলে বেরুলো। দেখে মনে হচ্ছে, মাতৃমুখী।'

মাতৃমুখী। বিমলা আবার তাকিয়ে দেখেছিলেন। বুঝতে পারেন নি। মেঘুর মায়ের কোলের দিকে তাকিয়েছিলেন আর হঠাৎ-ই নিজের কোলটা বড় ফাঁকা মনে হয়েছিল। মেয়ে না হোক, নাড়ী ছেঁড়া ধন। কোলে নিতে ইচ্ছা করেছিল। সে কথা বলতে পারেন নি। মনে মনে বলেছিলেন, 'মাতৃমুখী ছেলে সুখী হয়।'

বাইরে তখনো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কণার মা বিমলাকে সাব্যস্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। দুধ গরম করে খেতে দিয়েছিল। মেঘুর মা নতুন শিশুকে গরম জল দিয়ে ধুয়ে মুছিয়ে, কাঁথায় মুড়ে বিমলার কোলে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'বুঝেছি রে বাপু। জলের তোড়ে এলি, বাপের যেন এরকম তোড়ে টাকা আসে। কী বাদুলে ছেলে বাবা, জগত ডোবানো বিষ্টি মাথায় করে এল।'

জগত সংসার ভাসানো বৃষ্টিই বটে। উঠোনটা জলে থৈ থৈ করছিল। তখন রান্নাঘরের অবস্থাই বা কী। এখন তো অনেক পাকা পোক্ত ব্যবস্থা। তখন মাথার ওপরে ক্যানেস্তারার গোঁজামিলের চাল। ঘরের এখানে সেখানে টপ টপ করে জল পড়ে। বিমলা একটা কোণ বেছে নিয়ে, ছেলেকে বুকের কাছে ঢেকে শুয়েছিলেন। কণার মা চলে গিয়েছিল। তার তো সংসারের কাজ। মেঘুর মা ছিল। তার ওটাই কাজ। নবজাতককে বুকের কাছে নিয়েও, কৃপাল দয়ালের কথা বিমলার মনে পড়েছিল। ওরা তখন স্কুলে গিয়েছিল। বিমলার দুশ্চিন্তা, যা দুরন্ত তাঁর ছেলেরা। বৃষ্টি মাথায় করে, স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়েছে কী না কে জানে। বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছে হলে মাস্টারমশাইরা কি আর ধরে রাখতে পারবে। হরপ্রসাদের কথাও মনে পড়েছিল। অফিসে যাবার ইচ্ছা ছিল না। বিমলাই জোর করে

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ বাড়িতে থেকে কী করবে। খানিকটা ছটফট করা ছাড়া করার কিছুই নেই। তার চেয়ে অফিসের কাজে থাকলে ভাল থাকবে। এদিককার ব্যবস্থা যা করবার বিমলাই করে রেখেছিল। কণার মাকে খবর দেওয়া। মেঘুর মাকে ডেকে নিয়ে আসা। এমন কিছু হাতী ঘোড়া ব্যাপার তো নয়। পোয়াতি মেয়েমানুষ ছেলে বিয়োবে, তার জন্য পাড়া দূরের কথা, বাড়ি মাথায় কবারও কিছু নেই। ভালভাবেই সব হয়ে গিয়েছিল। কাক পক্ষীতেও টের পায় নি। ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে আশেপাশের কেউ নতুন ছেলের কান্নাও শুনতে পায়নি।

বিমলা নবজাতককে স্তন চেনাবার চেষ্টায় মুখের কাছে ছুঁইয়ে দিচ্ছিলেন। প্রথমটা একটু ধরিয়ে দিতে হয়। শিশুর মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছিলেন, এটি আবার কেমন হবে, কে জানে। সকলের বেলাতেই এই কথাটি মনে হযেছে। কৃপাল দয়ালের বেলাতেও। সব মায়ের কি এমনি মনে হয়। কে জানে। কৃপাল দয়ালের পরে আরও দুটি হয়েছিল। তারা বেঁচে নেই। এটি কী করবে, কে জানে। ভাবতে ভাবতে, বুকের কাছে আরও চেপে ধরেছিলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। মেঘুর মা বলেছে, মাতৃমুখ। বলেছে, খুব দুষ্টু হবে এই ছেলে। মাতৃমুখী ছেলে কেবল সুখী হয় না, দুষ্টুও হয়। কী দুষ্টুমি করবে? বিমলাকে জ্বালাতন করবে?

বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন। কোন্ ছেলেটা না জ্বালিয়েছে। কৃপাল দয়াল যে রকম দুরন্ত, এও সেই রকম হবে। একই গাছের ফল তো। তা হোক, ছেলে-পিলে তো দুরন্ত হবেই। তার জন্য বকুনি খাবে, মার খাবে, আবার ভুলেও যাবে। কৃপাল দয়াল যে-রকম করে। ওদের দৌরাত্ম্যে এক এক সময় অস্থির হয়ে পড়েন। তখন না মেরে উপায় থাকে না। এও দুষ্টুমি করলে মার খাবে।

নবজাতক কেঁদে উঠেছিল। বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'এখন তো মারছি না, কাঁদছিস কেন। বড় হ, তখন দেখব।'

বলতে বলতে বুকের কাছে তুলে, স্তন গুঁজে দিয়েছিলেন। সদ্যোজাত শিশু তা নিতে পারেনি। তখন দুধেতে পলতে ভিজিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। চুষে চুষে খেয়েছিল। বিমলা কোনো কথাই ভোলেন নি। এই তো যেন সেদিনের কথা। প্রত্যেকটা কথাই স্পষ্ট মনে আছে। কৃপাল দয়ালের কথাও মনে আছে। ওরা জন্মেছিল পদ্মার ওপারে, নিজেদের ভিটেয়। বাদল এই বাড়িতে জন্মেছিল।

বৃষ্টি একটু ধরতেই, কাক ভেজা হয়ে, কৃপাল আর দয়াল বাড়ি এসেছিল। আঁতুড় মানতে চায় নি, আগেই ভাইকে দেখতে এসেছিল। দয়াল তো বায়না

ধরেছিল, সে ভাইকে কোলে নেবে। মেঘুর মা ধমক দিয়েছিল। বিমলা সস্নেহে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে নিরস্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'কাল চান করবার আগে ভাইকে কোলে নিস।'

সন্ধ্যেবেলা হরপ্রসাদ বাড়িতে এসে আগেই আঁতুড়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গলা খাঁকারি দিয়েছিল। দরজাটা বন্ধ ছিল, বিমলা বুঝতে পেরে মেঘুর মাকে বলেছিলেন, 'কৃপার বাবা এসেছে, দরজাটা খুলে দাও।' মেঘুর মা দরজা খুলে দিয়েছিল। হরপ্রসাদ বিমলাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কেমন আছ?'

বিমলা সে কথার কোনো জবাব দেননি। হ্যারিকেনের আলোর সামনে ছেলেকে তুলে ধরেছিলেন। হরপ্রসাদ গম্ভীরভাবে শব্দ করেছিল, 'হুম্!' তারপরে হঠাৎ হেসে বলেছিল, 'রূপবান ছেলে হয়েছে মনে হচ্ছে। এ ব্যাটা বাপের মত হয়নি।'

বিমলা ওসব কথা ভোলেন না। সব কথা মনে থাকে, আছেও। হরপ্রসাদ কেন ও কথা বলেছিল, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। একবার হরপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বাপের খুশি মুখ দেখলে বোঝা যায়। হরপ্রসাদ খুশিই হয়েছিল। বিমলা একটু গর্ব বোধ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, 'এই মুখ দেখে হরপ্রসাদ এখন আর মেয়ের কথা মনে রাখেনি।'

মেঘুর মা বলেছিল, 'রূপবান তো হবেই, মাতৃমুখ যে।'

তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। হরপ্রসাদ রান্নাঘরের দরজায় ছাতা মাথায় দিয়েই দাঁড়িয়েছিল। নামটা তখনই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'ব্যাটা জবর বাদুলে, একেবারে বাদলা।'

ইতিমধ্যে বীণা এসে পড়েছিল। কলোনীরই বিধবা মেয়ে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। বিমলার প্রসব হলে সে রান্না-বান্না করবে। বীণা বড় ঘরের বারান্দায় রান্না চাপিয়েছিল। হরপ্রসাদ কৃপাল আর দয়ালকে নিয়ে গল্পে মেতেছিল। সেদিন আর ওদের পড়তে বসতে বলা হয় নি। বিমলা সবই শুনতে পাচ্ছিলেন। এদিকে মেঘুর মা নানানখানা বকবক করছিল। বিমলা বুকে সন্তান নিয়ে, কেমন একটা নিবিড় স্বস্তি বোধ করছিলেন।

আজ সেইদিন। আঠারো বছর আগের সেই দিন, এখন বেলা এগারোটা। চুপ করে বসে, চোখ বুজলে, বিমলা চমকে চমকে উঠছেন। পেটের মধ্যে যেন কিছু নড়েচড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল! ঘরের কোণে, জবা গাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন বিমলা। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন। হ্যাঁ,

আবার, আবার মনে হচ্ছে, পেটের মধ্যে ভ্রূণ নড়ছে। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করলেন। এ আবার কী, এরকম মনে হচ্ছে কেন। সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা তাঁর অনেককাল গত হয়েছে। আজ কে এমন করে তাঁর গর্ভের মধ্যে নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। বাদল কি তাঁর শরীরের মধ্যে মিশে আছে। তিনি মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল বাদল!'

'মা! ও মা!'

কৃপালের গলা। কৃপাল ডাকছে। বিমলা সাড়া দিলেন না, নড়লেন না। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরটাই শক্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টি ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। ছেলেদের ডাকে কোনোদিন সাড়া দিতে ভোলেন না। আজ বিমলার মুখে সাড়া নেই। আজ তিনি সাড়া দেবেন না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, আস্তে আস্তে তাঁর মনে পড়ল, কৃপাল দয়াল ভাইকে নিয়ে ছেলেবেলায় কেমন খেলা করতো। কৃপাল দয়াল পিঠোপিঠি ছিল। বাদলের বয়স কম ছিল। মাঝখানে দু'জন মারা গিয়েছিল। দয়ালের প্রায় সাত বছরের ছোট বাদল। বাদলকে ওরা কোলে করে বেড়িয়েছে। মায়ের কাজের সময় দেখা-শোনা করেছে। ছোট ভাইটিকে দুজনেই ভালবাসতো। কাড়াকাড়ি করে খেলতো। ছোট ভাইকে কিছু না দিয়ে দু'জনে মুখে তুলতো না। পিঠোপিঠি হলে তা হত না। কৃপাল দয়ালের তো রোজ ঝগড়া মারামারি লেগে ছিল। ওরা দুজনে ছিল সমানে! ওদের মারামারি থামাতে বিমলাকে লাঠি তুলতে হত। হরপ্রসাদও শাসন করতো। কিন্তু বাদলকে নিয়ে দু'জনেরই কাড়াকাড়ি। সব কথাই মনে আছে বিমলার। বাদল যখন কথা বলতে শিখেছিল, তখন কৃপাল দয়াল জিজ্ঞেস করত, বাদল কাকে বেশি ভালবাসে। কার কাছে থাকতে চায়। বাদল দু'জনের কাছেই থাকতে চাইতো। লোভী শিশু, সে বুঝতে পারতো, কাউকেই সে হারাতে চায় না। দুই দাদারই মন জুগিয়ে কথা বলত। বিমলা আড়ালে মুখ টিপে হাসতেন, মনে মনে বলতেন, 'এক ফোঁটা ছেলের চালাকি দেখ।'

হরপ্রসাদও ছোট ছেলেটিকে ভালবাসতো। কৃপাল দয়াল যত না আদর কাড়তে পেরেছে, কোলে চাপতে পেরেছে, বাদল সব কিছুই বেশি পেয়েছে।

কিন্তু সে সবই ছেলেবেলার কথা। তখন সংসারের চেহারা ছিল অন্য রকম। হরপ্রসাদ চাকরি করতো, আর প্রকাশ্যেই রাজনীতি করতো। অবসর সময়ে, নিজের দল নিয়ে মেতে থাকতো। বিমলার তাতে কোনোদিন কিছু যায় আসেনি। পুরুষ মানুষ, কত কী নিয়ে থাকে। মেয়েদের সে সব ভাবতে গেলে চলে না।

বিমলা বরং মনে মনে খুশিই ছিলেন। হরপ্রসাদ দশজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সভা সমিতি করছে। তবু নেশা ভাঙ করে বাজে আড্ডায় তো সময় নষ্ট করে না। টাকাও নষ্ট করে না। সবাই হরপ্রসাদদা বলে ডেকে নিয়ে যায়। পাড়ার একজন গণ্যমান্য লোক। বাইরে বাইরের মত, সংসারে সংসারের মত, স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে গরীব মধ্যবিত্তের জমজমাট পরিবার।

আস্তে আস্তে রূপাল দয়াল বড় হয়ে উঠতে লাগলো। ওদের পিছনে পিছনে বাদলও। যত বড় হয়ে উঠতে লাগলো, সবাই যেন কেমন বদলে যেতে লাগলো। বাদল দাদাদের সঙ্গ আর পাচ্ছিল না। ওরা তখন বাইরের জগত নিয়ে ব্যস্ত। ওদের কোথায় কী দল, বন্ধু, সে সব নিয়েই ব্যস্ত। বাড়িতে ওদের দেখা পাওয়া ভার। বাদলও ওর জগত খুঁজে নিয়েছিল। ওরও বন্ধু ছিল, খেলাধূলা ছিল। বিমলা এসব দেখেছেন, বিশেষ করে কখনো কিছু ভাবেন নি। বরং মনে হয়েছে, এ রকমই হয়। সকলেরই হয়। বড় হচ্ছে তো সব। সকলেই যে যার আলাদা পথে ফিরছে।

কেবল হরপ্রসাদ বিরক্ত হচ্ছিল। কখনো রাগ, কখনো ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। বিশেষ করে রূপাল আর দয়ালের ওপরে। বিমলা হরপ্রসাদের কাছেই শুনতেন, রূপাল দয়াল কলেজে ঢুকে নাকি রাজনীতি করছে। ছাত্ররা সবাই করে। রূপাল দয়ালের কী দোষ বিমলা ভেবে পেতেন না। একটা কথা বুঝতে পারতেন, হরপ্রসাদ যে রাজনীতি করে, রূপাল দয়াল তা করে না। বিমলা বলতেন, 'কলেজে ওরা কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ।'

হরপ্রসাদ রেগে জবাব দিতেন, 'ওসব রাজনীতির নামে গুণ্ডামী। আমার পয়সায় কলেজে পড়ে ওসব চলবে না। তোমার ছেলেদের এ কথা জানিয়ে দিও।'

হরপ্রসাদের কথার ধরনে বিমলা মনে মনে রুষ্ট হতেন। আবার ভাবতেন, বাবা যে রকম বলে, ছেলেদের সেরকম চলাই উচিত। তাহলে আর সংসারে কোনো গোলমাল থাকে না। রূপাল দয়ালকে তিনি বলেছেন, 'কলেজে যাস্ পড়তে, সেখানে আবার ওসব কী। তোদের বাবা পছন্দ করে না।'

ওদের এক জবাব, 'ওসব তুমি বুঝবে না মা।'

একমাত্র বাদলকে নিয়ে তখন কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। হরপ্রসাদেরও কোনো অভিযোগ ছিল না। মায়ের সঙ্গেই বাদলের ভাব বেশী। সংসারের কাজে কর্মে বাদলকেই পেতেন। বকে ধমকেই করাতে হত, তবু করত। কিন্তু দিনে দিনে সংসারের চেহারাটা বদলে যাচ্ছিল।

ক্লপালের সঙ্গেই প্রথম হরপ্রসাদের লাগলো। বাইরের বিবাদ ঘরে এসে ঢুকেছিলো। কেবল তর্কাতর্কিতেই সব শেষ হত না। হরপ্রসাদ ক্ষেপে উঠত। ক্ষেপে উঠে যা তা বলতো। ক্লপাল মাথা নোয়াতো না। সে হরপ্রসাদের দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে থাকতো। বিমলা এসে ক্লপালকে সরিয়ে দিতেন, 'সরে যা এখান থেকে। বাপের মুখে মুখে কথা বলতে লজ্জা করে না।'

বিমলা হরপ্রসাদেব ওপর খুশি হতেন না। ক্লপাল তো ওর ছেলে, বাইরের শত্রু না। কিন্তু কথা শুনলে সেরকমই মনে হত। কেবল ক্লপালের সঙ্গে না, দয়ালের সঙ্গেও হরপ্রসাদেব একই ব্যাপার ঘটতো। বিমলা মনে করতেন, ক্লপাল দয়াল একই দল করে।

বিমলার সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয়নি, যখন দেখেছিলেন, দুজনের মধ্যে তর্ক ঝগড়া। নিতান্ত বাড়ির মধ্যে আব বিমলা সামনে থাকতেন বলে ওরা মারামারিটা করতে পারতো না। এত দলাদলি কিসের, বিমলা বুঝতে পারতেন না। সবাই মিলে একটা দল করলেই তো সব মিটে যায়। কিন্তু বাড়িতে তখন তিনটে দল। হরপ্রসাদ, ক্লপাল, দয়াল। আর এক দলে বিমলা আর বাদল। তবে বাদল একেবারে নিরপেক্ষ ছিল না। ছোড়দা দয়ালের দিকে ওর টান বেশি। বলতো, 'ছোভদা ঠিক বলে।'

বিমলা জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন ?'

বাদল বলতো, 'আমাদের স্কুলের সব ওপর ক্লাসের ছেলেরা ছোড়দাকে মানে। ছোভদা গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে, সব ছেলেরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে।'

'তুই বুঝি ছোড়দার মত হবি!'

সে বিষয়ে বাদল কিছু বলত না। ওর জবাব ছিল, 'তা আমি কি করে জানব।'

বিমলা বলতেন, 'তুই ওসবের মধ্যে যাসনি। দেখছিস না বাড়িতে কী রকম অশান্তি।'

যত দিন যাচ্ছিল, অশান্তির চেহারাটা বদলে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ, ক্লপাল, দয়াল, কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলতো না। বিমলা রান্না-বান্না করেন, ওরা এসে খায়। রাত্রে শোয়। ক্লপাল দয়াল রোজ রাত্রে বাড়িতেও থাকতো না। পড়াশোনা হচ্ছিল না। ক্লপাল একটা চাকরি জোগাড় করে নিয়েছিল। দয়ালেরও সেই অবস্থা। পড়া হবে না। কিন্তু কেবল পার্টি করলে চলবে না। ওরও একটা চাকরি চাই।

ইতিমধ্যে বাদল বড় হয়ে উঠছিল। ক্লাস টেনে পড়বার সময় ওর টাইফয়েড হয়েছিল। বিমলার ভেতরটা ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল। নানা অশুভ চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল। এতখানি বড় বয়সে কোনো সন্তান তাঁকে হারাতে হয়নি। এমন ভারী রোগও কারোব হয়নি। তখন দেখা গিয়েছিল, কৃপাল ডাক্তার ডেকে এনেছিল। দয়াল বসে বসে বাদলের মাথায় ববফ দিয়েছে। রক্ত বিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্য নিয়ে গিয়েছে। হরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন মুখে, বাদলেব বিছানাব সামনে বসে থেকেছে।

তখন তো বাদল কোন পার্টি করে না। কবলে কী চেহারা হত, কে জানে।

বিমলার চোখের সামনে ভেসে উঠলো শ্মশানযাত্রার ছবি। এ বাড়িব উঠোন থেকেই ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বাদলকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহ ঘিরে ছিল বাদলের বন্ধুরাই, ওর পার্টির লোকেরা। কৃপাল দয়াল সেখানে এসে দাঁড়ায়নি। বোধ হয় দাঁড়াতে পারেনি। হরপ্রসাদ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। তাকে কেউ একটা কথা বলেনি। সেও বলেনি। বাদলকে ওর বন্ধুরাই কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা নয়, ভাইয়েরা নয়, পার্টির ছেলেদের কাঁধে বাদলেব মৃতদেহ শ্মশানে গিয়েছিল। হবপ্রসাদ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। দাদারা বাড়িতে ছিল না।

টাইফয়েডের সময়, বাদল যদি পার্টি করতো, তাহলে কী হত কে জানে। শ্মশানযাত্রার মতই হয় তো, বাবা দাদারা দূরে সরে থাকতো। পার্টির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পার্টির পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। একে কেমন পার্টি করা বলে, বিমলা বোঝেন না। বিমলা শুধু সংসারটা মাথায় করে রেখেছেন।

কিন্তু পার্টিই তা হলে সব। বিমলার চোখে যেন আগুনের আঁচ লাগে। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে শহীদ বেদী থেকে। তিনি বাড়ীর দিকে ফিরে তাকান। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে গোটা বাড়িটাকে যেন একবার দেখে নেবার চেষ্টা করেন।

'কোথায় গেলে, অ্যাঁ? শুনছ।'

হরপ্রসাদের গলা। বিমলাকে ডাকছে। বিমলা সাড়া দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার তাকালেন ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। তাঁর মনে পড়ল, আজ যেন কিসের ছুটি। কৃপাল হরপ্রসাদ কেউই কাজে যায়নি। কিন্তু বিমলা সাড়া দেবেন না। আজ আর এ সময়ে তিনি সাড়া দিতে পারছেন না। তাঁর

ভিতরে কী যেন ঘটছে। আঠারো বছর আগে, এই দিনে, এই সময়ে যা ঘটেছিল তাঁর সারা শরীরে যেন সেই ভাব। ওই বেদীতে না, শ্মশানে না, বাদল যেন তাঁর ভিতরে রয়েছে। বাদল পৃথিবীতে আসতে চাইছে।

বাদল যখন টাইফয়েড থেকে সেরে উঠেছিল, তখন ছেলেটা বড় রুগ্ন হয়ে গিয়েছিল। মনে হত ওকে শিশুর মত কোলে নেওয়া যায়। প্রায় একটা বছর পড়া নষ্ট হয়েছিল। তা হোক, তবু প্রাণে বেঁচেছিল, বিমলার সেটাই সান্ত্বনা। কৃপাল দয়ালের অসুখ হলেও সেই রকমই হত। হরপ্রসাদের অল্পস্বল্প অসুখ করলেও বিমলা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লোকটা যাই করে বেড়াক, শরীরের দিক থেকে খুব শক্ত না। তাছাড়া, হরপ্রসাদই তো একমাত্র কাণ্ডারী। স্বামীকে তিনি কখনো কোনো কারণে অযত্ন করেননি।

বাদল রুগ্নতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠেছিল। আগের মত স্বাস্থ্য না, তার চেয়েও যেন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। ও বরাবরই একটু কথা কম বলতো। বিমলার মত। বিমলা কথা কম বলেন। বেশি বলবার অবকাশ এ সংসার তাঁকে দেয়নি। সারাটা সংসার তাঁর মাথায়। স্বামী পুত্রদের খাওয়া-দাওয়া দেখা-শোনা। বাসন মাজা আর ঘর পরিষ্কার করা ছাড়া, সবই তাঁর নিজের হাতে।

বাদল কথা কম বলতো। বিমলা মনে করতেন, বাদল কৃপাল দয়ালের পথ ধরবে না। বাড়িতে তিনটি পার্টির লোক। কারোর সঙ্গে কারোর সদ্ভাব নেই, কথাবার্তা বন্ধ। বাদল সব দেখেছে শুনেছে। দেখে শুনে ও আর ও পথে যাবে না।

বিমলা ভুল ভেবেছিলেন। কলেজে ঢোকবার আগেই বিমলার কানে এল, বাদল আর একটা পার্টিতে ঢুকেছে। বিমলা বলেছিলেন, 'তুইও ওসব পার্টি করতে যাচ্ছিস!'

বাদলের কথা কম। সে মায়ের কথার জবাব দেয়নি। কিন্তু হরপ্রসাদ ছাড়েনি। কৃপাল দয়ালের সঙ্গে যে রকম ঝগড়া করেছে, তেমনি করেই বাদলকে বকেছে, ধমকেছে। বলেছে, 'তুই গিয়ে একটা খুনী পার্টির সঙ্গে জুটেছিস।'

বিমলা অবাক হয়ে শুনেছিল, বাদল ওর বাবাকে বলছে, 'আমাদের পার্টি খুনী পার্টি না।'

হরপ্রসাদ চিৎকার করে বলেছে, 'আলবৎ খুনী পার্টি। কতগুলো গুণ্ডা, বদমাইস, লোচ্চা ছাড়া ও পার্টিতে কোন ছেলে নেই। তুই আমাকে শেখাতে আসিস না।'

বাদল বলেছিল, 'আমি কাউকেই কিছু শেখাতে যাচ্ছি না।'

বিমলার মনে হয়েছিল, বাদলকে তিনি চিনতে পারছেন না। ও শান্ত আর গম্ভীর ভাবে ওর বাবার কথার জবাব দিচ্ছিল। কৃপাল দয়ালের মত গলা চড়িয়ে, উত্তেজিত হয়ে কথা বলেনি। বিমলা অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, বাদল কবে থেকে ওরকম কথা বলতে শিখলো। ও যেন কত বড় হয়ে গিয়েছে, কত কী বোঝে। অবাক হওয়ার সঙ্গে একটু একটু রাগও হয়েছিল। বাদল যদি ছেলেমানুষের মত চিৎকার চেঁচামেচি করতো, তা হলেই যেন বিমলা খুশি হতেন। অথচ, আবার, বাদল ওরকম করে কথা বলেছিল বলে, একটা কেমন গর্ববোধও করেছিলেন।

কিন্তু হরপ্রসাদ দু রকম কথা জানতো না। ঠিক যেমনভাবে কৃপাল দয়ালকে বলেছিল, তেমনি ভাবেই বাদলকে বলেছিল, 'ওসব কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এ বাড়িতে থাকতে হলে তোকে ওই পার্টি ছাড়তে হবে।'

হরপ্রসাদের এ ধরনের কথা বিমলার কখনো ভাল লাগে না। মানুষটা কথায় কথায় বাড়িতে থাকার খোঁটা দেয় কেন। বাদল ওর বাবার সে কথার কোনো জবাব দেয়নি। সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ নিজের মনেই গজগজ করেছিল, 'যারা দেশ গড়তে জানে না, কেবল ধ্বংস করতে চায়, তাদের আমি আমার বাড়িতে চাই না। তারা যে যার নিজের রাস্তা দেখে নিক গিয়ে ···।' এমনি অনেক কথা বলেছিল। বিমলাও হরপ্রসাদের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন। লোকটা কেবল বকতে ধমকাতেই জানে। কখনো দেখা গেল না, মাথা ঠাণ্ডা করে ছেলেদের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। যেমন কৃপাল দয়ালের সঙ্গে করেছে, বাদলের সঙ্গেও সেই রকম করে কথা বলেছিল।

বিমলার বুকভরা অশান্তি আর উদ্বেগ। শেষ পর্যন্ত বাদলের ওপরেই তাঁর রাগ হয়েছিল। সংসারে এত কিছু থাকতে, পার্টি ছাড়া, আর কি কিছু করার নেই। বাদলটাও শেষ পর্যন্ত সেই একই পথে চলে গেল। তিনি বাদলকে বলে ছিলেন, 'তুই লেখাপড়া করবি, খাবি দাবি, খেলা করবি। তুই কেন আবার পার্টি করতে গেলি?'

বাদল শান্তভাবেই বলেছিল, 'আমি তো কারোর কোনো ক্ষতি করছি না।'

বিমলা রেগে বলেছিলেন, 'ওসব ক্ষতি টতি জানি না। একটা সংসারের মধ্যে তোরা সব এক একটা পার্টি নিয়ে থাকবি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করবি, এসব আর আমি সহ্য করতে পারছি না। তুই ওসব পার্টি টার্টি ছাড়।'

বাদল গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'আমি বাড়িতে কারোর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে চাই না। পার্টি আমি ছাড়তে পারব না।'

বিমলা বলেছিলেন, 'তা ছাড়বি কেন। তাহলে যে আমার একটু সুখ হয়। বুঝেছি রে, বুঝেছি, আমি না মরলে তোরা বাপ ভাইয়েরা কেউ পার্টি ছাড়বি না। এ আমি কোথায় আছি। এটা কি একটা সংসার। কতকগুলো পার্টি ছাড়া এ বাড়িতে কিছু নেই।'

বিমলার গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। চোখে জল এসে পড়েছিল। আবার বলেছিলেন, 'এবার আমাকেও একটা পার্টিতে গিয়ে ঢুকতে হবে।'

মায়ের কথা শুনে বাদল বোধহয় একটু বিচলিত হয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি এরকম করছ কেন। বলছি তো, আমি বাবা দাদাদের কারোর সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি না।'

কিন্তু বাদলের সে-কথা টেঁকেনি। কখনো কৃপাল, কখনো দয়াল, কখনো বা হরপ্রসাদের সঙ্গে, তর্কাতর্কি বিবাদ লেগেই ছিল। বাইরের অশান্তি বাড়িতে দানা বেঁধে উঠেছিল। বাইরের যত গোলমাল, বাড়িতে এসে তার বোঝাপড়া চলছিল। সকলেই আলাদা আলাদা করে বাদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল। বিমলা সেই সব কথা থেকেই বুঝতে পারতেন, বাদল রীতিমত পার্টির কাজ করছে। লেখাপড়া ওর মাথায় ছিল না।

প্রথম কৃপালই একদিন বিমলাকে বলেছিল, 'বাদলা খুব বেড়ে উঠেছে। ওকে সাবধান করে দিও। কোনদিন একটা কী ঘটে যাবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না।'

বিমলা বলেছিলেন, 'আমাকে বলতে এসেছিস কেন। নিজের ভাইকে নিজেরা বোঝাতে পারিস না।'

'ও বোঝবার বাইরে চলে গেছে।'

বিমলা তিক্ত করেই জবাব দিয়েছিলেন, 'আর তোরা বুঝি ভেতরে আছিস। তুই নিজে পার্টি ছাড়তে পারিস না?'

কৃপাল বলেছিল, 'আমার যা বলবার বলে দিলাম। বাদলা আগুন নিয়ে খেলা করছে। রোজ মাস্তানি আর মারামারি করে বেড়াচ্ছে।'

সকলেরই সকলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ। বিমলার সামনে এসে কৃপালই যে কেবল বাদলের বিরুদ্ধে শাসিয়েছে, তা না। দয়ালও একইভাবে শাসিয়েছে। বিমলার সব থেকে অবাক লেগেছিল, হরপ্রসাদও যখন এক রকম ভাবেই শাসিয়েছে। বলেছে,

'তোমার ছোট ছেলেকে বলে দিও, এখনো সময় আছে। ও যেন সাবধান হয়ে যায়। ওর বড় পাখনা গজিয়েছে। ও পাখনা পুড়ে যাবে।'

বিমলার বুকের মধ্যে সেদিন একবার কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু হরপ্রসাদের ওপর রাগও হয়েছিল। বলেছিলেন, 'নিজের ছেলেকে নিজে বোঝাতে পার না। তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও। তুমি পার্টি ছাড়তে পার না। তারপরে ছেলেকে বলতে পার না? সবাই এসে আমার কাছে বলছ?'

হরপ্রসাদ বলেছিল, 'তুমি ওসব বুঝবে না। আমার পার্টি ছাড়ার কিছু নেই। আমি ওদের মত গুণ্ডা পার্টি করছি না। কিন্তু বাদলা যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছে, ও একটা কিছু না ঘাটিয়ে ছাড়বে না।'

বিমলা তিক্ত রাগে বলেছিলেন, 'আমাকে ওসব কথা বলে লাভ নেই। আমি তোমাদের সংসারে একটা দাসী বাঁদী আছি। তোমাদের খেদমত খাটছি। আর তোমরা লড়াই করছ। এবার আমাকে তোমরা রেহাই দাও।'

বিমলা হরপ্রসাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। শুনেছিলেন, তারপরেও হরপ্রসাদ আপনমনে বকবক করছিলেন, 'বাদলার মরণ ধরেছে। পার্টির নেতাদের উস্‌কানিতে ও নিজেকে কী একটা ভাবতে আরম্ভ করেছে...।'

বিমলার বুকের মধ্যে আবার কেঁপে উঠেছিল। বাবা হয়ে হরপ্রসাদ কেমন করে বলেছিল, ছেলেটার মরণ ধরেছে। কেবল বাদলের বেলায় না। হরপ্রসাদ সকলের বেলাতেই ও কথা বলেছে। কৃপাল দয়ালের কথাতেও বলেছে, ওদের মরণ ধরেছে। হরপ্রসাদ কি ছেলেদের বাবা নয়। পিতৃত্বের থেকেও পার্টি কি বড়? ওদের কি ভ্রাতৃত্ব বলতে কিছু নেই। পার্টি কি তার ওপরে। এই সংসারের মাঝখানে বসে এ কথাটা কোনোদিন তিনি বুঝতে পারেননি। কেবল ভেবেছেন, তাঁর ঘরে কেন এত অশান্তি। বাপছেলেরা মিলে, একটা সুখের সংসার কি ওরা ওরা গড়তে পারতো না। তার বদলে ওরা এক একজন এক একজনের বিরুদ্ধে কেবল মরণ ধরাটাই দেখতে পেয়েছে।

বিমলা বাদলকে বলেছিলেন, 'তোর বাবা দাদারা সবাই তোর নামে নালিশ করছে। তুই কি একটা বিপদ আপদ না ঘটিয়ে ছাড়বি না?'

বাদল বলেছে, 'বিপদ আপদ আবার কী। ওরা চায়, ওরা পার্টি করবে আমি চুপচাপ বসে থাকব। তা আমি থাকব কেন? ওদের শাসানিকে আমি কাঁচকলা ভয় পাই। বেশি ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করতে এলে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।'

বিমলা তবু ধমকে বলেছেন, 'তুই কেন ওদের সঙ্গে লাগতে যাস্?'

বাদল বলেছিল 'আমি কেন লাগতে যাব। ওরাই আমাদের সঙ্গে লাগতে আসে।'

'কেন, তুই বাবা দাদাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারিস না?'

'বাবা দাদারা বুঝি মিলেমিশে আছে? পার্টির ব্যাপারে কারোর সঙ্গে কারোর মিল মিশ হবে না।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছে, 'পার্টির সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারব না। তা বাবা আর দাদারা আমাকে যতই শাসাক। সবাই তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, আমার বেলাতেই খালি শাসানি। আমি কারোর পরোয়া করি না।'

বিমলা তারপরেও মোক্ষম কথাটি বলতে ছাড়েননি, 'বাপের অমতে এসব করছিস। এর পরে যদি তোর বাবা তোকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে?'

বাদল অনায়াসে জবাব দিয়েছে, 'বের করে দেয়, চলে যাব। তা বলে বাবাকে, বাবার পার্টিকে সমর্থন করতে পারব না।'

বিমলা যেন শাঁখের করাতের তলায় পড়েছিলেন। কোনোদিকে তাঁর শান্তি ছিল না। স্বামী পুত্রদের কারোকে তিনি বোঝাতে পারেননি। সংসারের মধ্যে চারটে পার্টির লড়াই চলছিল। একসঙ্গে বসে বাবা ছেলেদের খাওয়া উঠে গিয়েছিল। যদি বা কোনোদিন সবাইকে একসঙ্গে খেতে দিতেন, কেউ কারোর সঙ্গে একটি কথা বলতো না। কলের পুতুলের মত সবাই নিঃশব্দে খেয়ে উঠে যেত।

'মা। মা কোথায় গেলে?'

এখন দয়াল ডাকছে। এর আগে কৃপাল ডেকেছে। হরপ্রসাদও ডাকাডাকি করেছে। বিমলা কোনো সাড়া দেননি। এবারও সাড়া দিলেন না। ওদের সকলের ডাকে চিরদিন সাড়া দিয়ে এসেছেন। আজ তিনি ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ওই মোড়ের অবহেলিত ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ওইখানেই বাদলকে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। শনশন পুবে বাতাসের সঙ্গে এবার ইলশেগুঁড়ি ছাঁটের মত বৃষ্টি নেমে এল। জবা গাছটা ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বিমলার গায়ে মুখে পড়তে লাগল। তিনি নড়লেন না। তিনি আর ওই রান্নাঘরটায় গিয়ে ঢুকতে পারছেন না। আঠারো বছর আগে বাদলের ওই আঁতুড় ঘরে গিয়ে ঢুকলেই, তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন করছে। বিমলা স্থির থাকতে পারছেন না। তাঁর পেটের মধ্যে যেন কেবলই কী নড়েচড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল কি এখনো তাঁর গর্ভে!

বিমলা চোখ বুজে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপলেন। ব্যথা উঠছে নাকি তাঁর পেটে। তাঁর চোখের সামনে বাদলের সেই চেহারাটাই আবার ভেসে উঠল। ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত মৃত বাদল। সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে, সকলের শাসানির কথা তাঁর মনে পড়েছিল। এই তিন মাস ধরে, বারে বারে মনে মনে জিজ্ঞেস করেছেন, কারা মেরেছে বাদলকে। কৃপালের দল? দয়ালের দল, না হরপ্রসাদের দল? সবাই অস্বীকার করেছে, তাদের দল বাদলকে মারেনি। পুলিশ যাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে, তারাও অস্বীকার করেছে, বাদলকে তারা মারেনি। অথচ সবাই শাসিয়েছে, সাবধান করে দিয়েছে। কৃপাল দয়াল হরপ্রসাদের পার্টি ছাড়াও আরও পার্টি আছে। কিন্তু কেউ স্বীকার করেনি, বাদলকে কারা মেরেছে। বিমলাও জানেন না, কাদের হাতে বাদলের রক্ত লেগে আছে।

যতই অস্বীকার করুক, কোনো না কোনো পার্টির হাতেই বাদলের রক্ত লেগে আছে। সেটা কোন পার্টি? কৃপাল দয়াল হরপ্রসাদের কথাই আগে মনে আসে। ওরা সকলেই বলেছে, বাদলেব মরণ ধরেছে। অথচ, তারা বিমলাব স্বামী পুত্র। বাদল কি হরপ্রসাদের ছেলে ছিল না। কৃপাল দয়ালের ভাই ছিল না? কেবল কি একটা পার্টির ছেলে। ওদের বিরুদ্ধ পার্টির ছেলে একটা? বাদল কি এই সংসারে একমাত্র বিমলারই ছেলে। তা-ই যদি হয়, তবে বিমলা আজ ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না।

বিমলা শুনতে পাচ্ছেন, ওরা সবাই তাঁকে ডাকাডাকি করছে। কৃপাল ডাকছে. দয়াল ডাকছে, হরপ্রসাদও ডাকছে। ওরা নিজেরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। আলাদা আলাদা ডেকে চলেছে।

'মা, ও মা।'

'মা কোথায় গেলে?'

'কই গো শুনছো, কোথায় গেলে?'

বিমলা টের পাচ্ছেন, উঠোনে, ঘরে ঘরে, রান্নাঘরে, সবাই তাঁকে ডাকাডাকি করছে। বৃষ্টির ছাঁটে ছুটোছুটি করছে। শুনতে পাচ্ছেন, দয়াল রান্নাঘরের কাছ থেকে, কণার মাকে চিৎকার করে ডাকছে, 'মাসীমা, ও মাসীমা।'

কণার মায়ের জবাব শোনা গেল, 'কী বলছিস রে দয়াল।'

'মা কি আপনাদের বাড়িতে আছে?'

'না তো। সকাল থেকে একবারও আসে নি তো। কোথায় গেল তোর মা।'

'কী জানি, দেখতে পাচ্ছি না। রান্নাঘরের দরজা খোলা কুকুর ঢুকে কড়ার তরকারি খেয়ে গেছে। রান্নারান্না কিছু হয়নি।'

কণার মায়ের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল, 'সে কি রে। তোর মায়ের তো একরকম কখনো হয় না। ছাখ্ খুঁজে কোথায় গেল। আমিও দেখছি।'

কোথাও যাননি বিমলা। বাড়িতেই আছেন। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে দেখছেন। যারা বেদী তৈরি করেছিল তারাই বা আজ কোথায়। একটা শহীদ বেদী করেছিল। তিন মাসের মধ্যেই সেটা ভেঙে পড়েছে। তাদেরই বা কী হারিয়েছে। তারা সেই যে শহীদ বেদীতে বিমলাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরে আর আসেনি। তারা যেমন পার্টি করছিল, তেমনি করছে। এ বাড়ির বাবা ছেলেরাও করছে।

বিমলারই শুধু হারিয়েছে। দশ মাস বাদলকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তাঁর নাড়ি ছিঁড়ে বাদল এই পৃথিবীতে এসেছিল। আঠারো বছর আগে, এতক্ষণে মেঘুর মা বাদলকে ধুয়ে মুছে, তাঁর বুকের কাছে তুলে দিয়েছে। গম্ভীর স্বরে ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে। বিমলা তাকে স্তন চেনাবার চেষ্টা করছেন।

বিমলার গায়ের মধ্যে কেঁপে উঠল। বাদলকে তিনি যেন বুকের মধ্যে অনুভব করছেন। বাদল কোথাও নেই, শ্মশানে না, শহীদ বেদীতে না। তাঁর বুকেই আছে।

'বড় বৌ'—

হরপ্রসাদ ছাতা মাথায় দিয়ে এসে দাঁড়াল। বিমলার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইলেন। হরপ্রসাদ তার ভাইদের মধ্যে সকলের বড়। পূর্ববঙ্গে, একান্নবর্তী পরিবারে, বিমলাকে বড় বৌ বলেই ডাকা হত। হরপ্রসাদ কখনো কখনো তাঁকে ওই নামে ডাকে। বিমলা কোন জবাব দিলেন না।

হরপ্রসাদ বলল, 'আমরা তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ ?'

সে কথা হরপ্রসাদকে বলবার দরকার নেই। বিমলা জানেন, আজ বাদলের জন্মদিন, হরপ্রসাদের সে কথা মনে নেই। ছেলেদেরও কারোর মনে থাকে না। বিমলা ভুলতে পারেন না, কবে কোন ছেলেকে তিনি প্রসব করেছেন। মুখে কিছু বলেন না। কেবল তিন ছেলের জন্মদিনে ওদের একটু পায়েস রান্না করে খাইয়ে দেন। এতকাল দিয়ে এসেছেন। গত বছরও এই দিনে বাদলকে পায়েস রান্না করে খাইয়েছিলেন। বাদলের জন্য আর তাঁকে পায়েস রান্না করতে হবে না।

হরপ্রসাদের গলায় অসহায় বিস্ময়, কারণ সে বিমলার কিছুই বুঝতে পারছে না। বলেই চলেছে, 'রান্নাবান্না কিছু করনি। আধকাঁচা তরকারি কুকুরে খেয়ে গেছে। কী ব্যাপার তোমার ?'

হরপ্রসাদ ব্যাপার কিছুই বুঝবে না। বিমলা কিছুই বলতে চান না। তাঁর চোখের সামনে শিশু বাদল খেলা করে বেড়াচ্ছে। দুরন্ত দুষ্টু ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছে। গায়ে হাতে পায়ে কাদা মাখা। তারপরে বাদল বড় হচ্ছে। কিশোর বাদল স্কুলে যাচ্ছে। মায়ের কাছে দুটো পয়সার জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বাদল ছাড়া বিমলার কাছে এখন আর কিছু নেই। বাদল বাদল বাদল। সকলের কাছে ও ছিল একটা পার্টির ছেলে। সন্তান শুধু বিমলার।

হরপ্রসাদের গলার শব্দে কৃপাল দয়ালও এসে দাঁড়াল। ওরা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। ওরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করতে পারছে না। বিমলাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থ হয়ে গিয়েছে।

কৃপাল বলল, 'মা তুমি এখানে, কী হয়েছে ?'

সবাই অবাক। সবাই বিমলাকে বুঝতে চাইছে। কিন্তু ওদের বোঝার কিছু নেই। এরা তাঁর স্বামী পুত্র। এদের ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। কিন্তু আজ তিনি ওদের সঙ্গে নেই। আজ ওরা সারাদিন পার্টি করতে চলে যাক। বিমলা আজ বাদলকে নিয়ে থাকবেন। বাদল এখন তাঁর বুকে।

হরপ্রসাদ বলল, 'ঘরে চল বড় বৌ। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজো না।'

বিমলার দৃষ্টি মোড়ের ভাঙা বেদীর দিকে। স্পষ্ট করে বললেন, 'যাব না।'

তিন পার্টির লোক নিজেদের মধ্যে অবাক হয়ে চোখাচোখি করল। কৃপাল বলল, 'রান্নাবান্না করো নি, আমরা খাব কী।'

বিমলা নিচু পরিষ্কার গলায় বললেন, 'আজ আমি খেতে দিতে পারব না।'

তিনটে পার্টির লোক অবাক। বিমলা তাদের কাছে, পার্টির থেকেও যেন জটিল হয়ে উঠেছে দয়াল বলে উঠল, 'আমরা তবে কী করব এখন ?'

বিমলা বললেন, 'তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না।'

অন্তহীন বিস্ময়ে তিনজনেই চুপ। বিমলা ওদের সামনে থেকে সরে গিয়ে, ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তিন জনেই দেখল। তিন জনের চোখেই অপরিচয়ের দৃষ্টি। যেন স্বামী চিনতে পারছে না স্ত্রীকে। ছেলেরা মাকে। অথচ

কোনো কথা বলতেও যেন আর তাদের সাহস হচ্ছে না। এই প্রথম, তারা শুধু অবাক না, বিমলাকে যেন তাদের কেমন ভয় করছে।

তিনজনেই আরও একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টির ছাঁটে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তিনজনেই একটা অসহায় অস্বস্তি আর বিস্ময় নিয়ে একে একে চলে গেল।

বিমলা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টির ছাঁটে ধুয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বুকের কাছে এখন কিছু ঠেলে উঠেছে, গলার কাছে উঠে আসছে। তার চোখে এখন জল আসছে, বৃষ্টির জলে গাল ধুয়ে যাচ্ছে। তিনি বুকের কাছে হাত রেখে, মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল, তুই আমার কাছেই রয়েছিস। আমার কাছে থাক।'···

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

দিনকাল □ রমাপদ চৌধুরী

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আমাদের বড় মেয়েকে নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। সে একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতির, ছেলেবেলা থেকেই একটু বেশী লাজুক, এবং আমাদের দুজনেরই খুব বাধ্য ছিল। তার বি এস-সি পরীক্ষার ফল বের হওয়ার আগেই হঠাৎ একটি ভাল যোগাযোগ হয়ে গেল, অরুণা বললে ছেলেটি চমৎকার, তার বাড়ির পরিবেশটাও আমার পছন্দ হয়েছিল, আমি অরুণার সামনেই একদিন রুবিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এ বিয়েতে তোর মত আছে তো রুবি? রুবি বিষম লজ্জিত মুখ করে আমার সামনে থেকে পালিয়ে গেল। পরে অরুণার কাছে শুনলাম সে নাকি বলেছে, আমাব আবার মত কি, মেয়ের কিসে ভাল বাবা-মা ছাড়া আর কেউ বোঝে নাকি! শুনে আমার সত্যি খুব ভাল লেগেছিল। সৌভাগ্য আমাদের, ওরা সুখী হয়েছে।

আমার একমাত্র ছেলে অন্তুর বয়েস এখন একুশ। অন্তুর ভাল নাম নিরুপম। ও যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলো তখন ওকে দেখে নিতান্তই বালক মনে হতো অন্তু কখনো কখনো আমাদের লুকিয়ে চুলকাটার সেলুনে দাড়ি কামিয়ে আসতো, আমরা বুঝতে পারতাম, এবং ওর এই বড় হওয়ার চেষ্টা দেখে আমি ও অরুণা চোখাচোখি ভাবে নিঃশব্দে হাসতাম। ঐ বয়েস তো একদিন আমারও ছিল, তখন কি করে যে নিজেকে পূর্ণবয়স্ক যুবক ভাবতাম জানি না। আমার যতদূর মনে পড়ে প্রায় ঐ বয়সেই আমি প্রথম প্রেমে পড়ি। এবং সেটাই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেম। সে-সব দিনের কথা অরুণা কিছুই জানে না, জানলেও ও খুব একটা বিচলিত হতো বলে মনে হয় না। তবু আমার সেই কলেজ-জীবনের পরিচ্ছন্ন প্রেম-টুকুকে বিশুদ্ধ রাখার জন্যেই অরুণার কাছে তার আভাস কোনদিনই দিইনি। এমন কি আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে সেই পরম বঞ্চনা ও চরম আঘাতের কথা

কাউকে বলতে গেলে এই বাহান্ন বছর বয়সেও হয়তো আমার চোখের পাতা ভিজে যেতে পারে।

অন্তকে নিয়ে সে-জন্যেই আমার দুর্ভাবনার শেষ ছিল না। যৌবনের সেই হঠকারিতার পর থেকে প্রেম আমার কাছে একটি বিভীষিকা। তিরিশ-বত্রিশ বছর কেটে গেছে, সমস্ত স্মৃতি এখন ঝাপসা, কিন্তু প্রেমের মধ্যে, বিশেষ করে ব্যর্থপ্রেমের মধ্যে কি অসহনীয় কষ্ট, কি দুরন্ত জ্বালা, তা আমার আজও মনে আছে। আছে বলেই অন্তকে নিয়ে আমার এত ভাবনা।

কবি অন্তর চেয়ে দু' বছরের বড়। তার ফলে কবির সঙ্গে কলেজে যে মেয়েরা পড়তো তাদের দু-একজন আমাদের বাড়ি আসতো। তারা কিন্তু কেউই অন্তকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতো না। আমাদের কাছে অবশ্য সেটুকুই ছিল সান্ত্বনা। আমি হাসতে হাসতে অরুণাকে একদিন বলেছিলাম, ভাগ্যিস কবি ওর ছোট বোন নয়! শুনে অরুণা অবাক হয়ে হেসে ফেলেছিল, কি যে বলো, প্রেম কি অত সস্তা নাকি!

আমি বলতে পারতাম না যে প্রেম খুব সুলভ নয় বলেই আমার এত ভয়।

আসলে অন্তকে আমরা দুজনেই যে খুব ভালবাসি, দুজনেই যে তার জন্যে খুব গর্বিত, এটাই শেষ কথা নয়। আমরা তাকে কবির মতই সুখী দেখতে চেয়েছিলাম। এবং প্রেম সম্পর্কে আমার নিজের আতঙ্ক আমি নিশ্চয়ই অন্তর ওপর চাপিয়ে দিতে চাইনি। আমি মনে মনে এমন একটা উদার চিন্তাকেও লালন করেছি যে অন্ত যদি কোন মেয়েকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করতে চায়, তা হলে আমি সম্মতি দেবো তো নিশ্চয়ই, এমন কি অরুণার মনে কোন দ্বিধা থাকলেও আমি তা দূর করে দেবো। প্রকৃতপক্ষে প্রেমে আমার কোন ভয় ছিল না, ভয় ছিল ব্যর্থপ্রেমে।

আমার সমবয়স্ক সহকর্মীদের কয়েকজনকে আমার রীতিমত বৃদ্ধ মনে হতো। অথচ আমি নিজে কিছুতেই আমার নিজের বয়েসকে অনুভব করতে পারতাম না। সেজন্য সমবয়স্কদের সঙ্গে আমার তেমন মেলামেশা ছিল না। তাদের আলোচনায় আমি কোন আকর্ষণ বোধ করতাম না, তাদের সুখ-দুঃখ আমাকে স্পর্শ করতো না, কারণ চিন্তাভাবনা বা মানসিকতায় আমি এখনো যুবক। বাহান্ন বছরের যুবক। চাকরি থেকে অবসর নিতে আর ক' বছর বাকী আছে সে হিসেব একদিন অন্যের মুখে শুনে আমি বিষণ্ণ বোধ করেছিলাম। তবে আমার সেই সহকর্মীর মত বিব্রত বোধ করি নি। কারণ লেখাপড়ায় অন্ত খুব উজ্জ্বল না হলেও তার পরীক্ষার ফল

কখনো তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানিকে আমার চোখে নিষ্প্রভ করে দেয় নি। অন্তু চিরকালই অত্যন্ত উৎফুল্ল চরিত্রের ছেলে। এবং অত্যন্ত কোমল স্বভাবের। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্রত হবার কারণ ছিল না।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অন্তু স্বাভাবিক ব্যবহার করতো। সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে কখনো কখনো সে রাস্তায় যখন কথা বলতো বা কোন বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করতো তখন তার মধ্যে কোন জড়তা থাকতো না। অল্পবয়স থেকেই সেই মেয়ে কটির সঙ্গে সে বড় হয়েছে, রাস্তায় ক্রিকেট খেলেছে, একদল হয়ে সরস্বতী পূজো করেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কারো সম্পর্কে অন্তুর কোন দুর্বলতা আছে কিনা আমি অকারণেই কখনো কখনো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। কখনো মনে হয়েছে তেমন কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারলে আমি খুশীই হবো, অরুণার সঙ্গে ভাগাভাগি করে সেই মজাটুকু উপভোগ করবো।

অন্তু যেবার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হলো সেই বছর আমি প্রথম নিজেকে একটু বয়স্ক মনে করতে পারলাম। রুবির বিয়ের সময় এই অনুভূতিটা আসেনি, বরং মনে হয়েছিল রুবির বিয়েটা আমাকে জোর করে বয়স্কদের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। কিন্তু ছেলে বড়ো হলে নিজেরই বুড়ো হতে ইচ্ছে করে।

একবার অরুণার সঙ্গে পূজোর বাজার করতে বেরিয়েছিলাম, সঙ্গে অন্তু কিছুতেই যেতে চায় নি, তবু অরুণা তাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল একালের জামাইদের পছন্দ জানতে এবং রুবির জন্য শাড়ি বাছার কাজে সাহায্য পাবে বলে। সেখানে ভিড়ের মধ্যে লাজুকভাবে ও যে দুটি মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখেছিল আমি সে-দুটি মেয়েকে লক্ষ্য করেছিলাম। এবং অন্তুর রুচি ও পছন্দ দেখে খুশী হয়েছিলাম।

তাই প্রথম যেদিন ওর কাছে একটি মেয়ের টেলিফোন এলো, আমি ভয় পাই নি। ভীষণ মজা পেয়েছিলাম।

টেলিফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই একটি মধুর মেয়েলি কণ্ঠ জিগ্যেস করলো, নিরুপম আছে ?

আমি বললাম, না, সে একটু বাইরে গেছে, এক্ষুনি ফিরবে।

আমি প্রথমটা বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমাদের সময়ে কোন মেয়ে এভাবে টেলিফোন করেনি। মেয়েদের গলা শোনার জন্যে অন্যের বাড়ি থেকে আমরা তিনটি বন্ধু একবার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে সময় জানতে চেয়ে ফোন করেছিলাম, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অপারেটর মিষ্টি গলায় জবাব দিয়েছিল এইটুকুই মনে আছে।

সেকালে অটোমেটিক টেলিফোন ছিল না, অপারেটর বেশির ভাগই ছিল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

যে মেয়েটি নিরুপমের খোঁজ করছিল তার নাম জিগ্যেস করতে আমার সঙ্কোচ হলো, তা ছাড়া আমি একটু বেশী বেশী নরম গলায় উত্তর দিলাম। কারণ আমি শুনেছিলাম আজকাল ঐ বয়সের ছেলেদের অনেক মেয়ে-বন্ধু থাকে, আমি বিস্মিত হয়েছি বা অপছন্দ করছি কোনক্রমে জানতে পারলে মেয়েটি নিশ্চয় কলেজে তা রাষ্ট্র করে নিরুপমকে লজ্জায় ফেলবে।

তাই আমি মেয়েটিকে জিগ্যেস করলাম, নিরুপম ফিরে এলে তাকে কি কিছু বলতে হবে ?

মেয়েটি এক নিমেষের জন্যে কি যেন ভাবলো, তারপর বললে, না, আমিই আবার ফোন করবো।

মেয়েটি নাম বললো না বলেই আমার মনে ঈষৎ খটকা লাগলো।

কিছুক্ষণ বাদেই নিরুপম এলো। আমি সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, তোর ফোন এসেছিল, এখনি আবার রিং করবে বলেছে।

আমার মনে হলো নিরুপম একটু অস্বস্তি বোধ করলো।

মিনিট পনেরো বাদে টেলিফোন বেজে উঠলো আবার। নিরুপম রিসিভার তুললো। আমি সে-ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলাম, যাতে নিরুপম না মনে করে আমি তার দিকে কান পেতে আছি।

মেয়েটির এই ফোন করার ঘটনাটা আমার বাহান্ন বছরের মনে তোলপাড় আনলো। শুধু কৌতুকই নয়, রোমাঞ্চের স্পর্শও ছিল ঘটনাটিতে। আমি অরুণাকে এক সময়ে সে-কথা বললাম, যদিও আমার মনে দ্বিধা এবং ভয় ছিল যে অরুণা হয়তো ঘটনাটিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। অরুণা কিন্তু অবাক হয়ে সশব্দে হেসে উঠলো, হাসি থামলে ওর মুখের ওপর একটা মুগ্ধভাব ফুটে উঠলো। আমার মনে হলো ছেলের জন্য অরুণার কোন দুশ্চিন্তা নেই, ও যেন একটু গর্বই বোধ করছে। এবং ঠিক তখনই আমার নিজেরও মনে হলো আমিও একটু গর্বিত বোধ করছি।

মেয়েটি টেলিফোনে অন্তুকে কি বলেছিল আমার জানার কথা নয়। তার নাম হয়তো অন্তুকে জিগ্যেস করলেই জানতে পারতাম। কিন্তু আমি কিছুই জানতে চেষ্টা করি নি, যদিও আমার সে-বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। ফলে, কল্পনায় তিন চারটি একালের সুন্দর নাম নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেছিলাম, এবং

ভেবে নিয়েছিলাম মেয়েটি নিশ্চয়ই অন্তুর সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করার কথা বলেছে। কারণ, আমার মনে আছে, তখন অন্তুর কলেজে পর পর তিন দিন ছুটি ছিল।

একটি মেয়ে আমার একুশ বছরের ছেলেকে বাড়িতে টেলিফোন করছে—এই ছোট্ট ঘটনাটি আমার মনে এমনই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল যে আপিসের দু-একজন সহকর্মী বন্ধুকে না বলে পারি নি। তারা কেউ এ ঘটনার কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, কেউ একটি প্রেমোপাখ্যান শোনার মত মুখভাব করে তা উপভোগ করেছে এবং তাদের নিজেদের যৌবনকালে কিভাবে বঞ্চিত হয়েছে তা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। বলা অপ্রয়োজন যে আমিও সেই কপট দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্বর মিলিয়েছি।

এর পর অন্তুর কাছে আরো কয়েকবার আরো ঘন ঘন মেয়েলি গলার টেলিফোন এসেছে। সে-সব সময়ে কখনো আমি নিজেই রিসিভার তুলেছি, কখনো অরুণা। তখন আর আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা 'মজা' নয়, বরং কখনো কখনো মনে হয়েছে অন্তু আমাদের যেন উপেক্ষা করছে, কিংবা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করছে না। তা না হলে সে নিশ্চয় তার বান্ধবীদের বাড়িতে ফোন করতে নিষেধ করে দিতো। অন্তু যে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকদিন আগে থেকেই সিগারেট খাওয়া ধরেছে আমি জানতাম, তার পকেটে একখানা চিঠি পোস্ট করার জন্যে রাখতে গিয়ে দেশলাই দেখেছিলাম একদিন। আরেকদিন ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পরই আমি ঢুকতে গিয়ে একরাশ ধোঁয়া এবং সিগারেটের গন্ধ পেয়েছিলাম। এই বয়সে সিগারেট খাওয়াকে আমি খুব দোষের মনে করতাম না, কিন্তু সেজন্যে অন্তু আমার চোখের সামনে টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট রাখলেও সহ্য করতে হবে এতখানি উদার আমি হতে পারি নি। ও অবশ্য তা করেও নি কোনদিন এবং সম্ভবত ঐ বয়সে পুরো প্যাকেট সিগারেট কেনায় ওরা অভ্যস্তও হয় না। আমি নিজে ঐ বয়সে খুচরো একটি সিগারেট কিনে দোকানের দড়িতে ধরিয়ে নিতাম। সে যাই হোক, ঘন ঘন টেলিফোন আসা আমার কাছে প্রায় চোখের সামনে সিগারেট ধরানোর সামিল মনে হতো।

প্রথম দিকে ব্যাপারটা উপভোগ করলেও অরুণার কাছেও এটা আর কৌতুক রইলো না। দেখতাম, অরুণাও বিরক্ত হতো, এবং আমি জানতাম বিরক্তিটা আসলে ওর রাগ 'জানি না', 'নেই' বা 'বলতে পারি না' গোছের উত্তর দিয়ে ও কোন কোনদিন রিসিভার নামিয়েও দিয়েছে।

আমি ঘরে বসে থাকলে অন্তু টেলিফোনে কাটা কাটা কথা বলতো, অস্পষ্ট ভাবে উত্তর দিতো, এবং আমার তা শুনে বেশ মজা লাগতো।

—মেয়েটা কে রে? বেশ বিরক্তির সঙ্গেই একদিন অরুণা ওকে জিগ্যেস করেছিল। আমি তখন অন্তুর চোখের দিকে তাকাতে পারিনি।

কলেজের দু-একটি মেয়ের নাম অরুণার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, কারণ তাদের কথা অন্তু সেদিনই অরুণাকে হাসতে হাসতে বলেছিল। তাদের কথা বলার সময়ে অন্তু এমন ভাব করলো যেন তারা নিতান্তই নাবালিকা এবং নির্বোধ, বোকার মত কথা বলে এবং অন্তু যেন তাদের গ্রাহ্যই করে না।

অরুণা একদিন হাসতে হাসতে আমাকে বললো, টুকটুক মেয়েটাই তো ওকে বেশী ফোন করে, জিগ্যেস করলাম কেমন দেখতে, অন্তু নাক সিঁটকে যা বর্ণনা দিলো, কোন ভয়ই নেই।

টুকটুক নামটা আমি আগেও একদিন শুনেছিলাম। তার ভাল নাম যে ঋতা তাও অরুণা বলেছিল। আর আমি অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, কলেজের মেয়েদের ডাক নামে পরিচিত হওয়া এ আবার কোন ধবনেব আধুনিকতা। তাতে রুবি সেদিন এসেছিল, বললে, তুমি বাবা একেবারে সেকেলে। আমাদের সময়েও সব ছিল মিনি দত্ত, টুলি মিত্র, ফুচু সান্যাল।

কিন্তু অন্তু টুকটুকের রূপের যে বর্ণনা দিক না কেন, একদিন আপিস থেকে ফিরতেই অরুণা চায়ের কাপ রেখে হাসতে হাসতে বললে, ছেলের তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

অরুণা হাসলো, বললে, সেই টুকটুক! সে আজ এসেছিল।

তারপর একটু থেমে বললে, কি মিষ্টি চেহারা তুমি ভাবতে পারবে না, আর কি ভালো যে মেয়েটা! অন্তু কিনা ওকে দেখেও নাক সিঁটকোয়! ও ছেলের তা হলে কোন মেয়েই পছন্দ হবে না।

আমি বললাম, ছেলের বউ করার জন্যে তাকে বুঝি তোমার খুব পছন্দ হয়েছে?

অরুণা হেসে ফেলে বললে, তা বলছি না, কিন্তু সেদিন যে অন্তু বললে, টুকটুক দেখতে তেমন ভাল না! এর চেয়েও সুন্দর মেয়ে কি ওর কপালে জুটবে নাকি!

আমার মনে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খটকা লাগলো। আমার মনে হলো টুকটুক সম্বন্ধে আমাদের যাতে কোন সন্দেহ না হয়, সেজন্যেই ঐ মিষ্টি চেহারার মেয়েটাকে অন্তু খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করেছে। টুকটুককে দেখার জন্যে আমার তখন খুবই আগ্রহ, আমি ফিরে আসার আগেই ওরা দুটিতে চলে গেছে শুনে আমার খারাপ লাগলো। ভাবলাম, আরেকটু আগে কেন আসিনি।

এর দিনকয়েক পরেই দুপুরের দিকে আপিস থেকে বেরিয়েছি ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম জমা দিয়ে আসতে, হঠাৎ মেট্রোর নীচে অন্তকে দেখলাম, সঙ্গে রীতিমত সুশ্রী একটি মেয়ে। স্লিম চেহারা, এক মাথা শ্যাম্পু করা হাল্কা চুল। চোখ দুটি ……সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটিকে এক নজরে দেখে নিয়েই আমি উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলাম, পাছে অন্ত আমাকে দেখে ফেলে। অর্থাৎ, লজ্জা যেন আমারই।

আমি অরুণাকে এসে ফিসফিস করে বর্ণনা দিলাম মেয়েটির আর অরুণা বললো, বা রে, ঐ তো টুকটুক।

টুকটুককে ভালো করে দেখার, কাছে বসে তার সঙ্গে কথা বলার আমার ভীষণ ইচ্ছে হতো। এবং আমার সবচেয়ে বড় কৌতূহল ছিল তাকে দেখে বা তার সঙ্গে কথা বলে মেয়েটিকে যাচাই করে নেবার। আমার ধারণা ছিল, তার সঙ্গে কথা বলে আমি তার ভিতরের চরিত্রটি আবিষ্কার করতে পারবো এবং সেই সঙ্গে ধারণা করে নিতে পারবো সে সত্যিই অন্তকে ভালবাসে কি না। কারণ টুকটুক যথেষ্ট সুশ্রী বলেই আমার সেই পুরোনো ভয়টা মাঝে মাঝেই বুকের মধ্যে উঁকি দিতো। আমার কেবলই আশঙ্কা হ'ত, শেষ অবধি অন্ত না সেই চরম আঘাতটা পেয়ে বসে।

পুত্রসন্তান যুবক হয়ে উঠলে বাহান্ন বছর বয়সের বাপকেই সব সময়ে তটস্থ থাকতে হয়। আমি মাঝে মাঝে আপিস ছুটির পর সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে চৌরঙ্গীর দু' একটি রেস্টোরেণ্টে গিয়ে চা খেতে খেতে আড্ডা দিতাম, কোনদিন বা শ্রান্ত বোধ হলে তাদের সঙ্গে আউটরাম ঘাটের দিকে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে বায়ু সেবনের জন্যে বেড়াতে যেতাম। অস্বীকার করবো না, বাহান্ন বছর বয়সেও আমার বুকের ভেতরটা যুবক রয়ে গেছে বলেই আমি ঐ সব সুদৃশ্য জায়গায় বেড়াতে গিয়ে কখনো কখনো সুদৃশ্য রমণীর দিকেও কয়েক পলক তাকিয়ে দেখেছি। কিন্তু ঐ সব স্থানগুলি প্রেমের তীর্থস্থান জানতাম বলেই আমার বেড়ানোর জায়গাও সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। কারণ, আমার তখন একটাই আতঙ্ক, কোথাও না ওদের দুটিকে অর্থাৎ অন্ত ও টুকটুককে দেখে ফেলি। ওদের কোনদিন যদি লজ্জায় ফেলি, আমাকে দেখতে পেয়ে ওদের সুন্দর সন্ধ্যা যদি নষ্ট হয়, তাহলে আমার আর অনুশোচনার যেন শেষ থাকবে না।

এই সময়েই অন্তদের কলেজে পুজোর ছুটি হলো। অরুণার কাছে শুনলাম টুকটুক তার বাবা-মার সঙ্গে দিল্লী বেড়াতে যাচ্ছে। টুকটুক নিজেই নাকি তাকে বলে গেছে।.

অরুণা বললে, ছেলেটা একেবারে অমানুষ। আমার সামনেই টুকটুক বললে, নিরুপম চিঠি দেবো, উত্তর না দিলে দেখবে মজা। অন্তু কি বললে জানো? বললে, রিপ্লাই কার্ড দিও, আর নয়ত এখনই খাম পোস্টকার্ডের পয়সা দিয়ে যাও। সত্যি সত্যি ওর কাছ থেকে দুটো টাকা নিলো, আমাব বকুনিতে কানই দিলো না।

টুকটুক যে দিল্লী চলে গেছে তা কয়েক দিন পবেই টের পেলাম। কারণ, অন্তুর নামে যে চিঠিখানা এলো, তার ঠিকানা দেখেই বোঝা গেল সেটি কোন মেয়ের লেখা। আমি সে চিঠি নিজেই রেখে দিলাম, নিজেই অন্তুর হাতে তুলে দিলাম, অরুণাকে জানতেও দিলাম না। কারণ আমাব ভয় ছিল, অরুণা সে চিঠি খুলে পড়তে পারে বা পডার পর ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে। ফলে, ওদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে পারে। এবং মা বা বাবা সে-চিঠি পড়েছে বা নষ্ট করেছে জানতে পারলে অন্তু তখন নিশ্চয় আমাদের ঘৃণা করতে শুরু করবে।

কিছুদিন পবেই অরুণার কাছে শুনলাম টুকটুক ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই সে নাকি অরুণাকে ফোন করেছিল। অরুণা বললে, যাই বলো, টুকটুক আমাদের খুব ভালবাসে। চিঠি পায়নি ক'দিন অন্তুব কাছ থেকে, খুব ভাবনা হয়েছিল তার, বাড়ি ফিরেই ফোন করে জিগ্যেস করলো আমরা কেমন আছি।

সত্যি সত্যিই টুকটুককে একদিন দেখলাম। দেখলাম মানে তাকে আমিই ডেকে আনলাম।

আমাদের ফ্ল্যাটখানা তিনতলায়, সামনে একটুখানি ব্যালকনি আছে। সেদিন শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না, বছর শেষ হয়ে আসছে অথচ ক্যাজুয়েল লীভ পাওনা অনেক, ইচ্ছে করেই আপিস যাইনি। বিকেলে হঠাৎ শুনলাম, নীচে রাস্তা থেকে কোন একটি মেয়ে চিৎকার করে কাকে ডাকছে। দুবার শোনার পরই মনে হলো মেয়েটি অন্তুকে ডাকছে। আমি ব্যালকনিতে বেরিয়ে দেখি নীচে রাস্তায় টুকটুক চিৎকার করে ডাকছে, অন্তু, অন্তু! ও তখন তিনতলাব দিকে চোখ তুলে ডাকছিল, আমাকে দেখেই লজ্জা পেল। ও হয়তো সুট্ করে সরে পড়তো, মাথা নামিয়ে নিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, তাই আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বললাম, তুমি ওপরে এসো, এসো না!

মেয়েটি সিঁড়ির দিকে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখে হাসি আর লজ্জা ছড়িয়ে উঠে এলো, আমি তখন সিঁড়ির মাথায়।

আমি বললাম, তুমি টুকটুক, না?

টুকটুক ঘাড় কাৎ করলো। আর আমি বললাম, অন্তু না থাকলে ওপরে বুঝি আসা যায় না?

অরুণাও ততক্ষণে এসে পড়েছে, হেসে বললে, সে কথা বলো না, আমার সঙ্গে তো ও কতদিন এসে গল্প করে গেছে।

আমি টুকটুককে সামনে বসিয়ে নানান গল্প শুরু কবে দিলাম। আমি প্রায় তার সমবয়স্ক হবার চেষ্টা করলাম। হাসলাম এবং হাসালাম। আমি নিজেকে যথেষ্ট মডার্ন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলাম।

টুকটুক চলে যাবার পব আমি অরুণাকে বললাম, যদি সত্যি সত্যি তেমন কিছু হয়, ভালই হয়, কি বলো?

অরুণা মৃদু হেসে বললে, মেয়েটা ভীষণ ভালো, তাই না?

আমরা রাত্রে অন্ধকাবে শুয়ে শুয়েও অন্তু এবং টুকটুককে নিয়ে কোন কোন দিন চাপা গলায় আলোচনা করেছি, আমাদের চোখকে ফাঁকি দেবার যখনই ওরা চেষ্টা করেছে, আমরা হেসেছি। কখনো কখনো আমরা স্বপ্নও দেখেছি।

এরপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। টুকটুক ফোন করলে আমি যদি রিসিভার তুলতাম তাহলে ও আগে আমার খবরাখবর নিতো, অরুণার, আর তারপর আমি নিজেই বলতাম, 'ধরো, অন্তুকে ডেকে দিচ্ছি', কিংবা 'অন্তু তো এখনো ফেরেনি, কলেজে যাওনি তুমি?' টুকটুক যখন বাড়িতে আসতো, আমি থাকলেও কখনো সটান অন্তুর ঘরে চলে যেত, কখনো রান্নাঘরে অরুণার কাছে, আবার অন্তুর ঘরে যাবার আগে এক মিনিট দাঁড়িয়ে কোন কোনদিন আমার সঙ্গে কথাও বলতো।

মাঝখানে হঠাৎ কি যে হয়েছিল আমি জানি না, বেশ কিছুদিন টুকটুক আসতোও না, ফোনও করতো না। সেই সময়ে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। অরুণাকে জিগ্যেস করেছিলাম, টুকটুকের কি খবর বলো তো? অরুণা বললে, ঝগড়া করেছে, আবার কি। এত বলি, একদিন আসতে বলিস, কেবল এড়িয়ে যায়।

শুনে আমার মনটা দমে গেল। আমার বিশ্বাস হলো না। আমি মনে মনে ভয় পেলাম। আমি ভাবলাম, যে আতঙ্কটা আমার মনের মধ্যে বরাবর উঁকি দিয়েছে, সেটাই বোধহয় সত্যি হলো। আমার কেবল ইচ্ছে করতো, আগের মতই অন্তুর ঘর থেকে ওদের দুজনের সশব্দ হাসি বা হট্টগোল বা তুচ্ছ ঝগড়াঝাঁটি ভেসে আসুক। একটা কাঠের বাজনা শুনেছিলাম ছেলেবেলায়, ওদের কথা-কাটাকাটি ঠিক তেমনি মিষ্টি লাগতো।

আমি সে-সময় অন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতাম। ও মাঝে মাঝেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেত, একটু খিটখিটেও হয়েছিল। খাবার টেবিলে বসে আমি লক্ষ্য করতাম, ওর ক্ষিদে ঠিক আগের মত নেই। আমি কি করবো ঠিক করতে পারতাম না, আমি শুধু মনে মনে চাইতাম, ও যেন আঘাত না পায়, কষ্ট না পায়।

তখন গরম কাল, অন্তু বললো, বাবা চলো না এবার দার্জিলিং যাই।

আমি ভাবলাম, কোলকাতা ওর কাছে এখন একটা যন্ত্রণা। ও এখান থেকে পালাতে চাইছে। পালাতে।

আমি অরুণাকে বললাম, তাই চলো, অন্তু যখন বলছে……

আমি অরুণাকে বললাম, দোষ তোমারই। তুমি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিলে, অথচ শেষরক্ষার কথা ভাবলে না।

অন্তুর জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট হতো, অনেক রাত অবধি আমার ঘুম আসতো না। অরুণাও তার ব্যথা তার কষ্ট চেপে রেখেছিল, হঠাৎ একদিন রাত্রে কেঁদে ফেলে বললো, আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না। একটু থেমে হঠাৎ বললে, আচ্ছা আমি যদি টুকটুকদের বাড়ি যাই? আমি নিষেধ করলাম। বললাম, ওঁদের কাউকে তো আমরা চিনি না। কি জানি কি মনে করে বসবেন ওঁরা, তাছাড়া অন্তু জানলে রেগে যাবে, ওর হয়তো সম্মানে লাগবে।

শেষ অবধি তাই দার্জিলিঙেই আমরা গেলাম। ক্যাপিটল সিনেমার কাছেই হোটেল কুণ্ডুতে গিয়ে উঠলাম। সেদিনই বিকেলে বেড়াতে গেলাম ম্যালে।

আমরা কেউই দেখতে পাইনি, টুকটুক ছুটে এলো একমুখ হাসি নিয়ে। অন্তু, তুমি? গ্র্যাণ্ড হয়েছে, কাকাবাবু আপনারাও এসেছেন। বলে তার বাবা-মা ভাই-বোনদের দিকে ফিরে তাকালো। আমাদের ডেকে নিয়ে গেল।

আলাপ হল সকলের সঙ্গে। বোঝা গেল অন্তুকে ওঁরা খুব ভাল করেই চেনেন, অন্তু ওঁদের বাড়ি অনেকবার গেছে।

টুকটুকের বাবা খুব সজ্জন, মা বেশ মিশুকে।

প্রতিদিন সকাল বিকেল আমাদের দেখা হতো, কখনো ম্যালে বেড়াতে এসে, কখনো দোকানে বাজারে, কখনো দল বেঁধেই আমরা এখানে-ওখানে যেতাম। কিন্তু অন্তু আর টুকটুক, সব সময়ে আলাদা। হয় ওরা আমাদের সকলের পিছনে পিছিয়ে যেত, কিংবা তড়বড় করে অনেক আগে আগে চলে যেত। আবার এক একদিন ওরা দুজনেই একেবারেই দলছাড়া হয়ে কোথায় যেত কে জানে।

আমি অরুণাকে বললাম, যাক বাবা, ঝগড়া মিটে গেছে।

অরুণা বললে, ঝগড়া না ছাই।

—তার মানে? আমি বুঝতে পারলাম না অরুণা কি বলতে চায়।

অরুণা হাসলো।—সব প্ল্যান, সব প্ল্যান করে এসেছে, বুঝতে পারছো না। তা না হলে হঠাৎ দার্জিলিং আসতে চাইবে কেন অন্তু।

ওদের দুজনকে দেখে আমরা দুজনে আবাব হাসাহাসি করলাম। আর অরুণা বললে, দুটিতে বেশ মানায় কিন্তু।

একদিন আমরা অতটা ওপরে উঠতে পারিনি, মাঝপথেই থেমে গিয়েছিলাম, আব অন্তু-টুকটুক অনেকখানি ওপবে উঠে গিয়ে একটা বিশাল পাথবের ওপর বসেছিল। ওদের দু'জনের বসার ভঙ্গিটি ছিল ছবির মত। ওরা খুব হাসছিল আর গল্প করছিল।

সেদিকে তাকিয়ে আমি ফিসফিস কবে অরুণাকে বললাম, দ্যাখো দ্যাখো, ঠিক যেন মেড ফর ঈচ আদার।

অরুণা হেসে উঠে বললে, সত্যি!

দার্জিলিং থেকে ফিরে এলাম খুব একটা খুশী মন নিয়ে। সমস্ত বুকের ভেতরটা যেন ভরাট। মনে হল জীবনে এত সুখী আমি কখনো হইনি। অন্তুও ট্রেনে আসবার সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, ওয়াণ্ডারফুল, দার্জিলিং এত সুন্দর ভাবতেই পারিনি! আমি আর অরুণা চোখ-চাওয়াচাওয়ি করে হাসি চেপেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে এসে আবার সেই অসহ্য গরম, অন্য দিকে মন দেবার জোটি ছিল না। তবু এরই মাঝে আমি সহকর্মী বন্ধুদের কাছে দার্জিলিঙের ঘটনা সবিস্তার বলেছি, বলে আনন্দ পেয়েছি, আর কপট আক্ষেপের গলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছি, 'আরে মশাই, কি নির্লজ্জ, কি সাহস মেয়েটারও। আমরা যেন বাবা মা নই, স্রেফ অচেনা পাবলিক।'

বন্ধুরা মজা পেয়েছে, সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, এখনকার হালচালই ওরকম, কি আর করবো, আমরাও সহ্য করে যাচ্ছি। তাদের মধ্যে দু' একজন আবার গোঁড়া, বাহান্নতেই বৃদ্ধ, তারা দোষ দিয়েছে আমাকে, 'আস্কারা দিয়ে দিয়ে আপনারাই তো ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছেন।'

আমি মনে মনে হেসেছি। এবং আমি মনে মনে স্বপ্ন দেখেছি। তারা তাদের ছেলেদের জন্যে অনেক কিছু চাইতো, ভাল রেজাল্ট, ভাল চাকরি, উন্নতি, আরো কত কি। আমার চাওয়া শুধু একটিই। অন্তু যেন সুখী হয়, অন্তুর এই একুশ

বছরের স্বপ্নমাখা নরম বুকে যেন কেউ আঘাত না দেয়। এই বয়সেই সে যেন আমার মত ভেঙে না পড়ে। আমার একুশ বছরের মত।

অরুণার কাছে শুনেছিলাম, টুকটুক আবার এসেছিল একদিন, সারা দুপুর অন্তুর ঘরে বসে গল্প করেছে। অরুণা আচার রোদে দিয়েছিল, চেয়ে নিয়ে চেটে চেটে খেয়েছে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে বসে গল্প করার কথায় আমার একটু ভয় হত, একটু অস্বস্তি। ঐ বয়েসটাকে বিশ্বাস করতে পারতাম না আমি, ভাবতাম শেষে কিছু একটা···পরমুহূর্তে মনে হত, ওরা এত খারাপ হবে না, আমাদের মনটাই খারাপ।

রুবি একদিন এসে বললে, জানো মা, তোমার জামাই বলছিল অন্তুর নাকি আজকাল খুব পাখা গজিয়েছে।

অরুণা হেসে বললে, তা আর কি করা যাবে, দিনকালই যে বদলে গেছে।

রুবি বললে, আমার বেলায় তো খুব কড়া শাসন ছিল তোমার।

সত্যি কথা বলতে কি, রুবিকে আমরা একটু আগলে আগলেই রাখতাম। কিন্তু রুবি তো সুখী হয়েছে।

পরে শুনলাম, রুবি বলেছে অরুণাকে, তোমার জামাই দেখেছে, একটা ছিপছিপে মেয়েকে নিয়ে কি একটা হোটেল থেকে বেরুচ্ছে। (অরুণা বললে) তোমাকে বলিনি, ভেবেছিলাম চোখের ভুল, সেদিন দুপুরে···

অরুণা হঠাৎ অন্তুর ওপর রেগে গেল। আমাকে বললে, এভাবে বেশিদিন ভাল নয়, বিয়েটিয়েই যদি করতে চায় করুক না।

কিছু একটা ঘটে যেতে পারে এই ভয় তারপর থেকে আমাকে পেয়ে বসলো। যদি কিছু ঘটে আমি ভাবতাম, তা হলে আমাদের প্রশ্রয়ই তার জন্যে দায়ী। আবার ভাবতাম, অত ভয়ের কি আছে, ওরা বিয়ে করতে চাইলে টুকটুকের বাবা নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। তিনি তো আরো মডার্ন।

তবু ভয় হতো বলেই অরুণাকে বলেছিলাম, অন্তুকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করতে। তবে পাস করার আগে, কোন চাকরি না পেয়ে ওর বিয়ে করার কথা আমি ভাবতাম না।

ঠিক সেইসময়ে টুকটুক একদিন এসে হাজির।—নিরুপম আছে কাকাবাবু?

আমি ওকে দেখে বেশ খুশী হয়ে উঠেছিলাম। বললাম, না।

টুকটুক সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিল, আমি বললাম, নিরুপম ছাড়া কি আর কারো

সঙ্গে কথা বলতে তোমার ভাল লাগে না? আমরা বুড়ো হয়েছি বলে কি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেও পারি না!

টুকটুক মাথা নীচু করে লাজুক হাসলো।

আমি বললাম, বসো এখানে।

ও চুপটি করে সামনের চেয়ারে বসলো। বড় লম্বা ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে।

আমি বললাম, কি খবর-টবর বলো তোমার। অন্তু এখুনি ফিরবে, ওকে ওষুধ কিনতে পাঠিয়েছি।

টুকটুক মাথা নীচু করেই বললে, খবর একটা আছে কাকাবাবু। মৃদু সলজ্জ হেসে বলল, আমার বিয়ে।

বিয়ে? আমার বুকের মধ্যে কেউ যেন দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলো। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো।—কবে? কোথায়? কি করে ছেলেটি?

আমি ঠিক কি প্রশ্ন করেছিলাম, আমার নিজেরই মনে নেই।

টুকটুক ব্যাগ থেকে একখানা চিঠি বের করে দিলো, আমি পড়লাম, কিন্তু কিছুই মাথার মধ্যে ঢুকলো না। সব অক্ষরগুলো ঝাপসা লাগলো। আমার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠলো। আমার ভিতরটা কেবল বলতে লাগলো, এ কি হলো, একি হলো।

কোনরকমে মুখে হাসি এনে বললাম, ভাল ভাল।

আর টুকটুক উঠে বলল, আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি। নিরুপমকে একটু থাকতে বলবেন কাকাবাবু।

টুকটুক চলে গেল, আর তখনই অরুণা এসে বললে, টুকটুকের গলা শুনছিলাম না?

আমি অরুণাকে সব বললাম, অরুণা আমার সামনে এসে বসলো, আমরা পরস্পরের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হওয়ার পর নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে বসে রইলাম। ফিসফিস করে বললাম, এই বয়সে, বেচারী, প্রথম থেকেই আমার এই ভয় ছিল।

অরুণা বললে, এইটুকু ছেলে, ও সহ্য করবে কি করে।

আমার সত্যি সত্যি কান্না পাচ্ছিল। আমার নিজের একুশ বছর বয়সের সেই আঘাতটার কথা মনে পড়ছিল। অন্তু ফিরে এসে ওষুধটা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল, আমি ওকে কিছুই বলতে পারলাম না। এমন কি টুকটুক এসেছিল বা থাকতে বলেছে সে-কথাও বলতে পারলাম না।

মিনিট কয়েক পরেই টুকটুক ফিরে এলো, আমি ওকে অন্তুর ঘর দেখিয়ে দিলাম। ইশারায় শুধু বললাম, আছে।

আমি আর অরুণা অন্তুর ঘরের দিকে তাকাতে পারলাম না। শুধু চুপ করে বসে রইলাম আতঙ্কে অপেক্ষায়। যেন এখনই একটা ভূমিকম্প হবে!

হঠাৎ একটা হট্টগোল ভেসে এলো ওর ঘর থেকে। চীৎকার উল্লাস, হৈ হৈ। 'তুমি একটা ইডিয়ট,' অন্তুর গলা। 'নিরুপম, ভাল হবে না বলছি, তুমি না হলে

আমি অরুণার চোখের দিকে তাকালাম। অরুণা আমার চোখের দিকে তাকালো।

একটু পরেই অন্তু আর টুকটুক বেরিয়ে এলো।

অন্তু চিৎকার করছে, আচ্ছা বাবা, মা, তুমি বলো, স্টুপিড বলবো না ওকে? ওর পরশু বিয়ে, একটা বন্ধুকেও এখনো নেমন্তন্ন করেনি।

টুকটুক সাক্ষী মানলো অরুণাকে।—আচ্ছা কাকীমা, আমি কাল পরশু দু-দুবার ফোন করিনি? নিরুপম, তুমি বাড়িতে থাকো নাকি কোন সময়ে।

ওরা দুজনে বেরিয়ে গেল বন্ধুদের নেমন্তন্ন করতে।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম। পরস্পরের চোখের দিকে তাকালাম একটু অবাক হয়ে।

অরুণা হঠাৎ বললে, তুমি এবার নিশ্চিন্ত হলে তো।

বললাম, জানি না, বুঝতে পারছি না।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

পরাজিত খেলোয়াড় □ আহমদ বুলবুল ইসলাম

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

অনেক দিন পর আলতাফ এসেছিলো আমার অফিসে।

আমার বন্ধু, স্কুলজীবনের বন্ধু। অবৈধ প্রেমের মতো যে বন্ধুত্বের আকর্ষণ অনিবার্য।

অনেক আনন্দ আর বেদনার স্মৃতিতে উজ্জ্বল আলতাফ। যদিও আমি আমার অন্যসব বন্ধুদের সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারিনি, তবুও অন্তত আলতাফের সঙ্গ আমার কাম্য। এখনো আমার উন্নতি হবে বা হতে পারে এ রকম আশা সে পোষণ করে।

অথচ সেই আলতাফের সামনেও আমি আমাকে সবটুকু প্রকাশ করতে পারি না। ওর প্রশ্নের উত্তরে আমি নিজেকে একজন বুদ্ধিমান বলেই জাহির করতে চাই। বাস্তব জীবনের উর্ধ্বে স্থাপন করে ওর চোখে নিজেকে এক সুউজ্জ্বল জগতের নায়করূপে প্রতিভাত করতে চাই।

তুমি পরীক্ষা দাওনি কেন?

আমি ওর প্রশ্নের উত্তরে হাসলাম। বুদ্ধিমানের মতো হাসলাম। কিন্তু সে হাসি ওকে কি বোধ দিয়েছিলো জানি না।

সময় পাইনি এই আর কি। আর তাছাড়া পড়াশোনাও করা হয়নি। কী করে আর দেবো।

পর পর তিনটি বাক্যে আমার সবটুকু ওকে জানিয়ে দিলাম। অথচ অনেকেই তো চাকরী করেও বেশ পাস করে যাচ্ছে।

আলতাফ আমাকে আশান্বিত করতে চাইলো।

হাঁ, তা যাচ্ছে বৈকি। শুধু আমিই পারলাম না বন্ধু। যাক্ ওসব কথা। তার চেয়ে বল কি খাবে? সেভেন আপ, কোকা অথবা ফানটা?

একটা হলেই হলো।

অতএব, আমরা অনেকক্ষণ ধরে কোকা কোলার তরল ঠাণ্ডা পান করলাম।

যাবার সময় হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো : তুমি যাবে কিন্তু।

চেষ্টা করবো, বললাম আমি।

চেষ্টা নয়, যেতেই হবে।

বুঝলাম অনেকদিন আগের মতো প্রাণের উচ্ছলতায় ও আমাকে অন্তরঙ্গ করতে চাইলো।

এবার মনে পড়লো অনেকদিন হলো ওদের ওখানে যাইনি। আগে কতো যেতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পে, তর্কে আর হুল্লোড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তাম।

কই, আগের মতো আর বেহিসেবী হতে পারছি কই। সবকিছু ভেবে চিন্তে এবং বিচার করে করতে হচ্ছে। ওর অনুরোধের আন্তরিকতায় আমার মনে একটা হারানো আনন্দের আঁচল দুলে উঠলো।

আমি বললাম, হ্যাঁ যাবো।

পরদিন রোববার। অতএব অফিস বন্ধ। একটু দেরী করেই বিছানা ছাড়লাম। রেডিও থেকে গান ভেসে আসছিলো। ছুটির গান। আমরা সবাই কী ভয়ঙ্কর ভাবে ছুটি চাই। কিন্তু ছুটি, কর্মহীন ছুটি আমাদের মেলে না কখনো। তবুও আমরা আজীবন তেমনি একটি ছুটির অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করব।

সকাল এগারোটার মধ্যেই কাপড় চোপড় পরে রওয়ানা হয়ে গেলাম। রবিবার বলেই বোধহয় তাড়াতাড়ি বাস পেয়ে গেলাম—ডবল ডেকার।

ফার্মগেটে নেমে পড়ে ওদের বাসার দিকে হাঁটতে লাগলাম। সেকেণ্ড ক্যাপিটালের পার্কের পাশ ঘেঁষে। সবুজের বিনম্র আমন্ত্রণ সমস্ত পার্ক জুড়ে। লিচু গাছগুলির নীচে অনেকে বসে, আবার কেউ শুয়ে আছে। আর আমি সারি সারি কৃষ্ণচূড়া গাছগুলির নীচ দিয়ে ছায়াকে ভালবেসে হেঁটে যাচ্ছিলাম। শীতল বাতাস আমাকে ভালবাসলো। কেননা বাসের ভেতর অনেক লোকের ভীড়ে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছিলাম।

স্কুলজীবনে এসব পথে কত হেঁটেছি। আর আমি এখন এই বিধ্বস্ত নগরের নষ্ট ভ্রূণে আমার আজন্ম ভালবাসাকে খুঁজে মরছি।

সেই তখন এতো রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তাঘাট আর সেকেণ্ড ক্যাপিটালের বিচিত্র ভাস্কর্যের কল্পনায় নূতন রাজধানী গড়ে ওঠেনি।

যে জায়গায় এখন এতো দালান কোঠা তখন সেখানে ভুট্টা আর জোয়ারের

ক্ষেতগুলো সবুজ টিয়াপাখির কলকাকলিতে মুখর ছিল। কতো লুকোচুরি খেলেছি ভুট্টার ক্ষেতে!

হাঁটতে হাঁটতে ওদের বাড়ীর সামনে এসে পড়লাম। ওই তো এয়ারপোর্টের হ্যাঙ্গার দেখা যাচ্ছে। একটা জেটপ্লেন গর্জন করে উড়ে গেলো আমার মাথার ওপর দিয়ে।

রাস্তায় আলতাফের বড় মতি ভাইএর সঙ্গে দেখা। কি হে, কামাল নাকি?

জি, আমি।

আমি বাড়ীর সদর দরজা ফেলে ঘুরপথে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু মতি ভাই বললেন, এদিকে এসো।

অতএব, ছন্দপতনের মতো বন্ধুত্বের দাবিতে সদর দরজা দিয়ে আলতাফের ঘরের দিকে হেঁটে যেতে যেতে শুনলাম, নাজমা বলছে, বৈঠকখানায় বসুন, এখুনি আসছে ভাইয়া।

পেছন ফিরে তাকালাম।

সেই ছোট্ট নাজমা এক বৎসরে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। রীতিমতো ক্ষুদে মহিলা। লুইজা মে অলকট্-এর 'লিট্‌ল্ ওমেন'-এর ক্ষুদে মহিলার মতো। শালোয়ার কামিজ ছেড়ে শাড়ী ধরেছে নাজমা! আমার যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ হতে লাগলো।

আলতাফ আমাকে দেখে খুব খুশী হলো। ও তখন গোসল করতে যাচ্ছিল।

আমি বললাম—আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, কি বল?

কেন একথা বলছো কেন? আলতাফ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

এই তো দুপুর বারোটা বাজলো। এটা কী আর বেড়াবার সময়। আমি সবসময় অসময়ে এসে পড়ি, কী বলো?

আলতাফ শুধু হাসলো।

ও এতো সুন্দর করে হাসতে পারে। এতো আন্তরিকতার হাসি। অথচ আমি পারি না।

ও বললো, তুমি একটু বোস, চট করে গোসলটা সেরে আসি আমি।

তাই যাও, বন্ধু। তোমার দরকারী কাজগুলো সব সেরে নাও, আর আমি এই দুঃসময়ের ঘরে বসে একজন বন্ধুর প্রতীক্ষা করতে থাকি ; একজন মানসীর প্রতীক্ষা করতে থাকি। মনে মনে ভাবলাম আমি।

আলতাফ চলে গেলো। আমি অগত্যা ওর পড়ার বইগুলি অনিচ্ছায় হাতড়াতে

লাগলাম। অক্ষরগুলো আমার কাছে অজানা অজ্ঞাত। অক্ষরের গোলকধাঁধায় আমি প্রবেশ করতে পারলাম না। কিন্তু তবু পাতা ওল্টাতে লাগলাম।

জানালার বাইরে তখন বর্ষার রোদ।

বাতাবিলেবু, আতা আর আম গাছের পত্রে তার ঝাঁঝালো সদম্ভ প্রকাশ। সবুজ কচু গাছের ডগায় তার আন্তরিক আলিঙ্গন।

আমার সামনে বসে মতিভাই পত্রিকা পড়ছিলেন। চুপচাপ অনেকক্ষণ সময় চলে গেলো। আকারহীন নৈঃশব্দের ক্যানভাসটাকে হঠাৎ কথার ধ্বনিতে রঙিন করতে চাইলেন তিনি।

তারপর, তোমার খবরাখবর কী?

আমার? আমার তো কোন খবর নেই!

আমার এ ধরনের কাব্যিক ও দার্শনিক টাইপের উত্তরগুলোকে আমি ভালবাসি! কেননা ওদের আঘাতে কেউ আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। আমার দৈন্যতাকে ঢাকার এর চেয়ে বড় কৌশল আর কী আছে।

আলতাফ এলো। বললো, চল ক্যারাম খেলি।

হ্যাঁ চল। আমি উৎসাহিত হলাম।

অতএব, খেলা চললো।

কিন্তু খেলা জমলো না। কেননা, আমি শুধু হেরে যাচ্ছিলাম। আগে হেরে গেলে এমন জিদ হতো, ওকে মনে হতো শত্রুর মতো। অন্যায়ভাবে জিততে গিয়ে গুটি ছড়িয়ে রাগে শুধু জ্বলতাম। কিন্তু আগে আমি জিততামও। বেশীর ভাগই আমি জিততাম। নাজমা, জ্যোৎস্না'পা মতিভাই ওরা সবাই প্রশংসা করতো আমাকে। অথচ আজকে আমি হেরে যাচ্ছি।

কিন্তু হেরে যাবার দুঃখ বা জিতে যাবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা আজ আর কোনোটাই অনুভব করতে পারলাম না।

মতিভাই বললেন, আমি ওর সাথে একটু খেলি, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু পরাজিত হতে এবং পড়ে পড়ে মার খেতে দেখে তার পৌরুষ বোধ হয় জেগে উঠেছিলো।

মতিভাই-এর সঙ্গে আলতাফ ভালো পারছিলো না। তখন নাজমা এলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলো।

জ্যোৎস্না'পাও এলো।

আমি কম চেনার মতো হেসে বললাম, কেমন আছেন?

চাকরী করে কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে, বাব্বা!

কই না তো। সহজ হতে চাইলাম আমি।

পরীক্ষা দাও নি কেন?

পরীক্ষা? মানুষের জীবনটাই তো একটা চরম পরীক্ষা। আবার তেমনি করে হাসলাম।

জ্যোৎস্না'পা কি ভেবেছিলেন জানি না।

নাজমা খেলা দেখতে বসলো, এখন তোমাকে একটা নীল গেম দেয়া যেতো ভাইয়া!

এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললো: আপনি খুব ভালো পারেন, না?

আমি? এককালে পারতাম।

আমি চেয়ারে বসে বসে ওদের খেলা দেখছিলাম। আর হারিয়ে যাওয়া ক্যারামের গুটিগুলি চেয়ারের তলা, চৌকির কোণা, আলমারীর পেছন থেকে সংগ্রহ করে দিচ্ছিলাম শুধু।

আর তাকিয়ে তাকিয়ে বাইরেটা দেখছিলাম, কবে এই দুপুরের ঝাঁঝালো রোদ কমে গিয়ে অপরাহ্ন আসবে—সেই বিকেল বিকেল প্রদোষ লগ্ন! নারকেল গাছের চিরল পাতার চিকণ বিলম্বিত ছায়া কবে রান্নাঘরের টিনের চালে আলিঙ্গন দেবে?

আমার কানে শুধু ক্যারামের খট্ খট্ শব্দ, মারভেলাস, এক্সেলেণ্ট, ফার্স্টক্লাস, শট্ শট্, এই আর একটু হলেই বাজী মেরে দিয়েছিলাম—ইত্যাকার শব্দগুলো যেন এক দেয়ালের ওপার থেকে গুঞ্জন ধ্বনির মতো ক্ষীণ হতে হতে কানে এসে আঘাত করছিলো। সবাই বাজী মেরে দিচ্ছে।

চমৎকার!

আমিই শুধু হেরে গেলাম।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

সত্যশব □ শাহ্‌ নূর খান

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আমি স্বপ্নের ভেতর থেকে উত্থিত হই, কিম্বা কোন গভীর বোধ থেকে উৎসারিত। অর্থাৎ, আমি একটি কামজ যন্ত্রণার আর্তনাদ মণ্ডিত, শয়তানের মত পবিত্র, ঈশ্বরের মত নির্বাসিত একক সত্তা। আমি এক এবং অভিন্ন আমার আত্মার ভিতর, আমার রক্তের ভিতর, গভীর শব্দের ভিতর। আমাকে বিচ্ছিন্ন থেকে সমন্বয়ের অতলান্তে টেনে আনতে পারলে না, পৃথিবী হে—হে আনুষঙ্গিক পারিপার্শ্ব। আমি অবিশ্বাসীর বিশ্বাসেব অমোঘ শক্তির ভ্রান্ত দেবশিশু—স্বর্গ বিচ্যুতির ভয়াল গহ্বর—মানুষ, যার দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ, দুই কান, এক নাক। স্বাতন্ত্র্যের অনুষঙ্গ বিশ্বের আর আর জীব থেকে—প্রকৃতি থেকে।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমি প্রপাত সম যন্ত্রণার তীব্র আর্তনাদে দ্বিখণ্ডিত—আমার অবিচ্ছিন্ন সর্বাঙ্গ—অভিন্ন আত্মা—কুসুমের মত নির্মল: মাধবীর মত বোধির বিশ্বাস। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি সহস্র লক্ষ দানবীয় পদধ্বনি আমার রক্তের ভেতর।

আমি শুনতে পাচ্ছি, আমার মা, আমেনা নাম্নী সেই মহিলা, যার দশমাস দশদিন যন্ত্রণার কারণ হয়েছিলুম একদা, তার অনুচ্চারিত কণ্ঠস্বর। আমি সজাগ হলুম,—আমার সমস্ত সত্তার ভেতর—সমস্ত রক্তের ভেতর, দারুণ স্বেচ্ছাচারের বাসনায় উত্তেজিত এই ক/১ মিরাণ্ডা লেনের আধা অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে, যার পাশের ঘরে আমার মা নাম্নী সেই মহিলা শায়িতা।

অর্থাৎ অপর একজনের শয্যার অনুষঙ্গ, যাকে আমি প্রায়শই দেখি, যিনি আমার কোন কালেই জনক নন—অথচ অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী। আর যিনি আমার জন্মের দুর্বিসহ লগ্নে শুধুমাত্র পিতৃত্বের পরিচয়টুকু দিতে স্বীকৃত হয়েছেন

এবং সেই মহিলাকে যার অনুগ্রহের গর্ভে আমার জন্ম, কেবল মাত্র আইনের ফাঁকটুকু পূর্ণ করে অবাধ যাত্রার স্বীকৃতি দিয়েছেন তার অর্থের যোগানদার হিসেবে। যিনি প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রীর গৌরব অর্জন করেছেন পোস্টারের রঙ্গিন কলায়, যার পরিপুষ্ট স্তনাভারে (মা আমাকে ক্ষমা কর) আমারও ইচ্ছা জাগে মূর্ছা যেতে। আমি এমনতর সত্যের ভিতর যেতে চাইনি। অথচ আমাকে যেতে হয়। এমন নিষ্ঠুরতার ভেতর যেতে ছিলুম কুণ্ঠিত এবং ছিলুম এসব থেকে বিরোধী, অথচ, হে ঈশ্বর, পরম বন্ধুর মত তোমার শত্রুতার ছুরি বসিয়ে দিলে শয়তানের মত আমার পবিত্র বিশ্বাসের বুকে। জঘন্য পৈচাশিক উন্মত্ততায়, নিষ্ঠুরতার পরম নিষ্ঠায় ফেড়ে ফেললে আমুণ্ডু। আমি দেখলুম তাল তাল অন্ধকার নগরী ও রক্তাক্ত সত্যের উজ্জ্বল শহর।

বাইরে এখন অবিশ্রান্ত বর্ষণ। তাণ্ডব শব্দের বাজন। হে ঈশ্বর, এই যে আমি, আবুল ফরহাদ নামক ষোল বছর বয়স্ক সদ্য ইস্কুল ডিঙ্গিয়ে কলেজ পাওয়া যুবক, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আমার এই পাশের ঘর থেকে উত্থিত খাটের অস্বাভাবিক, কর্কশ, অথচ ছন্দবদ্ধ শব্দ। তাকে তুমি ডুবিয়ে দাও। ভাসিয়ে দাও ঐ তাণ্ডব শব্দের বাজনে। আমি এসব থেকে বধির হ'তে চাই। ওহে আমার তৃষ্ণার্ত হৃদয়, আবুল ফরহাদ নামক ষোল বছর বয়সের যুবক যন্ত্রণা—তুমি কি পারনা বধির হ'তে শব্দপুঞ্জের ছন্দিত গীতি কুসুম থেকে ?

আমার কৌতুহল আমাকে টেনে আনল দেয়ালের পাশে, পাশের ঘরের দিকের জানালায়—যেখান থেকে পাশের ঘরের নীল আলো এ-ঘরের অন্ধকারকে চুমু খাচ্ছে অনর্গল এবং ভরিয়ে তুলছে তীব্রতর যন্ত্রণায়। আমি চোখ বাঁধলুম জানালার সেই ছোট্ট ফুটোয়, যেখান থেকে যন্ত্রণা হয়ে এক ঝলক নীল আলো আমাকে জাগিয়ে দিল অবলীলায়। আমি দেখলুম—আহ্ ! ঈশ্বর—আমাকে যিশু করে দাও, পবিত্রতায় মুড়িয়ে দাও আমার ষোল বছর বয়সের যুবক যন্ত্রণাকে। মা, অর্থাৎ আমেনা নাম্নী সেই মহিলা তার উজ্জ্বল উদোম শরীরে (মা, তুমি অত জোরে তাকে চেপে ধরোনা, পারবে না তার বিশাল বপুর ভার বইতে) অনাবিল শুয়ে আছেন। চোখ দুটো আধবোজা। তার দু'টো রাঙা অধর নিয়ে মুখটা দেয়ালের দিকে ফেরানো।

ঈশ্বর, আমাকে এই মুহূর্তে বধির কর এবং অন্ধ। আমার সমস্ত শরীর দগদগে ঘায়ে ভরিয়ে দাও। আমার সমস্ত সৌন্দর্যবোধ কুৎসিত বস্ত্রাবরণে ঢেকে রাখ। মা আমি তোমার বুকের চপলতা মাপব এবং অধরের উষ্ণতা। ইস্ ! আমার

ষোল বছর বয়সের যুবক যন্ত্রণা—মা, তোমাকে কামনার কাদায় কেমন করে আমি সিক্ত করার ভাবনা ভাবতে পারি? শাহানা, ক/২ এর ওহে উজ্জ্বল মহিলা, তুমিও কি এমন করে উজ্জ্বল শাদা উরু দেখাতে পার? কিম্বা পার কি উরুতে লতিয়ে নিতে আর কাউকে?

গির্জার পেটা ঘন্টিতে ভোর পাঁচটা শব্দ তুলল এবং পাখি জাগল শব্দের ভারে। আমি সরে এলুম মাথার দু'পাশের রগ চেপে। পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দ জাগল। বাইরে কি এখনও বৃষ্টি আছে? হয়তো বেরিয়ে গেল বসন্তমুখো সেই ভদ্রলোক। (আমি কি যিশু হয়ে গেছি, হা ঈশ্বর!)

মা তোমার কষ্ট হয় না এমনভাবে বিশাল বপুর ভার সইতে! আমাকে যিশু করে দাও ঈশ্বর, আমি মুক্তির বুকে স্বাক্ষর আঁকবো। আমার ভাবনার চিত্রলেখা থেকে এই মুহূর্তে সরিয়ে দাও আমেনা নাম্নী উদোম শরীর জননী ও বসন্তমুখো সেই ভদ্রলোককে (?)।

আমি বেরিয়ে এলুম দরজা খুলে—বাত্যাবিধ্বস্ত। আমার সত্তায় ষোল বছর বয়সের যুবক যন্ত্রণা। শাহানা, এই মুহূর্তে তোমাকে পেলে আমার কামনার কাদায় ভিজিয়ে দেবো অবলীলায়।

পাশের ঘরের দরজার সম্মুখ দিয়ে চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। বেশ কিছু আগে বেরিয়ে গেছে বসন্তমুখো সেই ভদ্রলোক (?)। চাপানো দরজার সম্মুখে দাঁড়ালুম।

ওহে আমার ষোল বছর বয়সের যুবক যন্ত্রণা তুমি দরজা মেলোনা। কেন না তুমি এখনও মাতাল, বোধের ভিতর, উষ্ণ তোমার রক্তের ভিতর। আমূণ্ডু কামনার কাদায় সম্মুখে শায়িতা মহিলাকে ভিজিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। তখন তুমি বিপন্ন হবে! বিপন্ন হবে!

আহা, আমি বিপন্ন হবো,—আমার কৌতূহলের কাঁপা হাত আলতো ঠেলা দিল দরজা। মুহূর্তে—আর্ত রক্তের চিৎকারে স্তম্ভিত হতে হ'ল আমাকে।

আমার সম্মুখে শায়িতা—হা ঈশ্বর, আমাকে অন্ধ কর এবং বধির—ক্ষিপ্র হাতে শরীরের উপর টেনে নিলেন চাদর। সন্দেহের দুই চোখে অনর্গল বিদ্ধ করতে লাগলেন। আমি অস্বস্তির ভেতর ঘামতে লাগলুম। কেননা আমার রক্তের সমস্ত উষ্ণতা ভেসে যাচ্ছে। অবশ হয়ে যাচ্ছে আমার বিদ্রোহের সত্তা। প্রজ্বলনের শিখারা।

হা ঈশ্বর আমি কি শয়তানের দোসর হয়ে গেছি? আমার শরীরের রক্তের

ভেতর কি একটুকরো আগুন ছড়িয়ে দিতে পারে না মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনাকে? আমার সম্মুখে শায়িতা, বিশ শতকের গৌরবান্বিতা অভিনেত্রী, যে আমার পবিত্রতায় ভরিয়ে দিয়েছে মৃত্যুময় পাপ ও স্খলনের সমস্ত সম্ভাবনা। মা আমাকে ক্ষমা কর! আমার এ হাত যদি হঠাৎ সামর্থ্যে বলিষ্ঠ হয়ে ছুটে যায় তোমার রূপালী কণ্ঠের কাছে, যদি হঠাৎ শিরা অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরে তোমার কণ্ঠনালী এবং তোমার শরীর যদি বরফের মত হয়ে যায়, তবে ক্ষমা করে দিও। কেননা আমার নিরবধি বোধের অতলান্তে তোমার ঐ মুখাবয়ব দুর্বিসহ।

আমার এবং সম্মুখে শায়িতা আমিনা নাম্নী জননীর মধ্যের দূরত্বের নিঃশব্দ বিস্ময় একটি কালো সাপ হয়ে ক্রমাগ্রসরমান। তার বঙ্কিমতায় ছন্দের সমাহার। লকলকে জীব। তীক্ষ্ণ চোখে দৃষ্টির বলিষ্ঠতা। শাহানা, যে সাপের শীতলতায় আমি কেঁপে উঠি তোমার বুকের নিষিদ্ধ অংশের কথা ভাবলে—তোমার বিস্মিত রূপালী মাছের কথা ভাবলে, আমাকে সেই সাপ জড়িয়ে নিতে চায় তার আপন কুণ্ডলীর মধ্যে। পাকানো বিড়ার প্রকোষ্ঠে।

: কি হয়েছে ফরহাদ?

: কাল রাতে সারাক্ষণ ভীষণ বিষ্টি হয়েছে মা?

পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গেলাম। জানি তার সন্দেহের দুই চোখ আমাকে বিদ্ধ করছে অনর্গল। তবুও আমি এগুবো। হে আমার সামর্থ্যের হাত তোমার পেশীর গ্রন্থি থেকে তুমি উঠে এসো আমার হাতের মুঠোয়। ঐ কণ্ঠনালী থেকে তুমি কেড়ে নাও সমস্ত শব্দের ব্যঞ্জনা। সমস্ত ছন্দের স্পন্দন। ঈশ্বর এই মুহূর্তে আমার সমস্ত পাপবোধ থেকে উৎসারিত হও সত্যের সম্ভাষণে। ব্যাকুল প্রস্তাবনায়।

: হুঁ! কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

: না, আমি তা তোমাকে বোঝাতে পারব না, কেননা আমার সমস্ত বোধ যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে। গাঢ় দৃষ্টান্ধ নীল।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত শক্তি শীতল হয়ে গেছে। না, কোন শক্তিই আর নেই। পেশীর কোষে কোষে ব্যথা। এবং আমার সমস্ত সত্তা, বোধ, অক্ষমতার আর্তনাদে ভেসে গেল। কান্নায় গড়িয়ে গেল আমার রক্তের উষ্ণতা সরল শিশুর মত: আমি সারা রাত ঘুমুতে পারি নি মা! সারা রাত ঘুমুতে পারিনি।

বিশ শতকের গৌরবান্বিতা হাত যেনো মাথার উপর নেমে এলো আশ্রয়ের ছায়া হয়ে, আমার রক্তের অক্ষমতায়, আমার সম্ভাব ব্যর্থতায়, আমার সত্যের পরাজয়ে। যে হাত শাহানা হয়ে ছায়া দেয় প্রতিদিন, প্রতি ক্ষণে, প্রতি পলে এই বিশ শতকের উপর, প্রতিটি মানুষের উপর, প্রতিটি বোধ ও সত্যের উপর ক্ষমাহীন।

আমি ভেসে গেলাম প্রতিকারহীন সেই শীতল সম্ভাষণে, সত্যশবের মত।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

অমিয়া বলল, পয়সা কি কামড়াচ্ছিল। কয়লাওলাব কাছে এখনো ছ্ মণের দাম বাকি। তাছাড়া, ওই কটা আলুতে কি হবে, ঘরে যা আছে তাও দিতে হবে দেখছি। এরপর সে বলল, টাটকা খুব, চর্বিও কম দিয়েছে। পুতুল বলল, রোববার কোর্মা রেঁধেছিল তৃপ্তির নতুন বৌদি। খুব বেশি ঘি দিয়েছিল, তাই ক্যাটক্যাটনি শুরু করেছিল শাশুড়ি। এই নিয়ে সে কি ঝগড়া মায়েতে ছেলেতে। তারপর সে বলল, আমি কিন্তু রাঁধব বলে দিলুম, বাবুদা বলছিল পাঞ্জাবীর হোটেলে নাকি দারুণ রাঁধে, আজ আসুক না একবার দেখিয়ে দোবোখন।

চাঁদু বলল, আগে জানলে জোলাপ নিয়ে পেটটাকে রবারের করে রাখতুম। খানিকটা কাল সকালের জন্যে তুলে রেখো, চায়ে বাসি রুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে তো জিভে চড়া পড়ে গেল। শেষকালে সে বলল, যেই রাঁধো বাবা, জবাফুলের রসের মতো রঙ হওয়া চাই কিন্তু।

রাধু এখন বাড়ি নেই। পাঁচ বছরের খোকন শুনে শুনে কথা শেখে, সেও প্রমথর হাঁটু জড়িয়ে বলল, বাবা আমি খাব মাংস।

ওরা যাই বলুক প্রমথ লক্ষ্য করছিল চোখগুলো। ঝিকোচ্ছে বরফ-কুচির মতো। ওরা খুশি হয়েছে। ব্যস, এইটুকুই তো সে চেয়েছিল, তা না হলে মাসের শেষ শনিবারে একদম পকেট খালি করে ফেলার মতো বোকামি সে করতে যাবে কেন। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথটা আরো ছোট হয়ে যায় শোভাবাজারের মধ্যে দিয়ে গেলে। বিয়ের পর কয়েকটা বছর বাজারের মধ্যে দিয়েই আফিস থেকে ফিরত, সেও প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। তারপর বাবা মারা গেলেন, দাদারা আলাদা হলেন, প্রমথও এখনকার বাড়িটায় উঠে এল। কবে উঠে এল সে

তারিখ পাওয়া যাবে ভব শ্রীমানির খাতায়। সেই মাস থেকেই অমিয়া মাসকাবারি সওদা বন্ধ করল, ওতে বেশি বেশি খরচ হয়। তারপর কালেভদ্রে দরকার পড়েছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার। আজ গরমটা যেন অন্যদিনের থেকে বেশি চড়ে উঠেছে, জুতোর তলায় পিচ আটকে যাচ্ছে, কোনোরকমে বাড়ি ফিরলে বাঁচা যায়।

ডাব বোঝাই একটা ঠেলা গাড়ি পথ জুড়ে মাল খালাস করছে, চারধারে যেন কাটামুণ্ডুর ছড়াছড়ি। তার ওপর বাজারের আস্তাকুড়টাও জিনিসপত্রের দামের মতো বেড়ে এসেছে গেট পর্যন্ত। পুব দিকের গেট দিয়েই বেরোনো ঠিক করল প্রমথ। দুটো রকের মাঝখানের পথটায় থৈ-থৈ করছে জল। চাপা-কল থেকে জল এনে ধোয়াধুয়ি শুরু করেছে দুটো লোক। ঝাঁটার জল যেন কাপড়ে না লাগে সেই দিকে নজর ছিল। তাহলে আঁশটে দাগ তুলতে হয়তো ঘুম ভাঙিয়ে পুতুলকে কলতলায় পাঠাতে হবে, তাছাড়া সাবানের যা দাম।

আর দু পা গেলেই মাছের বাজারটা শেষ হয়, তখুনি আচমকা জল ছুঁড়ল লোকটা থপাস করে। কাপড়ে লাগে নি, কিন্তু লাগতে তো পারত। বিরক্ত হয়েই সে পিছন ফিরেছিল, আর অবাক হল পিছন ফিরে।

বাজারের শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছিল প্রমথ, যতদূর দেখা যায় প্রায় শেষ পর্যন্ত এখন চোখ চলে গেল। ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে, অদ্ভুত লাগল তার কাছে।

সকালে মাছির মতো বিজবিজ করে, তখন বাজারটা হয়ে যায় যেন কাঁঠালের ভূতি। ঘিনঘিন করে চলতে ফিরতে। আর এখন, চোখটা শুধু যা টক্কর খেল কচ্ছপের মতো চটমোড়া আনাজের ঢিপিতে, নয় তো সিধে মাছের বাজার থেকে ফলের দোকানগুলো, দোকানে ঝোলানো আপেলগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আপেল না হয়ে ন্যাসপাতিও হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর দিনটায় একবার ওদিক মাড়াতে হয়! ফুল, পাতা ওই দিকটাতেই পাওয়া যায়, আর তখনই চোখে পড়ে ঝোলানো আপেল, সবরি কলার ছড়া, আনারস আর শীতের সময় চুড়োকরা কমলা লেবু। শীতের কথা মনে পড়লেই কপির কথা মনে আসে, আগেকার দিনে সের দরে কপি বিক্রি হত না। নাকের সামনে বাঁধাকপি লোফালুফি করতে করতে সন্নেসীচরণ হাঁক ছাড়ত, খোকাবাবু এই চলল পাঁচ নম্বরী ফুটবল, ছোঁকা রেঁধে খাও, গোষ্ঠ পালের মতো সট্ হবে। সন্নেসীটা যেন কি করে জেনে ফেলেছিল স্কুল টিমে প্রমথ ব্যাকে খেলে, আর গোষ্ঠ পালকে তো সে পুজো করত মনে মনে। আজকাল অনেকেই নাম করেছে, চাঁদুর মুখে কত নতুন নতুন নাম শোনা যায়। ওই শোনা পর্যন্ত। মাঠে যেতে আর ইচ্ছে করে না। সন্নেসী একদিন ফুটপাতে

মরে পড়ে রইল। আজেবাজে জায়গা থেকে রোগ বাধিয়ে শেষকালে বাজারের গেটে বসে ভিক্ষে করত। সন্নেসীর সঙ্গে সঙ্গে কুলদাকে মনে পড়ল প্রমথর, চেহারা কি! যাত্রাদলে বদমাইসের পার্ট করত। বাজারে, শিবরাত্তিরে যাত্রা শুনতে আসার আগে হিসেব করে আসতে হত বাবার কাছ থেকে কতগুলো চড় পাওনা হবে। কুলদার হাতে আড়াইসেরী রুইগুলোকে পুঁটি বলে মনে হত। ওর মতো ছড়া কাটতে এখন আর কেউ পারে না। আজকাল যেন কি হয়েছে, সেদিন আর নেই। গুইরাম মরে গেছে, ওর ছেলে বসে এখন। ছেলেটা বখা। অথচ গুইরামের পানে, পোকা হাজা কিম্বা গোছের মধ্যে ছোট পান ঢোকানো থাকত, কেউ বলতে পারত না সে কথা। গুইরামের দোকানের পাশে এখন একটা খোট্টানি বসে পাতি-লেবু নিয়ে, অমিয়ার জন্য রোজ লেবুর দরকার, একদিন ওর কাছ থেকে লেবু কিনেছিল প্রমথ। মাস ছয়েকের একটা বাচ্চা, বয়স দেখে মনে হয় ওইটেই প্রথম, কোলের ওপর হামলা-হামলি করছিল, বুকের কাপড়ের দিকে নজর নেই। ওর কাছ থেকে আর কোনোদিন লেবু কেনে নি সে, দুনিয়াসুদ্ধ মানুষের যেন হজমের গোলমাল শুরু হয়েছে, আর লেবুও যেন এতবড়ো বাজারটায় ওই এক-জায়গাতেই পাওয়া যায়। কতদিন সে মনে মনে গালাগাল দিয়েছে লেবুউলীকে। দিন দিন যেন কি হয়ে উঠছে। বুড়োধাড়ীদের কথা নয় বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু কচিকাঁচারাও'তো বাজারে আসে, বাজার পাঁচটা লোকের জায়গা।

প্রমথর বেশ লাগছে এখন বাজারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে। ছোট বেলার অনেক কথা টুকটাক মনে পড়ছে। পেচ্ছাপখানার সামনে চুনো মাছ নিয়ে বসে একটা বুড়ী, ওকে দেখলেই আবছা মনে পড়ে মাকে। বোকার, মতো হাসে, আর পায়ের আঙুলগুলো বাঁকা। ওখানটায় এখন থৈ-থৈ করছে চাপা-কলের জল। মাকে পুড়িয়ে গঙ্গায় চান করেছিল সে, সেই প্রথম গঙ্গায় চান করা। তখন কত ছোটই না ছিল, স্টিমারের ভোঁ শুনে জলে নামতে ভয় করেছিল তার। মাসের শেষে বাজারের ওইদিকটায় আর যাওয়া হয় না। তখন আলু, পান আর দু-একটা আনাজ কিনেই বাজার সারতে হয়। চাঁদুটাই শুধু গাঁইগুঁই করে, কেমন যেন বাঙালে স্বভাব ওর, মাছ না পেলেই পাতে ভাত পড়ে থাকে। খিটিমিটি লাগে তখন অমিয়ার সঙ্গে। চালের সের দশ আনা, পাতে ভাত ফেলা কেই বা সহ্য করতে পারে। পয়সা রোজগার করতে না শিখলে চাঁদুটা আর শোধরাবে না। রাধু একটা টিউশনি পেয়েছে। তবে আই এ-টা পাস করলে অন্তত গোটাকুড়ি টাকা মাইনে হত। ওর কিম্বা পুতুলের খাওয়ার কোনো

ঝামেলা নেই, অমিয়ারও না। পাতে যা পড়ে থাকে অমিয়া পুতুলকে তুলে দেয়, বাড়ের সময় মেয়েদের খিদেটাও বাড়ে। শিগগিরই আর একটা দায় আসবে। পুতুলের বিয়ে। মুখটা মিষ্টি, রঙটা মাজা, খাটতে পারে, দেখেশুনে একটা ভালো ছেলের হাতে দিতে হবে।

হটিয়ে বাবুজী।

এবার এইধারটা ধোয়া হবে, পিছিয়ে এল প্রমথ। সেই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। একটা বুড়ো বসত ওখানে। পেয়ারা, আমড়া, কদবেল ছোট্ট ঝুড়িতে স'জিয়ে বুড়োটা দুপুরে বসে বসে ঝিমোত। সে কি আজকের কথা! বাবা মারা যাবার অনেক আগে, বড়দাব তখন থার্ড ক্লাস, যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। সরু চালের দর এগারো টাকা, কাপড়ের জোড়া বোধহয় আট টাকায় উঠেছিল, সে আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল। স্কুলের টিফিনে একটা আধলা নিয়ে তিন-চারজন তারা আসত, পয়সায় আটটা কাঁচা আম পাওয়া যেত। আর এ বছর দশ পয়সা জোড়া দিয়ে একদিন মাত্র সে কাঁচা আম কিনেছে, তাও কুসিকুসি। আহা, সে কি দিন ছিল। প্রমথর ইচ্ছে করে বুড়ো যেখানটায় বসত সেখানে গিয়ে একবার দাঁড়ায়। ওখানে তখন রক ছিল না, দেয়ালের খানিকটা বালি-খসা ছিল। দুটো ইঁটের ফাঁকে গর্তটায় দোক্তা রাখত বুড়োটা। গর্তটা এখনো আছে কিনা দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছেটা খুব ছেলেমানুষের মতো। এত বছর পরেও কি আর গর্তটা থাকতে পারে, ইতিমধ্যে কতই তো ওলট-পালট হয়ে গেছে, ভেঙেছে, বেড়েছে, কমে নি কিছুই। তবু এই দুপুরের বাজারের চেহারাটা একরকমই আছে। ছেলেমানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, বুকটা টনটন করছে, তবু ঝরঝরে লাগছে গা-হাত-পা।

এই যে আসুন বাবু।

প্রথম পিছন ফিরল। গোড়ার দোকানটা লক্ষ্য করে সে এগিয়ে এল। সদ্য ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়েছে। পাতলা সিল্কের শাড়ি-জড়ানো শরীরের মতো পেশীর ভাঁজগুলোকে রাক্ষুসে চোখে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

কত করে দর যাচ্ছে।

তিন টাকা।

ভাবলে অবাক লাগে। চাঁদুর মতো বয়সে ছ-আনা সের মাংস এই বাজার থেকেই সে কিনেছে। তখন প্রায় সবই ছিল মুসলমান কসাই। ছেচল্লিশ সালের পর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।

একসের দি?

উৎসুক হয়ে উঠেছে লোকটার চোখ আর ছুরি। এর মতো মুন্নাও হাসত, তাব একটা দাঁত ছিল সোনার, তবে মুন্নাকে কিছু বলার দরকার হত না, গর্দানা থেকে আড়াই সের ওজন করে দিত। সেই মুন্না বুড়ো হল, তার ছেলে দোকানে বসল। তখন সংসার আলাদা হয়ে গেছে। দেড় সের নিত তখন প্রমথ। ঘোলাটে চোখে তাকাত বুড়ো মুন্না, চোখাচোখি হলে হাসত, চোখ ঝিকিয়ে উঠত। রায়টের সময় মুন্নাকে কারা যেন মেরে ফেলল।

একসের দি বাবু?

না তিন পো, গর্দানা থেকে দাও।

ওজন দেখল প্রমথ, যেন সোনা ওজন করছে। পাসানটা একবার দেখে নেওয়া উচিত ছিল। থাকগে ওরা লোক চেনে। তিনটে টাকা পকেটে ছিল। বাকি বারো আনা থেকে আলু, পেঁয়াজ কিনতে হবে। মাইনে হতে এখনো ছ-সাত দিন বাকি। ট্রামভাড়ার পয়সাও রাখতে হবে। মাংসের ঠোঙাটা তুলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল প্রমথ।

মেটুলি দিলে না যে, তিনটাকা দর নিচ্ছ, আমরা কি মাংস কিনি না ভেবেছ। লোকটা একটুকরো মেটুলি কেটে দিল। অনেকখানি দিয়েছে। অমিয়া দেখে নিশ্চয় খুশি হবে।

রাস্তায় পড়েই প্রমথর আবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। বাবার সঙ্গে ভবর জ্যাঠা হরি শ্রীমানির দোকানে এসেছিল এক সন্ধ্যায়। পাশেই ছিল মাটির খুরি-গেলাসের দোকান। তখন বিয়ের মরশুম, একহাজার খুরি-গেলাস কিনল কারা যেন। একহাজার লোক খাওয়ানোর কথা তো এখন ভাবাই যায় না। স্বদেশ কনফার্মড হবার পর বিয়ে করল। বরযাত্রী হয়েছিল আত্মীয়স্বজন, অফিসের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মিলিয়ে তিরিশ। কন্যাপক্ষ মাংস খাইয়েছিল। কায়দা করে রাঁধলে মাছের থেকে সস্তা হয়। স্বদেশের বিয়েও আজ সাতমাস হয়ে গেল। ছেলেও নাকি হবে। তবু তো সে সাতমাস আগে মাংস খেয়েছে। কিন্তু বাড়ির ওরা, অমিয়া, পুতুল! রাধু হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে, একটা পয়সাও বাজে খরচ করে না। চাঁদু ভালো ফুটবল খেলে, হয়তো বন্ধুরা খাওয়ায়ও। ছেলেটা ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসে, আর খেতেও পারে। এইটেই তো খাওয়ার বয়স। অমিয়ার খুড়তুতো বোনের মেয়ে শিলুর বিয়ের কথা শুনে কি লাফালাফিটাই জুড়েছিল। নেমন্তন্নে অবশ্য যাওয়া হয় নি। অন্তত একটা সিঁদুর-কৌটোও তো দিতে হত। চাঁদুটা আজ খুব খুশি হবে, ওরা সকলেই খুশি হবে।

বড় রাস্তার ঠিক মধ্যিখানেই কালীমন্দির। হাতে মাংসের ঠোঙা। চোখ বন্ধ করে মাথা ঝুঁকিয়ে দূর থেকেই প্রণাম জানিয়ে প্রমথ রাস্তা পার হল। পর্দা-ফেলা রিক্‌শা থেকে গলা বার করে দুটি বৌ প্রমথর পাশ দিয়ে চলে গেল।

সিনেমা হলগুলো আজকাল এয়ারকণ্ডিশন করা হয়েছে। প্রমথ ভাবতে শুরু করল, তা না হলে এই অসহ্য দুপুরে পারে কেউ বন্ধ ঘরে বসে থাকতে। তবু শখ যাদের আছে তারা ঠিক যাবেই, অমিয়ার কোনো কিছুতেই যেন শখ নেই আজকাল। অথচ মেজবৌদি, তার আপন মেজদা যিনি ডাক্তার হয়েই আলাদা হয়ে গেছেন, তার বৌ এখনো নাকি এমন সাজে যে ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়ে মেয়ে-বাড়ির সকলে গা টেপাটেপি শুরু করেছিল। মেয়েকে ফিরে সাজাতে হয়েছিল ওর পাশে মানাবার জন্যে। এ-খবর অমিয়াই তাকে দিয়েছিল। ওর শখ এখন এইসব খবর জোগাড় করাতে এসে ঠেকেছে। অথচ সাজলে এখনো হয়তো পুতুলকে হার মানাতে পারে।

গলিটা এবার দেখা যাচ্ছে, ওখানে ছায়া আছে। এইটুকু পথ জোরে পা চালাল প্রমথ।

ভাবনারও একটা মাথামুণ্ডু আছে। অমিয়া যতই সাজগোজ করুক পুতুলের বয়সটা তো আর পাবে না। সতেরো বছরের একটা আলাদা জেল্লা আছে, দেখতে ভালো লাগে। অমিয়ার বিয়ে হয়েছিলো সতেরো বছরে, সেও পুতুলের মতো লাজুক আর ছটফটে ছিল।

হাড়গোড়সার ছেলের হাত-পায়ের মতোই ন্যাতানো গলিটা। হল্‌কা বাতাস পর্যন্ত যেন স্যাঁতসেতিয়ে যায়। এ গলিতে ঢুকলে গায়ে চিটচিটে ঘাম হয়। কোঁচাটা পকেটে থাকছে না আলু আর পেঁয়াজের জন্যে। পেটের কাপড়ে গুঁজে দিতে একটুক্ষণ দাঁড়াল প্রমথ। ওপর থেকে উকিল বাবুর বিধবা বোন দেখছে। প্রমথ ঠোঙার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ওপর থেকেও বোঝা যায় এর মধ্যে মাংস আছে। নন্দীবাড়ির সঙ্গে ওর খুব ভাব। ছোটমেয়ের শ্বশুর বুঝি কোন এক উপমন্ত্রীর বন্ধু। তাই নন্দীগিন্নি ধরাকে সরা দেখে, অমিয় দুচক্ষে দেখতে পারে না এই মানুষগুলোকে। উকিলবাবুর বোনের দেখা মানেই পাড়ার সব বাড়ির দেখা। খবরটা শুনলে অমিয়া নিশ্চয় খুশি হবে।

বাড়ি ঢোকার মুখে দোতলার মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা হল প্রমথর। এ বাড়িতে অল্পদিন এসেছে। মুখচোরা, ওর বৌএর মতোই মেশে না কারুর সঙ্গে। শুধু কবিতা আর রাজনীতির কথায় মুখে খই ফোটে।

দেখেছেন তো আবার স্ট্রাইক কল করেছে, বেস্পতিবার।

শুনছি বটে, আপিসে বলছিল সবাই, যা মাগ্‌গীগণ্ডার বাজার, আগের বার এগারো সিকে ছিল, এখন তিনটাকা।

ঠোঙা-ধরা হাতটা দোলাল প্রমথ। কিন্তু মিহিরবাবুর নজর তাতে আটকাল না।

এখন তবু তিন টাকা। এক-একটা ফাইভ ইয়ার যাবে আর দেখবেন দামও পাঁচগুণ চড়বে।

অন্য সময় হলে মিহিরবাবুর সঙ্গে একমত হত প্রমথ। কিন্তু সে যা চাইছিল তার ধার দিয়েও গেল না কথাগুলো। গত রোববার মিহিরবাবুদের মাংস রান্না হয়েছিল। গরম মশলা গুঁড়োবার জন্যে হামানদিস্তেটা নিয়েছিল। এখনো ফেরত দেয় নি। বোধহয় ভেবেছে, ওদের আর কিসে দরকার লাগবে, যখন হোক ফিরিয়ে দিলেই হবে। মিহিরবাবু লোক ভালো। তবু প্রমথর মেজাজ তেতে উঠল ক্রমশ।

আরে মশাই স্ট্রাইক-ফ্রাইক করে হবেটা কি, তাতে পাঁচটাকার জিনিস এক-টাকায় বিকুবে?

কিছুটা তো কমবে।

আপনাদের ওই এক কথা।

প্রমথ ততক্ষণে উঠোনের কোণে রান্নাঘরের সামনের রকে ঠোঙাটা নামিয়ে রাখল। গলার আওয়াজে অমিয়া বেরিয়ে এল। তার পিছনে পুতুল আর চাঁদু। মিহিরবাবু ওপরে উঠে গেলেন। তারপর ওরা কথা বলল। ওদের চোখগুলো বরফ-কুচির মতো ঝিকিয়ে জুড়িয়ে দিল প্রমথকে।

এইটুকুই সে চেয়েছিল। খুশি হোক অন্তত আজকের দিনটায়। জিনিসের দাম বাড়ছে, স্ট্রাইক হবে, মিছিল বেরোবে, ঘেরাও হবে, পুলিশ আসবে, রক্তগঙ্গা বইবে—এ তো হামেশাই হচ্ছে। মানুষকে যেন একটা কামার তাতিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে বিরাট একটা ভারী হাতুড়ি দিয়ে। সুখ নেই, স্বস্তি নেই, হাসি নেই।

ওসব ভাবনা আজ থাক। খোকনকে কোলে নিয়ে হাসতে শুরু করল প্রমথ ওদের দিকে তাকিয়ে।

রোদের কটকটে জলুনি এখন আর নেই। বেলা গড়িয়ে এল। অমিয়া তাড়া দিচ্ছে দোকানে যাবার জন্যে। ঘরে আদা নেই। বঁটি সরিয়ে উঠল প্রমথ। এতক্ষণ তার মাংস কোটা দেখছিল খোকন। চাঁদু বিকেলের শুরুতেই

বেরিয়েছে। কোথায় ওর ফুটবল ম্যাচ আছে। বাটনা বাটতে বাটতে পুতুল খোঁজ নিচ্ছে চৌবাচ্চার। দেরি হলে বালতিতে শ্যাওলা সুদ্ধ উঠে আসে।

পাড়ার মুদির দোকানে আদা পাওয়া গেল না। তাই দূরে যেতে হল প্রমথকে। ফেরার সময় খোকনকে দেখল রাস্তায় খেলছে। ওর সঙ্গীদের মধ্যে ভুবন গয়লার নাতিকে দেখে ডেকে নেবার ইচ্ছে হল। তারপরেই ভাবল, থাক, এখন বাড়ি গিয়েই বা করবে কি। তাছাড়া, ঘুপচি ঘরের মধ্যে আটকা থাকতেই বা চাইবে কেন। খোকনকে ভালো জামা-প্যাণ্ট কিনে দিতে হবে, উকিলবাবুর ছেলেদের সঙ্গে যাতে মিশতে পারে। উকিলবাবুর ছেলেরা বাসে স্কুল যায়, বেশ ইংরিজিও বলতে পারে এই বাচ্চা বয়সে।

মাংসে বাটা-মশলা মাখাচ্ছিল অমিয়া। প্রমথকে দেখা মাত্রই ঝেঁঝে উঠল।

এত দেরি করে ফিরলে, এখন বাটবে কে।

কেন, পুতুল কোথায় ?

বিকেল হয়েছে, তার কি আর টিকি দেখার জো আছে। সেজেগুজে বিবিটি হয়ে আড্ডা দিতে গেছে।

আচ্ছা, আমিই নয় বাটছি।

বঁটি পাতল প্রমথ আদার খোসা ছাড়াবার জন্যে। অনেকখানি শাঁস উঠে এল খোসার সঙ্গে। সাবধানে বঁটির ধার পরীক্ষা করল, ভোঁতা। তাহলে অত পাতলা করে খোসা ছাড়ায় কি করে অমিয়া, অভ্যাসে! অভ্যাস থাকা ভালো, তাহলে সময় কেমন করে যেন কেটে যায়। অবশ্য আলু বা আদার খোসা ছাড়িয়ে কতক্ষণ সময়ই বা কাটে। তবু ঘর-সংসার, রান্নাবান্না, ছেলেপুলে মানুষ করা, এটাও তো একরকমের অভ্যাসেই করে যায় মেয়েরা, নাকি স্বভাবে করে। অমন স্বভাব যদি তার থাকত, প্রমথ ভাবল, তাহলে বাঁচা যায়। জীবনটা যেন ডালভাত হয়ে গেছে। ওঠানামা নেই, স্বাদগন্ধ নেই, কিছু নেই, কিচ্ছু নেই, তবু কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। আশ্চর্য, এই ভোঁতার মতো বেঁচে থাকাটাও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বদ অভ্যাস।

থাক, তোমায় আর কাজ দেখাতে হবে না।

অমিয়া হাত ধোবার জন্যে একটা বাটি টেনে নিল, হাতে মশলা লেগে, জলভরা বাটিটা রেখে দিল সে। শিলের ধারে আদাগুলো ঘষে, বাটতে শুরু করল অমিয়া। কত সহজে কাজটা করে ফেলল ও, প্রমথ ভাবল, এটাও এসেছে ওই অভ্যাস থেকে। তার মানে, ভোঁতা বঁটিতে, চুলচেরা করে খোসা ছাড়ানোর

যন্ত্রণাভোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই তৈরি করে নিয়েছে সহজ উপায়। অসহ্য হয়ে উঠলেই মানুষ স্বস্তি খোঁজে, সহজ হতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টাটাও কত অল্প সময়ের জন্যে। না হলে হাত-ধোয়া জলটুকু অমিয়া তো নর্দমাতেও ফেলতে পারত।

বাড়িতেই বসে থাকবে নাকি, বেরোবে না?

কোনো কথা বলল না প্রমথ। অমিয়া আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে।

খোকনের একটা ভালো নাম ঠিক করতে হবে।

করো না।

উকিলবাবুর ছেলেদের নামগুলো বেশ।

ওরা সাহেবি স্কুলে পড়ে শুনেছি, ছোটটা তো খোকনের বয়সী।

হ্যাঁ, বড়োটা শুনেছি ইংরিজিতে কথা বলতে পারে।

রামগতির পাঠশালায় দিও না খোকনকে ভর্তি করে, দুপুরে বড্ডো জ্বালায়।

উঠে পড়ল প্রমথ। ভেবেছিল আজ আর বাড়ি থেকে বেরোবে না। মাংস ফুটবে, ছেলেমেয়েরা কাছাকাছি জড়ো হবে, গল্প হবে এটা সেটার, আসন পেতে থালা সাজিয়ে দেবে অমিয়া, একসঙ্গে সকলে খেতে বসবে গরম ভাত, গরম মাংস। অমিয়া তাকিয়ে আছে; গলায় চটের মতো ঘামাচি। মুখ ফিরিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল প্রমথ।

উকিলবাবুর রকে বসে ছিলেন গৌর দত্ত। প্রমথকে দেখে কাছে ডেকে বললেন, দেখেছ কেমন গরম পড়েছে, এবার জোর কলেরা লাগবে।

নড়েচড়ে বসলেন গৌর দত্ত। প্রমথ ওঁর পাশে বসল।

শুধু কলেরা, আবার ইনফ্লুয়েঞ্জাও শুরু হয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখলুম জানো—

গৌর দত্ত প্রমথর গা ঘেঁষে ফিসফিসিয়ে প্রায় যে-স্বরে অনিল কুণ্ডুকে তার সংসার থেকে বিধবা ভাজকে আলাদা করে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেই স্বরে বললেন, লক্ষ্য করে দেখলুম জানো, বোমাটা ফাটার পরই এই ইনফ্লুয়েঞ্জা শুরু হয়েছে, গরমও পড়েছে, ঠিক কিনা?

হ্যাঁ, গরমটা এবারে তিষ্টোতে দিচ্ছে না।

লক্ষ্য করেছ যত বোমা সব জাপানের কাছাকাছি ফাটাচ্ছে। তার মানে কি, এতক্ষণ ওরা খুব ফরোয়ার্ড বলেই তো ওদের এত রাগ। আমাদের পুলুর আপিসে

একটা জাপানি আসে, ভালো ংরিজি জানে না, কথা বলতে খুব অসুবিধে হয় পুলুর, ওতো ফার্স্ট ডিভিশনে বি এ পাশ করা। তা জিজ্ঞেস করেছিল নেতাজীর কথা। ওরা আবার আমাদের চেয়েও শ্রদ্ধাভক্তি করে। কি উত্তর দিলে জানো, বোসের মতো কেউ থাকলে তোমাদের ফাইভ ইয়ার প্ল্যানগুলোয় চুরি হত না। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে!

হ্যাঁ, জিনিসপত্তর যা আক্রা হচ্ছে দিনকে দিন। মাংস তিন টাকায় উঠেছে।

এনেছ বুঝি আজ?

সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন গৌর দত্ত। অন্যমনস্কের মতো লাঠিটা ঘোবাতে ঘোরাতে আবার বললেন, কি গবম পড়েছে, টিকে নিয়েছ? খাওয়া-দাওয়া সাবধানে কোরো। ছেলেপুলেব সংসাব, বলা যায় না কখন কি হয়।

হলে আর কি করা যাবে, সাবধানে থেকেও তো লোকে রোগে পড়ে।

ওই তো ভুল করো। আজ তোমার যদি, ভগবান না করুন, ভালো মন্দ কিছু একটা হয় তখন সংসারের অবস্থাটা কি হবে ভেবেছ?

অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল প্রমথ। এসব কথা এখন ভালো লাগছে না। মনের এমন একটা অবস্থা আসে যখন এসব চিন্তা ভালো লাগে। বোধহয় সেটা সংসারে আর কিছু দেবার বা নেবার না থাকলেই মনে জাগে। আহা বুড়ো মানুষ।

একটু চাখবেন নাকি মাংস?

কি এনেছ, খাসি? রাঙ না সিনা?

গর্দানা।

এ হে, খাসির রাঙ দারুণ জিনিস।

গৌর দত্তর গালে যেন পিঁপড়ে কামড়াল। চুলকোতে চুলকোতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বুঝলে, আগে খুব খেতুম। সামনে জ্যান্ত পাঁঠা বেঁধে রেখেই হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত উড়িয়ে দিতে পারতুম। এখন ছেলেরা লায়েক হয়েছে, রোজগার করছে, বৌদের হাতে সংসার। পুলুটাও হয়েছে বৌ-ন্যাওটা, তোমার বৌদি বেঁচে থাকলে এ অবস্থাটা হত না।

টিকিট কাটার সঙ্গে সঙ্গে বাস বিকল হলে যাত্রীদের মনের অবস্থার মতো আস্তে আস্তে থেমে গেলেন গৌর দত্ত।

দুঃখ হচ্ছে প্রমথর। বুড়ো মানুষটার নিজের বলতে আর কিছু নেই। এখন কোনোরকমে টেনেটুনে চিতায় ওঠার অপেক্ষা। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন

তো আর সব জ্যান্ত মানুষের মতো ওর বুকের মধ্যেও জীবনটা ধুকপুক করবে, সাধ-ইচ্ছে তৈরি হবে, পূরণ করতে চাইবে, অথচ পারবে না। আহা বুড়ো মানুষটা মরবেই বা কেন।

চলুন গৌরদা, আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক গঙ্গার ধার থেকে।

সে বড় দূর ভাই, তার চেয়ে পার্কে বরং গোটা কতক চক্কর দিয়ে আসি।

উঠে দাঁড়াল দুজনে। রাধু বাড়ি ফিরছে। প্রমথ তাকিয়ে থাকল তার দিকে। জড়োসড়ো ভঙ্গিতে ওদের পাশ দিয়ে রাধু চলে গেল।

তোমার বড় ছেলেটি ভালো।

হাসল প্রমথ।

হাঁটতে হাঁটতে গৌর দত্ত বললেন, ওরা খুঁজবে হয়তো।

পার্কে ঢুকেও জের টেনে বললেন, খুঁজলে আর কি হবে, নিজেরাই গপ্পোটপ্পো করবে। আশুর মেয়েকে নাকি মারধোর করেছে শাশুড়ি, আজ ওর যাবার কথা ছিল, কি ফয়সলা হল কে জানে। আমি তো বলেছিলুম হাতে-পায়ে ধরে মিটিয়ে আসতে। খাট বিছানা টাকা তো এজন্মে দেবার ক্ষমতা হবে না আশুর। প্রমথর এসব কথায় কান নেই, সে তখন ভাবছে পুতুল এতক্ষণে ফিরেছে ওর বন্ধুর বাড়ি থেকে। উনুন ধরিয়েছে। অমিয়া ওকে দেখিয়ে দিচ্ছে কেমন করে খুন্তি ধরলে মাংস কষতে সুধিধে হয়। ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমেছে মেয়েটার গালে, কপালে, নাকের ডগায়। ঠোঁটদুটো শক্ত করে টিপে ধরেছে। চুড়িগুলো টেনে তুলেছে। দপদপে স্বাস্থ্য, বেশিদূর উঠবে না। পাতলা ভাপ উঠছে হাঁড়ি থেকে, না এখনই কি উঠবে; এখনো তো জলই বেরোয় নি। খুব উৎসাহ নিয়েই মেয়েটা রাঁধছে। আগে তো কখনো রাঁধে নি। নিশ্চয় বুক দুরদুর করছে আর আড়চোখে তাকাচ্ছে অমিয়ার দিকে। অমিয়া কি করছে? পিঁড়িতে গালে হাত দিয়ে বসে দেখছে। কি দেখছে, পুতুলকে? তাই হবে, হয়তো খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে ওর কচি মুখটা আর ভাবছে হয়তো যে-কটা গয়না আছে ভেঙে কি কি গড়াবে ওর বিয়ের জন্যে। এতক্ষণে গন্ধে ম-ম করছে বাড়িটা। খোকন নাক কুঁচকে শুঁকছে। ভালো লাগছে গন্ধটা তাই মিটিমিটি হাসছে আর গুটিগুটি হাঁড়ির কাছে আসার তাল খুঁজছে। পারবে না, অমিয়ার নজর বড় কড়া।

দুচার দিন হয়তো বলাবলি করবে, বলবে গপ্পে লোক ছিল, বেশ জমিয়ে রাখত সন্ধেটা। তারপর একসময় ভুলে যাবে। যেমন নির্মলদা কি নীলুকাকা মরে যাবার পর আর এখন কেউ নামই করে না। তোমরাও তেমনি ভুলে যাবে আমাকে।

দগদগে লাল হয়ে আছে কেষ্টচুড়ো গাছের চিমসে-কাঠি ডালগুলো। ওদের ফাঁক দিয়ে আকাশটাকে কেমন অন্য রকম লাগে। লাগে, চোখ নয় মনটা। রাধু টিউশনিতে যাবার আগে নিশ্চয় দেখেছে। দেখে কিছু বলেছে কি? বড় কম কথা বলে ছেলেটা। তেইশ বছরেই বুড়িয়ে গেছে ওর শরীর-মন। ওকে দেখলে অস্বস্তি হয়। মনে হয় হাসি-খুশি-আনন্দ যেন কিছুই নয়। জীবনটা শুধু দুখ্যু, দুখ্যু আর দুখ্যু কাটানোর চেষ্টাতেই ভরা। অথচ ওর বয়স তেইশ। ওর বয়সটা যেন চিমসে-কাঠি ডালে ফুল ফোটার মতো। বয়সের ফাঁকফোকর দিয়ে যৌবনটাকে কেমন বুড়োটে দেখায়।

রকে বসে থাকলে এতক্ষণে আরো পাঁচজন জুটে যেত। তখন শুধু আমাকে নয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে ওদেরও বলতে হত। তার চেয়ে এই বরং ভালো হয়েছে, বেমালুম খিদেটাও বেশ চনচনে হল।

তখন থেকে ভ্যাজর ভ্যাজর করছে বুড়োটা। বয়স বাড়লে হ্যাংলামোও বাড়ে। আঃ, কি হুড়োচাল্লি শুরু করেছে ছেলেগুলো, মানুষ দেখে ছুটবে তো। লাগল হয়তো বুড়ো মানুষটার। আহা ছেলেবৌরা যত্ন করে না। ফাঁসির আসামীও তো শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পায়, অথচ মুখ ফুটে ওর ইচ্ছের কথা বলতে পারবে না কাউকে। গুমরে গুমরে মনের মধ্যে গুমোট তৈরি করবে। এবারের গরমটা অসহ্য, তবু নাকি বেতিয়াফেরত মানুষগুলো হাওড়া ময়দানে ভাজাভাজা হচ্ছে। বাইরে-ভেতরে সবখানেই অসহ্য হয়ে উঠেছে মানুষ। এই যে সকলে পার্কে বেড়াতে এসেছে, সেও তো গুমোট কাটাতেই। অমিয়াও আসতে পারে। কি এমন কাজ তার, ওইটুকু তো সংসার। না, এখন সংসারের কথা থাক, তার চেয়ে বরং ওই গাছটার দিকে তাকানো যাক। রাধাচুড়ো। একটাও ফুল নেই গাছে। থাকা উচিত ছিল। কেননা কেষ্টচুড়োয় ফুল ধরেছে। এই হয়, একটা আছে তো আর একটা নেই, সুখে জোড় বাঁধে না কোনো কিছুই। এখন তার খুশি থাকতে ইচ্ছে করছে। অথচ অমিয়া, কি জানি এখন হয়তো পুতুলকে বকছে দু পলা তেল বেশি দিয়ে ফেলেছে বলে।

চলুন গৌরদা, এবার ফেরা যাক।

এর মধ্যে? রান্না হয়ে গেছে কি!

রান্নার দেরি আছে। আপনাকে নয় বাড়িতে পাঠিয়ে দোবো চাঁদুকে দিয়ে।

তাই দিও, আমি বরং একটু ঘুরি, আর শোনো, চাঁদুকে বোলো আমার হাতে ছাড়া কাউকে যেন না দেয়, কেমন।

প্রমথ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটতে দেখেছে এই সেদিন, অনেকের সঙ্গে সেও রুদ্ধশ্বাসে, ঘোড়সোয়ার পুলিশের নাগাল ছাড়িয়েও ছুটেছে। তাই সে বোঝে অমিয়ার অবস্থাটা যখন উনুনে আগুন পড়ে। কোথায় পালাবে সে ওইটুকু বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে? যেখানেই যাক ধোঁয়া খেতে হবেই, এই সময়টায় সকলেই উনুন ধরায়। ছাদে যে উঠবে তারও ফুরসত নেই। ঘরে বিকেলে কেউ থাকে না। ভাড়াটে বাড়ির একতলা, সদর দরজা সব সময় হাট করা, মুহূর্তের জন্যেও ঘর ছাড়ার উপায় নেই।

আজও সেই রোজকার অবস্থা, তবু রক্ষে উনুন প্রায় ধরে গেছে। নিজের মনে গজগজ করছে অমিয়া আর হাওয়া দিচ্ছে। সাহায্য করতে গেল প্রমথ। তিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠল অমিয়া।

থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

অমিয়া চুল বেঁধেছে, গা ধুয়েছে, শাড়িটাও পরিষ্কার। প্রমথ বলল, তুমি পুতুলকে ডেকে আনো, ততক্ষণ আমি হাওয়া দিচ্ছি।

পাখাটা নামিয়ে দম-কাটা স্প্রিঙের মতো উঠে দাঁড়াল অমিয়া।

দাঁড়াও, মেয়ের আড্ডা শেষ হোক তবে তো ঘরের কথা মনে পড়বে। আসুক আজ, ওর আড্ডা ঘোচাচ্ছি।

তরতর করে ছাদে উঠে গেল অমিয়া। সেখান থেকে একটু গলা তুলে ডাকলে তৃপ্তিদের বাড়ি থেকে শোনা যায়। ছাদ থেকে অমিয়া নামল আর সদর ঠেলে পুতুলও বাড়ি ঢুকল। একটুও আভাস না দিয়ে অমিয়া এলোপাথাড়ি কতগুলো চড় বসিয়ে দিল পুতুলের গালে, মাথায়, পিঠে। পইপই করে বলি সন্ধে হলেই বাড়ি ফিরবি, সেকথা গ্রাহ্যই হয় না মেয়ের, কি এত কথা হয় শুনি, ফিসফিস, গুজগুজ, তৃপ্তির মাস্টারের সঙ্গে হাসাহাসি, কেউ যেন আর দেখতে পায় না, না?

বারে, আমি হাসাহাসি করেছি নাকি?

যেই করুক, তুই ওখানে থাকিস কেন, ঘরে আমি একা, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে সে খেয়াল থাকে না কেন? হাঁড়িটা উনুনে বসা।

অমিয়া ঘরে চলে গেল। উঠোনে গোঁজ হয়ে আঁচলটা মুঠোয় পাকাতে থাকল পুতুল। খামোকা মার খেল মেয়েটা। এইটুকু তো বয়েস, খাঁচার মতো ঘরে কতক্ষণ আর আটকা থাকতে মন চায়। উঠে এল প্রমথ রান্নাঘর থেকে।

মা যা বলল তাই কর।

ওর পিঠে হাত দিয়ে আস্তে ঠেলে দিল প্রমথ। পিঠটা বেঁকিয়ে ঠেলাটা ফিরিয়ে দিল পুতুল। গঙ্গাজলের ছড়া দিতে দিতে ওদের দেখে গেল অমিয়া।

রাগ করতে হবে না আর, কি এমন অন্যায় বলেছে? আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, হাসাহাসি না করলেই তো হয়?

আমি মোটেই হাসাহাসি করি নি, তবু মিছিমিছি—

ওর পিঠে হাতটা রেখে দিয়েছিল প্রমথ, তাই আঙুল বেয়ে উঠে এল বাকি কথাগুলো। থরথরিয়ে পুতুল কাঁপছে।

বিয়ের পর যত পারিস হাসিস, কেউ বারণ করবে না। বড় হয়েছিস, বুদ্ধি হয়েছে তোর, তৃপ্তিদের যা মানায় আমাদের কি তা সাজে?

শাঁখ বাজাচ্ছে অমিয়া। পুতুলের কাঁপুনি যেন বেড়ে গেল। বিশ্রী শাঁখের আওয়াজটা। শুভকাজে শঙ্খধ্বনি দেওয়া হয়, অথচ এখন মনে হচ্ছে মাটি টলছে ভূমিকম্পে, তাই মেয়েটা কাঁপছে। মৃদু ঠেলা দিল প্রমথ। এক পা এগিয়ে তারপর ঘরে ছুটে গেল পুতুল।

দাও আরো আদর। দিন দিন যেন বাঁদরী তৈরি হচ্ছে। অনেক দুখ্যু আছে ওর কপালে, বলে রাখলুম।

হাঁড়ি নিয়ে রান্নাঘরে যেতে গিয়ে অমিয়া মন্তব্য করল। প্রমথ নরম স্বরে বলল, আজকে না বকলেই হত।

কেন, আজ রথ না দোল যে বকব না।

শোবার ঘরে এল প্রমথ। পুতুল ফোঁপাচ্ছে। স্তূপ করা বিছানায় মুখ গুঁজে। শব্দটা সর্দি ঝাড়ার মতো শোনাচ্ছে। তার ওপর প্যাচপেচে গরম।

লক্ষ্মী মা আমার ওঠ, যা রান্নাটা শিখে নে। আরে বোকা শ্বশুরবাড়িতে যখন রাঁধতে বলবে তখন যে লজ্জায় পড়বি, আমাদেরও নিন্দে হবে।

পুতুলের ফোঁপানি থামল। একটা চোখ বার করে, স্বরটাকে নামিয়ে বলল, বিয়ে করলে তো।

হেসে উঠল প্রমথ, পুতুল মুখ লুকোল।

তোর মাও বিয়ের আগে ঠিক অমন কথা বলত।

পুতুল আবার মুখ তুলল। চোখের কাজল ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। আহা, মেয়েটা কেঁদেছে। মেয়েকে কাঁদানো মানেই লক্ষ্মীকে কাঁদানো। কত ভাগ্য করলেই না ঘরে মেয়ে আসে।

তুমি কি করে জানলে, মা বুঝি বলেছিল?

একই সঙ্গে দুজনে দরজার দিকে তাকাল। না অমিয়া নয়, খোকন এল।

চোখাচোখি হল পুতুল আর প্রমথর, হাসল দুজনেই। মেয়েটা দারুণ ভীতু হয়েছে। ওর মাও অমন ছিল, খালি দরজার দিকে তাকাত। কিছুতেই কাছে আসত না। রাত্রে ছাদে উঠত, তাও কত ভয়ে ভয়ে।

বলো না, মা বুঝি সেসব গপ্পো করেছিল?

হেসে খোকনের চুলে বিলি কাটল প্রমথ। সেসব গল্প কবে করেছিল অমিয়া, তা কি এখনো মনে আছে। চেষ্টা করলে টুকবো টুকরো হয়তো মনে পড়বে। কিন্তু সেকথা কি মেয়েকে বলা যায়। একদিন গলি দিয়ে গিয়েছিল একটা বেলফুলওলা, কত কাণ্ড করে মালা কেনা হয়েছিল। আর একদিন, ছাদের উত্তর-পুব কোণায় তুলসীগাছের টবটার পাশে একটা ছোট্ট পৈঠে ছিল, একজন মাত্র বসতে পারে। পাছে বাবার ঘুম ভেঙে যায় তাই চুড়িগুলোকে হাতে চেপে বসিয়ে, পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছুট দিয়েছিল অমিয়া রকটা লক্ষ্য করে। আচারের শিশি বিকেলে তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিল, ছাদের মধ্যিখানেই পড়ে ছিল সেগুলো। তারপর সে কি কেলেঙ্কারি। বড়বৌদি ছাদে উঠে এসেছিল, আর অমিয়া পাঁচিল ঘেঁসে বসে পড়েছিল লজ্জায়, ভয়ে।

হাসছ কেন!

এমনি। একটা কথা মনে পড়ল তাই।

অমন করে হাসলে কিন্তু তোমায় কেমন কেমন যেন দেখায়। বেশ লাগে দেখতে।

চোখ নামিয়ে হাসল প্রমথ। খোকন চলে গেল রান্নাঘরে। খুন্তি নাড়ার শব্দ আসছে, গন্ধও আসছে কষা মাংসের, রান্নাঘরে অমিয়ার কাছে এখন কেউ নেই। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে গালে, কপালে, নাকের ডগায়। বার বার কাঁধে গাল ঘষার জন্যে ঘোমটা খুলে গেছে। দুহাত সকড়ি, ঘোমটা তুলে দেবার কেউ নেই কাছে।

বসেই থাকবি, নাকি রান্নাঘরে যাবি।

না, আমি শিখব না।

তাহলে কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে আদর হবে না। প্রতিবেশিরাও খাতির করবে না। তোর মার কাছে শেখার জন্যে পাড়ার মেয়েরা আসত, বাটি বাটি মাংস যেত এবাড়ি ওবাড়ি।

অবস্থা ভালো ছিল তাই মা শিখতে পেরেছিল, আমি তো কোনদিন রাঁধলুমই না।

মেয়েটা ভয় পেয়েছে বোধহয় শ্বশুরবাড়িতে আদর পাবে কি পাবে না সেই কথা

ভেবে। ওর বয়সেই মেয়েরা বিয়ের কথা ভাবে। অমিয়া বলেছিল সেও ভাবত, আর ভাবে বলেই একতলার ঘুপচি ঘরে জীবনটা সহনীয় হতে পারে। না হলে পাগল কিংবা আর কিছু হয়ে যেত। সচ্ছল ঘরে পুতুলকে দেওয়া যাবে না, টাকা কোথায়। মেয়েটা সেকথা ভেবেও হয়তো ভয় পায়। আসলে ভয় তো সকলেই পাচ্ছে, পুরুষ মেয়ে সকলেই। নতুন বৌ অমিয়ার সময় মাংসের সের ছিল ছআনা আট আনা, পুতুলের সময় তিন টাকা। জিনিস-পত্তরের দাম বাড়ার জন্যে স্ট্রাইক হবে, হোক। মিহিরবাবু কবিতা লিখলেও বাজে কথা বলে না। খুন্তির শব্দ আসছে, কষামাংসের গন্ধ আসছে, মেয়েটার মুখ শুকনো। অসহ্য লাগছে এই ঘরটা।

পুতুল আর প্রমথকে দেখে গম্ভীর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসল অমিয়া। আলুর খোসা নিয়ে খেলা করছিল খোকন। পুতুল তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে কুটনোর ঝুড়িতে রেখে দিল, খোসা-চচ্চড়ি হবে।

গন্ধ উঠছে। এমন গন্ধ অমিয়ার হাতেই খোলে। ফুসফুস ভরিয়ে ফেলল প্রমথ। অমিয়ার গা ঘেঁষে পুতুল বলল, দাও না আমাকে।

উত্তর না দিয়ে অমিয়া শুধু খুন্তিটা নাকের কাছে ধরল। গনগনে আঁচ। একটুক্ষণ খুন্তি-নাড়া থামলেই তলা ধরে যাবে। পুতুলের কথায় কান দেবার ফুরসত নেই। পুতুল করুণ চোখে তাকাল প্রমথর দিকে।

দাও না ওকে, যখন রাঁধতে চাইছেই।

সবই যখন করলুম তখন বাকিটুকুও করতে পারব। খোকনের ঘুম পেয়েছে, শুইয়ে দে।

সত্যিই তো! এখন আর করার আছে কি। জল ভরা কাঁসিটা হাঁড়ির মুখে চাপা দেওয়া ছাড়া। মাংসের জল বেরোলে, কাঁসির উষ্ণ জলটা ঢেলে দেওয়া, সে তো একটা আনাড়িতেও পারে। তারপর সেদ্ধ হলে আলু, নুন আর ঘিয়ে রসুন ভেজে সাঁতলানো, ব্যস। হতাশ হয়ে তাকাল প্রমথ। হনুর গড়নের জন্যে এমনিতেই পুতুলের গালদুটো ফুলো দেখায়, এখন যেন আরো টেবো দেখাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বলল, তৃপ্তিকে ওর বৌদি নিজে থেকে ডেকে রান্না শিখিয়েছে, গোটা ইলিশ কাটা শিখিয়েছে, এবার ওদের মাংস এলে তৃপ্তি রাঁধবে, সেদিন আমায় খাওয়াবে বলেছে।

তাহলে তো তোকেও একদিন খাওয়াতে হয়।

হয়ই তো, আজকেই তো ওকে বললুম, আমাদের মাংস এসেছে, মা বলেছে আমি রাঁধব।

অমিয়ার দিকে চোখ রেখে এরপর পুতুল কিন্তু কিন্তু করে বলল, ওকে আমার রান্না খাওয়াব বলেছি।

গৌরদাও আজ বলল, দিও হে বৌমার হাতের রান্না। অনেক দিন খাই নি, কোত্থেকে শুনল কে জানে, বললুম দেব পাঠিয়ে। আহা বুড়ো মানুষটার যা কষ্ট, ছেলেবৌরা তো একটুও যত্ন করে না।

হ্যাঁ, পুলুদার বৌ কি ভীষণ চালবাজ, একদিন গেছলুম, সে কি কথাবার্তা, যেন কত বি-এ এম-এ পাশ, কারুর আর জানতে বাকি নেই দু-দুবার আই-এ ফেল, বলে বেড়ায় পাশ করেছে। আর রাস্তা দিয়ে হাঁটে যখন, তুমি দেখেছ বাবা, যেন সুচিত্রা সেন চলেছে।

বাকার মত হেসে প্রমথ বলল, কে বললে তোকে।

তৃপ্তি। ও তো ভীষণ বায়স্কোপ ছাখে, তবে হিন্দী বই ছাখে না, খুব অসভ্য নাকি, মাস্টারমশাইও ছাখে না।

এমনি শুনে শুনেই মেয়েটা বায়স্কোপের খবর নেয়। দুধের সাধ ঘোলে মেটায়। আহা, এখনই ফুর্তি করার বয়স। মনে পড়ছে না কোনোদিন বায়স্কোপে যাব বলে বায়না ধরেছে। সোনার মেয়ে, বাপের অবস্থা বুঝে সাধ-আহ্লাদগুলো চেপে রাখে, বাবা-মাকে লজ্জায় ফেলে না। এ একমাত্র মেয়েরাই পারে, পুতুলের মতো মেয়েরা। চাঁদুটা সামান্য হুজুগ উঠলেই পয়সা পয়সা করে ছিঁড়ে খেত, এখন আর পয়সা চায় না। টাকা নিয়ে এখানে ওখানে খেলে বেড়ায়। ভাড়া খাটলে মান-ইজ্জত থাকে না, কিন্তু কি করবে, উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে কখনো ফাঁকা পকেটে থাকতে পারে? রাধুর মত ছেলে আর কটা হয়, পানটুকু পর্যন্ত খায় না। ভালো, ওরা সবাই ভালো, আহা বেঁচেবর্তে থেকে মানুষ হোক।

একদিন তোর মাকে নিয়ে যাস না বায়স্কোপে।

খোকনকে কোলে নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এসে গলা চেপে পুতুল বলল, হ্যাঁ, মা আবার যাবে। বলে, কতদিন সাধলুম চলো চলো, সকলেই তো যায়। তা নয়, মার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। একমিনিট বাড়ি না থাকলে সে কি ডাকাডাকি, যেন পালিয়ে গেছি, এমন বিচ্ছিরি লাগে, সবাই হাসাহাসি করে। বাবুদার সামনেও মা অমন করে।

ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকলে অমন ডাকাডাকি সবাই করে, তোর মেয়ে থাকলে তুইও করতিস।

প্রমথ হাসল। তিতকুটে গলায় পুতুল বলল, তা বলে দিনরাত ঘরে বসে থাকব?

বেরোতে ইচ্ছে করে না আমার ? ঘরকন্নার কাজ সব সময় ভালো লাগে ? তুমি হলে পারতে ?

শেষ দিকে সপসপ করে উঠল পুতুলের গলা। খোকনকে নিয়ে সে ঘরে চলে গেল। রকে পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। একতলাটা শান্ত। দোতলার সামান্য খুটখাট, তিনতলায় ছাদ, বলা যায় বাড়িটা চুপচাপ। শুধু গোলমাল করছে পাশের বাড়ির স্কুল ফাইনাল ফেল-করা ছেলেটা।

ঘরে থাকতেই ভালো লাগে না মেয়ের, বাইরেই বা যাবে কোথায়, গিয়ে করবেই বা কি। এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়া আর আজেবাজে কথা বলা—এতে লাভ কি ? দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রমথ ঘাড়ের জাড় ভাঙার জন্যে মাথা পিছনে হেলাল। ক্ষতিই বা কি, এমনি করেই তো বাকী জীবনটা কেটে যাবে। মেঘের নামগন্ধ নেই, শুধু ঝকঝক করছে গুচ্ছের খানেক তারা। অসহ্য গরম, অসহ্য।

হঠাৎ একদমক হাওয়া পেরেকে ঝোলানো বাসনমোছা ন্যাতাটা ফেলে দিল। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে গা এলিয়ে দিল প্রমথ। ছটফটে গরমের মধ্যে একটুখানি হাওয়া বড মিষ্টি লাগে। খোশবাই গন্ধ আসছে, হাঁড়ির ঢাকনাটা বোধহয় খুলল অমিয়া।

ঝিমুনি এসেছিল প্রমথর, ভেঙে গেল সদর দরজা খোলার শব্দে। চাঁদু এল। অমিয়ার সঙ্গে কথা হচ্ছে ওর, রাত্রে কিছু খাবে না বলছে। উঠে এল প্রমথ। খাবি না কেন ?

খাইয়ে দিল ওরা রেস্টুরেন্টে, সেমি ফাইনালের দিনও খাওয়াবে। দুটো গোল হয়েছে, দুটোই আমার সেন্টার থেকে !

ভালোই হল, কাল তো বাজার আসবে না।

অমিয়া কালকের জন্যে চাঁদুর ভাগটুকু সরিয়ে রাখল। আড্ডা দিতে বেরুচ্ছিল চাঁদু, ডেকে ফেরাল প্রমথ।

তোর গৌর-জ্যাঠাকে খানিকটা দিয়ে আয়।

কেন ?

বিরক্তি, তাচ্ছিল্য আর প্রশ্ন, একসঙ্গে তিনটিকে অমিয়ার মুখে ফুটতে দেখে দমে গেল প্রমথ।

ওকে যে বলেছি, পাঠিয়ে দেব।

দেব বললেই কি দেওয়া যায়, অমন কথা মানুষ দিনে হাজারবার দেয়। এইটুকু তো মাংস। একে তাকে খয়রাত করলে থাকবে কি, কাল বাজার হবে না, খাবে কি কাল ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবার দরকার কি, বলে দিও নয় ভুলে গেছলুম।

অমিয়া আর চাঁদুর মুখের দিকে তাকাল প্রমথ। একরকমের হয়ে গেছে ওদের মুখদুটো। ওরা খুশি হয় নি।

কিন্তু বুড়ো মানুষটা যে আশা করে বসে থাকবে।

থাকে থাকবে।

কথাটা বলে চাঁদু দাঁড়াল না। অমিয়া চুপ করে আছে। তার মানে, ওইটে তারও জবাব। আবার পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। আকাশে গুচ্ছের খানেক তারা। আচমকা তখন হাওয়াটা এসে পড়েছিল, আর আসছে না। পুতুল চুপিচুপি পাশে এসে বলল, দিলে না তো! জানি, দেবে না। তখন মিথ্যে বলেছিলুম, তৃপ্তিকে মোটেই বলি নি যে মাংস খাওয়াব। বেড়ালের মতো পুতুল ফিরে গেল। হয়তো তাই, বোকামি হয়ে গেছে। বুড়ো মানুষটা বসে থাকবে, বসেই থাকবে। ঝিমুনি আসছে আবার, দেয়ালে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দিল প্রমথ।

সদর দরজায় আবার শব্দ হল, প্রথমেই প্রমথর মনে হল গৌরদা বুঝি। ফিটফাট, ব্যস্ত ভঙ্গিতে বাবু সটান রান্নাঘরের দরজায় এসে চাঁদুর খোঁজ করল, তারপর নাক কুঁচকে গন্ধ টেনে বলল, ফাস্ ক্লাস গন্ধ বেরোচ্ছে কাকিমা।

আঁচল দিয়ে শরীরটাকে মুড়ে পুতুল যেন ভেসে এল।

চেখে যাবেন কিন্তু।

তারপরই তাকাল অমিয়ার দিকে ভয়ে ভয়ে।

বাবারে বাবা, মেয়ের যেন তর সইছে না। খালি বলছে, বাবুদা কখন আসবে, ওকে দিয়ে চাখাব। নিজে রেঁধেছে কিনা।

যে কেউ এখন দেখলে বলবে, অমিয়া হাসছে। কিন্তু প্রমথর মনে হচ্ছে ও হাসছে না। হাসলে অত কুচ্ছিত দেখায় কাউকে? নাকি তার নিজের দেখার ভুল! প্রমথ তাকাল বাবুর দিকে। চৌকো করে কামানো ঘাড়, চুড়ো করে সাজানো রুক্ষ চুল। বুক, কোমর, পাছা সমান। চোঙার মতো আঁটসাঁট প্যান্ট, উলটে দিলেই গুলতির বাঁট হয়ে যাবে চেহারাটা, ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু হাসল না প্রমথ, ছেলেটা শ-খানেক টাকার মতো চাকরি করে।

মুখে আঁচল চেপে হাসছে পুতুল। অমিয়া জিজ্ঞাসা করল; কেমন হয়েছে।

ফড়ুত করে হাড়ের মজ্জা টেনে বাবু বলল, গন্ধ শুঁকেই তো বলেছিলুম ফাস্ ক্লাস।

অমিয়া ওর খাওয়া দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদুর সেই কাজের কি হল?

বাবুর জিভ বাটিতে আটকে রইল কিছুক্ষণ, তারপরই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, সে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। তবে বুঝলেন তো, ম্যাট্রিকটাও যদি পাশ করত তাহলে ভাবনা ছিল না। আজকাল বেয়ারার চাকরির জন্যে আই-এ পাশ ছেলেরাও লাইন লাগায়। তবে আমিও এঁটেলির মতো লেগে আছি সুপারভাইজারের সঙ্গে, রোজ ত্যালাচ্ছি।

চাঁদু না হয়, রাধুর জন্যে ত্যাখো।

না কাকিমা। রাধুটা আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছে, চাকরিতে ঢুকে শেষকালে ইউনিয়নে ভিড়ুক আর আমায় নিয়ে টানাটানি শুরু করবে তখন। এর ওপর আবার যা গরম বাজার চলছে।

হ্যাঁ, মিহিরকাকু বলছিলেন বেস্পতিবার নাকি স্ট্রাইক হবে।

আরে ও তো খুচরো স্ট্রাইক। বেশ বড়োসড়ো অল ইণ্ডিয়া স্ট্রাইকের কথাবার্তা হচ্ছে নাকি।

হলে হয় একবার, ব্যাটা সুপারভাইজারটাকে বাগে পেলে আচ্ছাসে ধোলাই দিয়ে দেব। মেজাজ কি ব্যাটার, যেন মাইনে বাড়ানোর কথা বললে ওকেই গ্যাঁট থেকে টাকাটা দিতে হবে, পাবলিকের টাকা পাবলিক নেবে তাতে ক্ষতিটা কি হয়?

খালি বাটিটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল বাবু, পুতুল টেনে নিল হাত বাড়িয়ে, জলের গ্লাসটাও এগিয়ে দিল সে। রুমালে ঠোঁট মুছে বাবু জিজ্ঞেস করল, চাঁদুটা গেল কোথায়, একটা কার্ড ছিল একস্ট্রা।

কার্ড কিসের, আপনাদের সেই অফিসের থিয়েটারের?

উহুঁ, যুব উৎসব। বলেছিলুম না আমার এক বন্ধু গল্প-টল্প লেখে, এর মধ্যে আছে, সে-ই জোগাড় করে দিল কার্ডটা। চাঁদু বলেছিল সতীনাথের গানের দিন যাবে; তা সেদিন আর জোগাড় হয়ে উঠল না।

কোন গানটা গাইল? 'সোনার হাতে'টা গেয়েছে?

ওটা, তারপর 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে'টাও নাকি গেয়েছে।

আপনাকে তো সেধে-সেধে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, তবু গানটা লিখে দিলেন না।

বেশ চলো, এখুনি লিখে দিচ্ছি।

কয়লা দিয়ে উনুনে হাওয়া করছে অমিয়া। পুতুল আর বাবু যেন ভাসতে ভাসতে ঘরে চলে গেল। প্রমথর গা ঘেঁষেই প্রায়।

চটপটে, চালাকচতুর ছেলে। ও কি বিয়ে করবে পুতুলকে? জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়। তবে ছেলেমানুষ, বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাবে। তার থেকে

ওর বাবাকে গিয়ে ধরতে হবে। মুশকিল বাঁধবে জাত আর দেনা-পাওনা নিয়ে। শ-খানেক টাকা তো মোটে মাইনে পায়। বাপের মুখের ওপর কথা বলার সাহসও হবে না। আশ্চর্য, বিয়ে করতেও আজকালকার ছেলে-ছোকরা ভয় পায়, অথচ বিয়েটা কত আনন্দের।

তুমি এখানে বসে রইলে কেন, ঘরে ওরা একা রয়েছে না?

প্রমথ তাকিয়ে রইল অমিয়ার দিকে। কত সাবধানে আঙুলের ফাঁক দিয়ে চাল-ধোয়া জলটা ফেলছে। অমন করে মনের কুৎসিত সন্দেহগুলোকেও তো ছেঁকে ফেলে দিতে পারে। থাকলই বা ওরা একসঙ্গে একটুক্ষণ, ক্ষতিটা কি তাতে।

ঘরে নয়, ছাদে যাবে বলে উঠে দাঁড়ল প্রমথ। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে থামল। ঘরে কারা হাসাহাসি করছে, ছাদে গেলে অমিয়া রাগ করবে নিশ্চয়। আজ ওকে রাগাতে ইচ্ছে করছে না। রান্নাঘরে গিয়ে গল্প করলে কেমন হয়, আগডুম-বাগডুম যা খুশি। মেজ-বৌদিকে সেদিন দেখলুম ধর্মতলায় গাড়ি থেকে নামছে, এখনও পেট-কাটা জামা পরে; কিংবা, দক্ষিণাবাবু কি সব ওষুধ খাইয়ে বৌকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল। তবে কাজ ঠিকই হাসিল হয়েছে। পেটেরটা বাঁচে নি। কিংবা, একটা দিন দেখে গুরুঠাকুরের কাছে গিয়ে মন্তর নেবার কথাটা পাড়লে হয়, ভাবছিল প্রমথ। পুতুল ঘর থেকে বেরিয়ে তার কাছে এল।

ছোড়দা তো নেই, কার্ডটা নষ্ট হবে, ওর বদলে আমি যাব? বাবুদা বলছেন এমন উৎসব নাকি এর আগে হয় নি, না দেখলে জীবনে আর দেখা হবে না. নাচ, গান, সিনেমা, থিয়েটার সব নাকি দেখা যাবে, যাব?

গেলে ফিরবি কখন?

কত আর দেরি হবে, ঘণ্টাখানেক দেখেই চলে আসব।

কচি শশার মতো কব্জিটা যেন মুট করে ভেঙে ফেলবে পুতুল আঙুলের চাপে। এইটুকু কথা বলেই ও হাঁপিয়ে পড়েছে।

তোর মাকে একবার বলে যা।

রান্নাঘরের দরজা থেকে কোনোরকমে পুতুল বলল, ছোড়দা তো নেই। তাই আমিই যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি ফিরবখন!

একটা কাঁচা কয়লা বিরক্ত করে মারছে। সেটাকে তুলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টাতে অমিয়া ব্যস্ত। প্রমথ কৈফিয়ত দেবার সুরে বলল, বাড়ি থেকে বেরোয়-টেরোয় না তো, যাক ঘুরে আসুক।

কে?

সাঁড়াশিতে চেপে ধরে কয়লাটাকে উনুন থেকে বার করে আনতে আনতে অমিয়া বলল, কে, পুতুল ?

হ্যাঁ, কি যেন উৎসব হচ্ছে বলল।

চলে গেছে ?

না, কেন।

রান্নাঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল অমিয়া। পথ আটকে দাঁড়াল প্রমথ।

কেন আবার, রাত্তিরে মেয়েকে ছেড়ে দেবে একটা ছেলের সঙ্গে !

দিলেই বা কি দোষ হবে। হাঁপিয়ে ওঠে না ঘরে বসে থাকতে ? শুধু ছাদ আর গল্প করা। এ ছাড়াও তো অনেক কিছু আছে। মারধোর করলেই কি মেয়ে ভালো হবে।

প্রমথ চুপ করল বুক ভরে বাতাস টেনে। দাঁত চেপে কথা বলতে বেশ কষ্ট হয়, কিন্তু উপায়ই বা কি, ওঘরে পুতুল আর বাবু রয়েছে। থমথম করছে অমিয়ার মুখ। ঘাম নামছে থুতনি বেয়ে কিলবিলে পোকার মতো, ফরসা গালে সেঁটে বসা উড়ো চুলকে চীনে মাটির ফাটা দাগের মতো দেখাচ্ছে। সত্যিই ফেটে পড়ল অমিয়া।

আমি যখন পারি, ও পারবে না কেন, কেন পারবে না। শুধু ওর কথাই ভাবছ, কেন ভাবার আর কিছু নেই তোমার ? বলে দিচ্ছি ওর যাওয়া হবে না।

চুপ, আস্তে, দোহাই আজ আর চেঁচিও না।

আঙুল বাঁকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল প্রমথ। দপদপ করছে তার রগের পেশী। পিছু হটে এল অমিয়া। প্রমথর নখের ডগাগুলো ভীষণ সরু।

চুপ করব কেন। আমি অন্যায় কথা বলেছি ? মেয়েকে কেন তুমি ছেড়ে দিতে চাও একটা পরের ছেলের সঙ্গে, তা কি বুঝি না ভেবেছ।

চোখে চোখ রেখে ওরা তাকাল। অমিয়ার চাউনি কসাইয়ের ছুরির মতো শান দিচ্ছে। মাংসের খোলা হাঁড়িতে চোখ পড়ল প্রমথর, থকথক করছে যেন রক্ত।

কি বুঝেছ তুমি, বলো কি বুঝেছ ?

দু হাতে অমিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল প্রমথ। খোঁপাটা খুলে পড়ল, চোখদুটো মরা পাঁঠার মতো ঘোলাটে হয়ে এল, ঠোঁট কাঁপিয়ে অমিয়া বলল, তুমি আমার গায়ে হাত তুললে !

অন্ধকার উঠোনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পুতুল আর বাবু। কোনো সাড়া নেই যেন ইন্দ্রিয়গুলোর। তবু ছাদে যাবার সময় প্রমথর নাকে চড়াভাবে লাগল পাউডারের গন্ধ। মেয়েটা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে, করুক। সকলেই তো

করছে, যা হোক একটা কিছুর জন্যে। মাথা নিচু করে প্রমথ ওদের পাশ দিয়েই ছাদে যাবার সিঁড়ি ধরল।

ছাদেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাধু ডেকে তুলল প্রমথকে। থালার সামনে বসে আছে অমিয়া। ঠাণ্ডা ভাত আর মাংস। ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়েছে।

পুতুলও শুয়ে পড়ল যে এর মধ্যে।

শরীর খারাপ, কিছু খায় নি।

শুকনো কড়কড়ে কথা হল দুজনের, তাছাড়া খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আর কেউ উচ্চবাচ্য করল না। মাংসের সবটুকুই খেল প্রমথ। শুধু মেটুলির টুকরোগুলো ছাড়া। মেটুলি ভীষণ ভালোবাসে অমিয়া, অথচ সবটুকুই সে প্রমথকে দিয়ে দেবে। প্রমথও না খেয়ে বাটিতে রেখে দেবে। একসময় এটা তাদের প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। তখন মিষ্টি ঝগড়া ভালো লাগত আর মাংসও আসত নিয়মিত। আজকেও প্রমথ মেটুলি রেখে উঠে পড়ল। কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে কষের দাঁত থেকে মাংসের আঁশ টেনে বার করল। ভিজে গামছা দিয়ে গা-মুছে যখন সে শুয়ে পড়ল তখনও অমিয়ার রান্নাঘর ধোয়া শেষ হয় নি।

অনেক রাতে উঠোনে বেরিয়ে এল প্রমথ। ঘরের মধ্যে যেন চিতা জ্বলছে। একটুও হাওয়া নেই, ঘুম নেই, মেঘও নেই। পায়চারি শুরু করল সে রকের এমাথা ওমাথা। একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। মুখ তুলে তাকাল প্রমথ। একটুখানি দেখা গেল, লাল আর সাদা আলোটা পালটা-পালটি করে জ্বলছে আর নিভছে। মাত্র কতকগুলো তারা দেখা যায় উঠোন থেকে। ছাদে উঠলে আরো দেখা যাবে। দেখেই বা কি হবে। ওরাও তো দেখল আজ মাংস এসেছে অনেকদিন পর, কিন্তু তাতে হল কি। পাতে মেটুলি রেখে সে উঠে পড়ল আর নির্বিকার হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল অমিয়া। এখন মনে হচ্ছে অমিয়া যন্ত্রের মতো তাকিয়ে ছিল। কিন্তু সেও তো যন্ত্রের মতোই শুধু অভ্যাস মেনে মেটুলিগুলো পাতে রেখে দিয়েছিল। এটা কি বদঅভ্যাস? পায়চারি থামাল প্রমথ। অমিয়াও উঠে এসেছে।

ঘুম আসছে না বুঝি?

না, ভয়ানক গরম লাগছে।

পিঠের কতকগুলো ঘামাচি মারল অমিয়া। দু-একটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল প্রমথ।

ছাদে যাবে?

কেন, এই তো বেশ।

বরাবরই তোমার কিন্তু ঘামাচি হয়।

অমিয়া পিঠের উপর কাপড় টেনে দিল।

বসবে ?

পাশাপাশি বসল দুজনায়।

পুতুলের জন্যে ছেলে ছ্যাখো এবার।

হ্যাঁ, দেখব।

চাঁদুটাকেও একটা যা হোক কাজেকম্মে ঢুকিয়ে দাও, কদ্দিন আর টো টো করে কাটাবে।

হ্যাঁ, চেষ্টা করতে হবে।

বাধু বলছিল আই-এ পরীক্ষাটা দেবে সামনের বছর।

ভালোই তো।

শান্ত রাত্রির মাঝে ওদের আলাপটা, কল থেকে একটানা জল পড়ার মতো শোনাল। ওরা অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, পাশাপাশি। কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। দুজনেরই চোখ সামনের শ্যাওলা-ধরা দেয়ালটাকে লক্ষ্য করছে। তারপরই একটানা নিস্তব্ধতা ভেঙে কয়েকটা কথা বলল অমিয়া।

কি দরকার ছিল মাংস আনার।

অমিয়ার স্বরে ক্ষোভ নেই, তাপ নেই, অনুমোদন নেই। শুধু যেন একটু কৌতূহল। তাও ঘামাচি মারার মতো নিস্পৃহ। মুখ না ফিরিয়ে প্রমথ বলল, কি জানি। তখন কেমন ভালো লাগল, অনেক কথা মনে পড়ল, মনটাও খুশি হল। ভাবলুম আজ সবাই মিলে একটু আনন্দ করব।

চুপ করে রইল প্রমথ। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল। অমিয়াও তার দিকে তাকিয়ে।

আজ পুতুলকে দেখে বারবার তোমার কথা মনে পড়ছিল। আর ওকে কাঁদিও না।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল প্রমথ, তারা জ্বলছে। একটা কামার মানুষকে তাতিয়ে বিরাট এক হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চলেছে, তারই ফুলকিগুলো ছিটকে উঠেছে আকাশে। ছাদে উঠলে আরো অনেক দেখা যাবে। অমিয়ার পিঠে হাত রাখল প্রমথ। থরথর করে কাঁপছে ওর পিঠটা।

জানো, আমি, আমরা কেমন যেন হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে আমি আর ভালোবাসি না, বোধহয় তুমিও বাস না। তা না হলে তোমার মনে হবে কেন আমি তোমার

গায়ে হাত তুলতে পারি। অথচ সত্যি সত্যি তখন ইচ্ছে হয়েছিল তোমার গলা টিপে ধরি।

অমিয়ার পিঠে হাত বোলাল প্রমথ। খসখসে চামড়া, মাংসগুলো ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে, মেরুদণ্ডের গিঁটগুলো হাতে আটকাচ্ছে। মুখ তুলল প্রমথ, যে-কটা তারা দেখা যায়, সেদিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, কেঁদো না, মরে গেলেই মানুষ কাঁদে, আমি কি মরে গেছি।

তারপর ওরা বসে রইল অন্ধকারে, কথা না বলে।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ওঁ

৪০০১৲ টাকা পুরস্কার

বাঙ্গালার মধ্যে কিম্বা যে-কোন স্থানে বেয়ালা বাজনার, স্বরগ্রাম সহ গান, ও লহরি, যথা : ১। বেহাগ, ২। কারপা, ৩। আসাবরি, ৪। দরবারি কালেংড়া, ৫। কারপা, ৬। পূরবি, ৭। ৮। ভান কীর্তন, ৯। ভৈরবি ও ১০। ভৈরব।

১ নং দাঁড়িয়ে বাজান
২ নং বসে বাজান
৩ নং শুয়ে বাজান
৪ নং চক্ষু ২টি বেঁধে বাজান
৫ নং লহরি ১০ মিনিট
৬ নং

যিনি এই কয়েকটি রাগিণী তানে ও মানে সমভাবে বাজাতে পারবেন তাহাকে ৪০০১ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পরাজিত হলে আমাকে উক্ত টাকা দিতে হবে।—

ঠিকানা—
শ্রীবিপীনবিহারী বিশ্বাস (রায় বাহাদুর)
M.A. Honours in English
Calcutta University

Vill & P.O. Dadarat
Dt. 24 Pargs W.B.
2/4/67

ওই তারিখে বারুইপুর স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে বসে আছি। লক্ষ্মীকান্তপুরের ট্রেন ধরব। খয়েরি পাঞ্জাবি গায়ে এক বুড়ো ঘরে ঢুকলো। বগলে বেহালার বাক্স। পায়ে তাপ্পিমারা পাম্প, পরণে খেটে ধুতি। গালে পাকা দাঁড়ি, সাদা ভ্রূ। লোকটি বসেই বেহালার ছড় ঘষতে লাগল।

ফাঁকা দুপুরে বাইরের খোলা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দুজন চাষী অনাবৃষ্টি খরার কথাবার্তা বলছিল। বাজনা শুনে তারাও এগিয়ে এল। খুব সম্ভব কনসার্ট পার্টির কোন খুব পরিচিত গৎ। শুনতে ভালই লাগছিল।

বাজিয়ে বাক্স বন্ধ করে লোকটি আমার কাছে একটি টাকা চাইল। দিলাম। তখন খুশি হয়ে পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে আমার হাতে দিল। খুলে দেখলাম তাতে ওসব লেখা রয়েছে।

কাগজখানার উলটো দিকে লেখা রয়েছে—To The Honble First Munseef of Baruipur, Sir, I wish to interview 2 minutes only kindly allow me, your valuable time west me. Excuse me for your trouble.

Your most Obedient Servant truly, polite, believe, sympathy. Sree Bepin Behary Biswas. (Rai Bahadur) M. A. Honour in English, Calcutta University. Vill. P.O. Dadarat, Biswaspara, D/24 Pargs., West Bengal.

পড়ে এই ক'টি জিনিস মনে হল :—

লোকটি ইংরেজিতে অনার্সকে খুব সমীহ করে মনে মনে। উপরন্তু রায়বাহাদুর হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। তাছাড়া সে চ্যালেঞ্জ ভালবাসে। এদিককার এমন কোন পাড়ায় থাকে—যেখানকার নাম বিপিনবাবুটির পূর্বপুরুষের পরিচয়ে হয়ত পরিচিত। ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি তার স্বপ্নে একচ্ছত্র।

কিন্তু লোকটি এখন নিশ্চয় রিটায়ার্ড ও সংসারে বাতিল।

লোকটিকে পরের রবিবার আমার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করতে বললাম। আরও বললাম, আপনার বাজনার হাতটি খুব ভাল।

খুব খুশি।

আমি একটি খালের পাড়ে থাকি। উপস্থিত অনেক কম সময়ে বেশি ধানের লোভে খালধারে আই আর এইট ধান চাষ করেছে। তাই খাল শুখো। দুপুরের রোদে রবিবার পুড়ে যাচ্ছিল। সেই খালধার ধরে ধরে বিপিনবাবু এলেন। সঙ্গে বেহালার বাক্স।

আমি প্রায়ই এরকম লোক ধরে ধরে আনি বলে আমার স্ত্রী বিপিনবাবুকে খেতে দিতে রাজি হচ্ছিল না প্রথমে। কিন্তু খেতে বসবার পর দেখলাম বেশ এটা ওটা এগিয়ে দিল। খেয়ে উঠে বিপিন বিশ্বাস লম্বা একটা ঘুম দিল বসবার ঘরে।

বিকেলে উঠে চায়ের কথা মনে করিয়ে দিল। তারপর বাক্স খুলে ছড় হাতে নিয়ে বেহালাটা জুৎ করে কাঁধে বসালো।

জানতাম না। সেদিন পূর্ণিমা ছিল।

আর কিছু হাওয়া ছিল। খুব জোর। আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যে হতে না হতেই হেরিকেন ধরানো হয়। চাঁদও উঠলো। কালো বাছুরটা পুকুরঘাটে দাঁড়ানো ওর মাকে খুব ঢুসোচ্ছে।

কাঁধে বেহালা সেট হয়ে গেছে। ছড় ঠেলে ঠেলে অনেক স্থর ভেঙে ওপরে উঠছে আবার নীচে পড়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য খাদে দাঁড়াচ্ছে। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো ফেলে এদিকেই কান খাড়া করে আছে।

এসব আমাদের বারান্দায় হচ্ছিল। বেহালার ধ্যাঁ ধোঁ কারও বুক তুবড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছিল! বিপিনবাবুর মুখে ভাঙা পাটালির ধারা এক চিলতে জ্যোৎস্না পড়ে শাদা দাড়িতে, ভ্রূতে ঝকঝক করছে। কাঁটা বোঝাই বাবলা গাছগুলো এখন কেমন নির্দোষ বৃক্ষ হয়ে দাঁড়ানো। খালধারের শেকুল কাঁটার ঝোপে হলদে ফুলগুলো জ্যোৎস্নায় হারিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ছড় থামিয়ে বিপিনবাবু বলল, 'এই রাগিণী মাঘী পূর্ণিমায় সারারাত দিঘির পাড়ে বসে বাজাতে পারলে পরী নামানো যায়। একবার মিত্তিরদের কাছারিবাড়ির পুকুরে নামিয়েছিলাম। ওঁরা একখানা কম্বল দেয় শেষে।'

আমার ছেলেপিলের মা এতক্ষণ অবিশ্বাস করতে করতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল বাজনা শুনে। পরীর কথায় ঠোঁট ওলটালো। নাও নাও এখন বিদেয় কর—এই ভাব নিয়ে উঠে গেল।

আমি বললাম, 'কম্বল কেন?'

'মাঘী পূর্ণিমের রাত। ঠাণ্ডা হবে না? আমার অবিশ্যি তখন জোয়ান বয়স। শীতবোধ বিশেষ ছিল না। তবে কিনা—একে মেয়েছেলে, তায় পরী। শীত তো লাগবেই। ওদের তো বিশেষ জামা-কাপড় পরতে নেই।'

আমার জন্যে তালশাঁস, ডাবের জল ঢাকা দেওয়া ছিল। ঘরের থেকে এনে নিজেই বিপিনবাবুকে দিলাম। ব্রেন্‌ওয়ার্ক হচ্ছে ওঁর।

'উত্তর আকাশ থেকে নেমেছিল। রাত দু'টো নাগাদ। ঘাটলায় এসে পাখা গুটিয়ে বসে আমার বাজনা শুনছিল একমনে। সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম পাছে উড়ে যায়।' তালশাঁস খেতে কিছু সময় গেল। 'মিত্তিরদের জেঠিমা যেমন হাসিখুশি তেমনি সাহসী ছিলেন। শরীরে দয়ামায়াও ছিল। তিনিই

হৃষিকেশ থেকে আনানো পাহাড়ী ভেড়ার লোমের কম্বলটা শেষরাতে দোতলা থেকে ঘাটলায় ছুঁড়ে দিলেন।'

'পরী উড়ে গেল না?'

'বড় ভাল ছিল মেয়েটি। শীত লেগেছিল। দৈববাণীর মত আকাশ থেকে কম্বল পেয়েই গায়ে জড়িয়ে ফেলল। তারপর আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। আমার ভেতরটা সেই ক' সেকেণ্ডের জন্যে—কি বলব গাঙ্গুলীমশাই, ধক্ করে উঠল। পরিষ্কার বাংলায় বলল—আরেকখানা বাজাও।'

'বাংলায়?'

বিপিনবাবু একটু থমকে গেল, তারপর বেহালাটা কাঁধে তুলে নিল, খানিকক্ষণ ছড় ঘষাঘষি করে একটা খুব ভারী রাগের মধ্যে ছড়সুদ্ধ হাত, মাথা ডুবিয়ে দিল, 'এই রাগটা বাজিয়েছিলাম।'

ছড়ের এক এক টানে হাওয়া সুদ্ধ নদীর জল উঠে আসছিল এক একবার। আবার ভাঁটাও হচ্ছিল। খালপাড়ের ওধারে দূর দিয়ে কলকাতার গাড়ি গেল আলো জ্বালিয়ে—লোকজন নিয়ে—আবার কয়েক গাড়ি লোক ফিরেও এল।

ছেলেমেয়েরা খেতে বসেছে। ওদের মা ভাত খেতে দিচ্ছে। হেরিকেনটা হাওয়ার জ্বালায় দেয়ালের পাশে সরিয়ে দিল।

এক সময় বললাম, 'পরী নেমে আসবে না তো?'

বাজনা না থামিয়েই বিপিনবাবু বললেন, 'নামতেও পারে।'

আমার অবিশ্বাস এতই বেশি—প্রায় হো হো করে হেসে উঠছিলাম। পরী নামার অবস্থাই বটে। মডিফায়েড রেশনে আমাদের এই স্টেশনপাড়ায় চাল গম কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না ক' সপ্তাহ। ডিলার গরুর গাড়িতে মাল পাঠিয়েছিল। বাদার মধ্যে দিয়ে পিচ রাস্তা ধরে তিন গাড়ি গম আসছিল। লুট হয়ে গেছে।

বিয়ের বরযাত্রী থেকে স্টেশনমাস্টার, পোস্টমাস্টার, হেডমাস্টার—সবাই চাল নিয়ে আলোচনা করে। স্মাগলারদের দাপটে ট্রেন রোজ লেট হচ্ছে। রাত হলে অন্ধকারে বসে বসে কত পরিবারের কর্তা হাওয়া খায়—বড় বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

আলাপ রীতিমত জমে উঠেছে। এমন সময় বড় ছেলেটা এঁটো হাতে উঠে এসে আমার সামনেই দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। ইসারায় থামতে বলে এগিয়ে গেলাম।

ব্যাপার সামান্য। ও এবেলা ওবেলা দুটো বেশি করে পান্তা ভাত খেয়ে থাকে।

আরও খাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ওর মা তুলে দিয়েছে মাঝখান থেকে। বলেছে, সবাই খাবে তো?

বিপিনবাবুর বেহালায় আলাপ জমে উঠেছিল।

চাষ উঠলে বছরকার ধান কেনা থাকে ফিবার। এবারই হয়নি! ট্রেনে, বাজারে যত পুলিশ বাড়ছে, ফ্রন্ট সরকারের ফতোয়া যত লম্বা হচ্ছে—চালের দামও তত চড়ছে। ফি রাতে ডাকাতি হয়। থানা এখান থেকে পাঁচ মাইল। খবর দিয়েও কোন লাভ হয় না।

বিপিনবাবু পরী নামানোর জন্যে বেহালাটা খুব জোরে কাঁধে চেপে ধরেছে। আমাদের বাগানের বেলফুল গন্ধ ছড়াচ্ছিল বাতাসে। চাঁদ সারা পাড়া জুড়ে টর্চ ফেলেছে। এ-বাড়ি সে-বাড়ির রেডিওগুলো জুড়িয়ে এল। শুধু স্টেশনের ধারের একটা দোকান—সারা বছরই ওদের হালখাতা থাকে।—মাইক বাজিয়ে দানাদার খাওয়ায়। বেয়াড়া খদ্দেরের বাকি টাকা তোলে। সেদিক থেকেই ভেসে আসছিল—'আলেয়া! আলেয়া!! জীবনে নারী পেয়েছি অনেক—'

পরী নামাতে না পেরে পরাজিত হলে বিপিন কি আমাকে ৪০০১ টাকা পুরস্কার দেবে? ছেলেটা বাইরের খাটে শুয়ে বাজনা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হয়ত খানিক বাদেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পরী নেমে এসে আমাদের ওই বাগানে বেলফুলের সারির মাঝে পাখনা গুটিয়ে দাঁড়াবে। তারপর বলবে—

Honble Mr. Biswas Sir, I wish to interview 2 minutes only kindly allow me, your valuable time west me.

প্রথম আলাপের সেই চিরকুটখানা আমার টেবিলের ড্রয়ার খুললেই রোজ চোখে পড়ে।

কিন্তু সেসব কিছুই ঘটল না।

বিপিনবাবু বাজাতে বাজাতে শুয়ে পড়েছেন প্রায়। নারকেল পাতাগুলো জ্যোৎস্না ছিঁড়ে ছিঁড়ে দুলছে। পৃথিবীতে এখন কোনো অশান্তি নেই। অথচ জানি, এই আধা শহর আধা গাঁয়ের প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে নানা অবিচারের বিরুদ্ধে নায্য অন্যায্য দাবি লেখা পোস্টার মেরেছে ছেলেরা। সব বদলে যাচ্ছে। মাটি, গাছপালা, খাল, আকাশ—এরাই শুধু পাল্টায়নি। এর মাঝখানে আমরা পরী নামাচ্ছিলাম। আমার বয়স চল্লিশ। বিপিনবাবু তো সত্তর হবে। লোকটা চিট হতে পারে—ক্র্যাক্ হতে পারে। জেনুইন কিনা কে জানে।

খড়ি-ওড়া শুকনো চামড়ায় বিপিনবাবু দিবানিদ্রার পর খুব জম্পেস করে

বাজাচ্ছিল। এসব বাজনা কতকাল শুনিনি। তাল, লয়, রাগ—কিছুই জানিনা। তবু বেশ লাগছিল। শুধু আমাকে শোনাতেই একজন বাজনদার প্রাণপাত করে যাচ্ছে—অথচ আমি সভাসদ, পাত্রমিত্র, পাইক বরকন্দাজ সাজিয়ে রাজা হয়ে বসে নেই। সামান্য শ্যামল গাঙ্গুলী।

বড় ছেলেটা বাইরের রোয়াকেই ঘুমিয়ে গেল। নয় পেরিয়ে দশে পড়েছে। ভাতটা খেতে বড় ভালবাসে। সবচেয়ে সস্তার জিনিস এমন আক্রা হয়ে যাবে একদিন কে জানত।

ছেলেমেয়েদের মা এখন সারাদিন পরে ফ্রি হয়েছে। মেয়েটাও এতক্ষণে ঘুমে হাল্লাট হয়ে গেল। অন্ধকার বারান্দায় আমি আর বিপিন বিশ্বাস। ভেতরের ঘরে আলোর সামনে গিন্নি দাঁড়ানো। তাই ওর মুখ চোখ দেখা যাচ্ছে না। ঘোমটা শাড়ির চারধারে আলোর আউটলাইন। একবার মনে হল আমায় ডাকছে। উঠতে যাব। বিপিনবাবু ছড় ঘষতে ঘষতে আমাকে খুঁচিয়ে দিল। ওঁর দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে বিপিন বিশ্বাস চোখ দিয়ে ইশারায় আকাশে তাকাতে বলল। এনি মোমেণ্টে পরী নেমে পড়তে পারে। সেই সময় কি আসন্ন? নড়া-চড়া বন্ধ হয়ে গেল আমার।

আলোর আউটলাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বউ যেন কি বলতে চাইল একবার। হাত নেড়েও যে থামিয়ে দেব সে সময় এখন নয়। এখন পরী নামে।

খট করে বিপিনের বাজনা থেমে গেল। আমি আর আকাশে তাকাতে পারছি না। যদি নামেই—আমি নির্ঘাৎ সেন্সলেস হয়ে পড়ে যাব। বিপিন বাগানের দিকে নেমে যেতে যেতে বলল, 'জল সরে আসছি। কখন থেকে একঠায় বসে বাজাচ্ছি।' তাই বল। এমন ভাবে আচমকা বাগানে নেমে গেল—যেন পরী নেমেছে। হাত ধরে বারান্দায় তুলে আনবে এক্ষুনি।

ছেলেমেয়েদের মা ঝড়ের বেগে ঢুকেই ঘুমন্ত ছেলেটাকে এক হ্যাচকায় কোলে তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে, 'কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে! ক'পালি চাল আছে ঘরে শুনি? রোজ রোজ লোক ধরে আনা চাই—'

ছেলে কোলেই শোয়াতে চলে গেল। যাবার সময় ওর পায়ের ধাক্কায় বেহালার বাক্সটা হাটকে খুলে গেল।

বিপিন বিশ্বাস ফিরে আসার আগে জায়গার জিনিস জায়গায় রাখা দরকার। বন্ধ করতে পারি না। কিসে আটকে গেছে। আলোতে নিয়ে দেখি, বাক্সটা নানান জিনিসে বোঝাই। তিনখানা নিমের দাঁতন। তেলচিটে গামছাও আছে একখানা।

একেবারে বিপিনের সংসার। রঙচটা নীল লুঙ্গিটাও কাগজে মুড়ে গুঁজে রেখেছে। তাড়াতাড়ি জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে দিলাম।

বারান্দায় উঠেই এক সেকেণ্ডে বিপিন বাজনার ছেড়ে আসা জায়গায় ফিরে গেল, 'ঠিক এমনি চাঁদের আলো ছিল সে-রাতে—'

আর,কথা নয়। আমার পরিচিত বউ এখনো প্রায় তরুণী। অল্পদিন হল ভ্রূ কুঁচকে কথা বলার সময় ওর নাকের পাশ দিয়ে দু'ধারে ভাঁজ পড়ে। যা দিনকাল। এসব দেখার সময় পাই—দেখে ভাবার সময়ও পাই—কেননা ব্যাঙ্কে আমার পাকা চাকরি। এখনো অনেককাল বেঁচে থাকলেই মাইনে পাব। শুধু অফিসে গিয়ে খানিকক্ষণ কলম নাড়তে হবে রোজ। খুব খারাপ লাগে। কোন মহৎ কাজ করি না। লোকে টাকা রাখে, তোলে, ধার নেয়, ফেরৎ দেয়—সুদ কষে সেসব তুলে রাখি লেজারে। এজন্য আজকাল পরীক্ষা করে বাজিয়ে টাটকা ছেলে ভর্তি করা হয়।

খুব জমাটি বাজনায় বিপিন নিজেই চোখ বুজে ফেলেছে। কাছাকাছি কোন বাড়িতে সুন্দর করে মুসুরির ডাল রান্না হচ্ছে। সেই গন্ধে আমার বাজনা শোনার গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। জীবনে অর্ধেকের বেশি খরচ হয়ে গেল। আর বড় জোর বিশ পঁচিশ বছর বাঁচবো।

বাগানের শুকনো পাতা মাড়িয়ে কে আসছিল। এই বারান্দার দিকেই। বিপিন এখন নিজের বাজনায় মাতোয়ারা হয়ে আছে।

আমার বউ। খুব সাবধানে এগিয়ে আসছে। কলমের পেয়ারার ডাল ধরে দাঁড়িয়ে গেল। সেই জায়গাতেই কিছু চাঁদের আলো ডালপাতার আড়াল খুঁড়ে ভেতরে নেমে পড়তে পেরেছে।

চোখাচুখি হল, সেখানে দাঁড়িয়েই ও হাতের ইসারায় বলতে চাইল, আর কেন? এবার বিপিন বিশ্বাসকে উঠতে বল।

হাত নেড়ে বিপিনকে তুলে দেওয়ার কথা বলল তিনবার। আড়াইসের চাল ন' টাকা চোদ্দআনা। কলকাতায় আরও বেশি। দশ বছর আগে বসানো খিরিশ চারা ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে গিয়ে মোড়ের মাথায় নানা লোকের সেন্টার। সেখান থেকে হরেক রকম কথাবার্তা ভেসে আসছে। আলাদা করে বোঝা যায় না।

আমিও সিগন্যাল দিলাম। খুব সাবধানে। বিপিন চোখ খুললেই ডেনজার। শেষে হাতজোড় করে অন্ধকারে নিজের মুখখানা যতটা কাচুমাচু করা যায়—তাই করে, যতটা মাথা নেড়ে বোঝানো যায়—তাতে বললাম, এবার তুমি দয়া করে গোয়ালের দিক থেকে ঘরে ফিরে এস।

মন বলছিল, সাপখোপ থাকতে পারে। উঠে এসো।

এত সুন্দর দেখাচ্ছিল। পারলে বরণ করে বারো চোদ্দ বছরের পুরনো বউকে বারান্দায় তুলে নিতুম। কতকাল আলতা পরে না।

বউ তবু নড়ে না। আমাকে বিপদে ফেলে ওর কি আনন্দ।

ও শুধু মাথা নাড়লো। মানে ওখান থেকে যাবে না।

বিপিন এমন কিছু বেশি খায় না। ভাতটা যা কিছু লাগে।

কতকাল আগে কিনে দেওয়া জরিপাড় কালো শাড়িখানা পরেছে আজ। অনেকটা আগের দিনের নীলাম্বরী প্যাটার্ন। কাউকে বিপদে ফেলতে এমন সেজে কেউ বাগানে নামে। গালে জ্যোৎস্না পড়লেও বোঝা যাচ্ছে না—পাউডার মেখেছে কি না।

উঠে দাঁড়িয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, হেট্‌ হেট্‌। যেন গরু তাড়াচ্ছি। যেন কারো কালো গাইটা হঠাৎ বাগানে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ওঠা গেল না।

বিপিন উঠতে দিল না। বুকের ভেতরে কত রকমের পাহাড পর্বত থাকতে পারে জানা ছিল না। ছড়ের এক এক টানে সে সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে শুধু সুদূর সাইকেল রিকসার প্যাক প্যাক আওয়াজ। তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না।

ঘস করে খোকার মা সরে গেল।

'ওই যে। নড়বেন না। এসেছে—', ছড় থামেনি বিপিনের।

বললাম, 'কোথায় ?'

'বাগানে—'

বুড়ো মানুষ। কোনবেলাই পেট ভরে খাওয়া জোটে না বোধহয়। বাজিয়ে, নানারকমের ভুজুংভাজুং দিয়ে তবে অন্ন হয়। নিজের বানানো পরীর গল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একেবারে জলজ্যান্ত পরী এসে বাগানে দাঁড়াবে এ ওর স্বপ্নেও ছিল না।

তাই বোধহয় হাত ফসকে টানের মাথায় ছড়খানা স্লিপ খেয়ে একেবারে বাগানে গিয়েই পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা বোঝাই সুর থেমে গেল।

'দেখলেন ?'

বললাম, 'একদম স্পষ্ট।'

দু'জনে চুপচাপ বসে রইলাম খানিক। এখন বাগান থেকে কে ছড় তুলে আনে। ব্যাপারটা অশরীরী। বুড়ো বিপিন আগে থেকে ভয় পেয়ে বসে ছিল। আমার

পাওয়া উচিত। তাই বেশ কিছুটা ভয় পেয়ে গেছি এইভাবে বললাম, 'থাকগে কাল সকালে তুলে আনা যাবে! কি বলেন—'

'তাই ভাল।'

যেমন ছিলাম তেমন আছি।

ছেলেপিলের মা জল দিয়ে, থালা সাজিয়ে ডাকতে এসেছে। পৃথিবী যেমন ছিল তেমন আছে। জ্যোৎস্নায় মেঘ কিংবা গাছপালার ছায়া লেগে কোথাও কোন ময়লা পড়েনি।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

দরজা খুলতেই চোখে পড়ল, একরত্তি উঠোন, ভিজে একসা হয়ে গেছে। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল। সারা উঠোন স্যাঁতস্যাঁত করছে। আধ-খোলা কপাট দিয়ে চোখেমুখে ঠাণ্ডা হওয়ার ঝাপটা লাগে। কী শীতল পবন! গা শিউরে উঠল। আসন্ন শীতের মৃদুধ্বনি। ঈস্, কত বেলা হয়ে গেছে! উঠোন রোদে মাখামাখি। বৃষ্টিস্নাত একটি চমৎকার রৌদ্রালোকিত সকাল। পাঁচিলের পাশে কানা-ভাঙা একটা টবে বৃষ্টিভেজা দৃপ্ত গাঁদার সবুজাভ পত্রগুচ্ছ ঘিরে হরিদ্রাভ পুষ্পাবলি আসন্ন শীতের বাতাসে দোলে। কবে কে যে গাছটা লাগিয়েছিল! সদর দরজার একটা কপাট হাঁ-খোলা। রাস্তায় লোক চলাচল দৃষ্টিত হয়। রিক্সার ঠুং-ঠাং ঘণ্টাধ্বনি এবং ধাবন্ত স্কুটারের চাপা ধাতব কর্কশ শব্দও ভেসে আসে। খোলা দরজা দিয়ে কাদের সাহেব উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। ডান হাতে একটা থলে। বেশ ফোলা দেখাচ্ছে। সম্ভবত বাজার থেকে ফিরলেন। উঠোন দিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ছেলের দিকে তাকালেন। শাহেদ তাকিয়ে দেখল, বাবা রান্নাঘরে ঢুকলেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনিক কর্মে তাঁর দিনের সূচনা এ-রকম ভাবে হয়। এমনকি ছুটির দিনেও। তারপর মুখে কোনোরকমে দুটো গুঁজেই অফিসে দৌড়ান। আধভেজানো কপাটের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে শাহেদ এসব দৃশ্যাবলি অবলোকন করে। দুহাত দিয়ে দরজা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়। টেবিলের ওপর কয়েকটা বইপত্র অগোছালো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দেরাজ টেনে টুথব্রাশ আর পেস্ট বের করল।

ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত ঘসতে ঘসতে বারান্দায় এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, রাস্তার ওপাশে আজিম আহমেদের বাগানের দীর্ঘকায় উদ্ভিদ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টিতে ধুলোর আস্তরণ মুছে গেছে। কেবল সবুজাভ পাতার চালচিত্রে

বোগানভিলার রক্তিম সতেজ স্তবককে সকলের স্বর্ণাভ রোদে প্রবল লোহিতাভ মনে হয়। কী নয়নশোভন দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। কার প্রযত্নের পরিণাম! শাহেদ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। আজ রোববার, অফিস নেই। মুখ হাত ধুয়ে ঘরে বসে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে নাস্তা করল। তারপর একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। পাশের ঘরে শাহু পড়ছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। ঐ এক অভ্যেস। এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। তবু চেঁচিয়ে পড়ার অভ্যেস গেল না। আনোয়ার সকাল থেকে বাসায় নেই। নতুন নতুন কলেজে ঢুকে কেবল ঘুরে বেড়ায়। হয়ত কোথাও বেরিয়েছে! সারাদিন কোথায় কোথায় যায়! মনে মনে রাগ হল শাহেদের এই অহেতুক বেয়াড়াপনার জন্যে। বইয়ের পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে এক সময় দেখল ঘড়িতে প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। সকালের স্বর্ণাভ রোদ খরতর হ'ল। বইটা পড়তে পড়তে কেমন একটা ক্লান্তি অনুভব করে। কেবল ক্লান্তি, দুঃসহ দুপুরের অবসাদ। নিদ্রাহীনতার খোঁয়ারির মত সারা শরীরে লেপটে থাকে। আরো কিছুক্ষণ ধবল শয্যায় চোখ বুজে পড়ে রইল। খানিকক্ষণ পর আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানা থেকে উঠে স্নানঘরে ঢুকল। আঃ, অবগাহনের কী তৃপ্তি! অনেক সময় নিয়ে স্নান করল। আহারাদির পর সারা দুপুর ঘুমিয়েই কাটাল। পড়ন্ত বিকেলে ঘুম ভাঙল। বিছানায় বসে জানালা দিয়ে দেখল, উঠোনে রোদ নেই। কেবল বিকেলের নিষ্প্রভ আলোয় গাঁদার সবুজাভ পাতার মাঝে ম্রিয়মান পুষ্পগুচ্ছ যেন গন্ধবিহীন শুকনো ফুলের মালা। হঠাৎ, কেন জানি, আবার খারাপ লাগতে লাগলো। সারা শরীরে একটা অপরাহ্নিক অবসাদ। যেন একটা নিস্তেজ ভাব লেপটে আছে। বৈকালিক চা পান করতে করতে দিনটা বৃথা গেল, এ-রকম ভাবতে ভাবতে কাপড় পরে রাস্তায় এল। আর তখনি রফিকের কথা মনে পড়ল। অনেকদিন তার সাথে দেখা হয়নি। মোড়ে একটা রিকশা নিয়ে রফিকের বাড়ি যেতে বলল। ফুটপাতে পথচারীর ভীষণ ভীড়। রাস্তায় গাড়ীর। মানুষজন বোধহয় বেরুতে শুরু করেছে। রিকশা ভীড় ঠেলে এগোয়।

বাড়ীতে গিয়ে রফিককে পেল না। হয়ত ক্লাবে পাবে এমন বাসনায় ক্লাবের দিকে রওয়ানা হ'ল। ফুটবল খেলায় এক সময় রফিকের ভীষণ সুনাম ছিল। এখন অন্য নেশায় মেতেছে। সন্ধ্যা হলেই ক্লাবে গিয়ে হয় হাউজি নয় তাস পিটোয়। একবার সিনেমা যাওয়ার কথা মনে এসেছিল। একা একা ভাল লাগলো না। ক্লাবে যখন পৌঁছুলো তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। রিকশা থেকে নেবে ক্লাবে গিয়ে ঢোকে। অনতি-প্রশস্ত ঘরটায় কী ভীড়। অতিক্রান্ত সন্ধ্যায় দিনান্তের উচ্চকিত আলো

যখন ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসে, আঁধারময় নিবিড় রাত নামে নগরীতে, তখন সব একে একে জমা হয় এখানে। শাহেদ চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে, সবাই আপনাপন আসনে গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত। মৃদু কলভাষণে সমস্ত ঘর উচ্চকিত। শাহেদ একটা হাউজি সিট কিনে এক পাশে বসে পড়ল। খেলা শুরু হবার আগে পুনরায় চতুর্দিকে দৃষ্টি ফেলে দেখে। না, রফিক এখানে নেই। টু লিটিল ডাক টুয়েন্টি টু। ওয়ান মোর টুয়েন্টি থ্রি। সেভেন এণ্ড... একটানা ছেদহীন গলায় বার বার হেঁকে যায় একটা বুড়ো লোক। এক হাতে গাণিতিক সংখ্যাবাহী টোকেনভর্তি বাক্সটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা টোকেন তুলে উচ্চকণ্ঠে দ্রুত সংখ্যাগুলো হেঁকে যাচ্ছে। আর কী গভীর আশা, উৎকণ্ঠা আর আকস্মিক প্রাপ্তির প্রবল বাসনায় লোকগুলো অখণ্ড মনোনিবেশে তাকিয়ে আছে হস্তধৃত ছক কাটা সংখ্যাসমষ্টির ওপর। কখন কার ললাটলিপি প্রসন্ন হয়। নম্বর বলার সাথে সাথে সবাই কেবল সংখ্যাপত্রে দাগ কাটছে। দিস ইয়ার সিক্সটি নাইন। বৃদ্ধের উচ্চারণের রেশ মিলোতে না মিলোতে পেছন থেকে কে একজন সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হোল্ড অন।'

শাহেদের চেতনায় কে যেন প্রবল আঘাত হানে। এই মুহূর্তটার জন্যে সবাই পরম প্রতীক্ষায় দ্বিধান্বিত। সে তাকিয়ে দেখে, অদূরে পেছনের সারিতে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে একজন। অকস্মাৎ প্রাপ্তিতে প্রোজ্জ্বল তার আনন। টাকাটা পেয়ে গেল তাহলে। যাক গে। খেলাও শেষ। কয়টা টাকা হেরে গিয়ে এবার মনটা তার ভীষণ খাঁ খাঁ করতে লাগলো। এতক্ষণ যারা গভীর প্রত্যাশায় বসেছিল তারা সবাই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। ঘোষক তখন পুনর্বার সংখ্যাগুলো মিলিয়ে নিচ্ছে। মেঝেয় চেয়ারের নীচে অসংখ্য ছেঁড়া কাগজপত্র পড়ে আছে। কে পেল অতগুলো টাকা? ভাবল শাহেদ। সেই ঈপ্সিত পুরুষকে দেখবার প্রবল বাসনা মনের মধ্যে চকিতে উঁকি দেবার আগেই শাহেদ রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। বাইরে এখন ঘন অন্ধকার, কেবল দূরে দূরে লাইট পোস্টের মাথায় মুমূর্ষু বৈদ্যুতিক আলোগুলো কায়ক্লেশে জ্বলছে। একটা লাইটপোস্টের কাছে তার দীর্ঘকায় ছায়া পড়ে রাস্তায়। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে, আলোটার চারদিকে ঘন হয়ে আসা অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। কতকগুলো পোকামাকড় বাল্বটার চারদিকে ওড়াউড়ি করছে। প্রাক্-শীতের রাত। বাতাসে স্বচ্ছ কুয়াশা বাল্বের চারদিকে ঘিরে একটা চালচিত্র হয়।

রাস্তায় যান চলাচল ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দু-একটা বাস স্ট্যাণ্ডে যাত্রীদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। হেল্পার ছোকরাটা অবিরাম ভাঙা গলায় একটানা চেঁচাচ্ছে গন্তব্য স্থানের নাম। সিনেমা হলের সামনে কতকগুলো রিকশা শেষ যাত্রীদের প্রতীক্ষায়

দাঁড়িয়ে আছে। সারি সারি অনেক ঝকঝকে মটর গাড়ীও দেখা যায়। মসৃণ গতিতে উন্নতির চিহ্নবাহী এইসব যানকুল। একটু পরেই সিনেমা ভাঙবে। লেভেলক্রসিং ছাড়িয়ে নবাবপুর ধরে হাঁটতে থাকে শাহেদ। সামনে একটা বাড়ীর ছাদে কোনো প্রসাধন কোম্পানীর বিজ্ঞাপন অবিরাম জ্বলছে আর নিভছে। এদিকটায় লোক চলাচল এখনও ক্রিয়াশীল। হাঁটতে হাঁটতে শাহেদ ভাবল কিছু খেলে হতো। প্রচণ্ড ক্ষুধায় সমস্ত শরীরে একটা অবসাদ অনুভব করে। ভাবতে ভাবতে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ে। সারা ঘরে একটা ভারী গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। সমবেত বাক্যালাপে উচ্চকিত চতুর্দিক। কোণের দিকে একটা টেবিল জুড়ে কয়েকজন তুমুল আলাপে মগ্ন। পাশেই অন্য এক টেবিলে দু'জন লোক দ্রুত আহারে মগ্ন। কেবল রেস্তোরাঁর এক কোণে কয়েকজন একটা টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে ঠাণ্ডা দারুময় আসনে বসে বেহেড মাতালের মত অসংলগ্ন অতি বাচাল কবোষ্ণ প্রতর্কে মত্ত। যদিচ কোনো বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য নয়, জৈবিক প্রশ্রয়ে লালিত নির্মল সমবেত বাক্যালাপই এদের একান্ত আরাধ্য। সমস্ত দিনের নিঃসঙ্গতা অপরাহ্নিক বিমর্ষতা হঠাৎ উদ্দাম বেগে শাহেদের মনের সমস্ত মালিন্য মুছে দেয়। অপরিচয়ের দূরত্ব সরে গিয়ে কখন জানিনা একাকার হয়ে যায়। আলাপরত মানুষগুলোকে শাহেদের তখন পরম ঘনিষ্ঠ মনে হয়, অন্যের শরীরে নিজের আদল দেখে মানুষ যেমন বিস্মিত হয়, শাহেদ তেমনি শিহরিত, সমস্ত ভুবন তার আলোড়িত হয়, কেননা, সামুদ্রিক ঘূর্ণি এখনও ধ্বনি তোলে এবং বিজিতের মানসিক গ্লানি দূরীভূত হয়। শাহেদ আলাপরত মানুষগুলোর পাশেই একটা ফাঁকা টেবিলে বসে, চেয়ারে বসতেই একটা ছোকরা এসে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে টেবিলটা মুছে দেয়। একজন বেয়ারাকে ডেকে শাহেদ খাবার আনতে বলে।

রেস্তোরাঁয় আহারাদি সেরে সে পুনরায় রাস্তায় নামে। পেছনে সমবেত গুঞ্জন পড়ে থাকে। আবার একাকীর নিভৃত নিঃস্বন। ভরাপেটে হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। সামনে একটা রিকশা পেলে তাতে চড়ে বসে। ফাঁকা রাস্তায় রিকশা দ্রুত এগিয়ে যায়। দু'একটা দোকান খোলা আছে এখনো। রিকশার সিটে গা এলিয়ে দেয় শাহেদ। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে আসছে। এখন সুখকর শয্যায় গা ডুবিয়ে গভীর একটা ঘুম ভিন্ন আর কিছু কাম্য নেই। গলির মোড়ে এসে রিকশাটা ছেড়ে দেয়। সদর রাস্তা ছেড়ে শাহেদ গলি ধরে এগোয়। অতি সম্প্রতি তারা এখানে উঠে এসেছে। শহরের এদিকটায় নতুন নতুন যেসব বাড়ী উঠেছে সবই প্রায় কোনো রকমে বেড়া আর টিন দিয়ে খাড়া করেছে। ফলত, স্বল্পজীবী লোকেদের মোটামুটি একটা সুখকর-আশ্রয়।

এখন অনেক রাত। সারা পাড়া গভীর ঘুমে মগ্ন। ফলত, নৈঃশব্দের গভীরতা প্রগাঢ়। কেবল দু'একটা ঘরে এখনো আলো দৃষ্টিত হয়। সদ্য ঘুমভাঙা শিশুর অনুচ্চ কান্নার ধ্বনি ভেসে আসে। নাতিপ্রশস্ত অন্ধকার ইট-বিছানো এবড়ো খেবড়ো গলিটা আজ ভীষণ শান্ত। অভ্যস্ত পায়ে শাহেদ অন্ধকারে হাঁটে। বাড়ীর সামনে এসে একটু দাঁড়ালো। না, দরজা খোলাই আছে। হাত দিয়ে ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। এক চিলতে উঠোন অন্ধকারে থৈ থৈ করছে। দরজা বন্ধ করে শাহেদ সোজা নিজের ঘরে ঢোকে। সুইচ টিপতেই ঘর আলো। ঈস, টেবিলটার ওপর বইগুলো কে যেন তছনছ করেছে। হয় শানু নয় আনোয়ারের কীর্তি। সন্ধ্যের সময় পড়তে বসে এই কাজ করেছে দু'জনে মিলে, কী এলো-মেলোভাবে ফেলে গেছে জিনিসপত্র। চেয়ারের ওপর বসে কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলে শাহেদ। স্নান-ঘর থেকে মুখহাত ধুয়ে এসে বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরায়। সকলেই ঘুমে অচেতন। কেবল পাশের ঘর থেকে বাবার কাশির শব্দ শোনা গেল। প্রায়ই গভীর রাত করে বাড়ী ফেরে, ফলত নৈশআহার বাইরে করে আসে। এজন্যে অহেতুক কেউ তার জন্যে জেগে থাকে না। কাল সকালে আবার অফিস! ভাবতেই মনটা দমে আসে।

শাহেদ একটা ওষুধ কোম্পানীতে চাকরী করে। বর্ণনাতীত স্বল্প বেতন। এ চাকরী তাব মোটেই ভালো লাগে না, আর ভাল না লাগলেও অন্য চাকরী পাচ্ছে কোথায়? টাকা কয়টা হেরে মনটা এখনো খচ্‌খচ্‌ করছে। পিতার সম্ভাব্য কর্মাবসর, ক্রমবর্ধমান সাংসারিক অনটন ও আর্থিক অপ্রাচুর্য তাকে এক অস্বাস্থ্যকর ভাবনায় ধাবিত করে। (আজ যদি সে টাকাগুলো পেয়ে যেত?) ফলতঃ নিষিদ্ধ অর্থোপার্জনের বাসনা এক দুর্মর অলীক সাফল্যের সংকেত হানে। অনুজ ভ্রাতৃদ্বয় এখনো বিদ্যায়তনিক শিক্ষালাভের অগম্য পথে অধ্যবসায়ী। একজন যদি অন্য ভুবনের স্বপ্ন দেখে তো দ্বিতীয়জন আত্মকেন্দ্রিকতায় নির্বিরোধী। ফলতঃ উভয়ই জনকের চোখে এখনো অন্য মিথিলার ছবি ধরে। বিজন ঘরে চিন্তার যুথচারী আপন অক্ষমতার অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা তাকে যেন কুরে কুরে খায় অহরহ। কে যেন তাকে বার বার প্রতারিত করে। সে যেন আর ফিরে যেতে পারবে না। আমার গন্তব্যের দুয়ারে কে যেন দু বাহু মেলে পথরোধ করে দাঁড়ায়। গলার ভেতরে কি যেন একটা জমে আছে। সজোরে গলা খাঁকারি দিল। গভীর ঘেন্নায় তার মন অদৃশ্য সেই অরাতিকে লক্ষ্য করে নিষ্ঠীবন ফেলে। জানালার বাইরে না পড়ে শিকে লেপটে যায়।

শাহেদের মনে হল, ঐ নিষ্ঠীবন জানালার শিকের মত যেন তার নিজের গায়েই লেপটে গেল। সমস্ত শরীর গভীর ঘৃণায় রি-রি করে ওঠে।

ভোরে উঠে আবার অফিস দৌড়ুতে হবে। শাহেদ আলোটা নিভিয়ে দেয়। সারা ঘর চকিতে অন্ধকারে মাতামাতি। বিছানায় গা দিতেই গভীর ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসে। জৃম্ভনের প্রাবল্যে ঘন ঘন মুখ স্ফারিত হয়। কোনোমতেই চোখের পাতা খোলা রাখতে পারি না। মাথার ভেতরে সমস্ত কিছু ঘুলিয়ে আসে। জাগরণের ব্যর্থ চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে আর স্ববশে আনা যায় না। ঘন ঘন হাই ওঠার দরুন চোখের কোণ ভিজে ভিজে ঠেকে। শাহেদ চিৎ হযে সটান শুয়েছিল। পাশ ফিরে ডান দিকে কাৎ হয়ে বাঁ হাতের কনুইটা ধনুকের মত ভাঁজ করে বালিশের ওপর ন্যস্ত করে আর ডান হাতটা বুকের ওপর আলতো করে ছুঁইয়ে রাখে। কাৎ হয়ে শোয়ার দরুন কানের পাশ দিয়ে একটা পানির রেখা টপটপ করে গড়িয়ে পড়ে। 'ঈস, হাই উঠলে এতো পানিও ঝরে'। তখন চোখের পানিতে উপাধান সিক্ত হয়। বাতাস এই নিঃশব্দ জৃম্ভনাশ্রুর ভেজা গন্ধ বয়ে বেড়ায় চার দেয়ালের ভেতরে। এখন কত রাত তা ঠাওর করা যায় না। নিদ্রার অপ্রতুলতায় একেক দিন কী ভীষণ ছটফটই না করেছে সারা—সারারাত। প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ বুজে পড়ে থেকেছে। আজ রাতে তার কিছুই করতে হয়নি। 'মনে হয় ঘুম হবে আজ। একটানা গভীর নিরুপদ্রব ঘুম। চেতন-অবচেতনের গভীরে নির্ভার ঘুম নিঃশব্দ পদপাতে এগিয়ে আসে। গভীর আবেশে প্রগাঢ় নিদ্রার ভারে চোখের পল্লব ক্রমে ক্রমে কপাট বন্ধ করে দেয়। কেবল একটা অস্পষ্ট চাপা গুঞ্জরণ বৃষ্টির ফোঁটার মত অনবরত তার চৈতন্যে ভেসে আসে, সেই ধ্বনিপুঞ্জ তাকে টেনে নিয়ে যায় ভিন্ন দৃশ্যে ভিন্ন লোকে। ধমনিতে কিসের সংস্তব! যেন বর্ণাঢ্য কোনো স্বপ্নের দৃশ্যাবলি একটি কোমল সুগন্ধী বয়ে আনে প্রবল হাওয়ায়, নিদ্রার গভীরে অশ্রুত এক রাগিণী কাঁপে। চৈতন্যের গভীরে সেই অমল ধ্বনি মরে আসে। দিনান্তের ক্লিশিত আলো জ্বলে জলে যেমন নিভে আসে। এখন শাহেদ কিছুই শোনে না, কিছুই দেখে না। কেবল আঁধারময় এক রজনী প্রতিভাসে কাঁপে। যে অন্ধকার তাকে অন্য এক ভুবনে নিয়ে যাবে, যেখানে প্রাত্যহিকতার ভাবনা নেই।

সারারাত ধরে শাহেদ, কেবল একটা স্বপ্নই দেখল, কাঙ্ক্ষিত উদ্যানে পৌঁছুনোর রাস্তাটা বার বার সে হারিয়ে ফেলছে।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

কবিরের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিলো। তার নাকি বিশেষ প্রয়োজন। বারবার বলেছিলো যেন সময়মতো তাদের লারমিনি স্ট্রীটের বাসাতে যেতে ভুল না হয়। অথচ কবিরকে তখন পাওয়া গ্যালো না, তার আপা জানালেন সকালে বেরিয়ে সে আর ফেরেনি। বাসায় কিছু বলেও যায়নি। সুতরাং ক্ষুণ্ন ফিরতে হলো আবুবকরকে। সাথে কেউ ছিলো না, থাকলে এ-দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে একচোট হয়ে যেতে পারতো।

বিকেল এরপর উদ্দেশ্যহীন কাটলো। স্টেডিয়ামের বইয়ের দোকানগুলি বৃথাই তছনছ করলো কাঙ্ক্ষিত পেপারব্যাক খুঁজে। পুরনো বইয়ের ব্যবসায়ীদেরও রত্নাকর মনে হলো না, বসে থাকতে হয় বলে বসে আছে—এ-কথা যেন ওরাও জানে। রেক্সে পাওয়া যাবে বন্ধুদের? ঠিক নেই। উজিয়ে সোজা চলে গ্যালো টনি কারটিসদের কাছে। নাহ্।

সন্ধ্যা নামলো যখন ঘন হয়ে তখন নুমারকেটের এক চায়ের দোকানে সে একা। চায়ের কাপ, সিগরেট ও কবিতার কাটাকুটি হাতে, কিন্তু অস্ত্র নেই সময়-কাটার। অথচ সে কবি, তার পক্ষেই সম্ভব শরীরের সকল রন্ধ্র খুলে পৃথিবীকে পান করা, তার জন্যেই সমীচীন রক্ষিতার মতো ভোগ করা পৃথিবীকে। আবুবকর এখন কোথায় যাবে। নীলখেত ফিরতে-ফিরতে সে একজন মহিলাবাদী অধ্যাপক, তিনজন রমণবিলাসী লেখক ও সাতজন স্ত্রীসাহিত্যিক দেখতে পেলো। তার সাথে জুটলো এক রাজনীতি-ব্যবসায়ী, বঙ্গদেশ খুন হতে থাকলো।

দশটা নাগাদ ঘরে ফিরে এসে সে আবার একা। সহমর্মী এক নতুন বৃটিশ কবির সাথে কিছুক্ষণ কুয়াশায় হাঁটাহাঁটি করা গেলেও, এক জর্মন কুমারীকে নিয়ে রোমহর্ষক

আলোচনায় মাতলেও, সে দেখলো কি সাংঘাতিক এই একাকিত্ব তার। সহবাসী বন্ধুব নারী ও মদ্যপানের আহ্বান উপেক্ষা করে বারোটা নাগাদ আবুবকরকে নামতে হলো রাস্তায়। নামতে সে বাধ্য ছিলো, এমন মনে হলো।

পথে—চারপাশে—ফাল্গুন দেখা দিয়েছে। কাঞ্চন ফুল বিকশিত। ডালে-ডালে আম্রমুকুল পুঞ্জিত। চঞ্চল মউমাছি। কেবল বেণুবন নেই, থাকলেও শোনা যেতো দখিণা বাতাসে মর্মর। একটি-দুটি গাড়ি আসছে মাঝে-মাঝে। যাচ্ছে বোড়ো বেগে। এতো রাতে কিসের তাড়া ওদের? নিরাকুল গান গাইতে-গাইতে যাচ্ছে পথচারী। বৃহৎ ও সুগোল চাঁদ একদম মাথার ওপরে। লারমিনি স্ট্রীটে পৌঁছবার আগে সে দেখলো তিনজন মাতাল, দু'জন মৃত ও একজন যুবতী প্রমোদবালা। গড়ে প্রায় পাঁচশো গজ পর-পর দেখেছে এদের, অথচ আবুবকরের মনে হলো এক সাথেই এই ক'জন হাঁটছে।

কবিরের আপা এবারেও দরজা খুলে দিলেন। না, এখনো ফেরেনি সে। রাতে না-ও ফিরতে পারে। আবুবকরের কিসের দরকার? ও, কবিরেরই জরুরি দরকার ছিলো। অতো দূর থেকে যখন এসেছে তখন একটু বসুক সে, হঠাৎ ফিরতেও পারে তো অনেক রাতে। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে? আজ বরং থেকেই যাক সে এখানে। না-না, কোনো অসুবিধে হবে না।

কিছুক্ষণ পর কবিরের বাবা এলেন। আগে থেকেই আবুবকরকে চেনেন তিনি। কবিরকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো, ছেলেটা এমন বখে গেল কেন।

কিন্তু উদ্বেগ নেই কারো মুখে। কোনো ফোনও হয়নি থানায় বা হাসপাতালে বা স্বজনদের কাছে। অর্থাৎ কবির আজকাল প্রায়ই বাইরে রাত কাটাচ্ছে এবং নিরাপদেই ফিরে আসছে। আবুবকর যদ্দূর জানে তার কোনো নেশা নেই—না মদে, না মেয়েতে, না তাসে, না রাজনীতিতে; তাহলে এমন হয়েছে কেন ও? জরুরি প্রয়োজন ছিলো, কিসের প্রয়োজন। ষোলো আনা সম্ভাবনা অবশ্য পরামর্শের। কিসের পরামর্শ।

কবিরের ঘরে সে যখন একা তখন কাকে যেন তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলো। দেখলো একটি মুখ যাতে দু'টি চোখ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু কোথায় যে দেখলো! জানালাগুলি বন্ধ। কেবল অন্দরের দিকে দরজাটা খোলা। গাঢ় লাল রঙের পরদা সবসময়েই কিছু-কিছু দুলছে। ওখানে কি? কে? অসম্ভব। আসলে সে দেখেনি কোনো দৃষ্টি হয়তো, অনুভব করেছে মাত্র। কিন্তু সহসা এই অনুভব কেন?

অতএব ঘুম এলো না। জাগরণে যাবে বিভাবরী? মরি-মরি।

ডেস্কের ওপর রাখা বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলো আবুবকর। সব কিছুতেই কবিরের চিহ্ন লেগে আছে। লেন ডেইটন-এর ক'টি বই। হজরত মোহাম্মদের (স) উক্তি মনে পড়লো: 'নারীকে তোমরা আঘাত করো না, ফুল দিয়েও না'। আজেবাজে কাগজপত্তরে 'পাম্পশ্ পায়ে শামসু মিয়া স্যুট হামসুন পড়ে' ইত্যাদির ছড়াছড়ি। ডায়রীর মতো একটা পেয়ে সে পড়তে থাকলো। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে রেখে দিলো। কিছুই নেই কৌতূহলের, উপভোগের। 'আমরা সবাই এই জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থার শিকার, একে পদাঘাতে-পদাঘাতে ভাঙা ছাড়া নতুন সুন্দর জীবন গড়া অসম্ভব'—এইসব। আবুবকরের মনে পড়লো মাতাল ও মৃত ও প্রমোদবালা ক'জনকে। মাথার ওপরে পূর্ণ চাঁদ। সেই চাঁদ।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লো সে। জানালার একাংশ রাখলো খুলে। না, ঘুম নেই। কবির এখন কি করছে? নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে না। এ-বিশ্বাস কেন জানি হলো তার।

অন্ধকারেই আবার ফিরতে হলো আবুবকরকে ডেস্কের কাছে। শীতলতায় মাথা ঠেকিয়ে, শরীর এলিয়ে বসে থাকলো। দু' হাতে টানতে লাগলো চুল। অনেক বড়ো হয়ে গ্যাছে চুল। বোদলেয়ারকে মনে পড়লো। বীঠোফেনকে মনে পড়লো। মনে পড়লো ব্লেক—উইলিঅম ব্লেককে। স্বর্গ-নরকের বিয়ে। শক্তি হচ্ছে শাশ্বত আনন্দ। কারণ শরীর আত্মার অংশবিশেষ মাত্র। জলপ্রেমিকদের জলেই ডোবাও। আইনের পাথরে কারাগার যেমন তৈরী, তেমন ধর্মের ইঁটে বানানো হয়েছে বেশ্যালয়। রমণীর নগ্নতা ঈশ্বরের কারুকর্ম। For everything that lives is Holy.

বিদায়, ব্লেক। ঘুম।

ঘুম আসছে আবুবকরের।

কিন্তু আবার সেই দু'টি চোখ। কি চায় ওরা? অবসন্ন দেখে সে ওদের। দু'টি তীব্র কালো পাখি সোজা উড়ে আসছে। দিগন্ত অন্ধকার। চারপাশে আবার রাত্রি নেমে এলো। ও কি চাঁদ না উজ্জ্বল কোনো ফুল?

ঘুমে চোখ জড়িয়ে গ্যালো, সেই সঙ্গে আত্মার অংশবিশেষ, রক্তও বুঝি নিশ্চুপ। কিন্তু কে যেন আবুবকরের সমস্ত মুক্ত করে নিচ্ছে। গর্বিত জনের আভরণ হচ্ছে লজ্জা, তার দুটোই অদৃশ্য হলো, কেবল থাকলো সৌন্দর্য। আবদ্ধ চোখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দৃষ্টির কালো বর্তুল, দেখলো নগ্ন আবুবকরকে, যাকে লেহন

করছে শয্যার পাশে দাঁড়ানো একটি পিপাসা, কখনো উবু হচ্ছে, আর ঘন শ্বাস ফেলছে ; কখনো ফিরে যাচ্ছে, আর উত্তাল হচ্ছে বাহুতে।

চার চোখ একত্র হলো।

কে তুমি ?

কে তুমি ??

আমাকে ছাখো।

আমাকেও ছাখো।

ওরা পরস্পর একতা পায়। সেই ঐক্য থেকে জন্ম নেয় শিল্প, জীবনের বৃক্ষ, আর মৃত্যুর বৃক্ষ বিজ্ঞান কেবল যাহাতে থাকে অতীত, তার ছায়া। বস্তুত একদা কল্পনা কোনদিন প্রত্যক্ষ হয়।

প্রখর আনন্দ নিয়ে জেগে ওঠে আবুবকর। অপসৃত হয় বৃক্ষ, বৃক্ষের মহান নৈঃশব্দ্য। ক্লান্তিতে জন্ম হয় তার। আবুবকর সুখী, ক্লান্তিতৃপ্ত।

চারপাশে সকালের আলো ফুটতে থাকে। কিন্তু ঘরের ভেতর এখনো গহন ছায়া। ওরা দু'জন একতা ভেঙে মুখোমুখি হয়। ওরা কেউ কারো মুখ দেখে না, দেখতে পায় না!

আবুবকর জানতে চায়—কে তুমি ?

সে বলে—আমাকে চিনতে চেষ্টা করো না। পরিচয়ে মৃত্যু হবে আমার।

—কিন্তু অপরিচয়ে তো আমার মৃত্যু। কবিরের মৃত্যু।

—না।

—কেন ?

—এ তোমাদের ভুল। তোমরা জানো না মৃত্যুর যুক্তি আছে। কিন্তু এ যুক্তি নয়, শক্তি।

—কবির ফিরছে না কেন ?

—ভ্রান্তিতে।

—আমিও ফিরবো না। অর্থাৎ আর কোনোদিন আসবো না। আমারো মৃত্যু হোক।

—না। প্রেমে তুমি জন্ম নাও আবুবকর, বাঁচতে থাকো।

সে চলে-চলে যায়। পরদা একবার কাঁপিয়ে দাঁড়ায়—আমাকে খুঁজো না।

আবুবকর তার অন্তর্ধান দেখে। রাত্রির ছায়াটি কে ? সে কেন আনন্দের কথা বলে, আনন্দে কি পেয়েছে জীবন, তার জীবন, আমাদের জীবন ?

সকাল আরো উজ্জ্বল ও শব্দিত হয়। জানালা খুলে, দরজা খুলে সে বারান্দায় যেয়ে কি খোঁজে। কবিরের পিতা বাগানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে অপরিচিত এক পুরুষ। হাতে ছড়ি। মাথায় টুপি। মনে হয় বেড়াতে বেরিয়ে এখানে থেমেছেন। তাঁকে কেমন খেয়াল করছেন কবিরের আপা। তা নিয়ে রগড় করছে ছোটো বোনটি।

এ-বাড়ির সবাই এতো ভোরে জেগে যায়? কেন যায়?

আবুবকরের কেমন শুষ্কতা পায়। ঘরে ফিরে আসে। বসে। বাথরুমে যাবে কি যাবে না করে। শেষে সিগরেট জ্বালে। তখন শুষ্কতার সঙ্গে-সঙ্গে দহন শুরু হয়। এদিকে চারপাশে দীপ্তি। তার কিছু নিয়ে ঘরে ঢোকে কবিরের ছোটো বোনটি—ভাইয়া!

—কি?

—নাশতা করবেন না? চটপট হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন।

—হ্যাঁ। কিন্তু নাম কি তোমার?

—আমার নাম? আমার নাম মউ। আর আপার নাম লোপা। লোপা'পা। আমি বলি পাপা।

—কোন ক্লাশে পড়ো তুমি?

—তা বলবো না। আপনি আমাকে কবির ভাইয়ার মতো খুকী ভাববেন তো!

—না মোটেই ভাববো না।

—উঁ, বললেই বিশ্বাস করছি বুঝি। আপা কাউকে বিশ্বাস করতে মানা করেছেন। আব্বুকেও না। আম্মুকেও না।

চঞ্চল বাচাল হাসিখুশি মেয়েটা আবুবকরকে চমকে দিয়ে চলে যায়। এই অনুকরণের নাম সমালোচনা। কেন সে ভাইয়া ডাকলো? কবিরের সমান সম্মানী পাওয়া সম্ভব নয়।

খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু আবুবকর এ-নিয়ে করতে লাগলো নাড়াচাড়া, কেন এমন হয় এবং কেন এমন হওয়া উচিত নয়। বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর, একাকী নাশতা সারার পর তুচ্ছাতিতুচ্ছকে নিয়ে তার আবার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বাড়াবাড়ি যেমন পৌঁছে বিষয়ান্তরে, তেমনি তাকে এক সময় ভাবতে হয় সামান্য সেই চমকে যাওয়ার কথা। অ্যালবিয়নের কোনো কন্যাকে দেখেছে। দেখেছিলো কি? বন্দিনী সে কাঁদছে। কিন্তু শক্তি, শাশ্বত আনন্দ, তুমি কে? তুমি কোথায়?

অচরিতার্থ বাসনাকে লালন না-করে বরং দোলনার শিশুটিকে হত্যা করো। জন্ম! জন্মের শিল্প। প্রচুর জন্মানোর নাম সৌন্দর্য।

মউ-র পাপা আবার ঢুকলেন ঘরে। নাশতার টেবিলে তাঁর সাথে কোনো কথা হয়নি। সারাক্ষণ তিনি কথা বলছিলেন সেই প্রশান্ত পুরুষের সঙ্গে। এখন কি বলতে চান বা বলবেন?

আবুবকর আগেই কথা কয়ে উঠলো—আপা, আমি এখন চলে যেতে চাইছি।

লোপা অদ্ভুত চোখে তাকে দেখলেন। যেন তার কথা কিছু শোনেননি, কিংবা অন্ত কিছু ভাবছেন। বললেন—কবির!

—আমি আবুবকর।

—কবির!

—উঁ। দেখুন…

লোপা তখন চলতে শুরু করেছেন। আনমনা। বারান্দায় যেয়ে দাঁড়ালেন। সেই রোমশ পুরুষ এখনি বোধহয় বেরিয়ে যাবেন।

—ভাইয়া!

—মউ! ও। আমি এখন চলে যাচ্ছি।

—কেন, ভাইয়ার সাথে দেখা করবেন না?

—ও তো এখনো এলো না। আর কতো অপেক্ষা করা যায়। আমার খুব কাজ আছে।

—কবির ভাইয়া তো আছে। কি বদলে গ্যাছে যে একদম চেনা যায় না। এতো সুন্দর হয়েছে তবু ওকে আগের মতো ভাল্লাগে না।

—কি বলছো তুমি!

—সত্যি বলছি। ওকে…

মউ হঠাৎ থেমে গ্যালো। লোপাকে দেখেই খুব সম্ভব। লোপার চোখেমুখে রোষ। এ-বাচালতার জন্যে শাসাতে গ্যালো কিন্তু হলুদ ফ্রকের কিশোরীটি তখন পলাতক। লোপা দাঁড়ালো আবুবকরের সামনে—তোমার যাওয়া হবে না কবির।

—কেন?

আবুবকরের স্বরে এই প্রথম তীব্রতা ধ্বনিত হলো। শিলাতটে আছড়ে পড়া তরঙ্গের আক্রোশ তার বুকে।

—তুমি বাইরে গেলে ফিরতে চাও না। অন্যায় সুবিধে ভোগ করো।

শান্ত হলো আবুবকর—আপনি ভুল করছেন, আমি কবির নই।

—তুমি কবির।

—না।

—প্রমাণ চাও?

—চাই।

—দিতে পারি, কিন্তু তার আগে তোমাকে বলতে হবে কেন তুমি লুকোতে চাচ্ছো। ভয়ংকর আজগুবির আশ্রয় নিয়ে পালানো তোমার উচিত হবে না।

—প্রমাণ পেলে আমি এসব কথার জবাব দেবো।

—দেবে? দিতে পারবে? তবে যাও অই আয়নার সামনে, ছাখো নিজেকে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবুবকর দেখে সে কবির। সে নত হয়ে যায়, আঁকড়ে ধরে লোপার জানু—আমি কবির।

তখন সেই চোখগুলি দেখা যায়। চারটি চোখ দু'টির বদলে। রাত্রির ছায়া দিনের কারনিশে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার মুখে একটি চোখ, বুকে দু'টি চোখ আর নিতম্বের সংকীর্ণতায় একটি চোখ। দৃষ্টি ভেদ করছে আবুবকরকে, গেঁথে রাখছে দেয়ালে। পাখি বানায় নীড়, মাকড়শা বোনে জাল, মানুষ গড়ে বন্ধুত্ব, কিন্তু তুমি কে—কি করো তুমি? তোমার চুল—রাশি রাশি উত্তাল চুল—তোমার জন্যে ছায়া, অই ছায়ার ভেতর কি? আরো—আরো চোখ?

—কি হয়েছে কবিরের?

জানতে চান কবিরের বাবা।

—ও অমন করছে কেন লোপা?

জানতে চান সন্ত্রাস্ত অতিথি। তিনি উঁকি মেরে কি দেখেন। লোপার জানু? আবুবকরের রক্তাক্ত হাত? কাচবিদ্ধ চোখ? Eternals! I hear your call gladly. তিনি কি জানেন the head Sublime, the heart Pathos, the genitals Beauty, the hands & feet Proportion?

—ওকে ঘুমিয়ে রাখো বাবা। ওর এখন ঘুমের দরকার। ঘুমোবে ও।

লোপা বলে। করুণ হয়ে গ্যাছে সে, অথচ বুকের ভেতর তার বনে-বনে ফোটা ফুল, দুল্যমান নবীন পাতা। হায়! জ্ঞানী ও মূর্খ একই গাছ কখনো ছাখে না!

আবার গভীর রাত্রি ও তার ছায়া। কি আজব স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙেছে আবুবকরের। কেন এমন স্বপ্ন দেখলো? বুকের ভেতর যেখানে খুউব নরম একটি

বুক সেখানে ঠুকে দে'য়া হয়েছে যীশুর জন্যে আনা পেরেক। হে জেরুজালেমের বিদগ্ধ যুবক-যুবতী ও অ্যালবিয়নের বন্দিনী কন্যাগণ, ছাখো কি আক্রোশ বাহুতে, কেমন জাজ্বল্যমান কেশরাশি, ছাখো পশ্চিম সাগরের অস্তায়মান আগুন! শয়তানের গভীর স্তনদ্বয়ে মুখ রেখে ছাখো রাহাব কেমন গ্যালো শাশ্বতীর দেশে। শারলেমেনের সন্ন্যাসী, হে ধুসর বৈরাগী, এ-অশ্রু ছাখো, for a Tear is an Intellectual thing. পুরুষ, তুমি পান্না-মোতির ফারনেস; নারী, তুমি সোনালি তাঁত; কবির, তুমি এখন খরদীপ্তিময় এক সিংহ, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। শাশ্বতী, তুমি মহাকাল-সন্তানের জন্যে, তোমার প্রেম সে-ই পায়।...আবুবকর এ-সমস্ত স্বপ্নের ভেতর দেখে কবিরকে, ক্যারিবিআন সাগরের তীরে উলঙ্গ শুয়ে আছে, তাকে লালাসিক্ত করছে বেলাভূমির রৌদ্র, হাওয়া, পুরুষ, শীতল পিছল ঢেউ। আবার অন্ধকারে কবির, কায়রোর এক নৃত্যশালায়, মদমত্ত উদরনৃত্যে উত্তরঙ্গ, নগ্ন জেরিন আফোকিকে চূষে-চূষে খাচ্ছে।... কবির এখানেও।

না, ঘুম ভেঙেছে আবুবকরের। পাশে গত রাত্রির সেই ছায়া। সম্পূর্ণ বদলে গ্যাছে মূর্তিটি। অবিকৃত আছে মাত্র চারটি চোখ: ওপরের মৃদু ও ভীতু একটি চোখ, মাঝের বিশাল ও কাতর ছু'টি চোখ, নিচের স্ফীত ও উৎসাহী চোখ। এমন কেন ও? কিন্তু দৃষ্টি! অহো, কি ভয়ংকর। নগ্ন হয়ে আছে আবুবকর, জ্বলে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে।

—বিশ্বাসঘাতক!

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে আবুবকর। কিন্তু সে খুব নরম ও সুরেলা স্বরে বলে—তুমি আজো খুব ভুল করছো কবির।

—না, করছি না। বিশ্বাসঘাতক তুমি, একশ'বার বলবো এ কথা, চেঁচিয়ে জানাবো সবাইকে। এভাবে আমাকে পুড়িয়ে মারবার জন্যেই কি থাকতে বলেছিলে কাল?

—আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি? গোলাপ, আমার গোলাপ তুমি। বাঘ, বাঘ, জ্বলন্ত অঙ্গার তুমি। নিজেকেই দহন করে দীপ্তি পাচ্ছো তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ, তোমার মন ভালো ছিলো না সারাদিন। লোপাকে, মউকে, কবিরকে তুমি আজ নষ্ট করতে চেয়েছিলে!

—না, চাইনি। তোমাকেই চেয়েছি।

—আমি কখনো নষ্ট হবো না। আমার অগ্নিশুদ্ধি হয়েছে, এ্যাদ্দিন তোমার তা

বাকি ছিলো। এসো, এখন এসো আমার কাছে। নাও এই চোখটি, রাখো প্রেম। নাও এই চোখ দু'টি, দাও আক্রমণ। নাও এই চোখটি, করো প্রবেশ। তুমি আত্মা, আমি তার অংশ।

*   *   *   *

সকালে লোপা ডাকলো। মউ ডাকলো। বাবা ডাকলো। উপস্থিত হলো কবির। আবুবকর শুনলো প্রয়োজন। একসাথে নাশতা খেতে-খেতে তখন সবাই এরা পরস্পরকে ভালবাসলো, আক্রমণ করলো এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করলো। ছায়াটি কেবল এ-সমস্ত দৃশ্য দেখলো, অশ্রুতে তার মুখ ভেসে গ্যালো।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

'মালেকুল মওত এসে বলবে: "আসসালামো আলায়কুম!" আর তুই সঙ্গে সঙ্গে ঢ'লে পড়বি!'—যিনি বলছিলেন, তাঁর লুঙ্গি হাঁটুর বেশী নিচে নামেনি; গায়ে একটি শাদা ফতুয়া; মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা ও শাদা, চোখে চশমা নেই: ঐ চোখে এখনো ভালো দেখতে পান কিন্তু চোখের চাউনি কেমন স্তিমিত মৃত ও ঘোলাটে, চোখের নিচে মাংসের স্তর ফুলে আছে। তিনি মেঝের উপরে বিছানায় ব'সে কথা ব'লে যাচ্ছিলেন; তাঁর বলার ভঙ্গি দেখে মনে হয় তিনি শ্রোতার সম্বন্ধে অজ্ঞ: যাকে বলা হচ্ছে সে আদৌ শুনছে কিনা, সে সম্বন্ধে তাঁর চেতনা নেই; কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন আছে কিন্তু চোখ সারাক্ষণ স্তিমিত। তাঁর সামনে তক্তপোশের উপর আধোশোয়া হয়ে যে ছেলেটি তাঁর কথা শুনছে, তার মুখে মৃদু-বিব্রত হাসি, তার দাড়ি-না-ওঠা এখনো-কিশোর মুখে সোনালি লাবণ্য জ্বলছে, লালচে গাল, ভিতরের আভা। যেন ত্বকের উপরে নীল-হলুদ আভা দিয়েছে। তিনি, বৃদ্ধ, অবিরাম কথা ব'লে যাচ্ছিলেন; আর সে, ছেলেটি, মণ্টু, মাথা নিচু ক'রে কি অন্যদিকে চেয়ে শুনে যাচ্ছিলো, মৃদু হেসে মাথা তুলছিলো কখনো।

তিনি বলছিলেন, 'মালেকুল মওত এসে তোকে সালাম দেবে, আর তোর দিন-রাতের খেলা তখনই শেষ হয়ে যাবে। তুমি দিনরাত কাজ করতোসো: একটু নিশ্বাস নেবার ফুরসৎ নেই, জিরোনোর সময় নেই, আল্লাতা'লার নাম নেবার ফুরসৎ নেই; তাহ'লি কি হবে, ডাক আ'লি আর দাঁড়াতি পারবি না, সোনা, সব জরুরি কাজ পড়ে থাকবে। ওরে, রাজা বলো প্রেজা বলো—সবারই তাঁর কাছে যাতি হবে। দুনিয়ার এই মজা—এ কিছু না রে বাপ: এ হলো চোখের ভুল, এ হলো দু'দণ্ডের মায়া। ওরে, এই দুনিয়া তো তোর আসল বাসস্থান না: খাঁচার

দোর খুলে দিলি পাখি দৌড়য়, মানুষও ছাড়া পালিই দৌড়য়। মৃত্যু ডেকে বলতেসে : "চ'লে আয়!" কবর ডেকে বলতেসে : "চ'লে আয়!" ক-দিন থাকবি তুই আর : একদিন-না-একদিন যাতিই হবে তাঁর কাছে ; তাই তো বলি তোদের : তারে ভুলিস নে, তার নাম কর, নামাজ পড়, রোজা রাখ, আর সোজা পথে চল, আল্লার নেক বান্দা হ।'

মণ্টু কোন কথা বলছিলো না, কেননা তার কথা বলতে হচ্ছিলো না, বৃদ্ধই অবিরাম অনর্গল কথা ব'লে যাচ্ছিলেন, সে কেবল মাঝে-মাঝে সমর্থনসূচক অস্ফুট শব্দ করছিলো বা মাথা নাড়ছিলো। তিনি মেঝের উপর বিছোনো শয্যার উপর শিরদাঁড়া খাড়া ক'রে ঠায় ব'সে বক্তৃতা করে যাচ্ছিলেন, কেবল তাঁর মুখ নড়ছিলো, চোখ স্তিমিত, দেহ স্তব্ধ। মণ্টু তার শোবার তক্তপোশের উপর ব'সে, অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে শুনছিলো, এখন মাঝে মাঝে সে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো, আর তার এ লোকটি সম্বন্ধে সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিলো।

বৃদ্ধ মণ্টুর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়, ওদের জন্মজায়গা খুলনায় থাকেন, মাঝে-মাঝে ঢাকায় আসেন, ঢাকায় এলে ওদের বাড়িতেই ওঠেন বা অন্য-জায়গায় উঠলে মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে এসে থাকেন। বৃদ্ধ লোকটি অদ্ভুত চরিত্রের ; নিঃসন্তান, স্ত্রী আছেন—তার সম্বন্ধে তিনি তেমন উৎসুক নন ; ভদ্রলোকের বয়স প্রায় সত্তর, আজীবন কোনো জীবিকা অবলম্বন করেননি—ব্যবসা বা চাকরি-বাকরি কিছুই না ; দেশে সামান্য জমিজমা আছে, তাতে সারা বছরের খোরাক চলে না, কোন এক সময়ে অল্পদিনের জন্যে মসজিদের এমামতি করেছিলেন। আত্মীয়দের—আর দেশের লোক মাত্রেই তাঁর আত্মীয় : খুঁজে-খুঁজে সব বের করেন, লতায়-পাতায় কোথায় সম্পর্ক আছে তা-ও—আত্মীয়দের বাড়ি-বাড়ি খেয়ে বেড়ান ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থা যাদের তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা চেয়ে নেন—এইভাবেই চলে তাঁর। যেহেতু এভাবেই তিনি চালাচ্ছেন বছরের পর বছর, অতএব কেউ তেমন আপত্তি করে না ;—যদিও বিরক্ত হয়তো অনেকেই হয়। মেয়েরা এবং বুড়োবুড়িরা বরং খুশিই হন দেশ-গাঁয়ের সব আত্মীয়স্বজনের নাড়িনক্ষত্রের খবর তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরে।

যথারীতি তিন-চারদিন হলো তিনি মণ্টুদের বাড়িতে এসেছেন। তিনি শুধু দিনের বেলা বাড়িতে খান, রাতে আদৌ কিছু খান না। এখনো অন্যান্য আত্মীয়দের বাসায় যাওয়া আরম্ভ করেননি, একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন বুঝি,—অন্যবার কিন্তু এতদিনে অন্য কোথাও চলে যান এবং যেখানেই তিনি যান সেখানেই জমিয়ে বসেন। কাছে

একটা মসজিদ আছে, অনেক সময় সেখানেই কাটিয়ে দিচ্ছেন দিনরাত। বাড়ির ছোকরাকে নিয়ে একদিন বাজারেও গিয়েছিলেন সাধ ক'রে। আর, যতক্ষণ বাড়িতে আছেন ততক্ষণ তাঁর মুখ চলছে, ততক্ষণ অবিরাম গল্প করছেন, নিজের বর্তমান ও অতীতের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা। বাড়ির ছোটো-বড়ো সবাইকে উপদেশ দিচ্ছেন অন্তরঙ্গ মুরুব্বির মতোই, সবার সঙ্গে তুই-তোকারি করছেন: মা, মেয়ে ও মেয়ের মেয়েকে একই সম্বোধন করছেন। কথাবার্তা উপদেশ ও গল্প সব সময় শালীনতার সীমার ভিতর থাকছেনা। মেয়েদের-বৌদের বলছেন নামাজ পড়তে, রোজা রাখতে আর মাথায় কাপড় দিয়ে চলতে। উনি কেবল বাড়ির কর্তাকে—ছেলেটি অর্থাৎ মণ্টুর আব্বাকে—ভয় ক'রে চলেন, একটু সতর্কভাবে কথা বলেন, সহজে তাঁর সামনে বের হ'তে চান না। মণ্টুর আব্বা, শাহাবুদ্দিন সাহেব, আবার উদার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন যে বুড়ো যতদিন থাকেন, ওঁর যেন কোনো অসুবিধে না হয়। এমনিতে মণ্টুদের পরিবারটি বেশ বড়ো: আব্বা, মা, বড়ো ভাই, ভাবি ও তাদের তিনটি ছেলেমেয়ে, মেজোভাই ও মেজোভাবি—এদের বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক, এখনো কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি, আর মণ্টুর বোন জুলেখা; বড়ো বোনের বিয়ে হয়ে গেছে—তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে থাকেন, বছরে দু'বছরে একবার ক'রে আসেন। জুলেখা আপা কলেজে পড়ে,—বুড়োকে দেখে সে তেমন সম্ভ্রম দেখায় না ব'লে আম্মা খুব বকাবকি করছেন,—কেননা, সবচেয়ে যা বেশি ভয়: বুড়ো আবার দেশে গাঁয়ে না-জানি কি নিন্দাই রটাবে। এমনিতেই আপার বিয়ে নিয়ে রোজ আম্মাকে কথা শোনাচ্ছে, 'আইবুড়ো মেয়েকে ঘরে রাখিস নে, ওতে ভীষণ গোনা, ভালো একটা পাত্র দেখে পার ক'রে দে—' বড়োভাবি ছেলে-মেয়ের মা, ওঁর সামনে মাথায় কাপড় দিয়ে থাকছে। মেজোভাবি যে এত উচ্ছলা, সেও বুড়োকে দেখলেই মাথায় কাপড় টানার একটা অর্ধপ্রয়াস করছে সম্ভ্রমসূচক,—আর আড়ালে গিয়ে ছোটো আপার সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। ছোটো আপা বলে, 'ভাবি, দেখেছো, বুড়ো যখন বকবক করে তখনো তসবিহ্‌ গুণে যায়—তসবিহ্‌ গুণলেই হলো, ও দোআ-দরুদ পড়ে কখন?' মেজোভাবি বলে, 'আর নামাজ পড়ে কি তাড়াতাড়ি লক্ষ্য করেছো?' বলে আর ওরা হাসাহাসি করে। মা অথবা বড়োভাবি থাকলে হেসে মিষ্টি ধমক দিয়ে থামিয়ে ছায়। এদিকে এই বুড়ো দূর-সম্পর্কের আত্মীয়টিকে, আত্মীয় না ব'লে দেশের লোক বলাই ভালো—তাঁকে জায়গা ক'রে দেয়া হয়েছে মণ্টুর ঘরে,—ইস্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্যে মণ্টুকে যে-ছোটো একটেরে ঘরখানি ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, তাতে। ছোটো ঘর, একটি তক্তপোশ, ন্যাড়া কালির দাগ-পড়া একটি টেবল—মণ্টু

প্রথম একেবারে বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, যখন সে-ঘরেরই অল্প পরিসর মেঝেতে তিনি তাঁর নোংরা বিছানা ক'রে নিলেন, মাথার কাছে তাঁর সঙ্গী পুঁটলিটা থাকল, সেই বিছানার উপরেই তিনি নামাজ পড়তে লাগলেন, তার ওপর ব'সে-ব'সে উপদেশ দিতে লাগলেন, রাজ্যের গল্প করতে লাগলেন। প্রথমদিন পড়ার ও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় পরের দিন সকালে মা-র উপরে রাগও করেছিলো মণ্টু; কিন্তু তখনই তলে-তলে অবচেতনে লোকটা যেন তাঁর অদ্ভুত গল্প ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাকে আকর্ষণ করছিলেন,—এবং ক্রমশ মণ্টু কৌতূহলে পড়াশোনা ও ঘুম একপাশে ঠেলে রেখে তাঁর সম্বন্ধে জাগ্রত হয়ে উঠছিলো, আর খারাপ লাগছিলো না; তাঁর অশ্লীল ও অদ্ভুত গল্প দিয়ে বৃদ্ধ যেন তাকে জাদুকরের বাঁশিতে মোহিত সাপের মতো মুগ্ধ ক'রে ফেলছিলেন। রাত। দেয়ালে শেডহীন আলো ঝুলছে ফলের মতো। মণ্টু ব'সে আছে তক্তপোশে: তার ঠোঁট মেয়েদের মতো লাল, গাল লাল্চে, কৃষ্ণ চোখ, ফর্শা মুখের কিশোর সুন্দর ছেলেটি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বৃদ্ধের কথা শুনছে, তার ভিতরে কোথায় যেন বহুদূরে রক্তের পলাশবনে অস্পষ্ট ঝড় উঠেছে। আর, বৃদ্ধ তাঁর মেঝের বিছানায় শিরদাঁড়া খাড়া ক'রে তার মুখোমুখি হয়ে গল্প করছেন।

বৃদ্ধ বলছিলেন, 'দুনিয়ারে খুব ছেনেছি, সোনা, সত্তর বছর ধ'রে ছেনেছি। এখন যৌবন গেছে, সে-সাধ নেই, শক্তিও নেই। চুল পেকে গেছে কবে, দাঁত প'ড়ে গেছে: ভালো-মন্দ খেতে পারিনে, সারাক্ষণ পেশাব টপটপ ক'রে পড়তেছে, জানিনা নামাজ কবুল হবে কি না, রহমান্থুর রহিম মাপ করবেন কিনা। কতো দেখলুম, কতো শিখলুম, সব খেলা রে, দুদিনের খেলা। দেখতে-দেখতে খেলতে-খেলতে চ'লে যায় সে-সব দিন, শিরদাঁড়া আর ক'দিন খাড়া থাকে। সত্তর বছর চ'লে গেলো রে, কখন যে গেলো কিভাবে গেলো বুঝতে পারলাম না, মনে হয় সেদিনের কথা, এই সেদিন যেন, ন্যাংটো হ'য়ে ঘুরতাম, সত্তর বছর চ'লে গেলো এক মুহূর্তের মতো। হায় আল্লা, কতোদিন কাঁদি আল্লার কাছে: একি লীলাখেলা তোমার মা'বুঝ। কিছুই বুঝলাম না, কিছুই বুঝা যায় না, আমি তোমার নাদান বান্দা। কানবি রে, আমার মতোই কানবি একদিন, তার চেয়ে এখন থেকে কাঁদ, এখন থেকে আল্লার নাম নে, তোর তো বয়েস হয়েছে, নামাজটা পড় নিয়মিত, এই বয়েস এখন থেকে বুঝে চল, সংযম শেখ, দেখবি: আল্লা তোর সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তোর এই চেহারা, মেয়েদের কাছে ঘেঁষবি নে, ছিবড়ে ক'রে দেবে তাহলে। সংযম শেখ, বেহেশতের সব হুরপরি—যাদের টাকুরা কেউ ছোঁয়নি—আ, তারা তোর জন্যে অপেক্ষা করবে। নামাজ পড়, রোজা রাখ, আর সোজা পথে চল। আলহামদোলিল্লাহ,

আমাদের ধর্মের মূল কথা কি জানিস ?—সোজা হ'য়ে চলো। ব্যাস, তাহলে আর কোনো দুঃখু থাকবে না তোর। এই কোঠা-বালাখানা এসব কিছুই থাকবে না, জাদু, সুতরাং আল্লার হুকুম মেনে, রসুল যে-পথ দেখিয়েছেন সে-পথে চল। তোর কবে নামাজ পড়ার বয়েস হয়ে গেছে, কতো নামাজ কা'জা করেছিস। জানিস, এক ওয়াক্ত নামাজ না পড়ার জন্যে আশি হোকবা—কতো বছরে এক হোকবা হয় তা কেউ জানে না—আশি হোকবা ধ'রে দোজখের আজাব সহ্য করতে হবে—সে কি কষ্ট, হায় আল্লা! দুনিয়াতে বাহাত্তরটা ধর্ম আছে, তার মধ্যে ইসলাম সেরা, কেন সেরা ?—তার কারণ ইসলাম ধর্ম খুব আধুনিক। কিন্তু ধর্ম ভালো হ'লে কি হবে বান্দা আর ভালো নেই, মানুষ অনাচারী স্বেচ্ছাচারী ব্যভিচারী হয়ে গেছে, এই যে চাঁদ এই যে সূয্যি, এর যে একজন কারিগর আছে, মানুষ তা ভুলে যায়। আস্তাগফিরুল্লাহ্, কতো মুসলমান বলে ও-আল্লা নেই, দুনিয়া আপনা-আপনি তৈরি হয়েছে। প্রমাণ চাস আল্লার ?—এই যে চাঁদ-সূয্যি—এর একজন কারিগর থাকবে না ? এই যে রাত দিন হচ্ছে এর পেছনে আল্লার হাত আছে না ? কিন্তু আল্লা নিরাকার, তাঁকে তো দেখিয়া দেয়া যাবে না, তাঁকে মনের মধ্যি অনুভব করতে হবে। তিনিই দাতা এবং দয়ালু। রাখাল এবং মুসা নবির সেই গল্প জানিস না ? কিন্তু মানুষ বড়ো খাবাপ হয়ে গেছে রে, ঠিক ধর্মের উল্টো কাজ করবে, কিন্তু আল্লা আর রসুল বার-বার বলেছেন : যাই করো করো, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন ক'রোনা। হ্যাঁ, সীমা লঙ্ঘন ক'রো না, নফস দমন করো : তুমি যাই কবছো ভেবো না যে আল্লা দেখতে পাচ্ছেন না। তোমার দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা রয়েছে যে : একজন নেকী, একজন বদী, তোমার ভালো-মন্দ সব কাজ লিখে রাখছে, সব মানুষেরই কাঁধের উপর ফেরেশতা রয়েছে দুজন ক'রে, রোজ হাশরের দিন তারা তোর সারা জীবনের সোয়াব এবং গোনাহ দাখিল করবে, তারপর যেদিকে পাল্লা ভারি হয় সেই অনুযায়ী তুই বেহেশতে বা দোজখে যাবি। কিন্তু সব মুসলমান একদিন না একদিন বেহেশতে যাবে, কেননা রসুলুল্লাহ তাঁর উম্মতদের জন্যে কাঁদবেন, "ইয়া উম্মতি, ইয়া উম্মতি!" ব'লে, বলবেন, "ইয়া আল্লাহু, তোমার বান্দাদের কসুর মাফ করো!" কিন্তু মানুষ কিছু সোয়াবের কাজ করবে তো, তা নাহ'লে রসুলুল্লাহ কেন তাঁর উম্মতদের জন্যে আল্লার দরবারে আরজি পেশ করবেন আর আল্লাই বা তাঁর বান্দাদের মাপ ক'রে দেবেন কেন ? কিন্তু কি হয়েছে দুনিয়া! আর দুনিয়ার মানুষ! তবলিক করছে ক'টা মুসলমান ? আর খুলনায় ছাখ গে, মেম-মাগিরা শাদা কাপড় প'রে সাইকেল নে খেষ্টান ধর্ম প্রচার করছে। কী তাদের প্রচারের ধরন! কী সুব্যবস্থা।

ইংরেজের হেকমৎই আলাদা, দু'শো বছর যে এ-দেশে রাজত্ব ক'রে গেলো সে তো আর এমনি-এমনি হয়নি। তো খায়েব। মুজিব আছে না, মুজিবর রহমান, তুই চিনবি না হয়তো, বুড়ো, আমাদের বয়েসী, এই সেদিন সে তার মেয়ের বয়েসী এক ছুঁড়িকে বে করলো। দেখা হয়েছিলো আসার আগে, বললাম, "শালা, করতোসো কি? পাঁচটা বে করলে? শালা, একেবারে জাহান্নামে যাবি যে।" দাঁত প'ড়ে গেছে, চুল পেকে গেছে, মুখ কুঁচকে গেছে—আমার তো ওর তুলনায় খুব ভালো স্বাস্থ্য—শালা খ্যা-খ্যা ক'রে হাসলো। বিশ্বশয়তান। এই তো মুসলমান। এ যে কাফেরের বাড়া। সেদিন মসজিদে এক মৌলানা সাহেব ওয়াজ নসীহত করছিলেন, বললেন: হাল জামানায় মেয়েদের দুটো জিনিশ খোলা—মাথা খোলা আর মাই খোলা—আস্তাগফিরুল্লাহ্। দিনে-দিনে কি হচ্ছে মেয়েরা। আর কি এক কাপড় বেরিয়েছে, কেরিলিন নাকি, ও আর প'রে কি লাভ, ও তো সবই দেখা যায়—মেয়ে-মর্দ সব ঐ কাপড় প'রে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর টেলিভিশন না কি হয়েছে: বেঁচে থাকলে আরো কতো কিছুই যে দেখবো। মানুষ এই সব ভড়ং খুঁজে পেয়ে ওর মধ্যেই ম'জে আছে। মানুষ যতদিন না নফ্স্ দমন করতে পারছে, ততদিন তার মুক্তি নেই। আমাদের ছ্যাথ: সারা জীবন রাঁড়বাড়ি গেলাম না—কতো বন্ধুবান্ধবকেই তো দেখলাম কতো কিছুই করলো। আমি যখন তোর মত ছিলাম বা হয়তো আরেকটু বড়ো, তখন একটা ঘটনা ঘটেছিলো। একদিন বিকেলে পুকুরধারে ব'সে আছি, পাড়ার একটা মেয়েলোক দেখি কলসি নিয়ে পানি নিতে এসেছে, কিন্তু পানি না নিয়ে আমার কাছে এলো। তারপর লোভ দেখাতে লাগলো আমাকে, পিঠে গরম মাই চেপে ধরলো,—কিন্তু আমি ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম,—জানবি ভয় অনেক সময় আল্লার আশীর্বাদ। পালিয়ে গেলাম, কেননা তখনই জানতাম জেনা করার শাস্তি সাংঘাতিক। আমাদের গ্রামেরই একটা লোকের একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছিলো তার কিছুদিন আগে,—আমরা সব জানতাম। লোকটা নিজের মেয়ের সঙ্গে জেনা করতে গিয়ে আটকে গিয়েছিলো—বুঝতে পারছিস তো—আর ছাড়াতে পারেনি, বাপে-মেয়েতে—কী সাংঘাতিক—একেবারে কবিরা গোনা। সেজন্যে মেয়ে শেয়ানা হয়ে গেলে বাপ ভাই কারো সামনেই যাওয়া উচিত নয়—আর আজকাল তো ঘরে-ঘরে শেয়ানা মেয়ে বোঝাই হয়ে আছে—কতো কী-যে হচ্ছে আল্লাই মালুম। কিন্তু মানুষের খাহেশ তো সারাজীবনে মেটানো যায় না, ইচ্ছা থাকলেও ক্ষমতায় কুলোয় না। এই সেদিন খুব খাহেশ হ'লো হঠাৎ, তোর দাদি তো বর্তমান, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না, বুড়ো হয়ে গেছি একেবারেই।

দুনিয়ারে আর কতো দিন ছানা যায়, ভোগ-বাসনা একদিন কমবেই। কিন্তু মানুষের লোভের কমতি নেই। মসজিদে কিছুদিন এমামতি করেছিলাম—তখন কি দেখেছিলাম জানিস? আমি বাড়ীর কাছের ঐ মসজিদে নিয়মিত যাতায়াত করতাম। দেখেছিলাম, ঐ মসজিদের ইমাম সাহেব কাফনের কাপড় চুরি ক'রে বেচতো, শেষে একদিন ধরা প'ড়ে গিয়ে বিদায় নিতে হয়। তাহ'লে ছাখ, বদমায়েশি কোথায় না আছে। তাই ব'লে কি ধর্ম নেই, আল্লা নেই?—বেশক্, নিশ্চয় আছে। ভালো লোকও কি দেখিনি, তা-ও দেখেছি। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হওয়ার আগে একবার আজমীর শরীফে গিয়েছিলাম। সে কি ভিড়ঃ স্টেশনে লোক থইথই করছে। আমি ভাবলামঃ হয়েছে, আমার আর আজমীর শরীফ দেখা কপালে নেই। কিন্তু আল্লার কি মর্জিঃ এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলোঃ সে-ই ব্যবস্থা ক'রে দিলো। কুলির মাথায় ঝাঁকায় চ'ড়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে কোনো রকমে ভিতরে ঢুকেছিলাম। কতো অভিজ্ঞতা আছে। কতো সোয়াব দেখেছি, কতো গোনাহ্। সব-কিছুর পেছনেই ভেদ আছে, দিল্ পরিষ্কার থাকলে সব বোঝা যায়। ধর, জিনের কথা, ভালো-মন্দ সব রকম জিন আছে দুনিয়ায়। জিনের মধ্যেও আলেম ফাজেল আছে। ফেরেশতা আগুনের তৈরি, আর মানুষ মাটির। আর জিন মানুষের লেবাশ প'রে মানুষ সেজে ঘুরে বেড়ায়। বাজারে যে এত ভিড় হয়, অর্ধেক জানবি জিন। হাসছিস? আল্লার ভেদ তো জানিস নে, তাই হাসিস, তাই বিশ্বাস করিস নে। তোদের ঐ "সায়েন্স" দিয়ে কিচ্ছু হবে না। এই যে মানুষ ফটফট ক'রে ম'রে যায়, কই কতো বড়ো-বড়ো "সাইন্টিস্ট" আছে বন্ধ করুক তো। তা পারবে না, সোনা। যাক গে। আসল কথা মনে রাখবিঃ দুনিয়াদারিতে ম'জে যাবি না, বেহেশতে—তোরা যাকে "হেভেন" বলিস ইংরেজিতে—দুনিয়ায় যা আছে তার দশ গুণ জিনিস আছেঃ এই যে সব খাপসুরত মেয়েমানুষ দেখিস তার চেয়ে ঢের খাপসুরত হুরপরি থেকে হাজার রকম মেওয়া আছে। কাজেই সার কথা বলিঃ এ সোনার খাঁচায় ভুলে থেকো না, দিন রাত আল্লার নাম করো, নফ্স্ দমন করো আর সোজা পথে চলো। ব্যাস, তাহলেই তোমার দিন-দুনিয়া সব জায়গায় শান্তি।'

কখনো থেমে থেমে, কখনো অবিরল অনর্গল কথা ব'লে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ; বিচ্ছিন্ন এলোমেলো, যোগসূত্রহীন কথা। মাঝে মাঝে তাঁর কণ্ঠস্বরের মাত্রা চড়ছিলো, কখনো নিচু স্বরে যেন কি গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করছেন—এভাবে তিনি কথা বলছিলেন। শুনতে-শুনতে কিশোর মণ্টুর অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হচ্ছিলোঃ কখনো রক্তোচ্ছ্বাসে

লাল হয়ে যাচ্ছিলো তার মুখ-চোখ, তাকাতে পারছিলো না মুখ তুলে, আবার কখনো সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলো—কিছু শুনতে পাচ্ছিলো না। 'নামাজ পড়তে হবে' ব'লে বৃলে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন বিছানাব উপর, তারপর দরজা খুলে বাইরে থেকে ওজু ক'রে এসে এশার নামাজ পড়লেন। তারপর সেই বিছানাতেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। এই কাজগুলি যখন তিনি করছিলেন এবং পরে মণ্টু পড়ায় মন দিতে চাইলো কিন্তু সমাজ-বিদ্যার বইখানি অনর্থক খোলা প'ড়ে থাকলো, কিছুই মাথায় ঢুকলো না তার। 'আজ আর পডা হবে না' ভেবে বাইরে বেরুলো মণ্টু, বারান্দায় খোলা বাতাসে অনেকটা আরাম পেলো সে, মাথার ভিতরে যে-জট পাকিয়ে গিয়েছিলো যেন তা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে রাতের ফুরফুরে বাতাসে। ঘরে এসে বইপত্র তুলে, বডো আলো নিভিয়ে, জিরো-পাওয়ারের আলো জ্বেলে দিয়ে মণ্টু শুয়ে পডলো। কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এলো না তার, মাথার ভিতরে যেন একটা পাথরের জাঁতা ঘুরছে আর অনেকগুলি টুকরো-টুকরো কথা ছিটকে-ছিটকে বেরিয়ে আসছে সেই বিভীষণ চাপের ভিতর থেকে, বাস্তব-বিভ্রম-স্মৃতি-স্বপ্ন-অবচেতন যেন চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে রঙিন ধুলোর মতো উড়ছে তার চারপাশে।

অনেক রাতে মণ্টুর ঘুম ভেঙে যায়। সে আধো আলো-অন্ধকারে দেখতে পায় বৃদ্ধ মণ্টুর বিছানার দিকে তাকিয়ে নিজের বিছানার উপর দাঁড়িয়ে আছেন, নগ্ন। ভয়ে মণ্টু চীৎকার করতে গিয়েও থেমে যায়; কেননা সে শুনতে পায় বৃদ্ধের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, 'নফ্‌স্‌ দমন কর, এখনো দমন করতে শেখ, আল্লার নাম কর—তিনিই রক্ষাকারী।' তসবিহ্‌ গুণতে গুণতে যেমন বলেন তেমনি বিড়বিড় ক'রে এসব কথা কি তিনি আমাকে বলছেন, না কি নিজেকে? মণ্টু ভয়ে পাশ ফিরে শুলো, অনেকক্ষণ তার ঘুম এলো না: মাথার ভিতর একটা উত্তেজিত শিরা যেন দপদপ করছে—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মণ্টু মনে করতে পারলো না: রাতে সে ঘুমের ঘোরে যা দেখেছিলো তা কি স্বপ্ন না সত্যি।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। হাওয়া দিচ্ছে উত্তর থেকে। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে শীতের হাওয়া। মেরু হরিণের শিঙের মতো তীব্র, তীক্ষ্ণ। এলোমেলো। খিদে, রাগ, জ্বালা, অভিমান। শীত। ক্রমাগত, অবিচ্ছিন্ন শীত। (উ-হুঁ, মুহাব্বাত! শালা বেজন্মা, চল।)

বুকের ভেতর তার সেই কষ্টটা, সেই পুরোনো দুঃখটা তাকে অস্থির করছিলো। সেই সঙ্গে একটা নাম না জানা আক্রোশ তার সমস্ত চেতনায় আপসাচ্ছিলো। চোখের মণিতে তার একটা অতি সূক্ষ্ম আগুনের শিখা। জ্বালা করছে।

আর একদিন, সেই যেবার রেল লাইনের ধারে অজিতের পেটে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, (শালা শুয়ারের বাচ্চা, আমার সঙ্গে মামদোবাজী? বোঝ শালা কেমন মজা।) সেবারও এমনি একটা অপরিচিত আক্রোশ তার ভেতরে জেগেছিলো।

এখন এই শীতালী অন্ধকারে ঠাণ্ডার চাবুক খেতে খেতে অজিতের মুখটাকে ভাবতে চাইলো সে। ছবিটা ঠিক মত মনে করতে পারলো না। কেমন হিজিবিজি। ঝাপসা।

চারিদিকে এখন কুয়াশা এবং ধারাবাহিক বাদুড় অন্ধকার বিধবার মতো শোকাহত। বুকের ভেতর সেই কষ্টটাকে নিয়ে সে হাঁটছিলো। এ দুঃখটা কি, কবে কেমন করে জন্ম নিয়েছে আমি জানি না। মাঝে মাঝে আমার ভেতর জাগে বিনা নোটিশে। আমাকে তখন অস্থির করে। কোন কিছুতে আমি তখন শান্তি পাই না।

'মদের গেলাস আর বাজারের মেয়েমানুষ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আবার দুঃখ কিসের। ও শালা সব চিন্তার ফুলস্টপ। হা, হা, হা।' পিয়ারু ভাই হাসতে হাসতে বললো। (শ্রীরামপুর ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের সেই চওড়া কব্জিওয়ালা, কাবলী স্যাণ্ডেল

পয়া, লাল লাল ছোপ লাগানো দাঁত—বেপরোয়া পিয়ারু ভাই। মদ খেয়ে ভোম হয়ে পড়ে থাকতো। দু'তিন দিন তার কোন খোঁজ পাওয়া যেত না। নিজের গাড়ী. বলবার কেউ নেই।) আমি তখন হীরাসিংয়ের ছোকরা ক্লীনার্স। বুঝতাম না। হাঁদার মতো চেয়ে থাকতাম। শুনতাম। ধমক দিয়ে উঠতো কেউ হয়তো: "আবে তু কিয়া শুনতা, আপনা কাম কর।" এখন বুঝি। কিন্তু পিয়ারু ভাইয়ের কথার কোথায় যেন ফাঁক ছিলো। এখন সেটা ধরা পড়ে। দুঃখটা যখন প্রবল হয়, জ্বালা যখন অসহ্য, অস্থিরতা যখন বুকের ভেতর ছট্‌ফট্ করে—মদ খেয়ে, মেয়েমানুষের উলঙ্গ শরীর নিয়ে নাড়াচাড়া করেও তখন তাকে ভোলা যায় না। আগে বুঝতাম না। এখন বুঝি। পিয়ারু ভাই তুমি মিথ্যে কথা বলেছিলে। হাসির আড়ালে তুমি কি যেন লুকোতে চাইতে। কিন্তু তা কি হয় পিয়ারু ভাই। তা হয় না। ক্ষণিকের জন্যে হয়তো তা ভুলে থাকা যায়। কিন্তু জীবনটা তো ক্ষণিক নয়, সময়টা তো মুহূর্ত নয়। আগে এসব বুঝতাম না। এখন বুঝি। আর বুঝি বলেই অস্থির হই। শান্তি পাইনা। ছটফট করি। (উ-হুঁ, মুহাব্বাত? চল্ শালা।)

অজিতকে যেদিন খুন করলাম সেদিন আমি প্রথম শ্যাওড়াফুলী বেশ্যাপাড়ায় ঢুকেছিলাম। পটলার দোকানে মদ খেয়েছিলাম। আমার ভেতর তখন একটা আক্রোশ দাপাচ্ছিলো।

ছোট বেলায় বাপ মারা গেছে। (বাপ মদ খেতো, বেশ্যাবাড়ী পড়ে থাকতো, রেস খেলতো, মাকে ধরে মারতো। মা পরের বাড়ী ধান ভানতো, শোলার ওপর রাঙতা বসিয়ে পুতুল বানাতো। বিক্রি করে সংসার চলতো।) একটু যখন বড় হলাম—ইস্কুলে যাই—কারক বিভক্তি মুখস্ত করি,—বড় ভাই মারা গেলো। (বাপ মরার পর বড় ভাইয়ের ওপর সংসার ছিল। বড় ভাই মিলে চাকরি পেয়েছিলো, সেই বড় ভাই মারা গেলো মজদুর মিছিলে গুলি খেয়ে।) আমি তখন কাজ নিলাম —হীরা সিংয়ের ক্লীনার্স। ট্যাক্সি ধোয়ামোছা করি, বালতি বালতি পানি ঢালি রেডিয়েটরের মুখে। প্যাসেঞ্জার জোটাই। রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে দেখি: ইস্কুল ঘর। মাস্টার। রোদে পোড়া ইস্কুল মাঠ। ক্লাসের পরিচিত মুখগুলো। আমার ভেতর তখন কষ্ট হতো। (সেই কি আমার প্রথম কষ্ট, জ্বালা, দুঃখ?—কি জানি।) মাঝে মাঝে খারাপ লাগতো, সব কিছু ছেড়েছুড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে হতো। কান্না পেতো। ওস্তাদ (হীরা সিংকে আমি ওস্তাদ বলতাম) বিরক্ত হয়ে কিছু বললে রাগ ধরতো নিজের ওপর, নিজের ভাগ্যের ওপর। মনে হতো সবাই আমাকে ঠকাচ্ছে। স্বার্থপর। এমন কি মাকেও। কিন্তু বাইরে কোনদিন প্রকাশ করতাম

না। আমার সেই কষ্টটাকে, সেই দুঃসহ কান্নাটাকে ততদিনে লুকোতে শিখেছিলাম।

ধীরে ধীরে আমি বড় হলাম। ক্লীনার্স থেকে ড্রাইভার। নূরীর (আমার বোন, তখন ষোলোয় পা দিয়েছে।) বিয়ের জন্যে চিন্তা করছি। নিজের সম্পর্কে নোতুন করে, আপন করে, একান্ত করে যখন ভাবতে শিখছি, তখন আমাকে মদ খেতে হলো, বাজারের মেয়েমানুষের কাছে যেতে হলো, অজিতকে খুন করতে হলো। (অজিতের মুখটা! আহ্ শালা, আমার একদম মনে পড়ছে না।)

২

শীত। বড্ডো শীত। এখন যদি একটু আগুন পাওয়া যেতো! আবার বৃষ্টি এলো। নাহ্ আমাকে আর বাঁচতে দেবে না। এখন একটু আগুন যদি…সারাটা জীবনই তো আমার শীতকাল, একটু আগুনের জন্যে, একটু গরম হবার জন্যে মাথা কুটে মরলাম। কুকুরের মতো হন্যে হয়ে ফিরলাম (উ-হুঁ, শালার শখ কত, চল্)।

অজিতকে যেদিন খুন করে ভাগলাম, সেদিন এমনি বৃষ্টি হয়েছিলো। শীত ছিলো। আমার ভেতরটা তখন ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছিলো। (তার মানে তোমার ভেতর তখন ভয় হচ্ছিলো। শালা ডরপোক ইঁদুরের আত্মা নিয়ে আবার যায় মানুষ খুন করতে! মর শালা!)

—কি রে তুই এখনো দুনিয়াতে আছিস দেখি, যাচ্ছিস কোথা?

—তোর বোনের কাছে।

—কি বললি? দেখ্‌গে শালা তোর বোনকে নিয়ে কে মজা লুটছে।

—তবে রে হারামির বাচ্চা…

তারপরই র‍্যাপার জড়ানো অজিত পেটে হাত চেপে রেল লাইনের খোয়ার ওপর আর্তনাদ করে পড়েছিল।

কালো অন্ধকার সমুদ্রের ভেতর থেকে একটা দ্বীপ ভেসে উঠলো: উঠোনে চাপ চাপ রক্ত। জমাট বেঁধে আছে। দরজাগুলো হা হা করছে। বিছানা বালিশ, ভাঙা হাঁড়ি, ছড়ানো ভাত, ছিটানো ঘরদোর—তার জ্বলে যাওয়া স্বপ্ন—সব, সব দেখতে পেলো সে।

৩

রহমত ভাইয়া, তোমাকে না বলে চলে যাচ্ছি। আমায় ক্ষমা কোরো। কোন কিছু না ভেবে সেদিন চলে এসেছিলাম আমি। অপরিচিত জায়গা। মসজিদে,

গাছতলায় শুয়ে রাত কাটিয়েছি। পকেটের পয়সা ফুরিয়েছে। অভুক্ত দিন গেছে। কোন চাকরী পাইনি। তুমি আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলে। কাজ দিয়েছিলে। মাঝে মাঝে স্মৃতিরা এসে ভিড় করতো, বুকের ভেতর কষ্ট হতো। কাজের ভেতর ডুবে থাকতে চাইতাম। দিন আমার মন্দ কাটছিলো না। কিন্তু এতো চড়াই উৎরাই পার হয়ে এসেও আমার ভেতরের সেই স্বপ্নটা, সেই সাধটা, সেই তৃষ্ণাটা তখনো মরেনি, আশ্চর্য! (উ-হুঁ, শালা মুহাব্বত, চল্)।

পেছন থেকে আমাকে কি ডেকেছিলো? কি জানি, আমি শুনতে পাইনি। আমি তখন কালা হয়ে গিয়েছিলাম। শীত, ওহ্ কি ভয়ানক শীত! বৃষ্টির বেগ বাড়লো। গায়ের জামা-কাপড় সব ভিজে উঠেছে। হাড়ে সুঁই ফোটাচ্ছে। মেয়েটা এতক্ষণ কি করছে? কাঁদছে?…আমার বউ কাঁদছে, এখন কাঁদছে? আমার বিয়ে করা বউ আমার, একান্ত আমার…অথচ…(বলিহারী যাই তোর সাধ দেখে। তুই শালা হ'লি রাস্তার কুকুর, তুই গেলি কি না বিয়ে কোরতে, মুহাব্বাত জমাতে? শালা লালচে কোথাকার, চার মাসের ছেলে পেটে করে বউ এলো তোর ঘর করতে, হা হা হা। লে ব্বাবা, তুই কাঁদছিস? মাইরী তুই কামাল করলি ইয়ার। আরে তোকে কাঁদতে নেই, মানুষ দেখলে হাসবে। উ-হুঁ, শালার শখ কতো, বিয়ে করবে, মুহাব্বত জমাবে, ছেলের বাবা হবে, শালা লাল্চে, চল্)।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

প্রত্যাশা কম, তাই ওর দুঃখও কম। কিন্তু আজকাল সুবলকে খুশি-খুশিই দেখায়। বাজার যা আক্রা তাতে কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হয়, গুঁড়ো-গাড়া মাছ ছাড়া বড়ো বড়ো মাছ যেন সব পালিয়েছে এ-তল্লাট থেকে, জাল দুখানা ঘরের কোণে পড়ে পচে—পাইকারদের কাছ থেকে কিনে এনে বাজারে বেচতে হয় তাকে—তিন টাকা সাড়ে তিন টাকার বেশি মুনাফা তুলতে হাড়ে দুব্বো গজিয়ে যায়—তবু এক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বুকখানা সব সময় ছমছম করে সুবলের। সাড়ে চার হাজার টাকা! এই তার বুড়ো আঙুলখানা কালিতে লেপ্টে কাগজের উপর একখানা ছাপ দিলেই সে সাড়ে চার হাজার টাকা পেতে পারে। সুবল আজকাল মাঝে মাঝেই তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। যেন নিজেকেই সে কলা দেখাচ্ছে! সাড়ে চার হাজার টাকা তাদের বংশে কেউ বাপের জন্মে দেখেছে একসঙ্গে? সেই বলে না, ঠোঁট ঢাকতে পেছন আলগা—এই তো হল গিয়ে অবস্থা!

আড়াই-শো গ্রামটাক বেলে মাছ তখনো পড়ে ছিল, আস্তে আস্তে হলদেটে হয়ে আসছে মাছগুলো, উড়ে বসছে নীল ডুমো মাছি—দর কমাতে কমাতে সুবল দু-টাকা চার আনা কিলোয় নেমেছে—তবু ও-কটা আর কাটছে না—একটা বুড়ো ঘুরঘুর করছে অনেকক্ষণ থেকে—তার মতলব সুবল যদি শেষ পর্যন্ত দেড় টাকায় নামে; হঠাৎ দিলদরিয়াভাবে সুবল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, ও-কটা বেলে মাছ আর বেচবে না, বাড়ি নিয়ে যাবে। নিতাই অনেকক্ষণ থেকে ঝাড়া হাত-পা হয়ে বসে আছে, ওর সঙ্গেই বাড়ি ফিরবে। ঝুড়িটা তুলে নিয়ে সুবল বলল, চল নিতাই, চল। বসে বসে কোমর টাটিয়ে গেল। বিড়ি আছে নাকি?

নিতাই বলল, না দাদা। কিনতে হবে। চলো, এক কিলো চালও কিনে নেবো।

—এ-বাজারে চাল কত ক'রে যাচ্ছে আজ?

—দু-টাকা তিরিশ, তাও ভাঙা।

—তবে চ, বাগুইআটির বাজারে অন্তত পনেরো নয়া সস্তা হবে।

নিতাই একটু শৌখিন, সে জামা পরে। প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে টাকা রাখে। সুবল ওসব ধার ধারে না, লাল কাপড়ের তৈরি গেঁজে তার কোমরে ধুতির নীচে বাঁধা, চকচকে খালি গা। গেঞ্জি জামা হলেই তার আবার কাচাকাচির ঝামেলা—শরীরের তো আর কাচাকাচি নেই। পুকুরে একটা-দুটো ডুব দিলেই—বাস। নিতাই চাল কিনল, আর শুকনো লঙ্কা। সুবলের বাড়িতে কালই র‍্যাশন তোলা হয়েছে—এখন দুদিন আর চাল কিনতে হবে না—সে কিনে নিল পাঁচশো নুন—বিড়ি কিনতে গিয়েও কিনল না। এই সুযোগে একটু চালাকি খেলে নিল—নিতাই বিড়ি কিনেছে—এখন সে নিজে কিনলে আর নিতাইয়ের থেকে নেওয়া যাবে না। তার থেকে, নিতাই কেষ্টপুরের রাস্তায় বেঁকলে তারপর সে তার নিজেরটা কিনে নেবে।

বড়ো রাস্তায় এসে বিড়ি ধরিয়ে নিতাই বলল, দিন-দিন ধাঁ ধাঁ ক'রে বাড়ি উঠে যাচ্ছে এ-জায়গায়। কি ছিল আর কি হল!

নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে সুবল একটু গর্বের সুরে বলল, দিনকাল কি আর চিরকাল এক থাকে? আমি নিজের চক্ষে দেখেছি, এখানে কামট ভাসত—এই অ্যাত্‌তো বড়ো হাঁ।

—কামট?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আর শালার মাছও ছিল, ইয়া ইয়া বোয়াল-চেতল, আর এখন দেখ দিনি—সে-সব বুজিয়ে কিরম বাস যাচ্ছে!

—সোবলদা, তোমার জমিটা ছাড়বে না? সাড়ে তিন হাজার টাকা দর উঠেছে শুনছি?

সুবল বিজ্ঞভাবে বলে, সাড়ে তিন কি, দেখবি একদিন দশ হাজার উঠবে। আমি এখন ছাড়চি না, অত কাঁচা পায় নি আমাকে!

কেষ্টপুরের অনেক ভেতরে দেড় মাইল দূরে নিতাইয়ের বাড়ি। সুবলের বাড়ি এই এখান থেকেই দেখা যায়। তালগাছটার মাথায় দুটো শকুন ব'সে আছে। শালারা রোজ ব'সে থাকবে। রাস্তার দু-পাশ বরাবর খাল চ'লে গেছে। বাঁদিকের খালটা বরাবরের পুরনো—ডানদিকেরটা নতুন। নতুন রাস্তা বানালেই তার পাশে খাল থাকবে। খাল কেটে সেই মাটি দিয়েই তো রাস্তা উঁচু করল, তবে ডানদিকের খাল বরাবর একটানা নয়—মাঝে মাঝে ফাঁক আছে, আছে মানে ছিল, এ-বছরের

বৃষ্টিতে সব ভেসে একাকার হয়ে গেছে। ছল ছল ক'রে বইছে বৃষ্টির নতুন টাটকা জল, এই জলে বাগ্দা-চিংড়ি খুব বাড়ে। রাস্তা থেকে নেমে কাপড় গুটোলো সুবল। কোন্ জায়গায় জল কম, তার জানা আছে। কাপড় গুটোতে গুটোতে কোমর পর্যন্ত তুলতে হল, হড় হড় ক'রে জল ঠেলে সুবল এসে পৌছল বাড়িতে—তার উঠোন পর্যন্ত ডুবে গেছে এবার—তার কুমড়ো আর কাঁচা লঙ্কা গাছগুলো সব পচিয়ে দিয়েছে। মাইরি, এরম বিষ্টি বাপের জম্মে কেউ কখনো দেখে নি!

কিন্তু এত বৃষ্টির জন্যও সুবল খানিকটা খুশি খুশি বোধ করে। উঠোন ভেসেছে ভাসুক, রান্নাঘরে জল ঢুকেছে ঢুকুক—কিন্তু মাঠ-খাল ডোবা-পুকুর সব একাকার হয়ে গেছে—সেনগুপ্ত বাবুদের গ্যারেজে জল ঢুকেছে—মোটর-গাড়িটা ইস্তক ডুবে গেছে গলা পর্যন্ত, বাবুরা সব ঠ্যাঙের কাপড় তুলে ছপছপিয়ে হেঁটে আপিস যাচ্ছে—তাই দেখে সুবল কম হেসেছে নাকি! ও-বাড়ির দেমাকী ঝি মাগী সে পর্যন্ত পোঁদের কাপড় তুলে—। তা ছাড়া, সুবলের লাভও হয়েছে। তার বাড়ির সামনের ডোবাটাও ভেসে গেছে, পেছনে সাইকেল কোম্পানির পুকুরে বড়ো বড়ো মাছ ভেসে এসেছে—সুবল চুপি চুপি বস্তায় গোবর ভ'রে ডুবিয়ে রেখেছে মাঝডোবায়—গোবরের গন্ধ পেলে বড়ো মাছ আর কোথাও যাবে না। জলটা একটু নামুক—সুবল তখন জাল বার করবে। এত বৃষ্টিতেও কিন্তু তুলসীগাছটা মরে নি—তুলসীমঞ্চটা বেশ উঁচু।

ঐ তুলসীগাছের জন্যই তো সব। ছিল জলা-জংলা জায়গা, নলখাগড়ার ঝোপ আর মাছের ভেড়ি। সুবলরা ক' পুরুষ ধ'রে এখানে বাস করছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সুবলের ঠাকুর্দার আমলে তো বেশ বাড়বাড়ন্ত অবস্থা ছিল তাদের, সুবলের একটু একটু মনে আছে। পাইকপাড়ার রাজাদের বাড়িতে রোজ মাছ জোগান দিত তার ঠাকুর্দা। মহিষবাথানে একটা নতুন ভেড়ি কিনতে গিয়েই তো একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল—জমি-জিরেত সব বেচে ফতুর হয়ে গেল। আর জমিরই বা কি দাম—এ-সব জলা-জমি কিনতই বা কে—সত্তর টাকা পঁচাত্তর টাকা বিঘে—তারও কোনো ঠিকঠাক মাপ-জোক নেই। কোথা থেকে কি হল—গরমেণ্টের লোক এসে তাঁবু গাড়লো—মোটা মোটা লোহার পাইপে করে গঙ্গামাটি এনে ভরিয়ে ফেলল জলা—নাম হয়ে গেল লবণ হ্রদ। এ-পাশে তৈরি হল রাস্তা—ভি. আই. পি. রোড—কি বাহারের রাস্তা—দু-পাশ দিয়ে আনাগোনার অন্য আলাদা ব্যবস্থা। যে দু-চার ঘর বাড়ুই-সাপুই থাকত এখানে—হাজার দেড় হাজার টাকা বিঘের দর পেয়ে ডগমগ হ'য়ে ঝটাঝট জমি বেচে চ'লে গেল। সুবলও কি আর থাকত? সুবলরা

ছ-ভাই, বাকি ভাইরা যে-যার ভাগের জমি বেচে পকেট ভর্তি টাকা বাজিয়ে চ'লে গেল হাতিয়াড়া আর কৈখালির দিকে, সুবলের যাওয়া হল না ঐ তুলসীগাছ আর তার মায়ের জন্য। সুবলের ভাগে শুধু পড়েছিল বসত-বাড়িটুকু—সুবলের মা বগলা তুলসীতলায় আছড়ে প'ড়ে ডুকরে উঠেছিল। বসতবাড়ি বেচবি শেষ পর্যন্ত! অ্যাঁ, তোরা ভেবেচিস কি? বসতবাড়ি বেচলে বাড়ির বড়ো ছেলে মুখে রক্ত উঠে মরে—তা জানিস না। আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফ্যাল আগে—পেটে বাবলার ঝাড় ধরেছিলুম—টাকার গরমাই—তুলসীগাছ উপড়ে তুললে হাতে কুষ্ঠ হয়—। সুবল অবশ্য মায়ের এ-সব কান্নাকাটিতে গ'লে যাবার লোক নয়—সাড়ে চার হাজার টাকার কাছে ও-সব কান্নাকাটি তো ছেঁড়া জালে মাছ ধরা। কিন্তু তার বউও ভয় পেয়ে বেঁকে বসল—শেষ পর্যন্ত বগলা এসে সুবলের পায়ে পড়তে সুবল একটু থতমত খেয়ে গেল—হাজার হোক মা হ'য়ে ছেলের পায়ে হাত দিয়েছে, বগলা পাগলের মতন সুবলের পায়ে মাথা কুটেছিল।

সুবলের বাড়ি রাস্তার এ-পাড়ে, একটুর জন্য বেঁচে গেছে। গরমেণ্ট যদি চাইত তা হলে সুবলকে আর টঁ্যা ফোঁ করতে হত না—বগলার হাজার কান্নাকাটিতেও কিছু আসত যেত-না—ঐ তো হরিদাস সাপুই বেচতে চায় নি গরমেণ্টের কাছে—মারোয়াড়িরা তাকে বেশি দাম দিতে চেয়েছিল—কিন্তু রাস্তার মাঝখানে তার জমি, শেষ পর্যন্ত সেই দামেই তো গরমেণ্টকে বেচতে হল। সুবলের জমি গরমেণ্ট চায় নি—কিন্তু আর পাঁচজনা এসে ধরাধরি করেছে তাকে—সাইকেল কোম্পানি রাস্তা বানাতে চেয়েছে, সেনগুপ্ত বাবুরাও চেয়েছিলেন তাঁদের জমির সঙ্গে একলপ্তে জুড়ে নিতে, দর উঠেছিল সাড়ে চার হাজার—তার তো মোটে এক কাঠা ন ছটাক জমি—সুবল দেয় নি। মা আর ক-দিন! ও-বুড়ি চোখ বুজলেই তার পর যে-কোনোদিন সুবল বুড়ো আঙুলের টিপছাপ দিয়ে সাড়ে চার হাজার টাকা পেতে পারবে—এই চিন্তা তাকে সব সময় একটা সুখ দেয়। এর মধ্যে দর আরো চড়বে না কি আর?

সুবলের বয়েস একচল্লিশ, তার ন-টি ছেলেমেয়ে। এর মধ্যে সাতটি বেঁচে-বর্তে আছে। বড়ো ছেলেটা হাতিবাগানে সবজি বিক্রি করে, ওখানেই ঘর ভাড়া ক'রে বউ নিয়ে আছে—বাপ-মার খোঁজ-খবর নেয় না। সুবলের বউটা একেবারে বছর-বিয়োনি—মাঝখানে দুটো বছর ক্যান্ত দিয়েছে একটু, তাও বিশ্বাস নেই, আবার কোন্‌দিন পেটে একটা বাঁধিয়ে বসবে তার ঠিক কি! ছেলেমেয়েগুলো উঠোনের জলে থল্‌ল্‌ থল্‌ল্‌ করছে—এদিকে যে শোবার ঘর পর্যন্ত জল ছল্‌কে উঠছে—সে

দিকে খেয়াল নেই। দেখেই সুবলের রাগ চ'ড়ে গেল। সব চেয়ে পাজি ঐ সেজো মেয়ে কুসীটা। ভাইবোনগুলোকে কোথায় একটু সামলাবে তা নয়, নিজেই হারামজাদী ধিঙ্গিপনায় মেতেছে। মেয়েটা একেবারে হাড়বজ্জাত—রান্নাঘর থেকে চুরি ক'রে খাবে, ভাই-বোনের খাবার ঠকিয়ে খাবে—রাক্ষুসীর মতন নোলা। ঝুড়িটা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে সুবল কর্কশভাবে ডাকল—এই কুসী, শোন ইদিকে।

শাড়িটা উরুত পর্যন্ত তোলা ছিল, জলের মধ্যেই শাড়িটা ছেড়ে দিল, বুকের আঁচল ঠিক ক'রে ভয়ে ভয়ে বাবার কাছে এসে দাঁড়াল। সুবল খপ্ ক'রে তার চুলের মুঠি চেপে ধ'রে বলল, কি করছিলি ওখানে? অ্যাঁ?

কুসীর মাথাটা হেলে পড়েছে, ক্যানকেনে গলায় বলল, একটা ল্যাটা মাছ, ঐ তুলসীতলায়—

সুবল ঠাস ঠাস ক'রে কুসীর গালে চড় কষাতে কষাতে বলল, ল্যাটা মাছ? তোর মুখে গুঁজে দেবো। হারামজাদী, খানকীর বাচ্ছা, সংসারের একটু সুরাহা নেই ওকে দিয়ে, মরিস্ না কেন? অ্যাঁ? মর না! মর! জল হ্যাদাচ্ছে? ও ছেলেটার জ্বর, ওকে সুদ্ধু জলের মধ্যে নিয়ে—

সুবলের বউ বেরিয়ে এসে সে-ও কুসীর পিঠে গুম-গুম ক'রে কিল মারা শুরু করল এবং চ্যাঁচাতে লাগল, গুখাকী আমার একটা কথা শোনে না, বললুম নক্কাগুলো বেটে রাখতে—

কুসীর বেশ ভারভত্তি চেহারা, বোঝাই যায় না তার বয়েস মোটে ষোলো—আর-সব ভাইবোনগুলো রোগা-রোগা, সুতরাং কুসীকে মেরেই বাপ মা খানিক হাতের সুখ পায়। মার খেয়েও কুসী কাঁদে না—মুখ গোঁজ ক'রে চ'লে য রান্নাঘরে।

সুবল প্রত্যেকদিন সূর্য ওঠার আগেই পায়ে হেঁটে চ'লে যায় দত্তবাগানে মাছের আড়তে। সেখান থেকে মাছ কিনে আসে নাগেরবাজারে বেচতে। বিক্রিবাটা সেরে অতখানি রাস্তা হেঁটে যখন বাড়ি ফেরে তখন রোদ মাথার ওপরে। বাড়ি ফিরেই ছেলেমেয়েদের মারধোর করা তার নিত্য তিরিশ দিনের অভ্যেস। এতগুলো পেটের জন্যই তো তাকে খেটেখুটে মরতে হয়। মাথায় একটু সর্ষের তেল থাবড়া মেরে সুবল খালে দু-চারটে ডুব দিয়ে আসে। তার পর দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে। সুবল নিয়ম ক'রে দিয়েছে, সে আগে খাবে—ছেলেমেয়েরা তার পর খাবে! তার নিজের শরীরটা ঠিক না রাখলে এত বড়ো রাক্ষসের সংসারটা চালাবে কে? সে অসুখে পড়লে তো কেউ কুটো নেড়ে সাহায্য করতে আসবে না! কলাইকরা

থালা ভর্তি ক'রে ভাত এনে দেয় তার বউ। মাঝখানে গর্ত ক'রে সেখানে ডাল ঢেলে দিয়ে সুবল পুরো ভাতটা একসঙ্গে মেখে ফেলে—তার পর যেদিন যা টাকনা থাকে—মাছের ঝাল কিংবা কুমড়োর শাক—যাই হোক—তা দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে চেটেপুটে খায়। থালাখানা সে এমন চকচকে ক'রে চেটেপুটে শেষ করে যে তার পর আর না মাজলেও চলে। খেয়ে উঠে সুবল একটা লম্বা ঘুম দেয়। শেষবিকেল নাগাদ ঘুম থেকে উঠে একটু গড়িমসি করে, কোনোদিন আর-এক দফা ছেলে-মেয়েদের মারধোর দেয়, কিংবা ঘরের চ্যাঁচার বেড়ায় ফুটোফাটা ছাইবার চেষ্টা করে, কিংবা চালায় উঠে কচি লাউগুলো গুনেগেঁথে দেখে। কোনোটায় পোকা লাগলে আদর ক'রে চুন মাখিয়ে দেয়। কোনো-কোনো দিন এ-সবে আর মন যায় না—অন্ধকার হয়ে এলেও তাদের ঘরে লণ্ঠন জ্বলে না—ভি. আই. পি. রোডের আলোর বাঁকা রেখা এসে খালের জলে খেলা করে—তখন সে উসখুস করে কিছুক্ষণ—তার পর গুটিগুটি পায়ে চ'লে যায় কেষ্টপুরের দিকে, দু-চারজন পুরোনো স্যাঙাতের সঙ্গে তাড়ি খায় পাঁচ ছ-আনা খরচ ক'রে, নিতাইয়ের সঙ্গে বড়োরকমের একটা মাছের ব্যবসা ফাঁদার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে। বাড়ি ফিরে এসে আগে গুড় দিয়ে গুটিকয়েক রুটি গিলে গলা ভর্তি জল ঢেলে পেট ভরায়, তারপর শুয়ে ঘুম। যে-সব দিন তাড়ি খেতে যায় না—সে-সব দিন আর সময়ই কাটে না—শিগগির খাওয়া সেরে নেবার জন্য তাড়া দেয়—কেরোসিন বেশি খরচ হল ব'লে গজগজ করে, বাতি নিবিয়ে কতক্ষণে শোবে সেই তার চিন্তা। শোবার ঘর মোটে একখানিই—মাটির মেঝেতে চট আর কাঁথা বিছিয়ে সার বেঁধে শোয় ছেলেমেয়েরা—সুবল শোয় একেবারে দরজার ধারে। বাইরের দাওয়াটার একপাশ ঘেরা—বগলা শোয় সেইখানে। সেই-সব দিন সুবল শুয়ে শুয়ে ঘন ঘন বিড়ি টানে, ঘুম আসবার আগে অন্য ধরনের উসখুসানি পেয়ে বসে তাকে—রান্নাঘর ধোওয়া মোছা ক'রে তার বউ যখন শুতে আসে দরজার কাছেই খপ্ করে তাকে টেনে আনে সুবল—ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়েছে কিনা গ্রাহ্য করে না—কিছুক্ষণ বউয়ের শরীরটা ঘাঁটাঘাঁটি করে, চটকায়, রোগা চিমসে চেহারা নিয়ে বউটা হাপরের মতন হাঁপায়—তার পর কোনোদিন মরাকান্না কাঁদার মতন গুনগুনিয়ে বলে, আবার একটা শত্তুর এসেছে পেটে, তোমাকেও বলিহারি—বুড়ো বয়েসে এখনো এ-সব ভালো লাগে বাপু? সুবল হ্যা-হ্যা করে বোকার মতন হাসে।

সুবল যখন বাড়িতে থাকে না তখন ছেলেমেয়েগুলো এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে—মাঝে-মাঝে রাস্তায় মোটরগাড়ি থামলে ওরা সেখানে ঘেঁষে হাঁ করে

দাঁড়িয়ে থাকে—ফরসা, সুন্দর সাজগোজ-করা বাবু আর দিদিদণিদের মুখ থেকে চোখ ফেরায় না—ছেলেছুটো পোড়া সিগারেটের টুকরো, সোডার ছিপি আর পাউরুটির মাথা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে যায়। বারো বছরের ছেলে হারাণ—সে-ই শুধু কিছু দিন ধরে একটা প্রাইমারি ইস্কুলে পড়তে যাচ্ছে। সুবলের বউ ছেলেমেয়েগুলোকে সামলাতে পারে না—শুধু সেজো মেয়ে কুসীকেই একটু চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করে, মাঝে-মাঝেই চেঁচিয়ে ওঠে, এই কুসী-ই, এই হারামজাদী, কোথায় গেলি রে? কুসীর সাড়া না পেলে হাতের কাছে অন্য যে ছেলেমেয়ে থাকে তাকেই বলে—ওরে ছ্যাখ না, সে আবাগীর বেটি কোথায় গেল? যা না মুখপোড়া!

কুসী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে, তখন থেকে অত চেল্লাচ্ছো কেন? এই তো ভ্যাইপি রোডে ড'াড়িয়েছিলুম।

কুসীর মা অঙ্গভঙ্গি করে বলে, চেল্লাবো না কি কেত্তন গাইব? আসুক আজ তোর বাপ্—অত ভ্যাইপি রোডে তোর যাবার দরকার কি না? আমি বুঝি না কিছু? শাড়ি পরেছে ছ্যাখো না—মাই-টাই সব বেইরে পড়েছে, এত বড়ো ধিঙ্গি মেয়ে—

কুসী আঁচল টেনেটুনে বলে, একটা তো জামা কিনে দিলে না। সবাই জামা পরে—

—জামা কিনে দেব না ঝ্যাঁটা দেব! ন্যাংটো করে রাখি নি এই ঢের, বলে পেটে ভাত জোটে না—আর গিলতেও পারে এক-এক জন।

দু-খানা গাড়ি থেমে আছে, চার-পাঁচজন ভদ্দরলোক হাত নেড়ে নেড়ে ওদের বাড়ির দিকে দেখিয়েই কি যেন বলছে। সুবলও সেখানে দাঁড়িয়ে। বগলা চোখ-দুটো বঁড়শির মতন তীক্ষ্ণ করে চেয়ে রইল। আবার বুঝি ছেলেটাকে লোভ দেখাতে এসেছে ড্যাকরারা। দাওয়ায় দাড়িয়ে বগলা চেঁচাতে লাগল, ও সোবল, সোবল, আবার কি কথা বলচিস?

সুবল গ্রাহ্য না ক'রে লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। লোকগুলো ভি. আই. পি. রোডের পাশ দিয়ে ছড়ছড় ক'রে অনেকখানি নেমে এল। খালের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল বাড়িটা। কুসী দাঁড়িয়েছিল ঠাকুমার পাশে—একটা লোক বারবার চোখ বুলোচ্ছে কুসীর শ্যাওলার মতন শরীরে। বগলা তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, ও সোবল, আগে শুনে যা, আগে

আমার কথা শুনে যা। আমি কিন্তু কুরুক্ষেত্তর করব ব'লে রাখচি—আমার ভাতার শ্বশুরের ভিটে—

সুবল মুখ ফিরিয়ে একবারমাত্র দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিল, আঃ, থামো না! নইলে জন্মের মতন চেঁচানি বন্ধ ক'রে দেব বলচি। সুবল আবার মনোযোগ দিয়ে লোকগুলোর কথা শুনতে লাগল।

বেশ খানিকটা বাদে সুবল প্রায় আনন্দে লাফাতে লাফাতে ফিরে এল। তার হাত ভর্তি টাকা। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে বগলার—তলার ঠোঁটটা কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে—সুবলের ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বলল, ওকি রে, কি ক'রে এলি? টিপসই দিয়ে এলি?

সুবল রহস্যময়ভাবে হেসে বলল, হ্যাঁ, দিলুম তো।

—অ্যাঁ? আমি মরার আগেই?

—ওকি ওকি, মাটিতে বসে পড়ছ কেন? আগে সবটা শোনো। মেয়েমানুষ একেই বলে। আগে থেকেই হেদিয়ে মরে! তোমায় তো কথা দিইচি তুমি মরার আগে বাড়ি বেচবো না। সহজে তো মরবেও না—গরিবের ঘরে মেয়েছেলেরাই বেশি বাঁচে।

—কি হয়েছে বল না? ও লোকগুলো এসেছিল কেন? টাকা দিল কেন?

—বাড়ি বেচি নি বাবা, বাড়ি বেচি নি! মুফৎসে তিরিশটা টাকা লাভ হয়ে গেল। ওরা এখানে একটা ছবি টাঙাবে—সেজন্য মাসে মাসে আমায় পৌয়েঁরো টাকা করে দেবে।

—ছবি টাঙাবে বলে টাকা দেবে? কি ছবি?

—কি ছবি তা কি জানি! সে যা হোক! বিজ্ঞাপন বলে একে।

—বিগ্‌গাপন আবার কি?

—বললুম তো ছবি!—মাস মাস পৌয়েঁরো টাকা—আজ শালা কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, ভগবান একেবারে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বললে, এই নে—দেখি যাই একবার নেতায়ের কাছে।

—মাস মাস দেবে!

সুবল দিলদরিয়া হয়ে হঠাৎ মাকে একটা সওয়া চার টাকা দামের কম্বল কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে! হারাণ দাবি জানায়—এবার তাকে কাগজ আর পেনসিল কিনে দিতেই হবে—নইলে ইসকুল থেকে নাম কাটিয়ে দেবে। সুবলের বউ বলে, হ্যাঁগা, কুসীর জন্য এবার একটা বেলাউজ কিনে দাও—গতরখানা তো

খুব হয়েছে। লোকে হ্যাংলার মতন তাকায়। হঠাৎ যেন মনে হল, মাসে পনেরো টাকা আয় বেড়ে যাওয়ায় সুবলের সংসারের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

তিন-চার দিন বাদেই ট্রাকে করে সব জিনিসপত্র এসে উপস্থিত হল। কয়েকটি প্যাণ্ট শার্ট পরা বেশ চটপটে ছোকরা ডোবার পাশ দিয়ে সুবলের বাড়িতে উপস্থিত হল। সুবলের বাড়ির দু-ধারে পোঁতা হল দুটো শক্ত লোহার পাল্লা। সুবলদের মাটির বাড়িতে বাঁশ আর শালবল্লার খুঁটি—এ-জমিতে এই প্রথম লোহা ঢুকল—তারপর সেই লোহা দুটোর মাথায় বসানো হল বিশাল একটা ছবি। বিমান কোম্পানির বিজ্ঞাপন। পুরো ছবিটাই সুন্দর মাদক নীল রঙের—ডানদিকের কোণে একটা উড়ন্ত বিমান, বাঁদিকে দূর শহরের দৃশ্য—মন্দিরের মতন বাড়ির চূড়া—মনে হয় দেবভূমি অমরাবতীর ছবি যেন, নীচে হাত ধরাধরি করে ছুটছে সাহেব মেম যুবক-যুবতী, মেমটির স্কার্ট উড়ে গেছে অনেকখানি, কি সুন্দর তার পা দুখানি, তার বুকের ডৌলও বড়ো মনোরম। ছবিটির মাঝখানে বড়ো বড়ো ইংরাজি অক্ষরে লেখা :

FLY *QUANTAS* TO THE WORLD

সুবলের বাড়ির এ-দিক থেকে ও-দিক পর্যন্ত জুড়ে সেই ছবি—ছোকরারা ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে সব ঠিক-ঠাক লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল। ছবিখানা এমনই ঝকঝকে রকমের নতুন এবং চোখজুড়ানো যে ছেলেমেয়েরা তো দূরের কথা, সুবলও অনেকক্ষণ সেদিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। তার বাড়ির শোভাই যেন বদলে গেছে। এখন ভ্যাইপি রোড দিয়ে যাবার সময় সবাই তার বাড়ির দিকে তাকাবে। ইস্, ছবিখানা কি, ঠিক যেন জ্যান্ত। ব্যাটাছেলেটার হাত ধরে মেমটা এইমাত্র যেন দৌড় শুরু করেছে, দৌড়োচ্ছে, এখনো দৌড়োচ্ছে। এরোপ্লেনটার গোঁ গোঁ শব্দ এক্ষুনি যেন শোনা যাবে! আর ঐ বাড়িগুলো? ঠিক যেন আকাশ ফাঁক হয়ে দৈবাৎ স্বর্গের একটা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। সুবল লোহার খুঁটি ভালো করে নেড়ে-চেড়ে দেখল—শক্ত করে পোঁতা হয়েছে কিনা। তারপর ছবির দিকে চেয়ে সে খুঁটির গায়ে আদর করে হাত বোলাতে লাগল। অতবড়ো ছবিতে বাড়ির পাশের তালগাছটাও যেন অনেকখানি চাপা পড়ে গেছে। তালগাছটার মাথায় দুটো শকুন বসে আছে। এ-শালাদের কিছুতেই তাড়ানো যাবে না! সুবল ঠিক করল, তালগাছটা না-হয় সে কেটেই ফেলবে। তা হলে কি এই ছবির ওপরেও শকুন বসবে! না-না। এইটুকু সময়েই ছবিটা যেন সুবলের নিজের সম্পত্তি হয়ে গেছে।

ছেলেমেয়েদের কাছে সেদিনটা একটা বিরাট উত্তেজনার দিন। কুসীও বারবার ঘুরে ঘুরে ছবিটার দিকে তাকাচ্ছে। এত ভালো লাগছে তার, সে বুঝতে পারছে না কি করবে, কাকে গিয়ে এ কথা বলবে। কি সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে, আর ছেলেটাও কি সুন্দর! সাহেব মেম অনেক দেখেছে কুসী। এ-রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়ি এয়ারপোর্ট যায় আসে—তাতে সাহেব মেম থাকে—কিন্তু এই ছবির মতন সুন্দর তারা কেউ নয়। ছেলেটার ঘাড় কি রকম চওড়া, আর মেয়েটার পা, মুখটা একেবারে গোলাপি গোলাপি টুসটুসে—ও-রকম জামার দাম অনেক, তা আর বলতে!

এ-বাড়িতে হারাণই সবেমাত্র লেখাপড়া শিখছে—আর কেউ ইংরিজি-বাংলা কিছুই পড়তে জানে না! মাঝখানে কি লেখা আছে কেউ বোঝে নি। হারাণই গম্ভীর ভাবে বানান করে পড়ল, এফ এল ওয়াই—ফ্লাই, ফ্লাই মানে মাছি! বাকি সবাই সমস্বরে বলল, যাঃ মাছি না হাতি! মাছি আবার কোথায়! হারাণ গম্ভীরভাবে বললে, লেখা আছে, আমি তার কি করব! হারাণের ছোটো ভাই নবু সবচেয়ে এঁচোড়ে পাকা—সে বলল, মা, ছাখ্ ছাখ্, মেয়েটার পোঁদ দেখা যাচ্ছে, হি-হি-হি—। কুসী অকারণে তাকে এক চড় কষাতেই তার মা খেঁকিয়ে উঠল, তুই এই ভর সন্ধেবেলা ছেলেটার গায়ে বিনা দোষে হাত তুললি যে বড়ো! তোর বড়ো বাড় বেড়েছে, না রে? তোর পিঠে আমি চ্যালা ভাঙব!

আজ বাড়িতে এ-রকম একটা দারুণ ব্যাপার হয়ে গেল, কুসী তাই আশা করেছিল সেই উপলক্ষে আজ রাত্রে ভাত রাঁধা হবে। তার মা সেদিক দিয়ে গেলই না। সুবল আনন্দ করার জন্য আজ তাড়ি খেতে চলে গেছে। কুসীকে আটা মাখতে বসতে হল। দুখানা দুখানা করে রুটিতে পেটও ভরে না—খিদে আরো বাড়িয়ে দেয়, তার থেকে ভাত এক গেরাস খেলেও শান্তি। রান্নাঘরের দোরের কাছে বসে কুসী আটা মাখছে, ঝুপ্‌ঝুপ্ করে নেমে আসছে অন্ধকার, কট্ কট্ করে ব্যাঙ ডাকছে, একটা ব্যাঙের ডাক ঠিক ছোটো ছেলের কান্নার মতন ট্যাঁ ট্যাঁ—ওটাকে নিশ্চয়ই সাপে ধরেছে। এই বর্ষাকালটায় ঢোঁড়া সাপের বড্ড উপদ্রব এদিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে কুসী দেখল এখন আর অন্ধকারে ছবিটা দেখা যায় না—তালগাছের মাথায় শোনা যায় শকুনের ডানার ঝটপটানি।

কাঠবিড়ালির ডাকের মতন একটা সরু শিসের শব্দ হতেই কুসী চঞ্চল হয়ে উঠল। চোখ তীক্ষ্ণ করে রাস্তার দিকে তাকাল। তাড়াতাড়ি হাত ডলে ডলে আটাগুলো পরিষ্কার করে বলল, ঠাকুমা, আমি আটা মেখে তো রেখেচি, তুই রুটিগুলো বেলে দেনা রে!

রান্নাঘর থেকে মা ঝংকার দিয়ে উঠল, কেন, তুই কোথায় যাবি ?

—আমি একটু আসছি।

—আসচিস মানে ? এই রাত্তিরে যাবি কোথায় ?

কুসীও ঝংকার দিতে জানে। সেও ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, বাবারে বাবা, একটু পাইখানাতেও যেতে পারব না !

বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঘুরে কুসী চুপি চুপি ভি. আই. পি. রোডে চলে এল। সাট্ সাট্ করে গাড়ি যাচ্ছে, কুসী চট্ করে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল ওপাশে, তার পর রাস্তার ধার দিয়ে নেমে ঢালু জায়গাটা পেরিয়ে জলের পাড় ঘেঁষে একটা আসশ্যাওড়া ঝোপের পাশে চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে তার শক্ত জোয়ান হাতে কুসীকে কোলে টেনে নিল। একটা ঠোঙা কুসীর মুখের কাছে এগিয়ে ধরে বলল, এই নে, তোর জন্যে এনেছি। তুই তো আলুর চপ ভালোবাসিস !

বাড়ির সবার কাছ থেকে সারাদিন লাথি-ঝাঁটা খাচ্ছে কুসী, উপরন্তু খাবার যা পায় তাতে তার একটুও পেট ভরে না। সারাক্ষণ খিদে থাকে। এই একজন, তাকে শুধু আদর করে, তাকে কত ভালো ভালো জিনিস খেতে দেয়। টাবু এর নাম। সাইকেলের কারখানায় ফিটারের কাজ করে। তেলেভাজা আলুর চপ বেগুনিগুলো কুসী হাম হাম করে খেতে লাগল। আর সেই ফাঁকে ওর আঁচলের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে টাবু ওর কচি স্তন দুটো ডলতে লাগল। খানিকটা খাওয়া হলে তারপর কুসী বলল, টাবুদা, তুমি খাবে না ? এই ইঃ, মাইরি, যা সুড়সুড়ি লাগছে, হি-হি-হি—

—চুপ চুপ, চ্যাচাস নি।

—ওখানে না, ওখানে না, তা হলে কিন্তু আমি সত্যি চেঁচাব।

—আচ্ছা আচ্ছা, পাগ্লি একটা।

কুসীর উরুর তলা থেকে হাত সরিয়ে এনে টাবু সেই হাত কুসীর নিতম্বে রাখলো দু'-এক মুহূর্ত, তার পর সেই হাত আবার ইতিউতি যাত্রা করল। শরীর মুচড়ে ছটফটিয়ে কুসী মাটিতে শুয়ে পড়তেই পাশাপাশি শুয়ে পড়ল টাবু।

ঢালু জমিতে অন্ধকারে দুজনে শোওয়া—বেশ খানিকটা ওপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে অনবরত। ওদের কেউ দেখছে না। কুসী ফিসফিস ক'রে বলল, জানো, আজ আমাদের বাড়িতে একটা ছবি টাঙিয়েছে—

—কি ছবি ?

—তুমি ছাখো নি ? উরেঃ সাবাস—এত সুন্দর না—না দেখলে বিশ্বাস হবে না, এখন অন্ধকার, কাল দিনের বেলা এসো—

হঠাৎ উত্তেজনায় কুসী দারুণ ভয় পাওয়ার মতন চম্‌কে গেল। যেন সে একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখেছে। ফ্লুরোসেণ্ট রঙে আঁকা তাদের বাড়ির বিজ্ঞাপনটায় কোনো চলন্ত মোটরগাড়ির হেডলাইটের আলো পড়তেই সমস্ত দৃশ্যটা একবার ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠল, আলো সরে যেতেই আবার অদৃশ্য। কুসী বলল, দেখেছ? দেখেছ? ছাখো নি?

—কি? কি দেখব? তুই আস্তে কথা বল্ না—কোন্ শালা আবার—

—ঐযে, ঐযে ছাখো, আমাদের বাড়িতে—আবার আলো পড়তেই আবার দৃশ্যটা ফুটে ওঠে। টাবু সেটা দেখতে পেয়ে বলে, ও, অ্যাডভার্টাইজ।

—তার মানে কি?

—কবে টাঙালো? বেশ সুন্দর তো!

—সুন্দর না! দেখতে পেয়েছ—ছেলেটা আর মেয়েটা—

এক-একটা গাড়ির আলো পড়ছে—আর আলোতে ছবিটা দেখার জন্য কুসী প্রত্যেকবার উন্মুখ হয়ে ওঠে। টাবুর ব্যস্ত হাত তার শরীরের নানা জায়গায় ঘুরছে—সে আর বাধা দিচ্ছে না। টাবু তার মুখের কাছে মুখ আনতেই তড়বড়ানিতে দাঁতে লেগে ঠোঁট কেটে যায়। জিভ দিয়ে নোন্‌তা রক্ত চুষতে চুষতে কুসী বলে, টাবুদা, ঐ ছেলেটা-মেয়েটা ছুটছে কেন?

—এরোপ্লেনে উঠবে ব'লে। তুই একটু পাশ ফের্, এই হ্যাঁ, ঠিক আছে।

—এরোপ্লেনে উঠে ওরা বুঝি ঐ বাড়িগুলো যেখানে—সেখানে যাবে?

—হ্যাঁ। উম্-ম্-ম্—

—ঐ জায়গাটা কোথায়?

—কে জানে? লণ্ডন হবে বোধ হয়—মানে বিলেত।

—ও ছবিটা আমাদের বাড়িতে টাঙাল্লো কেন?

—চুপ কর না, উঃ তোকে এত ভালোবাসি আমি মাইরি, সত্যি, উম্-ম্, সোনা সোনা, কাল তোকে মাংসের কাটলেট খাওয়াবো।

—ওদের দুজনের মুখ দুটো কি সুন্দর, না? বলো? শরীরময় অনির্বচনীয় পুলক নিয়েও কুসী বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকারে হঠাৎ-হঠাৎ ঝলসে-ওঠা সেই ছবিটার দিকে চেয়ে থাকে।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

সেই গোয়ালন্দ-চাঁদপুরী জাহাজ। ত্রিশ বৎসর ধরে এর সঙ্গে আমার চেনাশোনা। চোখ বন্ধ করে দিলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক বের করতে পারব, কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান, মুর্গীর খাঁচাগুলো রাখা হয় কোন্ জায়গায়। অথচ আমি জাহাজের খালাসী নই—অবরের-সবরের যাত্রী মাত্র।

ত্রিশ বৎসর পরিচয়ের আমার আর সবই বদলে গিয়েছে, বদলায় নি শুধু ডিসপ্যাচ স্টিমারের দল। এ-জাহাজের ও-জাহাজের ডেকে-কেবিনে কিছু কিছু ফেরফার সব সময়ই ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সব কটা জাহাজের গন্ধটি হুবহু একই। কীরকম ভেজা-ভেজা, সোঁদা-সোঁদা যে গন্ধটা আর সব-কিছু ছাপিয়ে ওঠে, সেটা মুর্গী-কারী রান্নার। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা আস্ত মুর্গী, তার পেটের ভেতর থেকে যেন তারই কারি রান্না আরম্ভ হয়েছে। এ-গন্ধ তাই চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, যে কোন স্টেশনে পৌছানো মাত্রই পাওয়া যায়। পুরনো দিনের রূপরসগন্ধস্পর্শ সবই রয়েছে, শুধু লক্ষ্য করলুম ভীড় আগের চেয়ে কম।

দ্বিপ্রহরের পরিপাটি আহারাদি করে ডেকচেয়ারে শুয়ে দূর-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না, যতক্ষণ না রবি ঠাকুর সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই আমি চাঁদের আলোর চেয়ে পছন্দ করি গ্রামোফোনের বাক্স। পোর্টেবলটা আনব আনব করছি, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা মর্দিতা 'দেশ'—মালিক না আসা পর্যন্ত তিনি যদি পরহস্তে কিঞ্চিৎ 'ভ্রষ্টা'ও হয়ে যান, তা হলেও তাঁর 'স্বামী' বিশেষ বিরক্ত হবেন না নিশ্চয়ই।

'রূপদর্শী' ছদ্মনাম নিয়ে এক নতুন লেখক খালাসীদের সম্বন্ধে একটি দরদ-ভরা লেখা ছেড়েছে। ছোকরার পেটে এলেম আছে, নইলে অতখানি কথা গুছিয়ে লিখল কী করে, আর এত সব কেচ্ছা-কাহিনীই বা যোগাড় করল কোথা থেকে? আমি তো একখানা ছুটির আর্জি লিখতে গেলেই হিমসিম খেয়ে যাই। কিন্তু লোকটা যা সব লিখেছে, এর কি সবই সত্যি? এতবড় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে খালাসীরা লড়াই দেয় না কেন? হুঁঃ! এ আবার একটা কথা হল! সিলেট নোয়াখালির আনাড়ীরা দেবে ঘুঘু ইংরেজের সঙ্গে লড়াই—আমিও যেমন!

জাহাজের মেজো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি। সিল্কের লুঙ্গি, চিকনের কুর্তা আর মুগার কাজ-করা কিস্তি-টুপি পরে ডেকের ওপর টহল দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছেও। ডিসপ্যাচের পুঁটি ও মানওয়ারির তিমি দুই-ই মাছ—একেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, 'রূপদর্শী' দর্শন করেছে কতটুকু আর কল্পনায় বুনেছে কতখানি!

একটুখানি গলা খাঁকারি দিয়ে শুধালুম, 'ও সারেঙ সাহেব, জাহাজ লেট যাচ্ছে না তো?'

লোকটা উত্তর দিয়ে সবিনয়ে বলল, 'আমাকে "আপনি" বলবেন না সাহেব। আমি আপনাকে দু-একবারের বেশী দেখি নি, কিন্তু আপনার আব্বা সাহেব, বড় ভাই সাহেবেরা এ-গরিবকে মেহেরবানি করেন।'

খুশী হয়ে বললুম, 'তোমার বাড়ি কোথায়? বস—না, তার ফুরসত নেই?'

ধপ করে ডেকের উপর বসে পড়ল।

আমি বললুম, 'সে কী? একটা টুল নিয়ে এসো। এসব আর আজকাল—' কথাটি শেষ করলুম না, সারেঙও টুল আনল না। তারপর আলাপ পরিচয় হল। দ্যাশের লোক—সুখ-দুঃখের কথা অবশ্যই বাদ পড়ল না। শেষটায় মোকা পেয়ে 'রূপদর্শী-দর্শন' তাকে আগাগোড়া পড়ে শোনালুম। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার জাতভাই চাষারা যেরকম পুঁথিপড়া শোনে, সে রকম আগাগোড়া শুনল, তারপর খুব লম্বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

আল্লাতালার উদ্দেশ্যে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'ইনসাফের (ন্যায়ধর্মের) কথা তুললেন, হুজুর, কিন্তু এ-দুনিয়ায় ইনসাফ কোথায়? আর বে-ইনসাফি তো তারাই করেছে বেশী, যাদের খুদা ধনদৌলত দিয়েছেন বিস্তর। খুদাতালাই কার জন্যে কী ইনসাফ রাখেন, তাই বা বুঝিয়ে বলবে কে? আপনি সমীরুদ্দীকে চিনতেন, বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছিল, অনেক টাকা কামিয়েছিল!'

আমেরিকার কথায় মনে পড়ল। 'চৌতলি পরগণায় বাড়ি, না, যেন ওই দিকেই কোন্‌খানে।'

সারেঙ বললে, 'আমারই গাঁ ধলাইছড়ার লোক। বিদেশে সে যা টাকা কামিয়েছিল, ওরকম কামিয়েছে অল্প লোকই। আমরা খিদিরপুরে সইন (sign) করে জাহাজের কামে ঢুকেছিলাম—একই দিন একই সঙ্গে।'

আমি শুধালুম, 'কী হল তার ? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

সারেঙ বললে, 'শুনুন।'

'যে লেখাটি হুজুর পড়ে শোনালেন, তার সব কথাই অতিশয় হক। কিন্তু জাহাজের কাজে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে যে কী জান-মারা খাটুনি তার খবর কেউ কখনও দিতে পারবে না, যে সে-জাহান্নামের ভিতর দিয়ে কখনও যায় নি। বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে যে-লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়লা ঢালে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে কী রকম ঘাম ঝরে দেখেছেন—এই জাহাজেই যার দু দিক খোলা, পদ্মার জোর বাতাসের বেশ খানিকটা যেখানে স্বচ্ছন্দে আনাগোনা করতে পারে। এ তো বেহেশ্‌ৎ। আর দরিয়ার জাহাজের গর্ভের নীচে যেখানে এঞ্জিন-ঘর, তার সব দিক বন্ধ, তাতে কখনও হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। সেই দশ বারো চোদ্দ হাজার-টনী ডাঙর ডাঙর জাহাজের বয়লারের আকারটা কত বড় হয় এবং সেই কারণে গরমিটার বহর কতখানি, সে কি বাইরের থেকে কখনও অনুমান করা যায় ? খাল বিল নদীর খোলা হাওয়ার বাচ্চা আমরা—হঠাৎ একদিন দেখি, সেই জাহান্নামের মাঝখানে, কালো-কালো বিরাট-বিরাট শয়তানের মত কলকব্জা, লোহালক্কড়ের মুখোমুখি।

'পয়লা পয়লা কামে নেমে সবাই ভিমরি যায়। তাদের তখন উপরে টেনে জলের কলের নীচে শুইয়ে দেওয়া হয়, হুঁশ ফিরলে পর মুঠো মুঠো নুন গেলান হয়, গায়ের ঘাম দিয়ে সব নুন বেরিয়ে যায় বলে মানুষ তখন আর বাঁচতে পারে না।

'কিংবা দেখবেন কয়লা ঢেলে যাচ্ছে বয়লারে ঠিক ঠিক, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, বেলচা ফেলে ছুটে চলেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে, খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। অসহ্য গরমে মাথা বিগড়ে গিয়েছে, জাহাজী বুলিতে একেই বলে "এমখ"—'

আমি শুধালুম, 'একেই কি ইংরাজীতে বলে এমাক্‌ (amuck) ? কিন্তু তখন তো মানুষ খুন করে!'

সারেঙ বললে, 'জী হাঁ। তখন বাধা দিতে গেলে হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে খুন করতে আসে।' তারপর একটু থেমে সারেঙ বললে, 'আমাদের

সকলেরই দু-একবার হয়েছে, আর সবাই জাবড়ে ধরে চুবিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করেছে—শুধু সমীরুদ্দী কখখনো একবারের তরেও কাতর হয় নি। তাকে আপনি দেখেছেন, সায়েব? বাং মাছের মত ছিল তার শরীর, অথচ হাত দিয়ে টিপলে মনে হত কচ্ছপের খোল। জাহাজের চীনা বাবুর্চীর ওজন ছিল তিন মনের কাছাকাছি—তাকে সে এক থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারত। লাঠি খেলে খেলে তার হাতে জমেছিল বাঘের থাবার তাগদ। কিন্তু সে যে ভিরমি যায় নি, "এমুখ" হয় নি, তার কারণ তার শরীরের জোর নয়—দিলের হিম্মৎ—সে মন বেঁধেছিল, যে করেই হোক পয়সা সে কামাবেই কামাবে, ভিরমি গেলে চলবে না, বিমারি পাকড়ানো সখ্‌ৎ মানা।'

সারেঙ বললে, 'কী বেহদ তকলীফে জানপানি হয়ে যে কুলুম শহর পৌছলাম—'

আমি শুধালাম 'সে আবার কোথায়?'

বললে, 'বাংলায় যারে লঙ্কা কয়।'

আমি বললুম, 'ও, কলম্বো।'

'জী। আমাদের উচ্চারণ তো আপনাদের মত ঠিক হয় না। আমরা বলি কুলুম শহর। সেখানে ডাঙায় বেড়াবার জন্য আমাদের নামতে দিল বটে, কিন্তু যারা পয়লা বার জাহাজে বেরিয়েছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, পাছে জাহাজের অসহ্য কষ্ট এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়। সমীরুদ্দী বন্দরে নামলেই না। বললে, নামলেই তো বাজে খরচা। আর সে-কথা ঠিকও বটে, হুজুর, খালাসীরা কাঁচা পয়সা বন্দরে বন্দরে যা ওড়ায়! যে জীবনে কখনও পাঁচ টাকার নোট দেখে নি, আধুলির বেশী কামায় নি, তার হাতে পনের টাকা। সে তখন কাগের বাচ্চা কেনে।

'আমরা পেট ভরে যা খুশি তাই খেলাম। বিশেষ করে শাক-সবজি। জাহাজে খালাসীদের কপালে ও-জিনিস কম। নেই বললেও হয়—দেশে যার ছড়াছড়ি।

'তারপর কুলুম থেকে আদম বন্দর।'

আমার আর ইংরিজী 'এইডন' বলার দরকার হল না।

'তারপর লাল-দরিয়া পেরিয়ে সুসোর খাড়ি—দু দিকে ধু-ধু মরুভূমি, বালু আর বালু, মাঝখানে ছোট্ট একটা খাল।'

বুঝলুম 'সুসোর খাড়ি' মানে সুয়েজ কানাল।

'তারপর পুর্স'ই। সেখানে খালের শেষ। বাড়িয়া বন্দর। আমরা শাক-সবজি খেতে নামলাম সেখানে। ঝামুরা গেল খারাপ জায়গায়।'

পোর্ট সঈদের গণিকালয় যে বিশ্ববিখ্যাত, দেখলুম, সারেঙের পো সে-খবরটি রাখে।

'পুর্সই থেকে মার্সই, মার্সই থেকে হামবুর—হামবুর জর্মনির মুলুকে।'

ততক্ষণে সিলেটী উচ্চারণে বিদেশী শব্দ কী ধ্বনি নেয়, তার খানিকটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে, তাই বুঝলুম, মারসেইলজ, হামবুর্গের কথা হচ্ছে। আর এটাও লক্ষ্য করলুম যে, সারেঙ বন্দরগুলোর নাম সোজা ফরাসী-জর্মন থেকে শুনে শিখেছে, তারা যে-রকম উচ্চারণ করে, ইংরিজীর বিকৃত উচ্চারণের মারফতে নয়।

সারেঙ বলল, 'হামবুর্গে সব মাল নেমে গেল। সেখান থেকে আবার মাল গাদাই করে আমরা দরিয়া পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌছলাম নুউক বন্দরে—মিরকিন মুলুকে।

'নয়া ঝুনা কোন খালাসীকেই নুউক বন্দরে নামতে দেয় না। বড় কড়াকড়ি সেখানে। আর হবেই বা না কেন? মার্কিন মুলুক সোনার দেশ। আমাদের মত চাষাভূষাও সেখানে মাসে পাঁচ-সাত শো টাকা কামাতে পারে। আমাদের চেয়েও কালা, একদম মিশকালা আদমীও সেখানে তার চেয়েও বেশী কামায়। খালাসীদের নামতে দিলে সব কটা ভেগে দিয়ে তামাম মুলুকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণ ভরে টাকা কামাবে। তাতে নাকি মার্কিন মজুরদের জবর লোকসান হয়। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দী।

'নুউক পৌছবার তিন দিন আগে থেকে সমীরুদ্দীর করল শক্ত পেটের অসুখ। আমরা আর পাঁচজন ব্যামোর ভান করে হামেশাই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমীরুদ্দী এক ঘণ্টার তরেও কোন প্রকারের গাফিলি করে নি বলে ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকবার হুকুম দিলে।

'নুইক পৌছবার দিন সন্ধেবেলা সমীরুদ্দী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কসম-কিরে খাইয়ে কানে কানে বললে, সে জাহাজ থেকে পালাবে। তারপর কী কৌশলে সে পারে পৌছবে, তার ব্যবস্থা সে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে বললে।

'বিশ্বাস করবেন না সায়েব, কী রকম নিখুঁত ব্যবস্থা সে কত ভেবে তৈরী করেছিল। কলকাতার চোরা-বাজার থেকে সে কিনে এনেছিল একটা খাসা নীল রঙের সুট, শার্ট, টাইকলার, জুতা, মোজা।

'আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেগচি যোগাড় করে দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমীরুদ্দী সাঁতারের জাঙিয়া পরে নামল জাহাজের উলটো ধার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেগচির ভিতরে তার সুট জুতো মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেগচি ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ-মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ডাঙায়। পাড়ে উঠে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জাঙিয়া ডেগচি জলে ডুবিয়ে দিয়ে সে শিস দিতে দিতে চলে যাবে শহরের ভিতর। সেখানে

আমাদেরই এক সিলেটী ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর থেকে। পুলিসের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কয়েকদিন, তারপর দাড়িগোঁফ কামিয়ে চলে যাবে নুউক থেকে বহুদূরে, যেখানে সিলেটীরা কাঁচা পয়সা কামায়। পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার যে কোন ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার সুটটি পরে রাস্তায় নামতে পারলে পুলিশ দেখলেও ভাববে, সে নুউকবাসিন্দা, সমুদ্রপারে এসেছিল হাওয়া খেতে।

'পেলেনটা ঠিক উতরে গেল, সায়েব। সমীরুদ্দীর জন্য খোঁজ্-খোঁজ্ রব উঠল পরের দিন দুপুরবেলা। ততক্ষণে চিড়িয়া যে শুধু উড় গিয়া তা নয়, সে বনের ভিতর বিলকুল উধাও। একদম না-পাত্তা। বরঞ্চ বনের ভিতর পাখিকে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নুউক শহরের ভিতর সমীরুদ্দীকে খুঁজে পাবে কোন্ পুলিশের গোঁসাই ?'

গল্প বলায় ক্ষান্ত দিয়ে সারেঙ গেল জোহরের নমাজ পড়তে। ফিরে এসে ভূমিকা না দিয়েই সারেঙ বললে, 'তারপর হুজুর, আমি পুরো সাত বচ্ছর জাহাজে কাটাই। দু-পাঁচবার খিদিরপুরে নেমেছি বটে, কিন্তু দেশে যাবার আর ফুরসত হয়ে ওঠে নি। আর কী-ই বা হত গিয়ে, বাপ-মা মরে গিয়েছে, বউ-বিবিও তখন ছিল না। যতদিন বেঁচে ছিল, বাপকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম—বুড়া শেষের ক বছর সুখেই কাটিয়েছে—খুদাতালার শুকুর—বুড়ী নাকি আমার জন্য কাঁদত। তা হুজুর দরিয়ার অথৈ নোনা পানি যাকে কাতর করতে পারে না, বাড়ির দু ফোঁটা নোনা জল তার আর কী করতে পারে বলুন!'

বলল বটে হক কথা, তবু সারেঙের চোখেও এক ফোঁটা নোনা জল দেখা দিল।

সারেঙ বললে, 'যাক সে কথা। এ সাত বছর মাঝে মাঝে এর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে খবর কিংবা গুজব, যাই বলুন, শুনেছি, সমীরুদ্দী বহুত পয়সা কামিয়েছে, দেশেও নাকি টাকা পাঠায়, তবে সে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরকিন মুলুকে, দেশে ফেরার কোন মতলব নেই। তাই নিয়ে আমি আফসোস করি নি, কারণ খুদাতালা যে কার জন্য কোন্ মুলুকে দানাপানি রাখেন, তার হদিস বাতলাবে কে ?

'তারপর কল-ঘরের তেলে-পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেল আমার পায়ের হাড্ডি। বড় জাহাজের কাম ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসে ঢুকলাম ডিসপ্যাচের কামে। এ-জাহাজে আসার দুদিন পরে, একদিন খুব ভোরবেলা ফজরের

নমাজের ওজু করতে যাচ্ছি, এমন সময় তাজ্জব মেনে দেখি, ডেকে বসে রয়েছে সমীরুদ্দী! বুকে জাবড়ে ধরে তাকে বললাম, ভাই সমীরুদ্দী! এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল, সমীরুদ্দীকে এককালে আমি আপন ভাইয়ের মতন কতই না প্যার করেছি।

'কিন্তু তাকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চেয়েও বেশী তাজ্জব লাগল আমার, সে আমার প্যারে কোন সাড়া দিল না বলে। গাঙের দিকে মুখ করে পাথরের পুতুলের মত বসে রইল সে। শুধালাম, "তোর দেশে ফেরার খবর তো আমি পাই নি। আবার এ জাহাজে করে চলেছিস তুই কোথায়? কলকাতা? কেন? দেশে মন টিঁকল না?"

'কোন কথা কয় না। ফকির-দরবেশের মত বসে রইল ঠায়, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, যেন আমাকে দেখতেই পায় নি।

'বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। তখনকার মত তাকে আর কথা কওয়াবার চেষ্টা না করে, ঠেলেঠুলে কোন গতিকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার কেবিনে। নাশতার পেলেট সামনে ধরলাম, আণ্ডা ভাজা ও পরটা দিয়ে সাজিয়ে—ওই খেতে সে বড় ভালবাসত—কিচ্ছু মুখে দিতে চায় না। তবু জোর করে গেলালাম, বাচ্চাহারা মাকে মানুষ যে-রকম মুখে খাবার ঠেসে দেয়, কিন্তু হুজুর, পরের জন্য অনেক কিছু করা যায়, জানতক কুরবানি দিয়ে তাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু পরের জন্য খাবার গিলি কী করে?

'সেদিন দুপুরবেলা তাকে কিছুতেই গোয়ালন্দে নামতে দিলাম না। আমার, হুজুর, মনে পড়ে গেল বহু বৎসরের পুরনো কথা—হুউক বন্দরেও আমাদের যখন নামতে দেয় নি, তখন সমীরুদ্দী সেখানেই গায়েব হয়েছিল।

'রাত্রের অন্ধকারে সমীরুদ্দীর মুখ ফুটল।

'হঠাৎ নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করল, কী ঘটেছে।'

সারেঙ দম নেবার জন্য না অন্য কোন কারণে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বুঝতে পারলুম না। আমিও কোন খোঁচা দিলুম না। বললে, 'তার সে দুঃখের কাহিনী—ঠিক ঠিক বলি কী করে সায়েব? এখনও মনে আছে, কেবিনের ঘোরঘুট্টি অন্ধকারে সে আমাকে সব-কিছু বলেছিল। এক-একটা কথা যেন সে অন্ধকার ফুটো করে আমার কানে এসে বিঁধেছিল, আর অতি অল্প কথায়ই সে সব-কিছু সেরে দিয়েছিল।

'সাত বছরে সে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল দেশে তার ছোট ভাইকে।

বিশ হাজার টাকা কতখানি হয়, তা আমি জানি নে, একসঙ্গে কখনও চোখে দেখি নি—'

আমি বললুম, 'আমিও জানি নে, আমিও দেখি নি।'

'তবেই বুঝুন হুজুর, সে-টাকা কামাতে হলে কটা জান কুরবানি দিতে হয়।

'প্রথম পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে ভাইকে লিখলে, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে বাড়ি ছাড়াতে। তার পরের হাজার দেড়েক বাড়ির পাশের পতিত জমি কেনার জন্য। তারপর আরও অনেক টাকা দিঘি খোদাবার জন্য, তারপর আরও বহুত টাকা শহুরী ঢঙে পাকা চুনকামকরা, দেয়াল-ওলা টাইলের চারখানা বড় ঘরের জন্য, আরও টাকা ধানের জমি, বলদ, গাই, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ির পিছনে মেয়েদের পুকুর, এসব করার জন্য এবং সর্বশেষে হাজার পাঁচেক টাকা টঙিঘরের উল্টোদিকে দিঘির এপারে পাকা মসজিদ বানাবার জন্য।

'সাত বচ্ছর ধরে সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে, অসুরের মত খেটে, দু শিফ্‌ট্ আড়াই শিফ্‌টে গতর খাটিয়ে জান পানি করে পয়সা কামিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কড়ি হালালের রোজকার, আর আপন খাই-খরচার জন্য সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরকিন মুলুকের ভিখারীরও দিন গুজরান হয় না।

'সব পয়সা সে ঢেলে দিয়েছে বাড়ি বানাবার জন্য, জমি কেনার জন্য। মিরকিন মুলুকের মানুষ যে-রকম চাষবাসের খামার করে, আর ভদ্রলোকের মত ফ্যাশানের বাড়িতে থাকে, সে দেশে ফিরে সেই রকম করবে বলে।

'ওদিকে ভাই প্রতি চিঠিতে লিখেছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে—করে করে যেদিন সে খবর পেল মসজিদ তৈরী শেষ হয়েছে, সেদিন রওয়ানা দিল দেশের দিকে। নুউক বন্দরে জাহাজে কাজ পায় আনাড়ী কালা আদমিও বিনা তকলিফে। তার ওপর সমীরুদ্দী হরেক রকম কারখানার কাজ করে করে কলকব্জা এমনি ভাল শিখে গিয়েছিল যে, তারই সার্টিফিকেটের জোরে, জাহাজে আরামের চাকরি করে ফিরল খিদিরপুর। সন্ধ্যের সময় জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে গেল শেয়ালদা। সেখানে প্লাটফর্মে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে চাটগাঁ মেল ধরে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পৌঁছল রাত তিনটেয়। সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা দিল ধলাইছড়ার দিকে—আট মাইল রাস্তা, ভোর হতে না হতেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।

'রাস্তা থেকে পোয়াটাক মাইল ধানখেত, তারপর ধলাইছড়া গ্রাম। আলের উপর দিয়ে গ্রামে পৌঁছতে হয়।

'বিহানের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সমীরুদ্দী পৌঁছল ধানখেতের মাঝখানে।

'মসজিদের একটা উঁচু মিনার থাকার কথা ছিল—কারণ মসজিদের নকশাটা সমীরুদ্দীকে করে দিয়েছিলেন এক মিশরী ইঞ্জিনিয়ার, আর হুজুরও মিশর মুলুকে বহুকাল কাটিয়েছেন, তাদের মসজিদে মিনারের বাহার হুজুর দেখেছেন, আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।

'কত দুর-দরাজ থেকে সে-মিনার দেখা যায়, সে আপনি জানেন, আমিও জানি, সমীরুদ্দীও জানে।

'মিনার না দেখতে পেয়ে সমীরুদ্দী আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে দেখে—কোথায় দিঘি, কোথায় টাইলের টঙিঘর!'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, 'সে কী কথা!'

সারেঙ যেন আমার প্রশ্ন শুনতেই পায় নি। আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর, আরও পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ি ছেড়েছিল, সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের ঠেকনায় খাড়া, আজ দেখে ছটা ঠেকনা। তবে কি ছোট ভাই বাড়ি-ঘরদোর গাঁয়ের অন্য দিকে বানিয়েছে? কই, তা হলে তো নিশ্চয়ই সে-কথা কোন-না-কোন চিঠিতে লিখত। এমন সময় দেখে গাঁয়ের বাসিত মোল্লা। মোল্লাজী আমাদের সবাইকে বড্ড প্যার করেন। সমীরুদ্দীকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

'প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চান নি। পরে সমীরুদ্দীর চাপে পড়ে সেই ধানখেতের মধ্যিখানে তাকে খবরটা দিলেন। তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে। গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, মৌলবীবাজারে, শেষের দিকে কলকাতায়—ঘোড়া, মেয়েমানুষ আরও কত কী।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'বল কী সারেঙ! এ-রকম ঘা মানুষ কি সইতে পারে? কিন্তু বল দিকিন, গাঁয়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন?'

সারেঙ বললে, 'তারাই বা জানবে কী করে, সমীরুদ্দী কেন টাকা পাঠাচ্ছে। সমীরুদ্দীর ভাই ওদের বলেছে, বড় ভাই বিদেশে লাখ লাখ টাকা কামায়, আমাকে ফুর্তি-ফার্তির জন্য তারই কিছুটা পাঠায়। সমীরুদ্দীর চিঠিও সে কাউকে দিয়ে পড়ায় নি—সমীরুদ্দী নিজে আমারই মত লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হারামজাদা ভাইটাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তবু মোল্লাজী আর গাঁয়ের পাঁচজন তার টাকা ওড়াবার বহর দেখে তাকে বাড়ি-ঘরদোর বাঁধতে, জমি-খামার কিনতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে নাকি উত্তরে বলেছিল, বড় ভাই বিয়ে শাদি

করে মিরকিন মুলুকে গেরস্থালী পেতেছে, এ দেশে আর ফিরবে না, আর যদি ফেরেই বা, সঙ্গে নিয়ে আসবে লাখ টাকা। তিন দিনের ভিতর দশখানা বাড়ি হাঁকিয়ে দেবে।'

আমি বললুম, 'উঃ! কী পাষণ্ড! তারপর?'

সারেঙ বললে, 'সমীরুদ্দী আর গাঁয়ের ভিতর ঢোকে নি। সেই ধানখেত থেকে উঠে ফিরে গেল আবার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে। সমীরুদ্দী আমাকে বলে নি কিন্তু মোল্লাজী নিশ্চয়ই তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপিড়ি করেছিলেন, কিন্তু সে ফেরে নি। শুধু বলেছিল, যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।

'কলকাতার গাড়ি সেই রাত আটটায়। মোল্লাজী আর গাঁয়ের মুরুব্বীরা তার ভাইকে নিয়ে এলেন স্টেশনে—টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে গাঁয়েই ছিল। সমীরুদ্দীর দু পা জড়িয়ে ধরে সে মাপ চেয়ে তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে। আরও পাঁচজন বললেন, বাড়ি চল্, ফের মিরকিন যাবি তো যাবি, কিন্তু এতদিন পরে দেশে এসেছিস, দুদিন জিরিয়ে যা।'

আমি বললুম, 'রাস্কেলটা কোন্ মুখ নিয়ে ভাইয়ের কাছে এল সারেঙ?'

সারেঙ বললে, 'আমিও তাই পুছি। কিন্তু জানেন সায়েব, সমীরুদ্দী কী করলে? ভাইকে লাথি মারলে না, কিছু না, শুধু বললে, সে বাড়ি ফিরে যাবে না।

'তার পরদিন ভোরবেলা এই জাহাজে তার সঙ্গে দেখা। আপনাকে তো বলেছি, শা-বন্দরের বারুণীর পুতুলের মত চুপ করে বসে।'

দম নিয়ে সারেঙ বললে, 'অতি অল্প কথায় সমীরুদ্দী আমাকে সব-কিছু বলেছিল। কিন্তু হুজুর, শেষটায় সে যা আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছিল, তার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তবে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল, "ভিখিরী স্বপ্নে দেখে, সে বড়লোক হয়ে গিয়েছে, তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার দুনিয়ায়। আমি দেশে টাকা পাঠিয়ে বাড়ি-ঘরদোর বানিয়ে হয়েছিলাম বড়লোক, সেই দুনিয়া যখন ভেঙে গেল তখন আমি গেলাম কোথায়?" '

বাস্তব ঘটনা না হয়ে যদি শুধু গল্প হত, স্বপ্ন হত, তবে এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু আমি যখন যা শুনেছি তাই লিখছি তখন সারেঙের বাদবাকী কাহিনী না বললে অন্যায় হবে।

সারেঙ বললে, 'চৌদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে হয় যেন কাল সাঁঝে সমীরুদ্দী আমার কেবিনের অন্ধকারে তার ছাতির খুন ঝরিয়েছিল।

'কিন্তু ওই যে ইনসাফ বললেন না হুজুর, তার পাত্তা দেবে কে?

'সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায় নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিল তখন জাহাজে মারা যায়। ত্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পৌঁছল সেই ভাইয়েরই কাছে। আবাব সে টাকাটা ওড়াল।'

ইনসাফ কোথায়?

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ঘুম ভাঙতেই চমকে উঠলো রাসেলা।

সে ভাবলো, ভোর হয়ে গেছে। চেয়ে দেখলো চারদিক, আলোছায়া অন্ধকার। ঠিক ভোর হয়নি এখনো। বিছানায় শুয়ে হাই তুলল সে ঘন ঘন। তারপরে কান সজাগ রাখলো বাইরের পদধ্বনির প্রতীক্ষায়। চারদিকে শীততাপ হাওয়া। এ মুহূর্তে ভালো লাগছে নিজকে, জীবনের মতো।

কাল রাতে ঘুমোতে যাবার সময় ভেবেছিলো, খুব ভোরে সে বড়ই কুড়োতে যাবে ; তার আগে কেউ যেন আর গাছতলে না যেতে পারে।

পা দু'টো টানা দিতেই পায়ের দিকটার কাঁথাটা ছিঁড়ে গেল শব্দ তুলে। এবার সে কাঁথাটা সরিয়ে উঠে পড়লো। বিছানা থেকে।

মায়ের শিয়রের কাছে এলো। চোখে পড়লো তার—মাকে জড়িয়ে ধরে বাবা তখনো অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছেন। উভয়ের কাপড় লজ্জাজনক অবস্থায় পায়ের কাছে গড়াগড়ি যাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে নিলো। যেন কিছুই দেখেনি সে। সামনের দিকে এগুতে এগুতে বাইরে বড়ইতলে পায়ের শব্দ শুনতে পেলো—অনেকগুলো পায়ের শব্দ। ঘরের ঝাঁপ খুলে দৌড়ে বাইরে এলো রাসেলা। ভাবলো, আলসেমি না করলে হয়তো বা এতক্ষণে অনেক বড়ই পেতে পারতো সে।

কুলসুম, ধলু হয়তো এতক্ষণে অনেক বড়ই পেয়েছ। ভরে ফেলছে কোঁচড়।

অসহায় লাগলো নিজকে। তবুও কতকগুলো বড়ই কুড়িয়ে কাপড়ের আঁচলে ভরে নিলো রাসেলা।

আঁধার কেটে সূর্য উঠি উঠি করছে। কুলসুম রাসেলার কাছে এলো। তারপর বললে সে, *"দেহি রাসেলা, তুই কতডি পাইছত।"*

উভয়েই নিজেদের কোঁচড়ের খোঁজ নিয়ে ঘরের দিকে এগুলো।

আমিনা এতক্ষণে ঝাঁপ ঠেলে বাইরে এলো। রাসেলা দৌড়ে মায়ের কাছে এলো, "এই যে মা এতডি।"

আমিনা মেয়ের কোঁচড়ের বড়ই দেখে হাসলো মনে মনে। তারপর লোটা নিয়ে চলে গেল ঘাটে। রাসেলাও তার পিছু নিল।

মুখে পানি দিয়ে মা মেয়ে ঘরে এলো।

"মা মুড়ি আছেনি গো?" মেয়ে হাঁকলো।

"দেগগা, টিনঅ আছেনি, তর বাপের লইগ্যা থুগ্‌গা রাহিছ।"

"রাখমু হানে।" মায়ের কথার উত্তরে রাসেলা বললে।

মুড়ির টিনে হাত দিয়েই রাসেলা হেসে উঠলো, "মাগো, মুড়ি দেহি একমুড, বাবার লইগ্‌গা রাইখ্যা আমি খামু কি?"

ওঘর থেকে উত্তর দিলো আমিনা, "যা আছে তুই খা, একমুড কড়কড়া বাত আছে। তর বাপেরে দিমু নে।"

মুড়ি কাপড়ের খোঁটে ঢেলে বাইরে চলে এলো রাসেলা। দাওয়ায় বসলো, বেঁকে। তারপর উঠে গিয়ে খড়ের-পাড়ায় হেলান দিয়ে চিবুতে লাগলো সে। খেতে খেতে চোখের সামনে ধরা পড়লো গ্রামের খোলা দিকটা। গ্রামের গাছের মাথা ছাড়িয়ে সূর্য উঠে গেছে অনেক উপরে। পাশের খালে নৌকো দুলতে দুলতে যাচ্ছে যেন হাওয়ায় ভর করে, বিনা পালে।

তারপর চোখ ঘোরালো লাউ মাচায়। মাচায় ঝুলছে ছোট বড় বেশ কয়েকটা সবুজ রংয়ের গলা—চিকন পেটমোটা লাউ। লাউ মাচার পাশেই গোয়ালঘর। দেখতে পেলো সে, ছোট্ট বাছুরটা তিড়িং করে লাফিয়ে ক্ষেতের দিকে ছুটে আসছে। আবার দৌড়ে যাচ্ছে মায়ের কাছে। খুব ভালো লাগলো রাসেলার। বাছুরটার এই অনাহুত ছুটোছুটি।

এদিকে কখন এসে কুলসুমদের ছাগলটা লাউগাছের একটা মূল ডগায় কামড় বসালো। দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠলো রাসেলা। ঝাঁকার ডাল ভেঙ্গে ছাগলটাকে তাড়া করতে করতে গাল পাড়লো। "হারামজাদী, মরাসোগীরা—অগ ছাগল বাইন্দা রাখতে পারেনা! মাইনষেগো গাছ যে খাইয়া যায় পরতেক দিন।" ছাগলটা ছুটে পালালো। তাই আবার গজরাতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে সে। "আইয়া লউকনা আবার, ঠ্যাং ভাইঙ্গা হালামু। অ' কুলসমী, অগো ছাগল বাইন্দা রাহিছ; নাইলে চুল ছিরা হালামু তর।" কুলসুমের উদ্দেশ্যে গাল দিতে লাগলো রাসেলা।

আমিনা মেয়ের চীৎকার শুনে এসে লাউয়ের ছেঁড়া ডগাটা হাতে নিয়ে দুঃখ পেল। তারপর বললে সে, "অগো ঐ বকরীডার জ্বালায় আর কিছ্চু লাগাইয়া সুখ পাই না। যা লাগামু আউস কইর‍্যা—গিইল্যা খাইয়া যাইব, এতবড় অতিষার ঐডার প্যাডের মইদ্দে। আর অয়াঅ' জানে অইও, অগ ছাগলের খাইচ্ছৎ। ইটটু বাইন্দা ছাইন্দা রাখবো হেয়োনা। মাইনষেরে জ্বালাইয়া খাইব।"

একসঙ্গে অনেক গালি দিয়ে হাঁপালো আমিনা।

তারপর মায়ে ঝিয়ে ঘরে এলো। "ক'গো মা দুদের কাইড়াডা? সাব-বাড়ীতে দুদ দিয়া আহিগা।"

"সিকার মইদ্দে ছ্যাখ।" আমিনা মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানালো।

"কিছু আছেনিগো মা, খালি একমুড মুড়ি খাইয়া চোঁ চোঁ কইরতাছে প্যাড্ডা।" রাসেলা মায়ের দিকে তাকালো কাতরভাবে।

"দুদডুগ দিয়া আয় সাব-বাড়ীতে। আমি রুডি বানাইয়া রাহুমনে, আইয়া খাইছ।" বলতে বলতে আমিনা ঘাটে এলো এঁটো বাসন হাতে নিয়ে।

রাসেলা অগত্যা দুধের কাড়াটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। সে নামলো মাটির রাস্তায়। রাস্তার বুকে গাছগুলো তখনো শিশির ভেজা। ঘাসগুলো ভেজা বলেই পায়ের নীচে ফস্‌কাতে লাগলো বারে বারে। পথের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা হাঁটতে লাগলো সে।

রাস্তার নীচে কুঁয়োর কাছে লজ্জাবতী গাছের মাথায় বেগুনী ফুল। ফুল তুলতে সে নামলো নীচে। তারপর যখন সে লজ্জাবতী গাছে হাত দিল পাতাগুলো লজ্জা পেয়ে সব ঘুমিয়ে পড়লো। বুঁজে গেল সবগুলো পাতা।

জোরে টান মেরে রাসেলা ছিড়লো দু'টো বেগুনীরঙা ফুল।

একটা বাড়ীর কাছে এসে পড়লো সে। এ বাড়ীর পাশ দিয়েই সাব-বাড়ীর পথ। উঠোন জুড়ে কিলবিল করছে মুরগীর ছা'গুলো। ধরতে ইচ্ছে হলো তার দু'একটাকে। সবার অলক্ষে সে ধাওয়া করলো দু'একটার পেছনে। কিন্তু বুড়ো মা-মুরগীটার চীৎকারে ভয় পেলো সে। পালাতে চেষ্টা করতেই এক ঝলক দুধ পড়ে গেল কাড়া থেকে।

ভয়ে বুকটা অবশ হয়ে গেল তার। মাটিতে দুধটা তখনো সবটুকু চুপসে যায়নি। কালিচোষা কাগজের মতো চুষতে চুষতে সবটুকু দুধ খাচ্ছিল তখন রাস্তার মাটি। ভয়ে কাঁপলো সে। দুধ কম হয়ে যায়, যদি সাব-বাড়ীর ঝি মেপে দেখে! 'আচ্ছা সামনের কল থেকে পানি মেশালে হয় না!' ভাবলো সে।

কলের দিকে চোখ পড়লো তার। একটা ঝুঁট শালিক কলের মাথায়। কখনো বা ক্ষেতের অন্যান্য শালিক কিংবা পাখিদের দিকে চেয়ে সেই ঝুঁটশালিকটা কিচির মিচির শব্দ তুলছে।

রাসেলা আস্তে আস্তে কলের কাছে আসতেই শালিকটা গেল উড়ে, দেখতে পেল সে। তারপর আবার দেখলো নীচু ধানক্ষেত থেকে এই রাস্তার উপরে উঠে আসছে গঞ্জের লোকেরা। ভয় পেল সে। পানি মেশাতে আর পারলোনা কোনরকমেই।

সাহেব বাড়ীতে এসে পড়লো যখন, ভয়ে ভয়ে ঝিকে ডাকলো সে। "দুধ বাহেনগো।" কথাটা যেন বার হচ্ছিল না রাসেলার কণ্ঠ থেকে। ঝি এসে দুধ নিয়ে গেল ভেতর বাড়ীতে।

কান খাড়া করলো রাসেলা। মনে হলো ভিতবে কাদের কণ্ঠস্বর। কেউ বুঝি বা বলছে দুধের স্বল্পতার কথা।

কিন্তু না। কিছছু না। দুধের কাড়াটা হাতে ঝি আবার রাসেলার কাছে এলো। হাতে দিল মাটির কাড়াটা। একঝাঁক আগুনের হাওয়া যেন কানের কাছ দিয়ে ছুটে পালালো।

মাটির কাড়া হাতে উঠোনে নামলো রাসেলা।

সাহেব বাড়ীর সামনে ছোট্ট আঙ্গিনায় ঘাসের আস্তরণ। সবুজাভ। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে সেই আঙ্গিনায়। এই ছোট ছেলে-মেয়েগুলোর মধ্যে একটি ছোট্ট মেয়েকে প্রতিদিন খুব ভাল লাগে তার। সে মেয়েটির নাম রীনা। অন্যদিন হলে গরম কাপড়ের লাল ফ্রক পরা রীনাকে চোখ ঘুরিয়ে দেখত সে বার বার। কিন্তু সে দাঁড়াতে পারলোনা ভয়ে।

ফ্রকের লাল রংটা শুধু চোখের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে গেল বাইরের দিগন্তে মিশে।

রাসেলা বাড়ী এলো। হাঁকলো এবার মাকে, "মাগো, রুটি অইছে নাহি?"

আমিনা মেয়ের কাছে এলো। সোহাগভরে পাতিল থেকে রুটি নিয়ে মেয়ের হাতে দিয়ে সতৃষ্ণভাবে মুখের দিকে চাইলো কয়েকবার। স্নেহাকাঙ্ক্ষায় মেয়ের বুক ভরে গেল। এমনি সময় পাশের বাড়ীর রাহেলার মাকে দেখতে পেল আমিনা—তার ঘরের কাছে এসেই দাঁড়িয়েছে মহিলা।

"বহেন গো বুজান"—বললো আমিনা।

"নাহ্, আর বইয়া কি করমু, পরানডা খাবলা খাবলা লাইগতাছে, বাল্লাগেনা মনডা, মাইয়াডার কহন যে কী অয়!" বলতে বলতে রাহেলার মা আমিনার এগিয়ে দেওয়া আসনে বসলো। বললো আবার, "আর অর বাপে অগো, বিয়ালে গ্যাছে,

সহাল সহাল ফিইর‍্যা আইবনা, হে'ওনা। আমারে টাঙ্গাইয়া রাইখ্যা হেয় বইয় রইছে। কি যে আরাম অইছে এইবার—হারাডা বচ্ছর ধইর‍্যা অই গুড়ির ব্যারাম আর মানু'ওতো টেহেনা বেশী।"

অজানা আশঙ্কায় কথাগুলো বলেই নিজের মুখে হাত দিল রাহেলার মা। "টিগবো কি দিয়া, শইল্লে তাগোদ থাকলে এনা ব্যারামের লগে লড়াই কইরবো! ন খাইয়া না খাইয়া তাগোদ আর আছে নিহি!"

কাঠের চটি দিয়ে উনুনের উপরে কড়াইয়ের পুঁইশাক নাড়তে নাড়তে বললে রাসেলার মা।

রাসেলা শুনছিল বসে। মাটির কলসী থেকে ঢক্ ঢক্ শব্দ তুলে পানি খেয়ে বেরিয়ে গেল সে। তারপর বড় ঘর থেকে কুলোতে করে বড়ই এনে দিল রোদে এলো মোখলেসের নতুন বিয়ে করা বৌ। রাসেলার বড়ই দেখে তার জিহ্বায় জল এলো। ছোঁ মেরে কুলো থেকে কতগুলো বড়ই তুলে নিল সে।

"নিয়েন্না, নিয়েন্না, ভাবীসাব, কইয়া রাইখলাম।" বলে চেঁচিয়ে উঠলো রাসেলা। ফজিলা খাতুন হাসতে হাসতে কাঁখের কলসী কাঁখ বদল করে ঘাটের পুকুরে চলে গেল।

এরপরে দৌড়োতে দৌড়োতে এল কুলসুম। তার নিত্যকার খেলার সঙ্গিনী। রাসেলা দেখলো চোখ তুলে। কুলসুম কলকণ্ঠে বললো, "লগো রাসেলা, কলই হাগ তুইল্যা আনিগা!"

হাত ধরা-ধরি করে রাসেলা আর কুলসুম চলে গেল বাড়ীর কাছে পশ্চিমের চকের খেতে।

আধঘণ্টা অবধি কলাই শাক তুলে বিরক্তিত হলো রাসেলা।

বললো সে, "এলা যাইগা কুলসুম, ঐ ছাখ, আজী সাব আইতাছে।" এবার ছুটে পালালো ওরা দুজনেই।

করিম হাজী দূর থেকে শাক তুলতে দেখে ওদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "কেরাগো তরা, খারইছ, আইতাছি! অহনে দৌড়াছ ক্যা হারামজাদীরা?"

রাসেলা বাড়ীতে ঢুকলো হাঁপাতে হাঁপাতে।

রান্নাঘরে ঢুকে বললো মাকে, "কলই হাগগুলা বিয়ালে রাইন্দেন গো মা।"

আমিনা ক্ষেপে উঠলো শাক দেখে, "লক্ষ্মীছাড়ী, তরেনা না করছি পরের কোলার হাগ তুইলতে। খারইছ, তর বাপে আইয়া লউক, তর একদিন নয়গা আমার একদিন, আইজ দেহুমানে!"

রাসেলা মায়ের ভয়ে চুপসে গেল। চোখ ফেলতে পারলোনা শাকগুলোর দিকে। সে ঘর ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করলেই ভাতের হাঁড়ি ঠেকা দিতে দিতে আমিনা বললো, "গোসা করিছনা। গোসল কইর‍্যা আইয়া বাত খা তুইভা। আর ঠিল্লাডা লইয়া যাইছ, বুড়াইয়া লইয়া আবি।"

রাসেলা নিঃশব্দে মাটির কলস কাঁখে নিয়ে ঘাটে চলে গেল।

দেখতে পেল সে, তখনো ঘাটের তালের তক্তার উপরে ভেজা কাপড়ে দাঁড়ানো ফজিলা ভাবী। স্নান করে ভেজা কাপড়ে চুল শুকোচ্ছে।

কলস নামিয়ে রাসেলাও বসলো ঘাটের তক্তায়। দেখতে পেল সে, ভেজা কাপড়ে লেপ্‌টে আছে ফজিলার উদ্ধত শরীর। দু'টো পীনোন্নত বুক দেহের উপর যেন শোভাময় হয়ে আছে। তাকিয়ে দেখলো কয়েক বার অলক্ষে। তারপর নিজের নবাঙ্কুর বুকের দিকে চেয়ে পুলকিত শিহরণ উপভোগ করলো রাসেলা। যেন দু'টো পদ্মকুঁড়ি তার দেহে অঙ্কুরিত হচ্ছে লজ্জানম্রভাবে।

কেমন গোপন শিহরণ এই প্রথম পেল রাসেলা। যৌবনের এই আগমনী যেন তাকে সুখ দিল এই মুহূর্তে। হঠাৎ মনে হলো তার, সে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে তাহলে!

গোসল সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলো রাসেলা।

ভাত খেতে বসলো সে উদাসানন্দে। কিছু যেন খেতে ইচ্ছে হচ্ছেনা তার!

"আর দু'গ্‌গা বাত দেই?" মা বললো।

"আর লাইগবোনা।" মাকে বললো রাসেলা।

"আর দুগ্‌গা দেই, খাইয়া ল।" ভাতের পাতিলের নীচে আমিনার হাতের কর্কশ আওয়াজ বাজলো। রাসেলা বুঝতে পারল ভাত বেশী নেই। তাই সে বললে, "মা আর বাত খামুনা!"

মায়ের বুক ফেটে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। রাসেলার কাছে ধরা পড়লো।

হঠাৎ পাশের বাড়ী থেকে 'মরা-কান্না' ভেসে এলো।

রাসেলা মাকে বললো, "কিগো মা, কি অইছে?"

তারপর উভয়েই বুঝলো—রাহেলার মার কণ্ঠ! হয়তো বা রাহেলার মৃত্যু-কান্না!

"কি অইছেগো বুজান," বলতে বলতে ঘর থেকে ছুটে বেরুলো আমিনা। পেছনে রাসেলা। ভাত পড়ে রইলো পাতে।

রাহেলার মা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে

"আমার কি অইল গো…হায় আল্লাহ আমারে কই ডুবাইয়া দিলি আল্লা।…অ রাহেলা আমারে ফালাইয়া গেলি কই মা'জান। তরে থুইয়া আমি ক্যামনে থাকমু, ও আল্লা কইয়া ছ্যাও আমারে…"

সবাই সান্ত্বনা দিল রাহেলার মাকে।

ফজিলা বললো, "কাইন্দেননা আম্মা, কান্দইা আর কি অইবো। যার বান্দা হেই লইয়া গ্যাছে। অর রহুর শান্তি আউক হেই মোনাজাত করেন আম্মা।"

কিন্তু রাহেলার মার চীৎকার আকাশে বাতাসে ছড়াতে লাগলো।

"মাগো মা……অ রাহেলা, তুই চইলা গেলে এই খালি গরে আমারে মা ডাইকবো আর ক্যাডা। অ রাহেলা……ও আল্লা, তর এইকী রহম আল্লাহ…"

সবার কণ্ঠেই কান্না। কিন্তু কাঁদলে আর চলেনা বলেই অনেকের ধমকানিতে শেষে সবাই রাহেলাকে কবর দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হলো।

স্নানঘরে নিয়ে গেলো রাহেলাকে।

অনেক সময় কাটলো। রাহেলাকে কবর দেয়া হয়ে গেছে পাশের ছাড়া ভিটেতে। রাসেলা সব দেখলো।

নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। যেন কথা বলার শক্তি নেই তার।

সন্ধ্যা শেষ হয়ে কখন রাত গাঢ় হয়ে গেল। বাড়ীতে এলো রাসেলা। বারে বারে রাহেলার মার কান্নার ধ্বনি যেন কানে ভাসতে লাগলো তার। "তরে ফালাইয়া আমি এই খালি গরে ক্যামনে থাকমু, অ…রাহেলা…." যেন বারে বারে এই কথাগুলোই রাসেলার কানে বাজতে লাগলো।

চোখের কাছে মনে হলো রাহেলা যেন জীবন্ত দাঁড়ানো। যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু ভুল ভাবলো তার। এ তো স্বপ্ন! আসলে মৃত্যু সব ছিনিয়ে নিয়ে যায়—সব কিছু অনাত্মীয় করে দেয়। ভাবতে লাগলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কতটা বা সময়! এর মধ্যেই সব ছিনিয়ে নিয়ে গেল একটি মৃত্যু।

বিছানায় উঠে এলো রাসেলা। ভয়ে ভয়ে কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে নিলো সমস্ত দেহের উপর দিয়ে। ক্লান্তি, দুঃখ, অবসাদে চোখের পাতাগুলো ভারী হয়ে আছে যেন! ঘুম আসছে। ধীরে ধীরে। ঘুম আসছে—যেন সমুদ্রের মতো ঘুম।

সারা দিনের ছবি, শব্দ, অনুভূতিগুলো সব ঢেউয়ের মতো তন্দ্রার সৈকতে গড়িয়ে পড়ছে যেন!

ছায়াছবির মতো সারাটা দিনের দৃশ্যগুলো দৃশ্যান্তর হয়ে যাচ্ছে তার মনের পর্দায়।

আব্‌ছা আব্‌ছা ভোরের অন্ধকার…বড়ই কুড়োনো…..

তুলতুলে মুরগীর ছা,……

লজ্জাবতীর বেগুনি ফুল…

রাহেলার মুখ…

মাটিতে লেপ্‌টে যাওয়া দুধ…

ভয়…সাহেব বাড়ীর রীনার লাল ফ্রক……

কলের মাথায় ঝুঁট শালিক…

রাহেলাবু, রাহেলাবু·· রাহেলাবু…

সবুজ কলাই শাক…মুড়ি…ভাত…শূন্য পাতিল…মায়ের করুণ দীর্ঘশ্বাস…ক্ষুধা… ফজিলার ভেজা দেহ…নিজের নবাঙ্কুর বুক…

মা…বাবা…ভয়…কান্না…রাহেলার মা'র শোকালাপ…ও আল্লা, তর এইকি রহম আল্লা…

রাহেলার জীবন্ত মুখ…মৃত মুখ…কবর…রাহেলাবু'…

রাহেলাবু…রাহেলাবু'…

সব যেন এখন ছায়াছবির মতো মনের পর্দায় ভেসে উঠে তলিয়ে যায়…ভেসে উঠে সরে দাঁড়ায়।

সব, সবকিছু।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

একটি মৃত্যুর জন্ম □ রবিউল আলম

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আহা, আমি আর লোকালয়ে যাব না। শওকতের বিধ্বস্ত ইচ্ছেরা মেডিকেল কলেজের ছয় নম্বর ওয়ার্ড থেকে হাহাকার করে উঠল। ইচ্ছেরা ইথারে তরঙ্গ তোলে না, তাই তিরিশ জন অধ্যুষিত এই ঘরের বাতাস এত ভারী, অকম্পিত। আমি হীনবল এক ক্যানসারের রোগী—অন্তিমদশায় , আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে—রোগী তার কাঠির শলাকার মতো হাত দুখানি নেড়ে দেখতে চাইল। উঃ, নাড়তেও কত কষ্ট! আমি স্থবির হয়ে গেছি। অথচ আমার বয়স চল্লিশ মাত্র। এবং তাই আমি সব কাজে অনুপযুক্ত, প্রয়োজনহীন ও বিরক্তিকর এক বোঝা।

—'মুখটা একটু খুলুন তো!' অনুরোধের গলায় আদেশ এক নারী-কণ্ঠের। নার্স। এরকম উপমার কোন মানে হয় না অথবা কেন মাথায় এল সে জানে না—শওকত উপমাটা আওড়ালো, মানুষ কামড়ানো ভোমরার মত নার্সটি গুণগুণ করে উঠল আমার কানের কাছে।

মুখ খুলল। থার্মোমিটারে তাপ উঠল না? নার্সের ভ্রূতে কুঞ্চন। নিশ্চয়ই তাপের মাত্রা খুশী করতে পারেনি তাকে। একটা দার্শনিক চিন্তার কীট মাথায় ঘুরছিল বহুক্ষণ। এবারে রূপ পরিগ্রহ করল : উষ্ণতা দিয়ে জীবনের পরিমাপ করা যায় না। অনুষ্ণ জীবনের সঙ্গীর সংখ্যা স্বল্প হতে হতে শূন্যে গিয়ে পৌঁছলেও জীবনের সেটাই আসল রূপ। তার সাম্প্রতিক জীবনের শেষ উষ্ণতাও যেদিন নীরবে নিঃশেষ হয়ে যাবে—সেইদিন সে নিঃসন্দেহে শেষতম, চরমতম এবং মহত্তম অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

নার্সটি তার শরীরের দুপাশে কম্বল গুঁজে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। শওকত দর্শনে বিরতি দিয়ে ডাকল, 'সিস্টার'।

সিস্টার এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালো।

—'পানি।' শব্দের সংক্ষিপ্ততা অমুষ্ক ব্যর্থতার করুণ রূপ। অথচ আমি একদিন কথা বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করেছি। শওকত অতীতকে ভাবল। শব্দের ফুলঝুরি ছিল আমার ব্যবসার অস্ত্র। আমি শওকত আলী, আঠারো বছর আগের বি-এ। চাকরীর বিধাতাদের তুষ্ট করতে না পেরে দালালী দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। জীবন বীমার দালালী।

নার্সটি ফিরে এল। হাতে ঘোলাটে জল। কতদিন গ্লাসটি মাজা হয়নি যেন। নাকি জলটাই ঘোলাটে! অথবা শওকতের দৃষ্টিও স্বাস্থ্যদোষে নষ্ট হয়ে গেছে? কিন্তু নার্সের চেহারাটি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মুখ স্বচ্ছ···ট্রান্সপারেন্ট সাবানের মত লালচে। জানালার রোদে দাঁড়ালে তার শিরা-উপশিরার রক্ত চলাচল দেখা যাবে—শওকতের বিশ্বাস। নার্সটির বুকে বিদ্ধ করার মত উদ্যত এক যৌবন।

অবশ্য যৌবন যত উত্তপ্তই হোক তাকে বিদ্ধ করবে না কোনদিন আর; করতে পারবে না বলা যায়।

শওকতের উষ্ণতা লাভ করার কল্পনা অবাস্তর। সিস্টার যখন এগিয়ে এসে শওকতের ঘাড়ের নীচে তার আশ্চর্য নরম একটি হাত ও বুকে আর একটি আলতো করে রেখে তাকে একটু উঠিয়ে পানি খাইয়ে দিতে চেষ্টা করল, তখন শওকত, আশ্চর্য হলেও, একটুও উষ্ণ হল না।

বরং তার মনে এক আশ্চর্য অনুভূতির সংক্রমণ: মোটামুটি সুন্দরী যৌবন সম্ভারে সজ্জিতা এই যুবতীটি কেন আমার শুশ্রূষা করছে? এটা কি তার মনের সহজাত স্পষ্ট ও পুষ্ট সেবাপরায়ণতা? না। তা নয়। এই সেবা তার চাকরী। আসলে পয়সার বিনিময়ে সে তার শ্রমকে সেবার পবিত্রতা দিয়ে বিক্রি করছে। আমি—আমরা তাকে নিয়োগ করেছি। কি আশ্চর্য! মৃত্যুর আগে আমাকে পানি কিনে খেতে হচ্ছে?

—'না, না'। শওকত আর্ত চীৎকার করে উঠল। দুর্বল হাতে সিস্টারের আলতো ধরে রাখা গ্লাসে এক অস্থির ধাক্কা দিয়ে বসল, যেন নিজের অজান্তে। সিস্টারের সাহায্য ছাড়াই শুয়ে পড়তে পারে সে। মেঝের ওপর গ্লাস ভাঙার উৎকট শব্দ উঠল। সে দেখতে পাচ্ছিল, পানি প্রথমে সিস্টারের মুখে ছড়িয়ে পড়ে পরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তার একপাশের বুকের জামাকে ভিজিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সিস্টার প্রথম অবস্থায় হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরতেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল অকস্মাৎ।

শওকত জানে সিস্টার তার সম্বন্ধে রিপোর্ট করতেই গেল। সন্দেহ নেই সে আহত হয়েছে মর্মান্তিকভাবে। আহত এবং অপমানিত। অথচ, আমি সারাজীবন আহত হতেই অভ্যস্ত। জীবনে কাউকে আহত করেছি—এমন উদাহরণ এই প্রথম। না না, প্রথম নয়। শওকত মনে করল, সে অসুস্থ হয়ে তার পরিবারের সবাইকে প্রথম আহত করেছে। কারণ অর্থের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ও হো! আরও একটা উদাহরণ তার মনে পড়ল। এই মুহূর্তের নিজের হাসির রূপ সম্বন্ধে ধারণা না থাকা সত্ত্বেও শওকত হাসল। সে প্রথম আহত করেছিল এক মহিলাকে—যিনি অতি উঁচু মহলের এক প্রতিষ্ঠিত পুরুষের গৃহলক্ষ্মী। এক লাখ টাকার কেস দিতে পারলে শওকতকে ইন্সপেক্টর করা হবে, কর্তৃপক্ষ কথা দিয়েছিলেন। ষাট সত্তর হাজারের কণ্ট্রাক্ট জোগাড়ও হয়েছিল কয়েকজনের কাছে থেকে। বাকীটা একজনের, সম্ভব হলে এই ভদ্রলোকের ওপর দিয়ে চালালে অনেক অকারণ শ্রম বাঁচত। তাই শওকত বহুদিন থেকেই মহিলার স্বামীটিকে শিকার করার উপায় খোঁজায় সচেষ্ট ছিল। নানা কারণে পেরে উঠছিল না।

শেষে একদিন হন্যে হয়ে মহিলার শরণাপন্ন হয়েছিল সে। দীর্ঘক্ষণ ধরে স্বামীর মৃত্যুর পরে মহিলার ও তার সন্তানদের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা সম্বন্ধে জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়েছিল। মহিলাটি আগ্রহ নিয়ে শুনেছিলেন। রহস্য করে মারাত্মক প্রশ্নও করেছিলেন একটা এক সময়, 'স্বামী যে আমার আগেই মারা যাবেন এ ধরনের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন তো।'

শওকত বিমূঢ় হয়েছিল। সামলে নিয়ে বলেছিল, 'দেখুন সে নিশ্চয়তা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলে এ ব্যবসা করতে আসতুম না। তবে আমি আর একটি কথা বলেছি সন্তানদের সম্পর্কে। সেটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।'

মহিলা খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, 'আমার সন্তান থাকতেই হবে এ ধরনের চুক্তিও তো কারো সাথে করিনি।'

শওকত হতাশ হয়ে পড়ল। আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, মহিলা চরমতম অবাক করলেন সেই মুহূর্তেই, 'আজই রাত্রে একবার আসুন। তখনই বলে দেখব ওকে।'

আশার পরিধিটাকে অনেক বড় করে সন্ধ্যার পরেই শওকত পৌঁছল। বিরাট বাড়ীটা বড় নির্জন। দিনেও সেই মহিলা ও জনচারেক চাকর গোছের লোক ছাড়া কাউকে দেখা যায়নি।

এখন কারও চেহারা চোখে পড়ছে না।

ড্রইংরুমে মহিলাটি একা বসে বিদেশী পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। শওকতকে দেখে মিষ্টি হেসে বললেন, 'আসুন।'

নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। শওকত ভাবছিল, ভদ্রলোকের দেখা সেখানেই পাবে। নেই। ঘরটি খাবার ঘর এবং বসবার ঘরের মতই নির্জন। মহিলা বললেন, 'উনি এখনও আসেন নি। কিছু মনে করবেন না—আসুন না আমরা এর মাঝে কিছু খেয়ে নিই।'

শওকতের এবার বিভ্রান্ত হবার পালা।

টেবিলে যা ছিল তা যদিও সেই ভদ্রমহিলার ভাষায় 'কিছু নয়' তবু শওকত এত রকমের খাবার একসাথে সেই প্রথম দেখেছিল। কিন্তু অবাক হওয়ার কারণ তা নয়! শওকত কারণগুলো একত্র করল: এক॥ আমি নিমন্ত্রিত নই। অথচ মহিলা কত সহজভাবে আমাকে খেতে বললেন—তায় নির্বিকারভাবে খাবার ঘরে এনে। আমাকে ভেবেছেন কি? দুই॥ তাঁর স্বামী এখনও ফেরেন নি, হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবেন। তার অপেক্ষা না করে, আমি যদি খাই···তা ছাড়া উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে খাচ্ছেন···। ব্যাপারটা সব মিলিয়ে তার কাছে অশোভন লাগল।

মহিলা পূর্ণ দৃষ্টি মেলে শওকতের দিকে তাকালেন। তার দৃষ্টির ভাষা শওকত যেন অনায়াসে পড়ে নিচ্ছিল তার চোখ থেকে: কি আশ্চর্য আপনাকে আগে থেকে না বলে খাবার ঘরে এনে খেতে বলায় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন মনে হচ্ছে। বিশ্বাস করুন আপনাকে আগে বলার কথা খেয়াল ছিল না। ও, আপনি আমার স্বামীর কথাও ভাবছেন।

তারপর চোখ নামিয়ে মুখে বললেন, 'উনি আজ আসবেন না।'

আবার বিস্ময়।—'আপনি জানতেন?'

—'সবই বলব, বসুন। নিন, শুরু করুন।'

শুরু হল।

মহিলা আপন মনেই বললেন, 'চাকর বাকর সব ঘুমিয়েছে। আর বাবুর্চী সন্ধ্যের ছুটি নিয়ে চলে গেছে। আমাদের নিজেদেরকেই সব কিছু নিয়ে টিয়ে খেতে হবে।'

খেতে খেতে বললেন, 'উনি শুধু আজ আসেননি, তা নয়। কোনদিনই প্রায় রাতে বাড়ী ফেরেন না। হঠাৎ কখনও যদি আসেন সে রাত দুটোর পরে।'

—'কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন রাতে ওর সাথে এ বিষয়ে কথা বলবেন।'

—'মিথ্যে বলেছিলাম।'

—'আমার আসবার প্রয়োজন বুঝতে পারছিনা।'

মহিলাটি এতক্ষণ পরে আশার বাণী শোনালেন : 'বুঝতে পারবেন। তবে কথা দিচ্ছি, আপনার কেস আমি করিয়ে দেবই। আমার স্বামী যদি টাকা নাও দেন—আমি নিজে দেব।'

খাওয়া শেষে শওকতসহ মহিলা ড্রইংরুমে এলেন। বাড়ীটি এখন অবধি নির্জন ও তৃতীয় প্রাণীহীন; অন্তত শওকতের কাছে।

মহিলা ওকে বসিয়ে বললেন, 'ভাল কথা, আপনার স্ত্রী কি অপেক্ষা করবেন আপনার জন্যে?'

—'না, আমার ফিরতে প্রায়ই রাত হয়। ও ঘুমিয়ে পড়ে।'

—'আচ্ছা আপনি কাগজটা পড়ুন, আমি কাপড় পাল্টে আসছি।'

চলে গেলেন।

শওকত কাগজটা হাতে নেওয়ার আগে মাথার ভাবনাগুলিকে গুছিয়ে নিল : 'মহিলার স্বামী রাতে ফেরেন না। কোথায় থাকেন? ক্লাবে? সারারাত? মহিলা একাই বাড়ী থাকেন। একা কি? না আমার মত কাউকে 'প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে' ডাকেন। অথচ আমার দু'বছরের ছেলে এখন মায়ের পাশে ঘুমিয়ে। মহিলার কি সত্যি আমাকে 'প্রয়োজন'? অথচ আমার টাকার দরকার। এবং শেষে : ছি ছি, একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে এরকম ধারণা করা উচিত নয় আমার।'

ধারণা করতে হল না। মহিলার নির্দেশিত 'কাগজ'টি নিয়ে চোখ বুলোতেই এক সেকেণ্ডে পরিষ্কার হয়ে গেল সব। পশ্চিমা নাইট ক্লাবের মাসিক সংকলন। পাতায় পাতায় ছবিতে ছবিতে চরম উচ্ছৃঙ্খলতার নগ্নতম প্রকাশ।

মহিলা কাপড় পাল্টে এলেন। ড্রইংরুমের উজ্জ্বল আলোতে শওকত তার সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছদ দেখল।

ডাক্তার এলেন।

যথারীতি বুকে পিঠে স্টেথিসকোপ লাগালেন। বিছানা পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা সুইপারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন।

এর মধ্যেই শওকতের চোক একবার ডাক্তারকে ছেড়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং অবাক হয়ে দেখল শওকত সমর্থ রোগীরা উঠে বসে এবং অসমর্থরা শুয়ে শুয়েই উৎসুক। লক্ষ্য করছে তার ও ডাক্তারের গতিবিধি। ব্যাপারটা বুঝল। পৃথিবীর সব বয়সের সব পরিবেশের মানুষই এক। শুধু মজা দেখতে চায়। মুমূর্ষা

অথবা অসুস্থতা তার প্রতিবন্ধক নয়। নার্সের সাথে তার ব্যবহারের মজা সবাই দেখেছে। এখন তার পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তারের আঘাত দেয়ার মজাটাও দেখে নিতে চায়।

ডাক্তার আঘাত দিলেন না। মিষ্টি হেসে বললেন, 'স্টাফদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হয়। ওরাই তো আপনার এখানকার কেয়ার টেকার। ওদেরকে রাগিয়ে দিলে ভালো সেবা পাবেন কি করে বলুন।'

ডাক্তার চলে যেতে শওকত আর একবার দৃষ্টি ফেলল ঘরে। সবাই শুয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে। তাকে দেখছেনা আর কেউ। আমি তোমাদের মজা দেখাতে পারলুম না, সে বলতে চাইল। কি করব বল, ডাক্তারটা বড় বেরসিক এবং ভদ্র। অবশ্য আমার যদি এতটুকু শক্তি থাকত, ডাক্তারের কাঁধ থেকে স্টেথিস্কোপ খুলে নিয়ে তোমাদের আর একবার মজা দেখাতুম।

নার্স আর একবার এল। গম্ভীরতার প্রতিমূর্তি। খাওয়াতে চাইল, পারল না। শওকত ইচ্ছে করে খেল না, বরং নার্সকে তুষ্ট করার জন্যে খাওয়ার চেষ্টা করল। পারল না।

নার্স চলে যেতে আবার সেই মহিলার কথা মনে হল। চিন্তার রাজ্যে লজ্জার স্থান নেইঃ মহিলার সত্যি আমাকে 'প্রয়োজন' ছিল। আমি তার এবং তিনি আমার প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকার কেসটা পেয়েছিলুম। ইন্সপেক্টরও হয়েছিলুম। এবং আমার দু'বছরের ছেলে নিউমোনিয়ায় মারা না যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে আমার যৌন সম্পর্ক বজায় ছিল।

এই সময় নার্স ও ডাক্তারদের দ্রুত ব্যস্ততা লক্ষ্য করল শওকত। একটা অসুস্থতার অবসান হল। ৩১নং বেডের অসুস্থতা সাদা চাদরে ঢাকা পড়ল।

এইবার আমার পালা, শওকত ঠিক ধরে নিল। আমি একা একাই ঘুমিয়ে পড়তে চাই। সবাইকে সামনে ডেকে ঘটা করে চোখ বন্ধ করে লাভ কি। আমার ছেলেও আমার অবর্তমানে এবং খুব সম্ভব মায়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও তার সাময়িক তন্দ্রার অবসরে বিদায় নিয়েছিল।

মহিলার বাড়ীতে আমি আর যাইনি। সন্তানের মৃত্যু আমাকে সৎ করেছিল। সৎ অসৎ কে? যেই হোক—মহিলার বাড়ীতে না যাওয়ার জন্যে আমাকে সারাজীবন এক ব্রাঞ্চ অফিসের খুদে ইন্সপেক্টর হয়েই থাকতে হল। মহিলা প্রভাবশালী ছিলেন সন্দেহ নেই, নইলে তাঁর এক কথাতেই আমার উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেল কেন।

—'স্যার, বাড়ী যাবেন না ?' নার্স ডাক্তারকে প্রশ্ন করছে এই ঘরেরই অন্য প্রান্তে।

—'হ্যাঁ, এইত।' ডাক্তারের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

বাড়ী সম্বন্ধে গৌরববোধ না থাকলেও শওকত বাড়ীর কথা ভাবতে লাগল। দুই ছেলের একজন বেতার শিল্পী হওয়ার ও আর একজন সিনেমার অভিনেতা বনবার আপ্রাণ কোশেশ করছে। তিন মেয়ের বড়টা বিবাহযোগ্যা, বিয়ে হয়নি আজও অবিশ্যি।

সহসা, আজ কি বার, এখানে আমি কতদিন আছি, এখন সময় কত—ইত্যাকার প্রশ্ন শওকতকে বিব্রত করে তুলল। বলা বাহুল্য একটারও উত্তর তার নিজের পক্ষে খাড়া করা সম্ভব হল না। জানালায় চোখ যেতে দেখল অনাহূত সূর্যের অস্পষ্ট প্রবেশপথ। এখন দিন বুঝলেও, সময় সম্বন্ধে সে সঠিক হতে পারল না। এই ঘরের দিক সম্বন্ধে তার ধারণা না থাকায়, সে এই রকম সিদ্ধান্ত নিল: যদি তার সামনেকার জানালাটি পূবের হয় তাহলে এখন সকাল, আর যদি পশ্চিমের হয় তবে বিকেল।

অবশেষে সে সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত হল, বাড়ীর সবাই যখন যথারীতি এসে পৌঁছুলো। তাহলে এখন বিকেল। ঠিক নিয়ম মত স্ত্রী শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলোল, বড় মেয়ে পায়ে। মেজ ছেলে খবর নিল শরীরের—আর বড় ছেলে বলল, টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলেই কেবিনে স্থানান্তরের ব্যবস্থা হবে।

এ পর্যন্ত রুটিন মাফিক চলল। এরপরে নতুন বিষয় ঘটল একটা। বড় ছেলে হঠাৎ শওকতের নিজস্ব জীবনবীমা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল।

শওকতের নিজস্ব একটা জীবনবীমা আছে। দশ হাজার টাকার আরও প্রায় পাঁচ হাজারের মত পুরতে হত। অতএব তার মৃত্যুতে পরিবারের আর্থিক অবস্থা কিছুটা উন্নত হবে বলা যায়। শওকত স্ত্রী ছাড়া কাউকে বীমার কথা বলেনি। টাকার পরিমাণ স্ত্রীও জানে না। বড় ছেলে সেটাই জানতে চাইল। হয়ত মায়ের কাছ থেকে শুনেছে। এবং সব টাকা দেয় না হলেও তা পাওয়া যাবে কিনা প্রশ্ন করল।

—'হুঁ।' শওকত টাকার পরিমাণটা কষ্ট করে উচ্চারণ করল। মৃত্যুতে তা পাওয়ার নিশ্চয়তা বোঝাতে চাইল, সক্ষম হল না।

শওকতের শেষ নিরীক্ষার দৃষ্টিটা সবার উপর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করে এল। অকল্পনীয় অর্থ-প্রাপ্তি সম্ভাবনার উৎকট আনন্দ প্রকট সবার মুখে, এই পরিবেশেও।

আমি জীবনে এত আনন্দ দিতে পারিনি কোনদিন ওদের, শওকত ভাবল, আমি শেষ বারের মত চিন্তা করছি, এই ভাল হল।

এখন রাত্রি। ছাদের বাতিগুলো নিষ্প্রভ ও দীপ্তিহীন। বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্যে সবগুলো নিভেও গেল এক সময়। শওকত কামনা করল, আজ যেন আর না জ্বলে ঐ অন্ধকারের যৌবনহননকারীরা। আজ আমি নিবিড় প্রশান্তিতে ঘুমোতে চাই।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বিপ্রতীপ □ শেখ আতাউর রহমান

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

তখন বেশ রাত্রি! কোথাও শব্দ ছিল না। আকাশে স্থির হয়ে ঝুলছে চাঁদ। বাতাসের সঙ্গে পারদের মত ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল ঘরে। আমি জানালায় রাত্রি দেখছিলাম। আর ঠিক তখন, আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে। আমি সেই কণ্ঠস্বর কোনদিন শুনিনি। সেইভাবে কেউ কোনদিন আমাকে ডাকেওনি।

আমি তখন সালমার কথা ভাবলাম। ভাবলাম সালমা হতে পারে। সালমা আমার প্রেমিকা। এত রাতে সালমা ছাড়া আমাকে কেউ মনে করবেনা। নিশ্চয়ই সে এখন আমার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কি দস্যি মেয়ে।

আমি দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বলতে ইচ্ছে হল, শেষ পর্যন্ত অভিসারিণী সাজলে। মোটেই মানাচ্ছে না। কাল সকালে কলেজে ঢুকবে কি করে? মেয়েগুলোর সামনে দাঁড়াবেই বা কোন সাহসে? আমি তো ভেবেই পাচ্ছিনা কি ভাবে তুমি প্রেমের কবিতার ওপর লেকচার দেবে কাল। ঢের হয়েছে, এসো এবার। ঘরে বসবে। কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পেলাম না। চাঁদ স্থির থাকলো আকাশে।

ঠিক এ-সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ঘরে কেউ নেই। সবুজ ডিম্ লাইটটা জ্বলছে।

অতএব কেউ আসেনি এখানে। আমার করিডোরে কেউ দাঁড়ায়নি। কেউ ডাকেনি আমার নাম ধরে। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।

পরদিন বিকেলে সালমাকে গিয়ে সব খুলে বললাম। বললাম, কণ্ঠস্বরটা তোমার নয়। তবে তোমার মত। তুমি যে ভাবে আমাকে নাম ধরে ডাকো ঠিক তেমনি মিষ্টি, তেমনি সুরেলা।

সালমা হাসলো, ডাক্তার দেখাও।

—দেখাচ্ছি তো।

—তাহলে ডাক্তার বদলাও। ও-সব হাতুড়ে ডাক্তারে কাজ হবে না। বেশ বুঝতে পারছি রাত্রিতে তোমার ঘুম হচ্ছে না।

—কি করবো তাহলে?

—বললামই তো, ডাক্তার দেখাও।

—তারপর?

—ভালো হয়ে যাবে।

—অর্থাৎ তোমার মত কণ্ঠস্বরে আর কেউ আমাকে ডাকবেনা, এইতো?

—না। সালমা হেসে বলল, এবং আমার কণ্ঠস্বরে আমিই তোমাকে কাছে ডেকে নেবো। এবং তা স্বপ্ন নয়, সত্যি।

অফিস শেষে বিকেলে ফ্ল্যাটে না ফিরে সোজা ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে হানা দিলাম। যেন লেকচার দিচ্ছি, কি পেয়েছেন মশাই। কি ডাইওগনোসিস্ করছেন আপনি? রাত বিরাতে লোকজন আমার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কি আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বেন?

ডাক্তার হাসলেন! কি ওষুধ দিলেন, আল্লাই জানে, ক'দিন বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমোলাম।

এর ক'দিন পরে আবার এক জ্যোৎস্না রাতে, এবার আর ডাকাডাকি নয়, একেবারে স্পষ্ট তাকেই দেখতে পেলাম। দেখলাম সালমা এসে দাঁড়িয়েছে জ্যোৎস্নায়।

—কি ব্যাপার, কি হচ্ছে ওখানে? ঘরে এসো। আর এত রাত্রিতেই বা কি দরকার?

—শব্দ নেই।

—কতক্ষণ এসেছো?

—শব্দ নেই।

—কথা বলছো না কেন?

—কোন শব্দ নেই।

—সালমা, আমি বিরক্ত হচ্ছি।

এবারও কোন উত্তর এলো না।

—সালমা কথা বল, কথা বল বলছি। চুপ করে থেকোনা।

এইখানটায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি কেউ কোথাও নেই। সবুজ

আলোটা এখনো জ্বলছে। তাহলে কেউ আসেনি। কেউ আমার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেনি। ভুল দেখেছি আমি। আর সহ্য হলোনা। ঘুসি মেরে টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসটা চুরমার করে ফেললাম।

সকালে উঠে ইয়াবড এক ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম অফিসে।

সন্ধ্যায় সিনেমার কাউন্টারে সালমার সঙ্গে দেখা।

—কোথায় ?

—হানি-মুনে। হাসলাম আমি।

—বয়স কমছে নাকি ওলডম্যান ?

—কমাতে চাইতো।

—আসল কথা বল।

অফিসে ছুটি নিলাম।

—উদ্দেশ্য ?

—এমনি। তুমিও নাও, আমাব মত, এমনি এমনি। বড্ড মজা হবেখন।

—অদ্ভুত প্রস্তাব। সে অল্প হাসলো। ঘন ঘন ছুটি নিলে চাকরীটা আমার থাকবেনা বন্ধু। বড্ড সাধের চাকরী।

—সালমা, তোমাব চাকরীর প্রয়োজন নেই। এবার থেকে তোমার চাকরী আমার ফার্মে। আমার সারা ফ্ল্যাট জুড়ে তোমার অফিস বসবে। বুঝলে লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার চাকরী আমার সারা জীবন জুড়ে। তারপর একটু থেমে বললাম, আমাদের প্রেমের শেষ। এবার বিয়েটা চুকিয়ে ফেলা কর্তব্য। তাহলেই আমি সুস্থ হয়ে উঠবো।

—ঠিক আছে। সালমা এবার গম্ভীর হলো, আমাকে ভাবতে দাও। তারপব ডাকলো স্কুটার। পর মুহূর্তে ওকে আর দেখা গেল না।

দু'দিন পর ঘরে ফিরে দেখি চিঠি এসেছে। সালমা জানিয়েছে বিয়েতে তার আপত্তি নেই।

হুরে। আনন্দে দু'হাতের মুঠি শূন্যে ছুঁড়লাম। ফূর্তিটাকে ধরে রাখতে পারছিনা। সালমা, সালমা আমার বউ হবে ? সকালে উঠে যাকে আমি রোজ দেখবো গুণগুণ করে গান করে আমার কফি তৈরী করছে, বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখবো ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় হঠাৎ আমার ছায়া দেখে চমকে উঠে হাসছে। এবং যাকে সঙ্গে নিয়ে রোজ রবিবার আমি মর্নিং শোয় যাবো সেই

সালমা আমার বউ হবে, আমার সন্তানের জননী হবে, আমার কাছে থাকবে, সারাটা জীবন ধরে থাকবে। আহ্ সালমা, কি লক্ষ্মী মেয়ে তুমি!

দিনগুলো যেন কাটতে চায় না। চারিদিকে চিঠি ছাড়তে শুরু করলাম। বাবা এলেন গ্রাম থেকে। বড় ভাই এল করাচী থেকে। তাঁরা অবাক এবং আশ্বস্ত। অবাধ্য ছেলেটার কুমারত্ব এবার ঘুচলো তাহলে।

অবশেষে দিনটি এল।

আগামীকাল আমার বিয়ে।

মোটেই ঘুম আসছিল না। চিঠি লিখতে বসলাম। কিন্তু কাকে?—সালমাকেই লেখা যাক। খাসা একটা প্রেমপত্র। লিখলাম, সালমা। খানিকক্ষণ মাথায় আর কোন ভাবনা এলো না। তারপর আবার লিখলাম, সালমা। তারপর আবার, সালমা সালমা সালমা। লিখেই চললাম। সারাটা পাতা জুড়ে শুধু একটি নাম, সালমা। এ-লেখা যেন আর শেষ হবে না। সাদা পাতায় স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর মুখ। ধীরে সে মুখ ঝাপসা হতে শুরু করলো। এক সময় তাকে আর চেনা গেল না। কী স্বচ্ছ। এবং কি ধূসর! কিন্তু একি? এ কার মুখ? এ কি সালমার মুখ। না আর কারো। তবে এ মুখকে চিনতে পারছিনা কেন? কেন মনে হচ্ছে একে কোনদিন দেখিনি পর্যন্ত। চিনি না? কে এ তবে? খুব সকালে সালমার দরজায় গিয়ে নক্ করলাম। চোখ দেখে বোঝা গেল সারা রাত সেও ঘুমোয়নি। আমাকে দেখে চমকে উঠলো। ফিস্ ফিস্ করে বললো, ভাগো শিগগির। বিয়ের বাড়ী, লোকে বলবে কি। লগ্নের আগেই বর এসে হাজির।

এবার আমার মুখ থেকে যেন ঈশ্বরের বাণীর মতই কথা বেরিয়ে এল: আমাকে মাপ কর সালমা। আমি যাকে ভালোবাসি সে অন্য কেউ, তুমি নও। দ্বিতীয় বার চমকে উঠলো সে।

আমি আবার বললাম, তোমার মত। কিন্তু তুমি নও। তোমার মত সে হাসে, কথা বলে, ডাক দেয়। কিন্তু সে তুমি নও। আমি দেখিনি কোনদিন তাকে। সে আর কেউ।

সব শুনে সালমা পাথর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ সে কোন কথা বললো না। তারপর বললো, আমি তোমার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। যাও তুমি।

আমি বললাম, সালমা, আমার সুস্থতা ফিরে আসার পথ হারিয়ে গেছে। এবার সালমা তাকালো আমার দিকে। আমার চোখের দিকে। এভাবে সে কোনদিন আমার দিকে তাকায়নি। সালমার এ চোখ কোনদিন আমি দেখিনি।

এক মুহূর্ত। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে গেল সে ঘরের ভেতর। দু'হাতে সশব্দে বন্ধ করলো কপাট। বুঝলাম সালমা কাঁদছে।

আমি ফিরে আসছি। ধীরে ধীরে ভোরের আলো জেগে উঠছে। কিন্তু এ যেন আরেক শহর। আমার প্রতিদিনের চেনা ভুবন এ নয়। আমি যেন আরেক রাজ্যে প্রবেশ করছি। এবং আমিই কি সেই ব্যক্তি গতকাল যে এই শহরের একজন বাসিন্দা ছিল?

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

সৌদামিনী মালো ☐ শওকত ওসমান

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

"একটু দাঁড়াও।"

আমার বন্ধু নাসির মোল্লা কোর্টের প্রাঙ্গণে হাঁটতে হাটতে হাতে হেঁচকা টান দিয়ে বললে।

"কি ব্যাপার?"

"ব্যাপার আছে। কোর্টের পেছনে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখে আসা যাক।"

আমার তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার কথা। খাজনা-সংক্রান্ত একটা মামলা ছিল, তার দিন পড়ে গেছে। সুতরাং এখানে এই টন্নি-দালাল উকীল-মোক্তারের দঙ্গলে আর এক তিল দাঁড়াতে মন চায় না।

কিন্তু আমার মামলার তদ্‌বির যুক্তি-পরামর্শ, উকীলের দরদস্তুর নাসিরই করে। এদিকে আমার মগজ দৌড়য় না। অগত্যা মোগলের সঙ্গে খানা খেতে হয়।

আমার আরো আপত্তি ছিল অন্য কারণে। আদালতের পেছনে যাওয়া কতকটা বিলাত ঘুরে মক্কা আসার মত। কোর্ট টিলার উপর। পেছনে যেতে হলে এক ধাপ নীচে নেমে আবার উপরে উঠতে জান খারাপ। রীতিমত হাঁপানি ধরে যাবে।

তবু নাসিরের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

আমরা দুজনেই চাকরী থেকে রিটায়ার করেছি। এখনও সংসারের গেরো কাটেনি। আর সময় কাটবে কী করে? কিছু না কিছু কাজে লেগে থাকতেই হয়। নাসির পাকাপোক্ত লোক। তার হাতে হাল সঁপেই আমি নিশ্চিন্ত। এই ক্ষেত্রে আর ঘাড় বাঁকিয়ে জোয়ালের ভার আরো বাড়াতে রাজী নই।

কিন্তু টিলার পথে যথারীতি নেমে আবার উপরে ওঠার সময় তামাসা দেখা

গেল। আদালতের পেছনে এক ফালি মাঠের উপর বেশ ভিড় জমে গেছে একটা পাদ্রীকে ঘিরে। যীশুখৃষ্টের সেবকটিকে আমরাও দেখতে পাচ্ছি। সামনে টাক-পড়া মাথা ফর্সা লম্বাটে চেহ্‌রা। গলায় ক্রুশ ঝুলছে ক্যাসকের উপর।

"এ ত আমার চেনা লোক! ব্রাদার জন।" নাসির হঠাৎ বলে উঠল।

আমরা ক্রমশ উপরে উঠছি। ধাপে ধাপে পা ফেলতে ফেলতে নাসির উচ্চারণ করে, "আরে তুমি চিনবে না। এ হচ্ছে ব্রাদার জন। একবার কেরোসিন ব্ল্যাক মার্কেট করার অপরাধে আমার কোর্টে ব্যাটা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। পরে সে কাহিনী বলব। এখন পা চালাও।" দু-জনে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। বৃদ্ধকালে পাহাড়-চড়া অত সহজ নয়।

অকুস্থলে দেখা গেল লোকজন কম জমেনি। ব্যাপার কী। ব্রাদার জন তখন চীৎকার দিচ্ছে, "এই সম্পত্তি খুব ভালো আছে। Very good—ভেরী গুড।"

আমরা দুই কৌতূহলী দর্শক। গিজগিজ ভিড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

পাদ্রী হাঁকছে, "দর্শকমণ্ডলী!" আমি তখন নাসিরকে বললাম, "বেশ বাংলা বলে তো!"

"বহুদিন এই দেশে, বলবে না কেন?" নাসির জবাব দিয়েই আবার পাদ্রীর উপর চোখ ফেললে।

পাদ্রী হাঁকতে লাগল, "দর্শকমণ্ডলী। এই সম্পত্তি খুব ভালো সম্পত্তি আছে। প্লট বারো 'কানী' জমি। পুকুর। আর আছে তিন একর জমির উপর বসতবাড়ী পুকুর গাছপালা, দশটা নারিকেল গাছ, লিচু গাছ পাঁচটা—আরো ফ্রুট-ফলের গাছ আছে। এখন নীলাম ডাকা হবে। প্রস্তুত—"। ব্রাদার জন দম নিলো।

কৌতূহলী শ্রোতা দর্শক এবার উৎকর্ণ। একজন নেপথ্যে জানতে চাইলে, সম্পত্তি কার?

"এই সম্পত্তির মালিক হচ্ছে সৌদামিনী মালো সিস্টার।"

"আজব নাম!"

পাদ্রী ব্যঙ্গস্বর শুনে আরো বিনয় সহকারে ঈষৎ জোর গলায় বলে উঠল, "সৌদামিনি মালো চার্চের সিস্টার—বহেন ভগ্নী ছিল। তিনি এক মাস মারা গেছেন। চার্চ তার সম্পত্তি নীলাম করছে।"

শ্রোতাদের মধ্যে এবার একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়, কারণ আকাশের রোদ্দুর বেশ নির্দয়। হঠাৎ গরম পড়ছে।

নেপথ্যে একজন বললে, "সাহেব, জলদি করো।"

"অলরাইট" উচ্চারণের পর ব্রাদার জন হেঁকে উঠল "সৌদামিনী মালো, সৌদামিনী মালো, তারই সম্পত্তি। এবার নীলাম শুরু হবে। আমাদের পয়লা ডাক পাঁচ হাজার। তারপর আপনারা বিডিং করুন। 'হায়েস্ট বিডার', উচ্চতম মূল্যে যিনি ডাকবেন, তিনিই পাবেন।"

পাদ্রীর সঙ্গে দুজন কুলী শ্রেণীর যুবক ছিল। তাদের দিকে চোখ ইশারা মাত্র একজন হেঁকে উঠল, "পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার।"

তার ডাকের মধ্যে জনান্তিকে একজন ডাক দিলে, "পাঁচ হাজার পাঁচ শ।"

পাদ্রীর সহকারী হাঁকলে, "পাঁচ হাজার পাঁচ শ। আর কেউ ডাকবেন?"

কিন্তু আর কারো হাঁক শোনা যায় না। অবিশ্যি দর্শকদের মধ্যে গুজগুজুনি চলছে নানা কথার। পাদ্রী-সহকারী আবার হাঁক দিলে, "পাঁচ হাজার পাঁচ শ—এক···পাঁচ হাজার পাঁচ শ—দুই—"

হঠাৎ একজন ডাক বাড়ালে, "ছ হাজার।"

"ভেরি গুড" ব্রাদার জন বলে উঠল। তার সহকারী ছ হাজার ছ হাজার রবে আরো কয়েকবার হাঁক দিলে। শেষে আর একজন ডাকিয়ে বাড়ল। সে সাত হাজার দাম তুলে দিলে।

আমরা বেশ মজা দেখছিলাম। কিন্তু বাড়তি টাকা ত নেই। পেন্সনে যে ক'টা টাকা পাই, তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে। নচেৎ এত বড় সম্পত্তি সস্তাই পাওয়া যেত। বড় আফশোস হতে লাগল। দাঁড়িয়েছিলাম; সম্পত্তি কোন ভাগ্যবানের পাতে যায় তা দেখার জন্যে।

নীলাম জমে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যে। কিন্তু ন হাজারের পর আর দাম শতে-শতে লাফ দিয়ে যায় না। একজন ডাকলে, ন হাজার ন'শ পঞ্চাশ। আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়ল। দশ হাজার।

পাদ্রী-সহকারী হাঁক দিতে লাগল, দশ হাজার এক—দশ হাজার দুই—। তারপর সে স্তব্ধ। জনতা নীরব। তিন—বলার আগে একজন মাত্র পঁচিশ টাকা যোগ দিলে। দশ হাজার পঁচিশ।

ওদিকে রোদ্দুর বাড়ছে। বৃদ্ধকালে কেন দাঁড়িয়ে আছি। আজ বলতে লজ্জা নেই, হয়ত সম্পত্তির লোভ। ক্ষুধার্ত কালেভদ্রে অপরের খাওয়া দেখেও নাকি শান্তি পায়।

শেষ পর্যন্ত আরো পঁচাত্তর টাকা দাম বাড়ল। অর্থাৎ দশ হাজার এক শ। বোঝা গেল নীলাম ডাকিয়েদের পকেট শুকিয়ে যাচ্ছে। রস নদারাৎ। যিনি শেষ পঁচিশ টাকা বাড়িয়েছিলেন, ভিড়ে তাকে দেখা গেল না। তবে হাত নাড়ছিল সে অপরের কাঁধের উপর দিয়ে।

পাদ্রী-সহকারী হাঁক দিলে, "দশ হাজার এক শ—এক···দশ হাজার এক শ—দুই—।" সে থামলে তারপর। পাঁচ ছ' মিনিট কেটে গেল। আর তিন উচ্চারণ করে না যে। এবার লোকটাকে দেখলাম যে দশ হাজারের উপর এক শ বাড়িয়েছিল। মাঝ-বয়সী লোক, বুড়ো-বুড়ো ঠেকে। প্যান্ট-কোট-টাই সমন্বিত। মাথায় মখ্‌মলের টুপি। বাজি মেরে দিয়েছে, এই ভাব চোখে মুখে। কতক্ষণ আর নীলাম-কর চুপ থাকতে পারে? কিন্তু 'তিন' আর উচ্চারিত হয় না। দর্শক অধৈর্য। তার চেয়ে বে-সবুর যিনি ওস্তাদের মার দিয়েছেন শেষ সময়ে। সে ত জবাব চেয়ে বসল।

এখন বেশ মজা বেধে গেছে। কৌতূহলী দর্শক তাই দাঁড়িয়ে থাকে, রোদ্দুর সত্ত্বেও নড়ে না।

ব্রাদার জনের মুখের দিকে তাকাই। সেখানে কালো আর ফিকে সবুজ রং খেলা করছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কিন্তু একটা কাশি দিয়ে হঠাৎ সপ্রতিভ হয়ে উঠে সে হাঁক মারলে, "দর্শকমণ্ডলী!"

কৌতূহল আরো বেড়ে যায়। নীলামদাতা এবার কী করবে?

ব্রাদার জন মুখ খুললে, যেন গীর্জার পুলপিট অর্থাৎ প্রচার বেদী থেকে সর্মন দিচ্ছে, এমনই কণ্ঠস্বর: "ভ্রাতৃগণ, আজ নীলাম এখানেই রহিত থাকবে। আগামী কল্য পুনরায় ডাকা হবে। আজ লোক খুবই কম। কাল দশ হাজার এক শ হইতেই আরম্ভ হইবেক। আমেন্।"

দর্শকদের মধ্যে অনেক গুলতানি শুরু হলো। আর টুপি পরা সেই শেষ পোঁচ-মারা নীলাম-শিল্পী ত রেগেই খুন। ব্রাদার জনের চারিদিকে জটলা পেকে গেছে। সেখানে ভদ্রলোক জোর গলায় বলছে, This is sheer hypocrisy, এটা জোচ্চুরি···ইত্যাদি। আমার কৌতূহলের মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছিল। ভিড়ের সান্নিধ্য এই ক্ষেত্রে আরামদায়ক। আমি তাই পা বাড়াই।

নাসির আমার হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে বললো, "আর ভিড়ে সেঁধিও না।"

—"একটু মজা দেখে যাই।"

—"আর মজা দেখে কাজ নেই। যা গরম, সর্দি গর্মি হয়ে মরবে। চলো বাড়ী যাই!"

—"একটু দেখে যাই না।"

—"দেখে কাজ নেই। আমার কাছ থেকেই সব বিত্তান্ত শুনে নিও।"

আকাশে সূর্য তখন দোজখের পিণ্ড বললেই চলে। আমি নাসিরের কথা মেনে নিলুম।

আবাব চড়াই-উৎবাই। ওঠা-নামার ব্যাপাবটা এখন কষ্টকর।

নাসির হেসে বললে, "আর মজা দেখতে গেলে আমাদের মাজা ভেঙে যেত।"

রসিকতাব দিকে আমাব খেয়াল ছিল না। আমি বললাম, "নাসিব, ব্যাপার কী?"

সে বেশ মাথা দুলিয়ে, ঈষৎ ব্যঙ্গ আর ক্রুবতা মাখানো এক রকমের হাসি ছড়ালো, শেষে মুখ খুললে, "বাবা, এর নাম ব্রাদার জন!"

"জন?"

—"হ্যাঁ, ও এক জন বটে। আমার কোর্টে কেরোসিন ব্ল্যাকমার্কেটের দায়ে অভিযুক্ত। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, What have you to say, তোমার কী বলার আছে? জন জবাব দিল, End justifies the means, উদ্দেশ্য দিয়াই উপায়ের বিচার করা উচিত। আমি ব্ল্যাকমার্কেট করিয়াছি 'ভিক্ষুকদের লঙ্গরখানায় ভাত প্রদানের জন্য।"

—"অপরাধ স্বীকার করলে?"

—"হ্যাঁ। প্রথম অপরাধ। তাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ব্যাটা পাকা বদমাস। আজ দেখলে না, কি ভাবে ম্যানেজ করলে।"

—"কি ম্যানেজ?"

—"ঐ সম্পত্তির দাম কম্‌সে কম পঁচিশ হাজার। দশ হাজারে ছাড়তেই পারে না।"

নাসির আমার দিকে মুখ কুঁচকে, চোখ নাচিয়ে জনের বাহাদুরীর আবহাও'টা ফোটাতে চাইলে।

—"কিন্তু সৌদামিনী মালোর সম্পত্তি, আর নীলাম করছে ব্রাদার জন? এ ব্যাপারটা কী?"

নাসির তার সাদাচুল মাথা দুলিয়ে চোখের কোণায় হাসি মাখিয়ে জবাব দিলে, "সেটাই ত মজা।"

—"মজা ?"

—"শোনো। সে অনেক কথা। ব্রাদার জনের মত চিজকে ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক বয়ান প্রয়োজন।"

—"তা বয়ান করো।"

—"বেলার দিকে খেয়াল আছে ? খেয়েদেয়ে এসো সন্ধ্যায় আমার বাড়ী, তখন সব বলব, ব্রাদার জন-সৌদামিনী মালো উপাখ্যান।"

—"না, অত দেরী করতে পারব না। খেয়ে একটু জিরিয়েই বিকেলে আসছি। বিকেলের চা তোমার ওখানেই খাব।"

—"বেশ!"

কথায় কথায় আমরা রাস্তায় এসে পড়েছি। উংরাই শেষ হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে পা চালাতে লাগলুম।

২

"জানো সাজ্জাদ, ভাবছি, কোথা থেকে আরম্ভ করব ? ব্যাপারটা বেশ জটিল। নাসির মোল্লা এখন বুড়ো হয়ে এসেছে, বলতেই পারো। তাই ভয় পাচ্ছে। তবে শুরু করতে হয়।

সৌদামিনী মালো নবীগঞ্জের অধিবাসিনী। নবীগঞ্জে যে ব্যাপটিস্ট মিশন আছে, তারই কাছাকাছি। তুমি ঐ অঞ্চলে কতদিন সার্কেল অফিসার ছিলে, জায়গাটা ত চেনোই। অবশ্যি তখন ওখানে মিশনের পাদ্রী ছিল ফাদার জনসন। লোকটা ভালই। এদের আবার ভাল মন্দ কী? বৃটিশ রাজত্বের ভিৎ পাকা করতে এদের এখানে সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হতো, যেন দরকার মত outpost—আউটপোস্টের কাজ করতে পারে। গরীব দেশে এখানে-ওখানে দু'চারটে দাতব্য ডিস্‌পেন্সারী, কি এক আধটা স্কুল চালায়। লোকে ভাবে, আহা কি সব দয়ার প্রাণ! বৃটিশরা ভালই জানত, The nearest way to poor man's heart is down their throat—ইংরেজেরই প্রবাদ। ব্যাটারা এই ভাবে কিছু কিছু খ্রীষ্টানও বানায়। তারা ত ইংরেজের খয়ের খাঁ ব'নে যেত। বলতে পারো ইংরেজ বাহাদুর এমন ভাবে কিছু দেশী বাচ্চা পয়দা করত। নদীয়ার কাছে ত কত মুসলমানকে ওরা খ্রীষ্টান করে ফেলে। পড়েছ নজরুলের 'মৃত্যু-ক্ষুধা?' আসলে এরা কেউ যীশুখৃষ্টের ভৃত্য নয়, এরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভৃত্য। হ্যাঁ, কোথা থেকে

কোথা এসে পড়লাম। একটু ধৈর্য ধরে শোনো। বৃদ্ধকালে তাল রাখা দায়। কথায় কথায় অনেক দূর চলে গেছি।

হ্যাঁ, সৌদামিনীর স্বামী জগদীশ মালো ছিল পেশায় আরদালি। কিন্তু বেজায় তুখোড় লোক। প্রভুর মন যুগিয়ে চলার শিল্প সে রপ্ত করেছিল। যে-কোন অফিসারকেই খুশি করার পন্থা আবিষ্কারে দক্ষ জগদীশ মালো। ফলে, কলা-মুলো ভালই পেত। বখশিসে মোটা পেট এমন আরদালি তুমি দু'টি খুঁজে বের করতে পারবে না। আমি অবিশ্যি তাকে দেখিনি। আমারও শোনা কথা। তখন সস্তার বাজার। পুরা বেতন বাঁচত, তার উপর উপরি ইন্‌কাম। আর সে ত মিশরের সম্রাট হতে চায়নি। চেয়েছিল, গ্রামে দু চার বিঘে জমি-জিরেৎ, একটু অনটন-মুক্ত দিন-যাপন। পনর বিশ বছরের চাকুরীতে জগদীশ তা পুষিয়ে নিলে। কিন্তু বেচারার একটা বেশ দুঃখ ছিল। ছেলেপুলে নেই। এখন না হয় 'জমিন আবাদ, বাচ্চা বাদ্' ধুয়া শুনছো। ক' বছর আগে কে আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাতো? জগদীশের, মোদ্দা কথা, ছেলেপুলে হয় নি। সে-যুগে কে বন্ধ্যা, তা ত আর ঠিক করা যেত না—গেলেও, গাঁয়ে এসব রেওয়াজ ছিল না। সৌদামিনীর স্বামী স্থির করলে, আর একটা বিয়েই যুক্তিযুক্ত। অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক। বংশ ত গুম্ করে দেওয়া চলে না? কিন্তু বেচারা বর সাজার অবসর পায়নি। হঠাৎ মরে গেল। অথচ বিয়ের কথাবার্তা ঠিক। তার মৃত্যুটা আজও রহস্য রয়ে গেছে। কু-লোকেরা রটিয়ে দিলে সৌদামিনী তাকে বিষ খাইয়েছে। বংশ-রক্ষা হোক, কিন্তু অপরের সন্তানে নয়। সৌদামিনী ভেতরে ভেতরে হয়ত এমন একটা দুর্জয় পণ করে বসেছিল। এসব খোদাকেই মালুম। এইসব ক্ষেত্রে কোন মেয়ে কী করে, বোঝা দায়। কিন্তু তুমি বলছ, স্বামীকে হত্যা করবে না—তা অনুমান করা মুশকিল? মুশকিল কিছুই নয়। এমন হতে ত পারে। আমিও বলছি, গুজবের কথা। কারণ, এসব নিয়ে আর কোন তদারক হয়নি। এখন সৌদামিনীর বয়স চল্লিশ পার। জগদীশ পঞ্চাশের সামান্য এদিক কী ওদিক। হয়ত যৌবনের থাই নেই, তবু সতীন বা সতীনের ছেলে আসবে—তা সৌদামিনী মনের সঙ্গে মেলাতে পারে নি। অতএব দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল আচ্ছা। আমিও বলছি, অনুমানের কথা। যাক, ও-পাট চুকল। সৌদামিনী তখন একা। কিন্তু সেও হুঁশিয়ার মেয়ে। আর রব-দব ছিল জোর। তখনও দেহ আছে, তার উপর সম্পত্তি। গ্রামের দু-চার জন ছুঁচোর মত হয়ত ছোঁ-ছোঁ ঘুরঘুর করছিল। কিন্তু সৌদামিনী গোপনেও জগদীশেরই বৌ হোয়ে থাকল! অপবাদ কেউ দিতে

পারবে না। অবিশ্যি জগদীশ একটা কাজ করে যেতে পারত। কোন আত্মীয়ের নামে সম্পত্তি লিখেপড়ে সৌদামিনীকে জীবন-স্বত্বের অধিকারী করে দিত। কিন্তু তা হওয়ার যো ছিল না। ওর নিকট আত্মীয় ছিল জেঠতেতো দাদা। সে স্বদেশী করত। জগদীশ সরকারের পেয়ারা লোক। অন্য দিকে স্বদেশীবাবু। সাপে নেউলে আর কি দিয়ে বন্ধুত্ব হবে? এসব কথা তোমাকে শোনাচ্ছি, তাহলে সব বুঝতে পারবে। জগদীশ ত মরল। কিন্তু জের কাটল না। বিধবার সম্পত্তির দিকে ঐ আত্মীয়ের লোভ সহজে কী মেটে? অবিশ্যি আট দশ বছর এইভাবে কেটে গেছে। স্বদেশীবাবুর নাম মনোরঞ্জন মালো। তার বয়েস হয়ে গিয়েছিল। ছেলেপুলে আছে। জেল্‌টেল্ খেটে গ্রামে ফিরে সে নামে স্বদেশীবাবু রইল। সাদা টুপিটা পকেটে গুঁজে অথবা দরকার হলে মাথায় দিয়ে সেও মন দিলে সংসার গোছাতে। গ্রাম্য দলাদলির মধ্যে মাথা গলানো এবং তৎ-মওকায় দু-চার পয়সার দালালী বা টন্নিগিরির কমিশনে একটা আয়ের পথ ত খোলা যায়। এক কথায় স্বদেশীবাবুর শুভ্রতা তার টুপির মধ্যেই নিবদ্ধ রইল। পাশাপাশি বাড়ী। সুতরাং বিধবা বৌদির দিকে নজর পড়া স্বাভাবিক। ভুল বললাম, বৌদি নয় সম্পত্তির দিকে। কিন্তু সৌদামিনীর শরীর গৌর আর মুখ সুন্দর হলেও, কঠোর হওয়ার যথেষ্ট তেজ ছিল। অবরে-সবরে এই মানুষ আবার হীরার চেয়ে শক্ত হতে পারে, যত ঝগড়া ত সেইখানে। নচেৎ মনোরঞ্জন মালো কবে দুর্গ ফতে করে ফেলত। স্বদেশীবাবু প্রথম প্রথম কতকগুলো স্ট্র্যাটেজি—পাঁয়তারা কষে নিলে। একদিন হয়ত সকালে দেখা গেল, সৌদামিনীর কলা-বাগান থেকে কয়েক কাঁদি পাকা ফল গায়েব। কিছু চারা গাছ মাড়ানো। কিন্তু বিধবা পাড়া-পড়শীদের খুব মিষ্ট ভাষায় ব্যাপারটা জানিয়ে এলো। আর কিছু না। তারপর মাঝে মাঝে রাত্রে সে বন্দুক ছুঁড়ত। কমিশনার সাহেব জগদীশকে নিজের বন্দুক দিয়ে গিয়েছিল বখশিসরূপে। অস্ত্রখানা এখনও সৌদামিনীর কাছে আছে। তা ছাড়া তার তাক্ আশ্চর্য। বাড়ীর উঠানে চিল ঢুকতে সাহস পায় না। মনোরঞ্জন মালো ফেল মারলে। বৌদির চেহারা সুন্দর, কিন্তু তেজ তেমনি অপর্যাপ্ত। অবিশ্যি সৌদামিনীর কয়েকটা হাতের লোক ছিল। তার জমিনের চাষী, কয়েকজন। তারা বলত, "মায়ের অন্নে প্রতিপালিত, মার ত অপমান হতে দিতে পারি নে।" স্বদেশীবাবুর সেও একটা ভয়। ছোটলোকগুলো কখন কী করে বসে, বলা যায় না। আর সৌদামিনীর অন্তর ছিল। বিপদে-আপদে সে বহু মানুষকেই সাহায্য করত। বেড়ার মধ্যে গেরস্থর মুর্গী দেখলে জিভে জল-সরা শেয়াল যেমন ঘন ঘন তাকায় আর লোভের

চোটে ছটফট করে, মনোরঞ্জন মালো সেই রকম অবস্থায় নতুন পাঁয়তারা ভাঁজতে লাগল। কী করা যায়, কী করা যায়। অবিশ্যি সময়ও এদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, তা মনে রেখো। বছর যাচ্ছে, বছর আসছে। সৌদামিনীর চুল ক্রমশ শন, দেহে প্রৌঢ়ত্বের রেখা। কিন্তু আদাওতি ঠিক চলছে। সৌদামিনী বনাম স্বদেশীবাবু......

ঠিক এই পর্যায়ে দেখা দিল ব্রাদার জন। সে ত পরকালের চেয়ে ইহকালের খবর ঢের বেশী রাখে। তারপর মিশনের অবস্থা ভাল নয়। য়ুরোপে মহাযুদ্ধ বেঁধেছিল। ফলে ডোনার্স'রা আর খাত-মত চাঁদা পাঠায় না বা হার দিয়েছে কমিয়ে। সুতরাং আয় বৃদ্ধির উপায় একটা করতে হয়। ব্রাদার জন এলাকার খবর জানত। স্বদেশীবাবুর সঙ্গে তার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। কারণ বাবু এলাকার সবচেয়ে ভাল ইংরেজী কইয়ে-বলিয়ে। ভাষা মারফৎ একটা অদৃশ্য যোগসূত্র গড়ে ওঠে। অবিশ্যি তখনও পাদ্রীর ভূমিকা তত প্রকট হয়নি। আর বাবুর সঙ্গে কি কথাবার্তা হোত, তা খোদাকেই মালুম।

কিন্তু সৌদামিনী সকলের মুখে ছাই দিয়ে বসল।

ব্যাপারটা বলছি। সৌদামিনী মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আট দশ বিশ মাইল দূরে তার মাতৃকুলের কিছু ভাই-বোন কুটুম আছে। এক জায়গায় থেকে থেকে মানুষের প্রাণ তো হাঁপিয়ে ওঠে। সৌদামিনী এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ, ওরা রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এবার সে শুধু বেড়িয়ে এলো না, সঙ্গে নিয়ে এলো একটা বছর দুয়েকের শিশু। এক আত্মীয়ের কাছ থেকে আনা। পোষ্যপুত্র রাখবে সৌদামিনী। পোষ্যপুত্র! সম্পত্তির দিকে যারা চোখ রাখছিল, তারা এবার আকাশের দিকে চোখ তুললে। সম্পত্তির নতুন মালিক জুটে গেছে। আর শুধু মালিক নয়, চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারী। সৌদামিনী তাকে মানুষ করে তুলতে নিজের সামান্যতম আরাম পর্যন্ত বিলিয়ে দিলে। এবার সৌদামিনী জননী, যেন সদ্য আঁতুড়-ঘর-ছাড়া। চব্বিশ প্রহর চোখে চোখে রাখতে লাগল ছেলেটাকে। নাম রাখলে হরিদাস। হরিদাস বেড়ে উঠতে লাগল। চেহারাটা ফর্সা, বেশ খাড়া নাক। আর চোখ দুটো ঝিলিকে ঠাসা। সৌদামিনী, হরিদাসের মধ্যে জীবনের সমস্ত পূর্ণতার একটা প্রতীক খুঁজে পেলে যেন। বেশী বাইরে যেতে দিত না তাকে। কারণ, পাড়াপড়শীর চক্ষুশূল। ওর জন্যে আলাদা একটা শিক্ষকই রেখে দিলে বাড়ী এসে পড়িয়ে যাওয়ার জন্যে। আরো ন' দশ বছর এইভাবে কেটে গেল। সৌদামিনীর অবিশ্যি চুল পেকে গেছে। চেহারা নিষ্প্রভ। কিন্তু তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির

আভা ছিল। সেই মুখের দিকে তাকালে তোমার চোখ খুঁজে পাবে স্নিগ্ধতা, দয়া-সঞ্জাত এক রকমের তাপহর স্পর্শ। অবিশ্যি স্বদেশীবাবুও বসে নেই। তারও বয়েস বাড়ছে। আর তৎসঙ্গে সংসার। অর্থাৎ সর্বরকমের বোঝা। সম্পত্তির দিকে চাইলে এখন চোখ পুড়ে যায়। নতুন গেরো এসে জুটেছে। হরিদাসের বয়স বারো। একটা মেয়েমানুষের কাছে হেরে যাবে মনোরঞ্জন মালো? আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা বরকন্দাজের উপপত্নীর (হোক বৌদি) কাছে? একটা কিছু করতে হয়। ব্রাদার জনের মিশন চলছে না ঠিকমত! তারও কিছু রুজি-রোজগার প্রয়োজন। একদিন ওদিকে গেলে কিছু একটা যুক্তি করা যায়। স্বদেশীবাবু মনে মনে এসব লঙ্কাভাগ করেছিল নিশ্চয়। ...আঁচ করতে পারো, সাজ্জাদ!...হ্যাঁ, জ্ঞাতিশত্রু বড় শত্রু। মনোরঞ্জন মালো এবার একটা বোমা ফাটালে, স্বদেশী আমলে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে থেকেও যা সে করতে সাহস পায়নি।

সে গ্রামময় প্রচার করে দিলে, সৌদামিনীর পোষ্যপুত্র জাতে নমশূদ্র নয়, ব্রাহ্মণ। ব্যাপারটা তলিয়ে ছাখো। কী ভয়ানক শাস্ত্র-বিরুদ্ধ পাপকর্ম। ব্রাহ্মণের জাত মেরেছে এক শূদ্রাণী! রাম, রাম। স্বদেশীবাবু এই ঢিলে পাখীকে কাৎ করে ছাড়লে। আগে শত্রুতা বা ঈর্ষা যা বলো, ছিল ব্যক্তিগত। এবার তা সমাজগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। গ্রামে দু-চার ঘর ব্রাহ্মণ কায়েত মাহিষ্য ছিল, তারা দাঁতে আঙুল কাটলে। ছি ছি, এমন কথা কে কোনদিন শুনেছে। যাদের বয়েস বেশী, তারা মন্তব্য করলে: কলিকাল। সৌদামিনীকে গ্রাম-সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হোলো—সে বেশ জোর দিয়ে হলপ করে বললে, হরিদাস শূদ্র—তার দূর সম্পর্কীয় এক গরীব আত্মীয়ের ছেলে। পরিস্থিতি আপাতত ঐখানে চুকলো। কিন্তু সৌদামিনীর বিরুদ্ধে ত মনোরঞ্জন মালো একা নয়। আরো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আছে। সুতরাং গ্রামের অঢেল নিষ্কর্মা প্রহর তারা সহজে যেতে দিলে না। খোঁজ নিয়েই দেখা যাক। যদিও বিশ মাইল দূরে, কিছু রাহা-খরচ যাবে, যাক। আহা, ভগবান যাকে ডাক দেয় সে ত হেঁটে হেঁটে বারাণসী চলে যায় তীর্থ করতে। এই দশ ক্রোশ পথ আর তারা সামাল দিতে পারবে না? বোঝা গেল. ওদের সেবার ভগবান ডাক দিয়েছিল। একজন দেব-উৎসর্গীত প্রাণ বারোয়ারী রাহা খরচে সৌদামিনীর সেই আত্মীয়-বাড়ী থেকে খোঁজ নিয়ে ফিরল। বাজি মাৎ। মজ্‌কুর ব্যক্তির কোন ছেলেই নেই। সব মেয়ে। সৌদামিনী ঝুট বলেছে, মিথ্যাবাদিনী। সমস্ত গ্রাম তোলপাড়। ধর্মের কল বাতাসে নড়ছিল, সেটা যুধিষ্ঠিরের দল থামাতে চায়, নচেৎ কল ত ভেঙে যেতে পারে। সৌদামিনী এবার বেশ রোয়াবের সঙ্গে

জবাব দিলে। কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করলে না। সমস্ত গ্রাম তার বিরুদ্ধে। আর জুলুম শুরু হোলো। তার ছাগল মাঠ থেকে আর ফিরল না, দুধেলা দুটো গাই হারিয়ে গেলো। এমন ছোট-খাট নিত্য নির্যাতন। একদিন ব্রাদার জন এই সময় গ্রামে এলো। ইহকালের খবর সে পরকালের চেয়ে কম রাখে না, আগেই বলেছি। ব্রাদার জন ব্যাপারটা শুনে গ্রামবাসীদের মিটিয়ে ফেলতে বললে ব্যাপারটা, সৌদামিনীর সামনেই। একটা ছেলে মানুষ করছে…মানুষ…'সে শূদ্র আছে না কায়েৎ আছে গড্ এসব দেখিতে বারন করিয়াছে'—এই জাতীয় নানা বাণী ছাড়লে। সৌদামিনী কাঁদতে কাঁদতে ব্রাদার জনকে উকীল পাকড়ালে একটা মিটমাটের জন্যে। মনোরঞ্জন মালোর সঙ্গেও এক পাশে চুপি চুপি কী কথা হোলো তা ব্রাদার জনের গডই জানে। বিষয় নিষ্পত্তি প্রয়োজন। কিন্তু মনোরঞ্জন মালো ত সম্পত্তি-নিষ্পত্তি চায়। ব্রাদার জন বললে, দু'দিন সবুর করো, আমি ফয়সালা করিয়া দিবে। আর মনে রেখো, সৌদামিনী এখন কোণঠাসা। এই হপ্তায় তার চুল শন হয়ে গেছে। আগে ত বুড়ি মনে হোত না, এখন ত শ্মশান-যাত্রীর সামিল ধরে নিতে পারো। যারা এই অবস্থায় ওকে দেখেছিল, তাদের কাছেই শুনেছি। হরিদাস আর বাড়ীর বাইরে যেতো না। যেতে চাইলে কেঁদেকেটে বাধা দিত। চতুর্দিকে ঘোলাটে আবহাওয়া। ব্রাদার জন এই গ্রামে আসে কিন্তু সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করে না। শেষে কয়েকজন মরীয়া ধর্মপুত্র ত একদিন সৌদামিনীর বাড়ী হামলা করে বসলো। কিছু শান্ত প্রকৃতির বুড়ো মানুষ এই ঈশ্বরপ্রাণ ব্যক্তিদের থামালে। কিন্তু সৌদামিনী বাপের বেটী, বাঘের দুধ খেয়েই বোধহয় মানুষ—বেরিয়ে এলো একদম নিরস্ত্র, যদিও বাড়ীতে বন্দুক আছে। ক্ষিপ্ত জনতার সামনে সে এবার বোমা ফাটালে। বোমাও বোধহয় এত শব্দ তুলতে পারত না। সৌদামিনী চোখ থেকে শিবের মত আগুন ছড়িয়েই বললে· কি বললে, শোনো। তার কথাটাই মুখজবানি পেশ করতে হয়। সৌদামিনীর উপর তখন যেন কিছু ভর করেছিল।

…শোন অভাগীর ব্যাটারা, ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির দল—আমার হরিদাস শূদ্রও নয়, ব্রাহ্মণও নয়। শোন্, কী। তোরা ত জানিস, আমি বছরে দু-বার আত্মীয়বাড়ী যাই। তখন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, একদম পুরো কোটাল। গাঁয়ে গাঁয়ে হাজার দু-হাজার লোক মরছে হপ্তায়। আমি ফিরছিলাম হরিশচক থেকে·· আলোক ডাঙার কাছাকাছি আসতে বেহারাদের তেষ্টা লাগল। একটা আমগাছের তলায় পাল্কী রেখে ওরা গেল জল খেতে। পুকুর আছে বিঘে দুই জমি দূরে। আমার সামনে আবার একটা ধান ক্ষেত। ধান পেকে গেছে। আর পনর দিন বাঁচলে কত লোক বেঁচে যেত নিজের

ক্ষেতের চাল খেয়ে। কিন্তু তা আর হলো কৈ। হঠাৎ ধানক্ষেত থেকে শিশুর কান্না আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, একজন লোক জমিন আঁকড়ে মরে পড়ে আছে। মুখে দাড়ি। তাব পাশে একটা মরা মেয়ে। তার পাশে একটা ছেলে। বসে মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে থেকে থেকে, আবার উঠে বসছে। কিন্তু সে-ও চিঁ চিঁ করছে, ধুঁকছে। ছেলেটার পানে চাইতে আমার দিকে হাত বাড়ালে। চোখের চাওয়া কী করুণ! আমিও অজানিতে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বছর তিনেকের ছেলে; কিন্তু অনাহারে-অনাহারে দেড় বছরের বেশী দেখায় না। কোলে তুলে নিলাম···নিয়ে এলাম···পাল্কীর ভেতর লুকিয়ে রাখলাম···আপিম খাই, সঙ্গে দুধ ছিল···দুধ দিতে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। বেহারারা টের পেলে না। এক আত্মীয়ের কাছে তিন মাসের জন্য রেখে এলুম দু'শ টাকা দিয়ে। ভাল খাওয়া দাওয়ায় ছেলেটা বেশ তাজা হয়ে উঠল। তারপর নিয়ে এলাম। ওর আসল বাবা, লুঙ্গি-পরা দাড়ীওয়ালা সেই মুসলমান চাষী · আমার হরিদাস মুসলমান···

যেন বাজ পড়ল উপস্থিত জনতার উপর। বেশ কাটল কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু সৌদামিনীকে কেউ একটা উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেলো না। তামাসা দেখতে দু-চার জন মুসলমান পর্যন্ত জুটেছিল। এখন ব্যাপার অন্যদিকে গড়াতে পারে। ধর্মপুত্রেরা যে-যার মানে মানে বাড়ী ফিরলে। বুঝলে, আর গোলমাল বিধেয় নয়। ব্যাপার আরো থিতিয়ে যাক, তখন দেখা যাবে। স্বদেশীবাবু অন্তত তাই ভেবেছিল। তাই ভেগেছিল।

সেই রাত্রে হরিদাস বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল। সৌদামিনী ব্রাদার জন-কে ডাকিয়ে আনলে এক হপ্তা অপেক্ষার পর। সে খ্রীষ্টান হবে। ব্রাদার জন প্রথমে বারণ করলে, উপদেশ দিলে, ধর্মত্যাগ ভাল নয়। শোনা কথা বলছি। ধরে নাও তা হতেও পারে। নৌকা ঠেলে দিয়ে বিয়াইকে 'আজ থাকলে হতো' বলার মত!

সৌদামিনী খৃষ্টান হয়ে গেল। তিন চার দিনের মধ্যে তার সমস্ত সম্পত্তি মিশনের নামে লিখে পড়ে দিলে পর্যন্ত। নিজে উঠে গেল মিশনের বাড়ীতে।

কিন্তু সাজ্জাদ, বুড়ো গাছ উপড়ে অন্য জায়গায় পুঁতলে কি আর শিকড় গজাবে? কিসের যীশুখৃষ্ট আর বটবৃক্ষ—। সৌদামিনী এক মাসের মধ্যে পাগল হয়ে গেল। বদলী হওয়ার আগে এক সিস্টারের মুখে শুনেছিলাম, সৌদামিনী প্রায় কাঁদত আর চীৎকার দিত: আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল—! হে যীশু, ও হরি, হে আল্লা, আমার হরিদাসকে ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে!

আজই জানতে পারলাম, এতদিনে হতভাগিনীর হাড় জুড়িয়েছে!

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

চামড়ার মোটা ব্যাগ হাতে দুলিয়ে ভদ্রলোক ওদিকের গাড়িগুলির কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। অনেকগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করেও পছন্দ হচ্ছে না। ব্যাগ খুলে টাকা গুণে দিলেই হয়, কিন্তু কিনবেন কিনা তাই ভাবছেন। কপালের ওপর ভাঁজ পড়েছে গোটা কয়েক। সেল্‌স গার্লটিও চেয়ে আছে মুখের দিকে, তাই কিছু বলতে গেলেন—

'আচ্ছা এটা, এটাও কি কিকস্টার্ট নাকি ?'

'ও ইয়েস, এটাও কিকস্টার্ট। গীয়র পায়ে, ব্রেক পায়ে। কিকস্টার্টে বরং স্থবিধে, স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বুঝতে পারবেন গাড়িটা স্টার্ট হল কিনা।

'ইয়ে—স্পীড কত ?'

'অ্যাবাউট ফিফটি মাইলস পার আওয়ার। সিংগেল মেসিন একটা হোণ্ডায় ফিফটি মাইলস কম নয়।'

'ডাবল মেসিন···'

মেয়েটি লুফে নিল কথা, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও আছে। আস্থন ওই দিকটায়'—

দ্রুতপায়ে মেয়েটি এগিয়ে গেল কোণাকুণি। কাঁধ থেকে পাতলা কারুকার্যময় তাঁতের শাড়ি খসে পড়ে অর্ধ অনাবৃত বাহু প্রকাশ করে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মুখে সৌজন্যের হাসি। বুকের ওপরে পড়ন্ত শাড়িটা ধরে ফেলেছে। তুলে দিল।

'এগুলো হচ্ছে ডাবল মেসিন। সেল্‌ফ স্টার্ট। ইজি অ্যাণ্ড স্মুদ গোয়িং। আপনি বুঝতে পারবেন না হোণ্ডা চালাচ্ছেন, মনে হবে গাড়ি চালাচ্ছেন।'

অনেকক্ষণ বলে থামল মেয়েটি। দেখান শেষ হয়েছে। ভদ্রলোক ইতস্তত করছেন। মনে ধরেছে বোধহয় কথাগুলো। চেয়ে আছে, ভদ্রলোকের মুখে আগের সেই অনিচ্ছা নেই। চোখাচোখি হল।

'আমি ভাবল মেসিনই একটা কিনব। শুনেছি এগুলো ট্রাবল দেয় না, আপনিও সেকথা বললেন। সেল্‌ফ স্টার্টও সুবিধের মনে হচ্ছে।'

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় টেবিলে বসে থাকা একটা লোকের কাছে এগিয়ে গেল মেয়েটি।—'একটা ক্যাশ মেমো করুন মিস্টার মল্লিক।'

ভদ্রলোক ব্যাগ খুললেন, টাকা গুনলেন, মেমো হাতে নিয়ে ব্যাগে পুরলেন। 'দেখুন, ডেলিভারী আমি আজ নেব না, সোমবারে নেব।'

'ঠিক আছে।'

মেয়েটা একটা কাগজে সোল্‌ড লিখে হোণ্ডার গায়ে লটকিয়ে এল: দুটো বেজেছে। দোকান বন্ধ হবে। আজ শনিবার তাই দুটো পর্যন্ত দোকান খোলা। অন্যান্য কর্মচারীরা এখনো যায়নি। মল্লিক এবং জেসমিন একসঙ্গে ফুটপাতে নামল।

সামনে একটা স্টেশনারী দোকানে ঢুকল তারা।

'এখানে কি দরকার?' মল্লিক জানতে চাইল।

'কিছু কেনাকাটার আছে।'

কিছুদূর এগিয়ে একটা বইয়ের দোকান। দোকানটার সামনে এসে হেসে মেয়েটা বলল, 'এক মিনিট মল্লিক।...শেষের কবিতা আছে?'

'আমার দোকানে দুটো শেষের কবিতা আছে। আপনি কোনটা চাইছেন?'

'আমি রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা চাই।'

'আছে। এই নিন।'

'নজরুলের অগ্নিবীণা দিন একটা।'

'এই নিন।'

'আর কি আছে, ভালো?'

এত বই নিতে দেখে মল্লিক বলল, 'এত বই কেন?'

'আছে, এ কেন-র উত্তর কাল পাবে।'

'কাল কেন?'

'হ্যাঁ, কাল। চল।'

'বইয়ের দাম?'

'দিয়েছি। চল।'

খানিকটা পথ এগিয়ে মল্লিক বলল, 'এগুলো বুঝি আমার কালকের জন্মদিনের উপহার?'

জেসমিন মাথা নেড়ে হাসল। এসো পেট্রল পাম্পের কাছে এসে উভয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। ধীরে ধীরে গলিটা ধরে হেঁটে চলল মল্লিক। ওদিকে আগামীকালের প্রতীক্ষায় খুশিমনে দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটছিল জেসমিন। গলিটার শেষ বাড়ীটা পাশ কাটিয়ে সুপার মার্কেটের কাছে বড় রাস্তার ওপর মাথা তুলেছে। নাতিপ্রশস্ত গলিমধ্যে গরম বাতাসের ধীরস্থির আনাগোনা। মাথার ওপরে চনচনে রোদ। জেসমিনের সঙ্গে মেসার্স আহমদ কোং-এই পরিচয়। মেয়েটা গোড়ার দিকেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কেউ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করুক বা কারো দৃষ্টি তার ওপর পড়ুক এটা সে চায় না। তবু তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপর একটি বছরের মধ্যে হৃদ্যতা ছাড়িয়ে হৃদয়ের কাছাকাছি। অফিস-ফেরত লোক ভর্তি গলিতেই হেসে উঠল মল্লিক। কেন লোকে হৃদয়ের কাছে আসে, কাছে আসতে চায়? বাড়ির দরজায় পৌঁছল। ক্লান্ত বিমুখ পা টেনে টেনে হিঁচড়ে উপরে উঠল। পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল। ঘরে ঢুকেই ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। ঘরটাকে মনে হচ্ছে বাড়ি বদলে এইমাত্র নতুন এক ঘরে এসে মালপত্তর নামিয়ে রাখা হয়েছে। সব বিশৃঙ্খল।

শার্ট-প্যান্ট গেঞ্জি খুলে ঘরের দড়ির আলনায় ঝুলিয়ে দিল। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অর্ধনগ্ন অবস্থায় শুয়ে শুয়ে নিমগ্ন হলো ভাবনায়। নগ্নতার প্রতি মল্লিকের কোনোপ্রকার বিদ্বেষ নেই। দেহের প্রতিটি ভঙ্গির পরিমাপে মানুষ যে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার প্রমাণ হয়ে যেত, মল্লিক একথা বিশ্বাস করে। নারী যে প্রকৃতির রহস্য এবং নারী-দেহ একাধারে সৌন্দর্য ও বেঢপ দেহ গড়নের মূর্ত প্রতীক তাও আর কারোকে বুঝিয়ে বলতে হত না।

বিছানা ছেড়ে উঠে জামা আর পায়ে পরবার স্পঞ্জ জোড়া নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। সকালে একবার স্নান করে অফিসে গিয়েছে। রোদে হেঁটে এসে ঠাণ্ডা হবার জন্যে এখন একবার স্নান করা আবশ্যক। শাওয়ারের চাবিটা ঘুরিয়ে দিল। রোদে ট্যাংক গরম হয়ে জলটা ত নিশ্চয় আগুনের মত হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় ফিরে স্নান করতে গিয়ে দেখেছিল জল তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। কিন্তু কই, মাথায় যে এখনো জলস্পর্শ নেই। চাবিটা আর একটু ঘুরিয়ে দিল। এবারও না। এ সময়ে জল না থাকার দরুন মল্লিক ওয়াসার ওপর বিরক্ত হল।

সন্ধ্যার আগে নতুন জলে স্নান করে সামনের পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসল। এধারে ওধারে ছেলেমেয়ে খেলছে। মল্লিকের ঠিক সামনে দিয়ে একটি যুবতী প্যারাম্বুলেটরে বাচ্চা ঠেলে নিয়ে গেল। দৃশ্যটি দেখে আগাগোড়া জ্বলে উঠল

মল্লিক। নতুন মা হয়েছে বোধ হয় মেয়েটা। বিরক্তিতে ভুরু দুটো এক হয়ে এলো।

পার্ক ছেড়ে বাইরে এলো। থমকাতে হল। পুরো রাস্তা জুড়ে এক পাল ছাগল-ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকটা লোক। ঊর্ধ্বশ্বাসে কয়েকটা ছাগল মল্লিকের আশপাশ দিয়ে দৌড়ে পার্কে ঢুকে পড়ল। একটা লোক গিয়ে ওগুলিকে তাড়িয়ে বার করে আনলো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মল্লিক একবার ছাগলগুলি যেদিকে ছুটছিল সেইদিকে তাকাল। মনে পড়ল ওদিকে আধ মাইল পরে কসাইখানা। ছাগলগুলো নিয়ে এখন জবাই করবে। জবাই করে একবার ঝুলিয়ে দিলেই প্রতি সের সাড়ে তিন টাকা।

বাসায় ফিরে এল। আর একটু পরে একেবারে কোন হোটেলে খেয়ে এলেই চলত। ক্ষিদে নেই। শুয়ে পড়ল দুপুরের এলোমেলো বিছানাতেই। খানিকক্ষণ আশেপাশে দু' একটা মশার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনলো। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল খুব সকালে। পার্কটাতে গিয়ে একবার ঘুরে এলো। আকাশ তখন পরিষ্কার হচ্ছে। রোজই এ সময় দুটো ফ্ল্যাট পরেরই একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। মেয়েটিও পার্কে বেড়াতে আসে। আজো এসেছিল। মিষ্টি করে একবার হেসেছেও। ঘরে এসে মল্লিকের খারাপ লাগল। আজ তার জন্মদিন। জেসমিনই একদিন জেরা করে জেনে নিয়েছিল। মেয়েটিকেও আসতে বললে হত। কথা হয়নি যদিও, এই ফাঁকে কথাও হত।

ঘরটা গুছিয়ে ফেলল দ্রুত হাতে। গোছানো শেষ হলে একটা চেয়ার টেনে জানালার ধারে বসল। আপাতত করবার কিছু নেই। মন্থর গতিতে সময় চলছে।

দরজায় টোকা পড়ছে। দরজার দিকে চাইল মল্লিক। সবে ন'টা। এ সময় কে আসতে পারে। মল্লিকের বন্ধু নেই, বন্ধুত্ব তার কাম্য নয়। আবার টোকা পড়ল। বসে থেকেই গলা চড়িয়ে বললে, 'ভিতরে এসো।'

বলার পর যে ঘরে ঢুকল তাকে ও এমনভাবে দেখবে আশা করেনি। জেসমিন রক্তরং শাড়িতে সজ্জিতা। গৌরী দেহের ওপর আলতা রং ছায়ায় জেসমিন যেন অপরূপা! ঘন কুন্তলের প্রশস্ত সিঁথির ছায়াশ্রিত ললাটে কুমকুমের টিপ। চোখের কোণায় কাজলটানা। হাতে রক্ত গোলাপের একটি তোড়া এবং উপহার। বিস্মিত নেত্রে মল্লিক চেয়ে রইল।

এগিয়ে এসে হাতের বস্তুগুলি টেবিলের ওপর রাখল। তারপর মল্লিকের কাছে এগিয়ে এল। তোড়াটি বাড়িয়ে ধরল সামনে, 'নাও।'

বিস্ময়াহত মল্লিক তোড়াটি নিল। জেসমিন মৃদু ঝংকার তুলে হাসল। জানালা দিয়ে আসা পূবের সূর্যের আলো ওর ঝকঝকে দাঁতের ওপর পড়ে সোনালী দেখাল। জানালার ফ্রেমে নিতম্বের ভর রেখে ঘুরে দাঁড়াল জেসমিন। 'একটু আগেই এলাম। আজ তোমার জন্মদিন, আজও সময় ধরে এলে চলবে কেন? কই তোমার নিমন্ত্রিতেরা কেউ আসেনি?'

'না।'

'তারা ঠিক দশটার পর আসবে।' জেসমিন হাসল, উঁচু বুকে হাসির ছন্দে কয়েকটা ঢেউ দুলল—'বংগালী তো, দেখবে সবাই এসে পৌঁছতে এগোরোটা বেজে গিয়েছে।'

থামল। চোখ বুলিয়ে ঘরটা দেখল। মল্লিকের ওপর এসে দৃষ্টি থামল। যাক, তবে সত্যি সত্যি সভ্যভব্য হয়েছ। যা হাল করে রাখতে ঘরের। কেমন করে থাক তুমি এর মধ্যে?'

'অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'অভ্যেস ফেরাও। এত বলছি তবু শুনবে না। আমি এলে তোমাকে এমন বিশৃঙ্খল ঘরে থাকতে দেব না, সময় পেলে অবশ্য এখনো আমি মাঝে মাঝে এসে ঘরটা গুছিয়ে গাছিয়ে দোব। তুমি ঘরের একটা চাবি দেবে আমাকে।'

হাসছে। বাতাসে আঁচল আর বিনুনী-ত্যক্ত চুলগুলি উড়ছে। অপমানে ক্ষোভে কালো হয়ে উঠেছে মল্লিকের মুখ।

'কই কিছু বলছ না।'

'দেব।'

'আজই দিও। তুমি আবার ভুলে যাবে।'

'ভুলব না।'

কিছুক্ষণের নীরবতা। সাড়ে দশটা বেজেছে। ওরা দু'জনে ছাড়া এখনো কেউ আসেনি।

'কই, এখনো কেউ এলো না যে?'

মল্লিক নিচের রাস্তায় যানবাহন দেখছে। জেসমিনের কথার উত্তর দিল না।

'শুনতে পাচ্ছ?'

'বল।'

'নিমন্ত্রিতেরা কেউ এলো না যে?'

'আসবে না।'

'নিমন্ত্রণ করনি বুঝি কাউকে ?'

'না।'

'এটা তোমার অন্যায়। বছরে জন্মদিন একটাই আসে, সেদিন সবাইকে নেমন্তন্ন করে একসঙ্গে ফুর্তি করবে। তা না করে তুমি চুপচাপ বসে আছ। আগে জানলে আমি তোমার বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে আনতাম।'

মল্লিক দেখছে। জেসমিন ঘরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। থমকে দাঁড়াল। চোখ গেছে দেয়ালে টাঙ্গানো ফটোর দিকে।

'এরা কারা ? এই মহিলা আর তার দুই পার্শ্বে দুজন পুরুষ ? এরা ?'

জেসমিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে মল্লিক ফটোর দিকে তাকাল। মুখটা সহসা যন্ত্রণাক্ত এবং কালো দেখাল।

'এদের জন্যে তোমার ঐ পরিকল্পনা সফল হত না।'

'কিন্তু এরা কারা ?'

মল্লিক নীরব। দৃষ্টিটা জেসমিনের মুখের ওপর থমকে আছে।

ফটোটা জেসমিন আবার দেখল। মন্তব্য করল, ভদ্রমহিলা বয়সকালে সুন্দরী ছিলেন। ফটোটা তার কবেকার ?

মল্লিক অপলকে দেখছে। কপোতীর বুকের মত বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। নিশ্বাসের মুখে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উড়িয়ে দেবে যেন।

আবার দেখল ফটোটা, কিছু একটা আবিষ্কার করল। বিস্ময়স্তব্ধ। 'এ যে দেখছি তোমার মুখটাই বসানো।'

বার কয়েক ফটো এবং মল্লিক ও মল্লিক এবং ফটোর দিকে দৃষ্টিপাত করল।

'আমার মুখটা বসানো নয়, ওঁর মুখটাই আমার মুখে বসানো।'

'এ তো আশ্চর্য !' জেসমিন উত্তরোত্তর বিস্মিত।

'আমার মা।'

'তোমার মা ?'

'হ্যাঁ, ঐ ভদ্রমহিলা আমার মা।'

নিজের অজ্ঞাতে জেসমিন একবার ফটোটা দেখল। হঠাৎ চমকে উঠল। কিছু অবিশ্বাস্য ঠেকছে। নিজের অজ্ঞাতেই প্রশ্ন করে বসল, 'ঐ লোক দুটো ?'

'আমার বাবা।'

কঠিন রুক্ষ মুখে মল্লিক লক্ষ্য করছে আরেকজনের মুখের পরিবর্তন। কতটা

আঘাত পেল চোখ দুটো দিয়ে তাই দেখছে যেন। জেসমিনের মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছে। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'কি বললে?'

দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল কথাটা মল্লিক। টলছে। পড়ে যাচ্ছিল, মল্লিক ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল। চোখ দুটো মুদে এসেছে।

চোখ মেলল। চেয়ে রইল মল্লিকের মুখের দিকে স্তব্ধ যন্ত্রণাক্ত চোখ মেলে। মল্লিক যেন এইরকম চেয়ে থাকার জবাব দিতে চাইল, 'তুমি পড়ে যাচ্ছিলে। আমি ধরে ফেলেছি।'

জেসমিনের চোখ দুটো মল্লিকের মুখের ওপর থেকে ফটোর দিকে উঠে গেল। আবার নেমে এসে স্থির হল মুখের ওপর। মল্লিক ফটোটা দেখল। জেসমিনের দিকে ঝুঁকে বলল, ফটোটা আমার জন্মের পর মার দুপাশে পিতৃদ্বয় দাঁড়িয়ে তুলেছিল। আমার বয়স তখন দেড় বছর।

একটা কাতর শব্দ করে বালিশে মুখ গুঁজে দিল জেসমিন। মল্লিক উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল। জেসমিন বিছানা ছেড়ে উঠে মল্লিকের সামনে দাঁড়াল।

'তুমি তোমার মায়ের জারজ সন্তান একথা আমাকে বলনি কেন?'

মল্লিক সোজাসুজি তাকিয়ে রইল জেসমিনের দিকে। জেসমিন রাগে অপমানে জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে।—'ভেবেছিলে জারজ সন্তান হয়ে একটা পবিত্র মেয়েকে বিয়ে করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে? মনে করেছিলে সত্য কথা গোপন করলেই তোমার জন্মের ইতিহাস কলঙ্কমুক্ত হবে? নিচ্‌জন্মে হয়ে আমাকে নিয়ে ঘর-, সংসার করবে, আর তোমার ছেলেমেয়েরা সমাজের মানুষ হয়ে জন্মাবে?'

জেসমিন প্রতারিত হবার ক্ষোভে নির্মম হয়ে উঠল।—'বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়িয়েছিলে তুমি, তোমার অত লোভ করতে লজ্জা হল না?'

'জন্মে যদি আমি সত্য হয়ে থাকি, আমার জন্মটাও তবে অসত্য নয়।'

'ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। জারজের আবার দেমাক।'

'জেসমিন।' সহসা গগনবিদারী চিৎকার করে উঠল মল্লিক।—'অহম্‌বোধ আমার বেশী। যা ইচ্ছে তাই বলে তুমি আমাকে অপমান করতে পারবে না। দোষ আমার নয়, আমার জন্মেরও নয়, দোষ যদি কিছু থেকে থাকে তা আমার মার। কিন্তু মাকে আমি দোষী ভাবতে পারি না। মার রূপ ছিল, যৌবন ছিল, তাই হয়ত—

'মল্লিক!' জেসমিন কঠোর কণ্ঠে ডেকে উঠল।

'আমার মা দুই পুরুষের কাছে আত্মনিবেদন করেছে। পুরুষের কামনাদীপ্ত

লালসাচর্চিত দৃষ্টির সামনে নিজেদের অর্ধনগ্ন করে বেড়াচ্ছো তোমরা। তোমাদের সতীত্ব আমার মায়ের সতীত্বের অনেক নিচে।'

'উহ্!' বিষাক্ত শরাহত হওয়ার বেদনায় জেসমিন টলে উঠল। মল্লিক চেয়ে দেখছে। খাটের বাজু ধরে নিজেকে সামলে নিল জেসমিন। দরজার দিকে এগুল। মল্লিক ছুটে গিয়ে গতিরোধ করে দাঁড়াল।

'সরে দাঁড়াও।'

'না।'

'এখানে আর এক মুহূর্তও আমি থাকব না। সরে দাঁড়াও।'

'না।'

জেসমিন জ্বলে ওঠা চোখ দুটো তুলে তাকাল, চোখাচোখি হল। সে কিছু একটা বলার আগেই মল্লিক বলল, 'আজ যখন বলতে শুরু করেছি তখন আর ফেরা যায় না। তোমাকে সব শুনতে হবে।'

'না। আমি তোমাকে ঘেন্না করি।'

'করো তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু সব না শুনে তুমি যেতে পার না।'

'আমি শুনব না।'

'না শুনলে। কিন্তু আমার বলা শেষ না হলে তুমি যেতে পারবে না। তোমার উপস্থিতিতে আমি বলব সব কথা।'

'জোর করছ?'

'হ্যাঁ।'

জেসমিন বসে পড়ল। মল্লিক বলল, 'সব কথা বলা শেষ হলে আমি তোমাকে আমার মাকে দেখাব।'

ছিটকে উঠে দাঁড়াল জেসমিন, 'কি! তোমার মা কি এখানে? বেঁচে আছে?' চারপাশে দৃষ্টি ফেরাতে লাগল।

'হ্যাঁ, বেঁচে আছে। এখানে নয়, ঐ পাশের ঘরে।'

ঘাড় ফিরিয়ে জেসমিন একটা দরজার শিকল তোলা দেখল। সভয়ে তাকিয়ে রইল ঐদিকে।

মল্লিক বলল, 'মা আজ তিন বছর ইনভ্যালিড হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছে। এই তিন বছরে যথেষ্ট ধকল গেছে মার ওপর দিয়ে, মা মরেনি। গত বছর একটা নতুন উপসর্গ জুটেছে। বাকশক্তি রহিত হয়েছে। তবু বেঁচে আছে! মৃত্যু হয়ত

খুব দূরে নয়, কিন্তু এখনো সে বেঁচে আছে, তাই তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। মরে গেলেও করব।'

জেসমিন মল্লিকের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল যেন সামনে সে নির্মম ব্যাধকে দেখছে।

মল্লিক বলল, 'বাবা ছিলেন ফরেস্ট অফিসার। এক ঝড়ের রাতে বাইরে গিয়ে বাংলোতে ফিরতে পারলেন না, যাবার সময় তাঁর বন্ধুকে বলে গিয়েছিলেন। শহরের মেয়ে ছিল মা। বনবাদাড়ে এসে ভয় পেত বলে বাবা কোথাও বাইরে গেলে তাঁর বন্ধু নাসিরকে বলে যেতেন। নাসির এসে রইল মার কাছে সে রাত্রে। বাইরে তুমুল ঝড়। কতকগুলি দানব যেন বড় বড় গাছগুলি নিয়ে টানা-হেঁচড়া শুরু করে দিয়েছে। মা একা ঘরে ভয় পেল কিনা দেখতে এসে নাসির যা দেখল, আমার জারজ হয়ে জন্মাবার জন্যে তাই যথেষ্ট ছিল। কেউ জানল না, কেউ দেখল না, ভবিষ্যতের একটি নিষ্পাপ মানুষকে তারা কলঙ্কিত করল। সে চিহ্নিত হয়ে রইল। সবার থেকে। আমি জন্ম নিলাম। বড় হলাম! বাবা মারা গেলেন। মায়ের রক্ষক হয়ে রইল নাসির সাহেব, কিন্তু মার বুঝি তা সহ্য হল না। আমরা তার দয়ার বেড়ি ছিঁড়ে পাড়ি জমালাম অনেক দূরে। অবশেষে গত যুগ ধরে এইখানে। সেইখানে। সেই সময় উপার্জনের সন্ধানে নামবার আগে মা এক সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে সব বলল। ঘরে বাতি জ্বালানো ছিল না, কেউ বাতি জ্বালাবার দরকারও বোধ করিনি। হয়ত তাই নির্দ্বিধায় মা সব বলেছিল। বলে আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমাকে তুই ছেড়ে যাবি?

মার মুখ আমি দেখতে পাইনি। কণ্ঠস্বরে মনে হয়েছিল মা যেন বলছে, পাপ আমি করিনি। সেই মুহূর্তেই মাকে আমি ক্ষমা করেছিলাম। কেন জানি না মনে হয়েছিল, মার রূপ, মার যৌবন আর পরিস্থিতি এর জন্য দায়ী।

তুমি আমাকে প্রতারক বলেছ। নিজের জন্মের ইতিহাস কেউ ফলাও করে বলে না জেসমিন। আমিও বলিনি। আর সে কারণেই আমাকে যদি প্রতারক বলে থাক, আমার দুঃখ করবার কিছু নেই। হ্যাঁ, তবে আমি প্রতারক। শুধু আমি নই, পৃথিবীর সহস্র সহস্র মানুষ তবে আমার মত প্রতারক। তোমাকে ভালবেসেছিলাম, একথা বললেই যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, আমি হয়ত দুঃখ পাব। তোমাকে আমার বলে পাব এ আশা আমার ছিল না তাই তুমি যখন ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখলে আমাকে নিয়ে, আমি অস্বস্তিবোধ করলাম। এবং তোমার মোহ ভাঙতেই আজ সবটুকু বলেছি। এবার তুমি চলে গেলেও আমি দুঃখ পাব না।'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল ওরা। জেসমিনের মুখ কালো বেদনার্ত দেখাচ্ছে। মল্লিক নীরেট মুখে জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে আছে। মুখের একটা পাশ শুধু দেখতে পাচ্ছে জেসমিন। ফিরে তাকাল। সহজ হয়েছে, যেন কিছুই ঘটেনি।

'মাকে দেখবে এসো।'

শিকলটা খুলে ফেলল। পাশের ঘরে ঢুকল দুজন। জেসমিন যেন যন্ত্রচালিত। বোধশক্তিহীন। ঘরের দক্ষিণ দেয়াল ঘেঁষে একটা খাট। স্ট্যাণ্ডে মশারী সামিয়ানার মত করে খাটান। খাটের পাশে একটা ছোট টেবিল। একটা হরলিক্সের শিশি, ফিডিং বোতল, কাপ ইত্যাদি টেবিলটাতে। অদূরে খাটের মাথার কাছে একটা হিটার! এক কোণায় জলের কুঁজো গেলাস দিয়ে ঢাকা। অনাড়ম্বর ঘরটাতে ঢুকতেই জেসমিনের নাকে ঔষধের গন্ধ ঢুকল। মল্লিক খাটের পাশে এগিয়ে গিয়েছে। একটা কঙ্কালের মত কিছু বিছানার ওপর দেখে ভয়ে চোখ বুজে ফেলল জেসমিন।

'আমার মা—ফটোয় তাকে দেখেছ।'

চোখ মেলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্ধ করে ফেলল। দুর্বোধ একটা কিছু শুনেছে। ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখছে যেন।

মল্লিক বলল, 'কেউ বিশ্বাস করবে না, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত এই কঙ্কালের গায়ে এমন রূপযৌবন ছিল যার মূল্য দিতে গিয়ে তাকে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছে। ফটোর সেই মুখ, সেই দেহের সঙ্গে এই কঙ্কালের সামঞ্জস্য নেই।'

মল্লিক স্নেহসিক্ত দৃষ্টি দিয়ে খাটের কঙ্কালের দিকে চাইল। সেই দৃষ্টি দেখে জেসমিন প্রথমে অবাক হল তারপর ঘৃণা বোধ করল। দৃষ্টি ফেরাল সে অন্য দিকে।

'কিছু বলবে?'

চমকে তাকাল জেসমিন। মল্লিক ঝুঁকে পড়েছে খাটের ওপর। শায়িতার ঠোঁট দুটো প্রবল বেগে কাঁপছে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে ঠিকরে কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বুকটা হাড়-পাঁজর সুদ্ধ ফুলে উঠেছে। অথচ টুঁ-শব্দটি বেরুচ্ছে না!

'থাক মা, চুপ কর। বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও। ও আমার সহকর্মিনী, নাম জেসমিন—তোমাকে দেখতে এসেছে।'

নিরস্ত হয়েছে। ওষ্ঠের কম্পন মন্দীভূত। মল্লিককে দেখবার পর থেকে সেই যে কাঁপতে শুরু করেছে একবারও থামেনি।

'যাই মা ওকে পৌঁছে দিয়ে আসি।' ওষ্ঠের কম্পন স্তব্ধ হল। দৃষ্টি নেমে গেছে। চোখ দুটো মুদে এলো। ক্লান্ত হয়েছে। ঘুমোবে।

এ ঘরে এসে শিকল তুলে দিল মল্লিক দরজায়। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল জেসমিনের। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। মল্লিক জানলার কাছে ফিরে গেল। দৃষ্টি বাইরে।

'এবার তুমি যেতে পার। আমি বাধা দেব না।'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে রইল ঘরটা। কেউ ঘর ছেড়ে চলে যাবার শব্দ হল না। বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাল মল্লিক। ঘরের মাঝখানে স্তব্ধভাবে জেসমিন দাঁড়িয়ে। আঁচল লুণ্ঠিত, পলকশূন্য চোখে মল্লিকের দিকে চেয়ে আছে।

চমক ভাঙল। মৃদুস্বরে বলল, 'একটা চাবি দাও।'

সব কথা শুনবার পরেও চাবি কেন মল্লিক বুঝতে পারল না। চাবিটা হাতে পেতেই কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল জেসমিন!

পরদিন যথাসময়ে উভয়ে অফিসে উপস্থিত হল। যথাবিহিত কাজ করে গেল। সেই ভদ্রলোক এসে তাঁর হোণ্ডা ডেলিভারী নিলেন। বিকালে অফিস থেকে পার্ক, রেসকোর্স লেক ঘুরে মল্লিক বাড়ী ফিরল।

উভয়ের কথা বলা প্রায় বন্ধ। মুখোমুখি হলে এবং অফিসের দু-একটা কাজে যেটুকু কথাবার্তা হয় তার বেশী কিছু নয়।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে মায়ের ঘরে গিয়ে দেখল ছোট টেবিল থেকে পরিষ্কার একটা টেবিলে ওষুধের শিশিগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে। শিয়রের টেবিলটাতে এক তোড়া রক্তগোলাপ। এরপর রোজই একতোড়া রক্তগোলাপ মায়ের ঘরে টেবিলটাতে দেখা যেতে লাগল। অফিসে দেখা হলেও মল্লিক এ বিষয়ে জেসমিনকে কিছু বলল না।

সেদিন বাড়ী ফিরে দেখল দরজা খোলা। ঘরে ঢুকল। মার ঘরের দরজাটাও খোলা। সেই ঘরে এসে মল্লিক দাঁড়াল। মায়ের শিথানের পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসেছে জেসমিন। উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের প্রতি সন্নিবদ্ধ। ভুরু কুঁচকে তাকাল মল্লিক।

'আমার মায়ের কাছে তুমি কেন আস? রোজ একতোড়া ফুল কেন রেখে যাও মায়ের শিথানে? মাকে তুমি ঘৃণা করেছ, অসতী বলেছ, মা সে কথা জানে না, তাই—?'

জেসমিন রূঢ় কণ্ঠ শুনে চমকে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ ধীর শান্ত। দৃষ্টিটা মল্লিকের ওপর থমকে দাঁড়িয়েছে। মৃদু অথচ কঠিন সুরে বলল, 'না।'

'তবে কেন? আর কি অপমানের বাকি আছে? মাকে তুমি অপমান করছ কেন?'

'অপমান নয়, সম্মান করছি মাকে।'

কথাটা ধাক্কা দিল মল্লিককে। পরক্ষণেই সে চীৎকার করে উঠল, 'যার সন্তানকে শ্রদ্ধা করতে পারনি তাকে সম্মান করছ কেন? কে চেয়েছে তোমার সম্মান?'

জেসমিন শান্তভাবে আঙুল দিয়ে খাটের দিকে দেখিয়ে জবাব দিল, 'চেয়েছেন উনি।'

'মিথ্যে, মিথ্যে, কেউ চায়নি।'

'ওঁর চোখে তার ছাপ দেখবে। উনি অসন্তুষ্ট হননি, হলে আমি আসতাম না। ওঁর চোখে দেখো তোমার প্রতি ভৎর্সনা।'

জলজ্বলে চোখ দুটো মল্লিকের দিকে স্থির হয়ে আছে, ঠোঁট দুটো দুর্বার বেগে কেঁপে যাচ্ছে। মল্লিক এগিয়ে গেল। ওঁর শিয়রে একটা হাত রেখে হাঁটু গেড়ে মেঝেয় বসল। যন্ত্রণাক্ত বিকৃত কণ্ঠে বলল, 'এ কি বললে মা। ও যে তোমাকে অশ্রদ্ধা করে।'

ওষ্ঠের কম্পন দ্রুততর হল? বুকটা দ্রুত তালে ওঠানামা করছে। মল্লিকের গণ্ডদেশে জল নামল চোখের কোণ বেয়ে। নির্বাক নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল শীর্ণ কঙ্কালের দিকে। জেসমিন অনেক আগেই চলে গিয়েছে।

পরদিন জেসমিন আবার এসেছে। তার পরের দিনও এসেছে। এমনি করে সে দিনের পর দিন এসেছে। মল্লিকের ঘরের ভোল বদলেছে, মল্লিকের মায়ের ঘর রোগীর ঘর ছেড়ে এক বিলাসের কক্ষ হয়ে উঠেছে। মল্লিক নীরব দ্রষ্টা।

সন্ধ্যার আগেই সেদিন বাইরে থেকে ফিরল মল্লিক। এসে দেখল মার শিয়রে সেবারত জেসমিন বসে আছে। ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল মল্লিক। জেসমিন বলল, 'ডাক্তারকে একবার ডাক। অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না।'

'কি হল?'

'নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে।'

মল্লিক ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার হাতের রোগী দেখা শেষ করে আসবেন বললে। ফিরে এল।

'ডাক্তার এলো না?'

'রোগী কমে এলেই আসবেন বললেন।'

কতকগুলি খণ্ড মুহূর্তের দুঃসহ নীরবতা।

'একি ! অমন করছ কেন ?'

জেসমিন চিন্তিত মুখে ফিরে তাকাল। রোগিনী নিশ্বাসের অভাবে ছটফট করছে। শীর্ণ হাত দুটো প্রবল বেগে কাঁপতে কাঁপতে গলার কাছে উঠে এল। মাথা নাড়াচ্ছে। গলার শব্দটা বেড়েছে ! মল্লিক হাঁটু গেড়ে বসল কাছে।

'খুব কষ্ট হচ্ছে মা ?'

বেরিয়ে-আসা গোল গোল চোখ দুটো ঘুরিয়ে তাকাল। মুখটা হাঁ করল। নাকের ছিদ্র দুটো ফুলে উঠেছে। বুক কাঁপছে। সহসা পরিবর্তন হল, মুখ বন্ধ হয়ে এল, বুক নেমে গেল, গলার শব্দ স্তিমিত হয়ে আসছে। শ্রান্ত হয়ে চোখ মুদল।

'এখন কেমন লাগছে মা ?'

'মাগো, ওমা—'

এক বিরাট স্তব্ধতা রোগিনীকে ঘিরে ধরেছে। এক অশুভ আশঙ্কায় চমকে উঠল মল্লিক। হাতের শিরা দেখল, বুকের ওপর কান পাতল। জেসমিনের দিকে তাকাল।

মল্লিকের চেহারা দেখে চমকে উঠল সে। মমির মত ভাবলেশহীন মুখ মল্লিকের।

'মা নেই জেসমিন। কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না জেসমিন। মাথায় কিছু ঢুকল না। শিয়রের পাশে স্থাণুর মত বসে রইল।

উঠে দাঁড়াল মল্লিক। জেসমিন তাকাল।

'এসো।'

মল্লিককে অনুসরণ করল সে। দরজায় ডাক্তারের সঙ্গে মুখোমুখি।

'আপনার আর দেখবার দরকার হবে না ডাক্তার সাহেব, নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।'

ডাক্তার বিব্রত মুখে বিদায় নিল।

দুদিন পরে মায়ের ঘরে বসেছিল মল্লিক। জেসমিন এলো। অসময়ে তাকে দেখে মল্লিক বলল, 'অফিসে যাওনি ?'

'না।'

তারপরই কথা ফুরিয়ে গেল। সন্ধ্যা হল। মুখোমুখি খাটের কাছে বসে রইল দু'জনে। দুটো চড়ুই কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে কোথায় উড়ে গেল।

ঘরটা অন্ধকারে ভরে উঠল। মল্লিক কয়েকটা ধূপকাঠি এবং দুটো মোমবাতি খাটের মাথায় জ্বালিয়ে দিল। দু'দিন আগে এই ঘরে ধূপকাঠি জ্বালাতে গিয়ে শুনেছিল মায়ের কাফনের চারপাশে ঘিরে পড়শীরা সুরা পড়ছে। তার মধ্যে এক বৃদ্ধার কণ্ঠ এখনো তার কানে লেগে আছে। তিনি পড়েছিলেন, ফাবি আইয়ে আলাই হে রাব্বি কু মাতু কাজ্জিবান। মল্লিক সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল। জীবনে বুঝি তখনকার মত এত ভাল লাগেনি কখনো।

মোমবাতিটা জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে যাচ্ছে। মল্লিক অপলক চোখে আলোর শিখার প্রতি তাকিয়ে ছিল। খাটের ওপাশে জেসমিন উঠে দাঁড়াল। মল্লিক সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

'যাচ্ছ ?'

'রাত হতে চলল।'

জেসমিন আঁচল টেনে মাথায় দিল। ঠিক সেই সময়ে আজান শোনা গেল। অপূর্ব মিঠে স্বরে মুয়াজ্জিন আহ্বান জানাচ্ছে। এশার নামাজের সময় হল। নামাজীরা এবার মসজিদে যাবেন, ওজু করবেন, নামাজের লাইনে দাঁড়াবেন। ইমাম তার শ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডলে প্রসন্ন হাসি নিয়ে পাগড়ী মাথায় সর্বাগ্রে দাঁড়াবেন।

···আসহাদো আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

'আজানের সুরটা কি মধুর দেখছো ?' মল্লিক কান পেতে দিল। জেসমিন আঁচলটা ভাল করে মাথায় টানল। মোমবাতি দুটো স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলছে। মল্লিক আরো কয়েকটা ধূপকাঠি ধরাল। আজান এখনো শেষ হয়নি।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

কয়েকদিনের মধ্যেই সাপের আঘাতে দু'জনের মৃত্যু হল। এ অঞ্চলে সাপের বড় উপদ্রব। সাপ এমন এক নিয়তি যার প্রতি সাবধান হওয়া মনের এক সান্ত্বনা ছাড়া কিছুই নয়। আমি সাবধানতার জন্য আমার তাঁবুর চারপাশে কার্বলিক অ্যাসিড, ডি ডি টি প্রভৃতি যথেষ্টভাবেই ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। ছয় ব্যাটারীর বড় একটা টর্চ ছিল আবার সঙ্গে। টর্চটা লাঠির মত সারাক্ষণ আমার হাতে থাকত। ঝোপ জঙ্গলে হাঁটবার সময় আমি গামবুট ব্যবহার করতাম। ভারী পায়ে হাঁটতে আমার কষ্ট হত। কিন্তু বড় রকমের একটা কষ্টকে এড়াবার জন্য এটুকু আমি সহ্য করে নিয়েছিলাম। এ ছাড়া সন্ধ্যার পর তাঁবুতে বসে কখনই আমি ট্রানজিস্টর খুলে গান শুনবার চেষ্টা করি না। আমার একটা সন্দিগ্ধ ধারণা ছিল, সাপ গান শুনতে ভালবাসে। বিশেষ করে বাঁশির সুরে সে মোহিত হয়। আমি সাপুড়ে দেখেছি, তারা লাউবাঁশি বাজিয়ে সাপকে বশে রাখে।

কিন্তু এ ব্যাপারে কে যেন আমার ভুল ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিল। সে বলেছিল, ব্যাপারটার মধ্যে সাপুড়েদের চালাকি আছে। আসলে সাপের কোন শ্রবণ ইন্দ্রিয়ই নেই। আমার মনে পড়ছে, পরিবর্তে তাকে একটা কাহিনী শুনিয়ে ছিলাম আমি। আমারই ব্যক্তিগত জীবনের একটা ঘটনা। বছর দশেক আগে, আমি আর হিরণ্ময় একবার খালের ভিতর দিয়ে ডিঙি বেয়ে আসছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। হিরু বাঁশি বাজাচ্ছিল, আমি অলসভাবে দাঁড় বাইছিলাম। আমরা দুজনে দু' গলুইয়ে বসেছিলাম বলে পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। খালের জল যেন কালো আলকাতরার মত জমাট বেঁধে গিয়েছিল। সেই জলে ডিঙি খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। হঠাৎ আমার সমস্ত শিথিল ইন্দ্রিয় যেন চকিতে

সতর্ক হয়ে জেগে উঠল। আমি আঁতকে উঠলাম। দেখলাম, হলুদ চক্র-কাটা একটা চন্দ্রবোড়া পাটাতনের মাঝখানে বিড়ে পাকিয়ে বসে আছে। পদ্মফুলের ডাঁটির মত সতেজ একটা অংশ বিড়ের মাঝখান থেকে উঠে ফণা ধরে আছে। অত্যন্ত তন্ময় সে। হয়ত বাঁশির সুরেই ওর অমন তন্ময়তা। আমি হিরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। মনে হল হিরুও খানিকটা বিচলিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মুহূর্তেই ও সামলে উঠল। ইঙ্গিতে আমাকে দাঁড় বেয়ে যেতে বলে সে আগের মতই বাঁশি বাজাতে লাগল। ইচ্ছে করলেই এ সময় আমি সাপটাকে বৈঠা দিয়ে আঘাত করতে পারতাম। কিন্তু হিরুই আমাকে বারণ করল। সাপ বড় প্রতিশোধ-প্রিয় প্রাণী। একবার আঘাত পেলে পালটা আঘাত সে দেবেই।

ফলে বৈঠাটাকে জল থেকে আমি উপরে ·তুলি নি সেদিন। অত্যন্ত সন্তর্পণে ডাঙার কাছে আসতেই আমরা দুজনে ডিঙি থেকে লাফিয়ে বাঁচলাম। এমন ঘটনার পর সাপের শ্রবণ ইন্দ্রিয় না থাকার কথা কে বিশ্বাস করতে পারে! আমি এই ভয়েই সন্ধ্যার পর কখনো রেডিও খুলি না।

স্বভাবতই আমার মত লোকের পক্ষে যত রকম ভাবে সাবধানতা গ্রহণ করা সম্ভব সব আমি করেছিলাম। তবু কখনো কখনো আমার বেহুলা লখিন্দরের গল্পটি মনে পড়ে যেত। লোহার বাসরে থেকেও লখীন্দর নিয়তিকে এড়াতে পারে নি। সাপ এমন এক নিয়তি।

যাই হোক, দিন দশেক হল তাঁবুতে এসেছি আমি। চতুর্দিকে জঙ্গল। পশ্চিম দিকের জঙ্গল গ্রামের সঙ্গে মিশে গেছে। ফলে আপাতভাবে গ্রামটাকেও একটা জঙ্গল বলেই ভুল হয়। বাঁশঝাড়, বকুল, জিওল, তেলাকুচার ফাঁকে ফাঁকে দুটো একটা কুঁড়ে ঘর। লাউমাচা, ঝিঙেমাচা। মাচা দেখলেই কেমন একটা কৌতূহল যেন আমাকে পেয়ে বসে। হয়ত অতিরিক্ত সর্পভীতিই এর কারণ। কিন্তু লতাগুলি যখন বাতাসে দোল খায় তখন মনে হয় যেন বা একটা তেজিয়ান সাপ চকিতেই আমার চোখের আড়ালে চলে যাবার জন্ত পাতার সঙ্গে মিশে গেল। ·ফলে আমি কখনো ভুলেও লাউমাচার কাছাকাছি এগোই না।

আমি জানি, আমার এই আচরণের জন্ত আমার সঙ্গীরা হয়ত গোপনে আমাকে নিয়ে আলোচনা করে। সঙ্গী বলতে একজন, আমার পিওন—গুণধর। অন্তজন এক নেপালী দারোয়ান—বাহাদুর। বাহাদুর আমাদের দেহরক্ষী। বন্দুকটি ওর হেফাজতেই থাকত। আমি তেমন চৌকস গানার হলে ও যন্ত্রটা আমার কাছেই রাখতাম। সে সুযোগ না থাকলেও আমি লক্ষ করেছিলাম প্রভুভক্ত কুকুরের মত

বাহাদুর আমাকে সারাক্ষণ নজরে নজরে রাখত। অনেক রাত্রি অবধি জেগে থেকে আমাকে পাহারা দিত! কিন্তু এত সত্বেও সাপে কাটা মৃত্যু দেখে আমার পরুষত্ব কোথায় যেন উবে গিয়েছিল। আমি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছিলাম দিনগুলি।

অথচ আমার কোন উপায় ছিল না। এই রকম জল জঙ্গল ঝোপঝাড়ে ঘুরে বেড়ানই চাকরি আমার। জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয় বলে তাঁবু আমাদের সব সময়ই সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হয়। এ যাত্রায় আমরা কেবলমাত্র একজোড়া তাঁবু পেতেছি। একটি আমার জন্য অপরটি ওদের দুজনের জন্য। গ্রামের লোকেরা এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ওরা আমাকে গ্রামের পরিত্যক্ত কাছারী বাড়িটা ব্যবহার করবার জন্য উপদেশ দিয়েছিল প্রথমে। আমরা যথা সময়ে গৃহপ্রবেশও করেছিলাম। কিন্তু গুণধরই আবিষ্কার করল সেই অভাবনীয় দৃশ্যটি। আমি চমকে উঠে দেখলাম ঘরের বাঁতায় আড়াআড়িভাবে দড়ির মত একটা সাপ ঝুলে আছে। আপাতভাবে ওটাকে একটা বাঁশ বলে ভুল হওয়াও অসম্ভব নয়। আমি সেই ভুলই করেছিলাম। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা আমাদের অভয় দিয়ে বলল, 'ওটা বাস্তু সাপ! এখানে প্রায় বাড়িতেই অমন থাকে। এ সাপ গৃহস্থের কোন অমঙ্গল করে না।'

আমি লক্ষ করলাম খড়ের ছাউনির নিচে কোণের দিকে একটা পাখি চড়ুইয়ের বাসাও আছে। হয়ত পাখির লোভেই বাস্তু সাপ ঘরের বাতায় আস্তানা গেড়েছে। তা যে জন্যেই হোক এ ঘরে বসবাস করা অসম্ভব। আমি বললাম, 'হয় সাপটাকে বাইরে আন, মেরে ফেল, নয় ফাঁকা মাঠের দিকে তাঁবু খাটাও।' গ্রামের কেউ কেউ আমার আতঙ্কগ্রস্ত চেহারা দেখে মুখ টিপে হাসলেও আমি মান অপমানের কথা ভুলে গিয়ে বাহাদুরকে বন্দুক আনতে বললাম। ওটাকে গুলি করব।

কিন্তু আমাকে ওরা বাধা দিল। ঘরের মধ্যে গুলি ছুঁড়লে খড়ের চালে আগুন লেগে যেতে পারে বলে ওরা আমাকে ভয় দেখাল।

'তা হলে কি এখানে থেকে প্রাণ দেব বলতে চাও?' আমি প্রায় বিকৃত গলায় ধমকে উঠলাম।

ওরা বলল, 'তা হলে হুজুর, বৈদ্যনাথ ওঝাকে ডাকা হোক। সাপের লেজ ধরে সে হিড় হিড় করে টেনে নামাক।'

আমি অসম্মতি দেখাই নি বলে বৈদ্যনাথ এল। ঘরের দরজা ঝাঁপ বন্ধ করে ধূপ-ধুনো জালিয়ে কি কৌশল করল কে জানে, হাঁপাতে হাঁপাতে একটা সাপ সে বাইরে নিয়ে এল। তারপর আমার সামনে ছুটে এসে মাথাটাকে মুঠোয় ধরে লেজের উপর পায়ে চাড় দিয়ে টান টান করে টেনে ধরল। বলল, 'বুঝলেন বাবুসাব, এটা

নির্জলা মাদী। মরদটা হয়ত ধারেকাছেই কোথাও গা লুকিয়ে রয়েছে। হদিশ পেলাম না।'

'তা হলে তো সোনায় সোহাগা হয়েছে।' আমার সারা গা সিরসির করছিল। নাভিকুণ্ডের কাছে আশ্চর্য এক অনুভূতি মোচড় দিয়ে উঠছিল। বললাম, 'চুলোয় যাক তোমাদের কাছারী বাড়ি। এ ঘরে আমার থাকা হবে না।' গুণধরকে ফাঁকা মাঠে তাঁবু খাটাতে আদেশ করলাম।

আমি সেই থেকে তাঁবুতেই আছি। রাতে নিজের হাতে বিছানার চারদিকে মশারী গুঁজে দেই ভাল করে। বালিশের কাছে টর্চ রাখি। সকালে চারদিক ফর্সা হলে বিছানা ছাড়ি। ভাল করে জামা গেঞ্জি ঝেড়ে নিয়ে গায়ে পরি।

এ ব্যাপারে আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোকের মুখে একটা ঘটনা শুনেছিলাম। তিনি তখন সুন্দরবনের দিকে পোস্টিং হয়েছিলেন। শীতকাল। এ সময় ক্বচিৎ কদাচিৎ সাপ চোখে পড়ে। তবু তিনি সারাক্ষণ সুন্দরবন আর সাপের কথাটা মনে রেখেছিলেন। একদিন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রাকেট থেকে জামা টেনে নিয়ে মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে দিয়েই আঁতকে শিউরে উঠলেন। কি যেন একটা জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বুকের উপর দিয়ে গা রগড়াতে রগড়াতে বিদ্যুতের মত নিচে নেমে গেল। তাকিয়ে দেখলেন, সাপ। বলা বাহুল্য ভদ্রলোক যেন পুনর্জীবন ফিরে পেলেন। সাপটা বোধ হয় শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্যই জামার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বসেছিল।

এখন অবশ্য শীতকাল নয়। তবু আমি সতর্কতার জন্য জামা গেঞ্জি এমন কি তোয়ালে অবধি দু-একবার না ঝেড়ে ব্যবহার করি না।

এতভাবে সাবধান থাকা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হত, হয়ত সতেজ পদ্মফুলের ডাঁটির মত কোন এক বিষধর সাপ আমার তাঁবুর কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। কেবল হয়ত তেমন একটি সুযোগের জন্য অপেক্ষা। আমি গুণধরকে নিয়ে লাইন বাক্স আর চেনের বাক্স না বইয়ে দিন দুয়েক ধরে আশে-পাশের সমস্ত গর্তগুলি বুজিয়ে দেবার কাজে লাগিয়েছিলাম।

কিন্তু এর মধ্যে পর পর দুজন লোককে সাপে কাটল। এবং দুটো মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলল। আমার বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছিল, অতঃপর সর্পাঘাতে তৃতীয় যে ব্যক্তিটি নিহত হবে সে হচ্ছি আমি। কিছুতেই আমি এই ধরনের একটা দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছিলাম না।

সাপে কাটার প্রথম ঘটনাটি ঘটল বড় সড়কের উপর একেবারে দিনের আলোয়। একজন রেলওয়ে পয়েণ্টসম্যান দিনকয়েকের ছুটিতে গ্রামে এসেছিল। সঙ্গে এনেছিল নববিবাহিত স্ত্রীর জন্য কিছু কিছু সুগন্ধী প্রসাধনী আর কিছু রোমান্স। ঘটনার দিন সে ভিন গাঁয়ে মুরগীর খোঁজে বেরিয়েছিল। পথে সড়কের উপর সাপের ছোবল। ইস্—ছুটতে ছুটতে সে বাড়ির দরজায় এসে স্ত্রীর নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে এলিয়ে পড়ল। ব্যাস।

বৈদ্যনাথ ওঝাকে ঝাড়ফুঁক করতে দেখা গেল। বেহুলার নাম ধরে সংকীর্তন। আমি জানতাম ও সব স্রেফ ভুয়ো ব্যাপার। সময় মত ডোর বাঁধলে, মুরগী লাগালে হয়ত বা বেঁচে যেত বেচারা।

আমি সেই রাতেই গুণধর আর বাহাদুরকে ডেকে সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসার কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। ডোর বাঁধতে হয়। ব্লেড দিয়ে চিবে দিয়ে টিপে টিপে রক্ত বার করতে হয়। ডাক্তার না এলে বাঁধন খুলতে নেই। সাপের বিষে নেশা হয়। মাতালের মত রুগী তখন টলতে থাকে। তাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। দরকার হলে চড় লাথি কিল। রুগী একবার ঘুমিয়ে পড়লেই বুঝতে হবে বিষ তার সারা দেহে ঘুরতে ঘুরতে মাথায় এসে জমে গেছে। কক্ষনো তা হতে দেওয়া উচিত নয়।

আশ্চর্য, আমি বলছিলাম, যেন আমাকেই দু' একদিন পর সাপে কাটলে এই ধরনের প্রতিষেধক নিতে হবে। যেন কোন এক বিচক্ষণ ব্যক্তি মরবার আগেই তাঁর মৃত্যুস্তম্ভ তৈরী করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কথাটা মনে আসতেই আরো কেমন বিপন্ন মনে হল নিজেকে।

যাই হোক, সাপে কাটার দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল। এক অশীতিপর বৃদ্ধাকে সাপে ছুঁয়েছে। লাঠি ঠুকে ঠুকে সে বনের কাঠকুটো যোগাড়ে গিয়েছিল। সেখানেই সে ঢলে পড়ে থাকে। হয়ত সে বৃদ্ধা সংসারের জঞ্জাল বলেই বৈদ্যনাথ ওঝাকে লাগাবার দরকার মনে করে নি তার ছেলেরা। মড়া কাঁধে বয়ে পাঁচ ক্রোশ দূরের নদীতে লাস ভাসিয়ে দিয়ে ওরা চলে আসে। ফিরে এসে বুড়ীর বড় ছেলে দেখে গোয়াল ঘরে গাই বাঁধা নেই। শুধু তাই নয় গরুটা ধারে কাছে কোথাও নেই। চড়াৎ করে মাথায় যেন রক্ত চড়ল। শালা—! গাইয়ের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে লোকটা জোড়া বাঁশঝাড়ের পাশে এসে দেখে গরুটা পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। আর ওর পা জড়িয়ে লতার মত একটা সাপ বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ চুষছে।

লোকটা একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে তৈরি হল। 'শালা, তুই না সকালে মাকে খেয়েছিস?' অবশ্য ও জানত বাঁট থেকে দুধ চুষে খায় যে সাপ সে সাপের বিষ থাকে না। তবু দুধ চুরি করার দৃশ্য দেখে পাগলের মত ও ক্ষেপে উঠল। 'শালা, সকাল বেলা মাকে খেয়ে আশ মেটে নি তোর? আবার দুধ চুরি করে খেতে এসেছিস! আজ হয় এসপার হবে নয় ওসপার। ক্রোধে মানুষের দিশে জ্ঞান হারিয়ে যায়। লোকটা যখন মরা থেঁতলানো সাপ মাথার উপর দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ি এল তখন সে মাতালের মত টলছে। তার কব্জির উপর জোড়া দাঁতের চিহ্ন দেখে বুঝবার উপায় ছিল না তখন ঐটুকু ক্ষত থেকেই পচন শুরু হতে পারে দেহে। পরমায়ু থাকলে হয়ত বা এ বেচারা বেঁচে যাবে। ভিন গাঁ থেকে ডাক্তার ধরে আনবার উপদেশ আমিই ওদের দিয়ে এসেছিলাম। জানি না আমার কথা কতখানি ওরা গ্রাহ্য করবে।

এইভাবে গতকাল সারাটা রাত আমার প্রচণ্ড এক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কেটে গেছে। সারাটা রাত এত বেশি স্পর্শকাতর ছিলাম আমি যে পাতার শব্দেও চমকে চমকে উঠেছি। বাতাসে কপালের উপর চুল উড়ে এলেও মনে হয়েছে সাপ। গভীর রাতে জঙ্গলের পাখি যখন কর্কশভাবে চিৎকার করে উঠেছে তখন আমি দুঃস্বপ্ন দেখার মত আর্তভাবে ডুকরে উঠেছি।

আজ আবার আর একটা রাত্রি এল। সমস্ত আতঙ্ক যেন রাত্রির জন্য জমা হয়ে ছিল। আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে মশারীর মধ্যে ঢুকে চারপাশ ভাল করে গুঁজে দিতে দিতে গুণধরকে ডাকলাম।

গুণধর কাছে এল। তাঁবুতে ঢুকল।

'খাওয়া হয়েছে তোদের?' আমি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে প্রশ্ন করলাম। 'বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে যা। লণ্ঠন ছাড়া বাইরে বেরিয়েছিস কেন?'

গুণধর নিঃশব্দে বাতি নিবিয়ে দিয়ে একটা ছায়ামূর্তির মত তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু একটু বাতাস বইছিল। পর্দার কাপড়টা একটু একটু দুলছিল। বাইরে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুন তেমন জোরালো না হলেও খানিকটা লাল আভা ছলকে ছলকে তাঁবুর মধ্যে আছড়ে আসছে। আর পাশে গুণধরদের তাঁবু বিছানায় শুয়ে ঠিক নজরে আসছে না। অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে শুয়ে পর্দা নড়া দেখছিলাম আমি।

বাইরে একটানা ঝিল্লিরব। দূরে সড়ক ধরে বোধ হয় কোন ভারি লরি চলে

যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে উৎকর্ণ হয়ে আমি শব্দ শুনলাম। অফিস ডাইরীটার কথা মনে পড়ল। কালো ডাইরী খাতাটা টেবিলের উপর পড়ে আছে। ওটাকে সাবধানে রাখা উচিত ছিল। ওপরঅলা হঠাৎ একদিন চলে এলে দেখবে ডাইরীর পাতা একদম ফাঁকা। কৈফিয়ত চাইবে। চুলোয় যাক। আমি ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ঘুমোতে চাইলেই ঘুমোন যায় না। প্রতিদিনই এমন হচ্ছে। কখনো কখনো পর্দা নড়ার শব্দে অহেতুক আমি চমকে উঠি। কিন্তু আজ আমার চমকে ওঠার পিছনে নির্দিষ্ট একটা কারণ ছিল। কটকট করে তাবুর ভিতরেই কি যেন একটা ডাকছে। কি ডাকছে? ব্যাঙ। আমি সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'গুণধর।'

গুণধর আবার লণ্ঠন হাতে তাঁবুতে ঢুকল।

'দেখ তো গুণধর ঐ কোণের দিকে ব্যাঙ ঢুকেছে কিনা? মনে হল ব্যাঙ ডাকছে।"

গুণধর হ্যাট হ্যাট করে মাটিতে চাপড়া মারল কয়েকবার। 'না বাবু কিচ্ছু নয়, কিচ্ছু নেই।'

'তবে কে ডাকল শুনি?' আমি বিরক্ত হলাম ওর ওপর। তবু সহজ গলায় বললাম, 'একটু ভাল করে দেখ না বাবা, বিদেশ বিভুঁইয়ে কি শেষটায় প্রাণ দেব।'

গুণধর ক্যাম্প খাটের নিচে, টেবিলের তলায়, স্যুটকেসের পিছনে, চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে আবার বিদায় নিল। আবার সেই বাইরের আগুনের আভা। একটা যেন আগুনের ফুল উড়তে উড়তে ভিতরে এল। না, জোনাকি ওটা। মশারির গায়ে নীলাভ শীতল আগুন ছুঁইয়ে দিয়ে জোনাকিটা বসে পড়ল।

আমার সমস্ত দৃষ্টি এখন জোনাকির দিকে। আগুনের ফুল জ্বলছে, নিবছে। আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত একটা জোনাকিই কখন যেন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

গভীর রাতে সমস্ত চরাচর যখন নিস্তব্ধ তখন আমাকে নিশিতে পেল। আমি না ঘুমে না জাগরণে। আমি ঘুম থেকে জাগরণে, জাগরণ থেকে ঘুমে অনেকক্ষণ ধরে দুলতে দুলতে এক সময় সতর্কভাবে কি একটা কুৎসিত স্পর্শ অনুভব করলাম। আঁতকে উঠলাম। কিছু একটা শীতল সরীসৃপের মত মস্ত আমার উরু বেয়ে উপরদিকে উঠে আসছে। ক্ষণিকেই আমি বস্তুটাকে চিনতে পারলাম। সাপ। একটা সাপ আমার দেহলগ্ন হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আকারে তেমন দীর্ঘ বলে মনে হল না ওকে। আমি জানি, সাপের ব্যাপারে বড় অথবা ছোট কিছুই যায়

আসে না। ফলে মুহূর্তেই আমার সর্বাঙ্গে এক অবর্ণনীয় অনুভূতি খেলে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আমি স্থিতধী করবার চেষ্টা করে কাঠের মত অনড় হয়ে পড়ে রইলাম। এ ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোন গতি নেই। কারণ এক ঝটকায় আমি লাফিয়ে উঠলেও মশারির মধ্যে জড়িয়ে যাব। যদি অতর্কিতে সাপটাকে চেপে ধরি তা হলেও ওটা আমার কঠোর মুঠোর ভিতর থেকে পিছলে বেরিয়ে আসবে। সাপের সঙ্গে পিচ্ছিলতার একটা সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে পড়ছিল। ফলে মরার মত ভান করে পড়ে থাকা ছাড়া আর আমি কিছুই ভাবতে পারছিলাম না এখন। আমার বিবেকবুদ্ধি সব যেন মুহূর্তেই লোপ পেয়ে গেছে। আমি কেবল চোখ বুজে অনুভবেই সাপের গতিবিধির দিকে নজর রাখতে লাগলাম।

মনে হচ্ছে ওটা এখন উরুর উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আমার পেটের দিকে আসছে। আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম প্রথমে ও সমস্ত দৈর্ঘ্যটাকে কুঁচকে ছোট করে সামনের দিকটা প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে। অনেকটা ঠিক কেঁচোর বুকে হাঁটার পদ্ধতির মত। ইচ্ছে থাকলেও আমার চোখের পাতা খোলার মত সাহস হল না। মনে হল চোখ খোলার শব্দও যেন সাপটা শুনতে পাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ফণা তুলে আমার নাভিমূলে দংশন করবে। আমি এখন সাপের সঙ্গে এক জাতীয় সখ্যতা গড়বার চেষ্টা করলাম। আমার দেহের উপর দিয়ে ইচ্ছেমত ওকে বিচরণ করবার অধিকার দিলাম। এ অধিকারে ও আমাকে দংশন করবে না এইটুকুই শুধু প্রার্থনা করছিলাম। ঠিক যেমনভাবে দুর্বল সবলের সঙ্গে সখ্যতা করে, যেমনভাবে মৃত জীবন্তের সঙ্গে সখ্যতা করে, তেমনিভাবেই আমি সখ্যতা গড়তে চাইছিলাম।

লক্ষ্য করলাম, ও তার মাথার দিকটা এপাশে ওপাশে ঘুরিয়ে দিক ঠিক করে নিচ্ছে। আমার সমস্ত রোমকূপের ভিতর দিয়ে শীতল একটা স্পর্শ চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছিল। সাপের দেহের রক্তে কি শীতলতা! আমি ছেলেবেলায় কোথায় যেন পড়েছিলাম সাপের দেহে হিমশীতল রক্ত থাকে। এই শীতলতা আমাকে অবশ করে আনছিল।

আমার গায়ে কোন জামা ছিল না। ডোরা কাটা পায়জামা হাঁটুর উপরে এসে গুটিয়ে কুঁচকে আছে। আমার একটা পা বাঁকাভাবে বালিশের উপর, অন্য পা সটানভাবে মশারির কোণা ছুঁয়ে আছে। আমার বাঁ হাত বুকের উপর, যেখানে ফুসফুস থাকে; ডান হাতখানা কোথায় রেখেছি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমি।

এজন্য আমার দুঃখও হল না। মনে হচ্ছিল আমার দেহ থেকে কয়েকটি অঙ্গ কমে গেলে সেই অঙ্গগুলি সাপেরও আওতার বাইরে চলে যেত। আমার বাঁচবার এখন একটাই মাত্র পথ মনে হচ্ছিল, সমস্ত অঙ্গগুলি হারিয়ে যাওয়া। কিন্তু ফুসফুসটার স্পন্দন আমি অনুভব করতে পারছিলাম। মনে হল তলপেটের দিক থেকে সাপটা এখন ক্রমশ উপর দিকে উঠে আমার ফুসফুসটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, ফুসফুসের দিকেই গতি ওর। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে জোরে ফুসফুসটাকে চেপে ধরতে ইচ্ছে হল আমার। না না, এখানে নয়, এখানে দংশন করলে আর কোন আশাই থাকবে না আমার। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টার পরও আমি আমার বাঁ হাতের আঙুল একটুও নড়াতে পারলাম না। যেন এতটুকু শক্তি নেই আমার। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এখন আর আমার ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল নয়। এমন অসহায় আমি। মনে হচ্ছিল একটা মেদ মাংসের দেহ ছাড়া আমি আর কিচ্ছু নই। আমি কি তা হলে অনেক আগেই মরে গেছি!

অথচ আমার অনুভব শক্তি প্রচণ্ডমাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল। আমি অনুভবে বুঝতে পারছিলাম ও তার সরু চেরা জিবটাকে বার করে ঘামের মধ্যে ভিজিয়ে নিচ্ছে। সরু পলতের মত জিব। যেন জিব দিয়ে ও আমার ঘামের স্বাদ লেহন করছে। মনে হল অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় জিব বুলোচ্ছে ও। আর একটু এগিয়ে এলেই আমার আঙুলের নিচে ফুসফুসটাকে খুঁজে পাবে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। শুধু অপেক্ষা ছাড়া আর আমার কিছুই করার ছিল না এ সময়।

আমার ফুসফুসের স্পন্দন এমন ভারি আর দ্রুততর হচ্ছিল যে আমি স্বাভাবিক হওয়ার কথা কল্পনায়ও ভাবতে পারছিলাম না। অথচ আমার অত্যন্ত স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন এখন। আমি খুব সন্তর্পণে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস টানতে লাগলাম।

ও আমার দু আঙুলের ফাঁকে মুখ আনল। মুখ এনে ফুসফুসের উপর জিব বুলিয়ে ঘাম চুষে নিতে লাগল। সাপের ছোঁয়ায় আমার হাতের আঙুল কি কেঁপে উঠেছে। আমি কি এখন মুঠো করে সাপটাকে চেপে ধরব। না না, এখানে নয়, এখানে নয়।

বোধ হয় আমার আকুতি ও শুনতে পেল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে ও। আমার কব্জি, আমার বাহু, আমার বাহুর কাছ দিয়ে বুকে হেঁটে বগলের কাছে এসে জড় হতে লাগল। বগলের ঘামে জিব বুলাতে লাগল। অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ওর চলাফেরা। তবে সত্যি সত্যি আমাকে মৃত বলেই কল্পনা করেছে ও। আমি আরো মৃত, আরো নির্জীব হবার চেষ্টা করলাম। যেন সেই পঞ্চতন্ত্রের দুই

বন্ধু আর ভাল্লুকের গল্পের মত। আমি গাছতলায় শুয়ে। ভাল্লুক আমার সর্বদেহে ঘ্রাণ নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছে আমি জীবিত কি মৃত।

আমার বগলের কাছ থেকে চামড়া ঘষে ঘষে উপর দিকে উঠে এল ও। আমার গলার কাছে ওর জিবের স্পর্শ পেলাম। আমার শ্বাসনলী খাদ্যনলীর উপর ওর দেহের ভার বিছিয়ে পড়ল। আমার চিবুকের নিচে কয়েকবার মাথাটাকে এ-পাশ ও-পাশ ঘোরাল ও। ঘাড়ের কাছে মুখ ছুঁইয়ে আবার উঠিয়ে নিল। আমার চিবুক বেয়ে দর দর করে ঘাম নামছে এখন। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘামের স্রোত আমার সারা দেহে। যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাপের সঙ্গে সহবাস করছি আমি। অথচ এইভাবে, একমাত্র বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর আমার কিছু নেই।

বুঝতে পারছিলাম ও এবার চিবুকের উপর উঠে আসবার চেষ্টা করছে। অনেকখানি উঠে এসে হঠাৎ ও গড়িয়ে পড়ল। ঝন্‌ন করে সর্বদেহে আমার রক্তের একটা ঢেউ খেলে গেল। যেন সেই স্রোতের গমকে আমার সর্বাঙ্গে থরথর করে কাঁপুনি শুরু হল। আতঙ্কে আমি অনুমান করবার চেষ্টা করলাম, এ সময় সাপটা নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছে আমি মৃত নই জীবিত। ফলে মনে হল বিষধর কালো কুচকুচে সেই সাপ নিশ্চয়ই এতক্ষণে গলার কাছে বিড়ে পাকিয়ে বসে পদ্মর ডাঁটির মত ফণা তুলে ধরেছে। ফণায় হলুদ কয়েকটা ছিট। চিকন নাতিদীর্ঘ সরীসৃপ ক্রোধে যেন আরো বেশি দৃঢ় লম্বাটে হয়ে উঠেছে। ফণার ভারে মাথাটা একটু একটু দুলছে ওর। যেন সে যে-কোন মুহূর্তেই ঢলে ছোবল মারতে পারে এখন। আমি নিষ্পলক ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে রইলাম। অপেক্ষা। শুধু অপেক্ষা।

এ সময় ফণাটা ওর নেমে এলে নির্ঘাৎ আমার চোখের নিচ স্পর্শ করবে। চোখের নিচে অত্যন্ত নরম চামড়ার উপর বিষ বিছিয়ে দিলে পলকেই আমার সর্বদেহে সেই বিষ ছড়িয়ে যাবে।

আমার আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছে হল। সকলের কাছে দুর্বলের অসহায় আকুতির মত আর্তনাদ। প্রখর উত্তেজনায় এ সময় আমি আমার চেতনা ছাড়া আর কিছুই উপলব্ধি করতে পারছিলাম না। যেন আমি বলতে শুধু এক চেতনা; দেহহীন চৈতন্য। রক্ত মাংস মেদ মজ্জা কিচ্ছু নেই আমার। আমার অধীনে, আমার আজ্ঞাবহনকারী কেউ নেই। না হাত, না পা, না আমার দেহের কোন অংশ। এমন অসহায় জীব আমি। তা হলে, কিভাবে এখন সাপটাকে আমি গলার কাছ থেকে নামিয়ে নেব। কি করে এখন ওর সঙ্গে যুঝে উঠে আরো

বহুকাল বেঁচে থাকবার চেষ্টা করব। অথচ আমায় বাঁচতেই হবে। কি যেন একটা বড় রকমের প্রয়োজনে আমার বেঁচে থাকার কথা ছিল। কি প্রয়োজন? আমি স্মরণে আনতে পারছিলাম না।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমি চোখ বুজে অন্তিম সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত দেহের উপর দিয়ে কিলবিল করে সাপের মত ঘাম নামছে এখন। যেন অসংখ্য সাপ আমার দেহের উপর ছড়িয়ে গেছে। গলার কাছে ফণা ধরে থাকা আসল সাপটাকে এখন আর আলাদা ভাবে চিনতে পারছিলাম না আমি।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেলে সহসা আমি মরিয়া হয়ে চোখ খুললাম। কিন্তু কিছুই আমি দেখতে পেলাম না। আমার দৃষ্টিকে অনেকখানি ছড়িয়ে দিলাম, প্রখর করলাম। না, কিছুই আমি দেখছি না। অনেকক্ষণ আমি দেখি নি কিছুই। তারপর ধীরে ধীরে ডুবুরির আলো দেখার মত একটু একটু করে আমার লোমশ বুকে, একটা হাত. একটা পা নজরে এল। বিষধর ফণা তুলে ধরা সাপটাকে খুঁজে পেলাম না। না, কোথাও নেই সে। তবে কি ও বিছানার ভাঁজে আশ্রয় নিয়েছে?

আমার গলার নলীটা হঠাৎ দপদপ করে ঝাঁকি খেয়ে ফুলে উঠল। আমার দাঁতের পাটি সিরসির করে কেঁপে উঠল। আমি নিঃশব্দে ঘাড় ঘোরালাম, তুললাম। না, এতটুকু চিহ্ন নেই সাপের। আমার ফুসফুসটা যেন ক্রমশই বড় হচ্ছে। আমি দম চেপেও ওকে স্বাভাবিক করতে পারছিলাম না এখন। আমার ঠোঁট খুলে গেল।

মশারির ভিতর বাতাস কি কমে গেছে! আমি হাঁ করে বাতাস টানতে লাগলাম। একটু প্রকৃতিস্থ হতে আমার মনে হল, যেন একটা ভিজে চাদরের উপর শুয়ে আছি আমি। এ সময় আমি নিজেই আমার ঘামের ঝাঁঝালো গন্ধ পাচ্ছিলাম। কিন্তু এখনো সেই ঘুম আর জাগরণের সন্ধিক্ষণের অবশতা আমার সমস্ত দেহের উপর যেন বিরাজ করছিল। আমি পুরোপুরি সক্রিয় হবার চেষ্টা করলাম। আবার সাপটাকে দেখতে পাওয়ার আগেই আমি আমাকে তৈরি রাখবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সকল চেষ্টাই কেমন যেন বৃথা হয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে গুণধর এল। সে-ই আমাকে পুরোপুরি জাগিয়ে তুলল। আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে হতবিহ্বলভাবে বিছানার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বিছানা চাদর মশারি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল এরপর। আমার শীতল টর্চটা ছিটকে মেঝের উপর পড়ে গেল। চাদরে একটা বিকৃত মানুষের ঘামের ছাপ। আমি সেই ছাপটার দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে রইলাম। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ওরকম বিকৃত একটা চেহারা কখনো কোন মানুষের হতে পারে। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না সারারাত একটা বিষধর সাপের সঙ্গে সহবাস করেও আমি বেঁচে আছি।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

দুহাতে বাজারের দুই থলে নিয়ে জলকাদা ভেঙে খানাখন্দ ডিঙিয়ে মোটাসোটা মানুষের মাঠ ভেঙে যত জোরে ছুটে আসা সম্ভব হেরম্ব আসে, তার তাড়া খেয়ে ছাগলটা পালিয়েও যায় বটে—কিন্তু মুখে করে নিয়ে যায় গোড়াসমেত চারাটা।

হেরম্ব করে ওঠে হায় হায়।

বার্ন কোম্পানির বাঁস দিয়ে বোজানো এই জালায় কত মেহনতে চারাটাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, পাক্কা তেইশটি দিন নট নড়নচড়ন থেকে সবে চারাটা পাতা ছাড়তে শুরু করেছিল—

হেরম্ব শুরু করে দেয় প্রচণ্ড হাঁকডাক।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে পুলিশ। ছেলে-মেয়ে-বউ।

সামনের পা দুটি গেটে তুলে দিয়ে পুলিশ হরদম লেজ নাড়ে। 'কী হলো?' 'কি হলো?' কোরাসে ছেলে-মেয়ে-বউ সোরগোল তোলে।

'দ্যাখ কী হলো! দ্যাখ! দ্যাখ! কত কষ্ট করে আমি—' দুঃখে রাগে উত্তেজনায় কথা হেরম্বর তালগোল পাকিয়ে যায়।

'ও-মা! গোরুতে—!'

'গোরু না দিদি, ছাগল। ওইতো—ধোপাদের সেই সাদা ছাগলটা—চ্ চু চ্ চু!'

'ঈশ!'

ছেলে-মেয়ে-বউ আপসোস জানায় প্রাণপণ।

'তোরা কি মরে ছিলি?' হেরম্ব ফেটে পড়ে।

'আমরা তো পড়ছিলাম বাবা।'

'পড়ছিলাম! অজুহাত মুখে লেগেই আছে! দামড়া দামড়া সব—'

'রাস্তায় চেঁচিও না।' খুন্তি উঁচিয়ে কমলা ধমক দেয়। 'লেখাপড়া ফেলে ওরা তোমার গাছ পাহারা দেবে?'

'তাই বলে—'

'কেন, তোমার পুলিশ কী করছিল? তোমার সোহাগের পুলিশ?'

বউয়ের ধমকে দমে গিয়েছিল, বউয়ের খোঁটায় দপ করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে হেরম্ব করে-কি, গেট খুলে ভেতরে ঢুকে বাজারের থলে দুটো বারান্দায় ছুঁড়ে দিয়ে বেড়া থেকে একটা বাখারি টেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের ওপর।

'হারামজাদা! শালা! শুয়ারকি বাচ্চা! তোমাকে রোজ গণ্ডেপিণ্ডে গেলাচ্ছি পড়ে পড়ে ঘুমোবার জন্তে!'

ঢিল হাতে নিলেই রাস্তার কুকুর দৌড় দেয়, কিন্তু পুলিশ কিনা পোষা কুকুর—পড়ে পড়ে মাঁর খায় বেধড়ক। কুঁই কুঁই করতে করতে খায়।

মারের চোটে দেহটা তার শিউরে শিউরে ওঠে। আথালিপাথালি মারের চোটে।

'বাবা! বাবা!'

'আর মেরো না বাবা!'

'মরে যাবে বাবা!'

'কী করছ বাবা!'

রমা এসে খপ করে বাপের হাত চেপে ধরে, বাচ্চু উবু হয়ে পড়ে পুলিশের ওপর।

'বাহাদুরি হলো! অবলা একটা জীবের ওপর বাহাদুরি ফলানো হলো!' মুখ ঝামটা দিয়ে বাজারের থলে নিয়ে কমলা চলে যায়।

ডিউটির খেলাপ হেরম্ব সইতে পারে না। অফিসে না, বাড়িতেও না। তাই বুকটা তার দারুণ ধড়ফড় শুরু করলেও মনটা হয়ে যায় ঝরঝরে।

বাখারিটা বেড়ায় গুঁজতে গুঁজতে বলে, 'কয়লার ঘরে বেঁধে রেখে আয়। আজ খাওয়া বন্ধ। জল পর্যন্ত না।'

'কেটে গেছে বাবা!'

'কাটুক।'

'রক্ত বেরোচ্ছে!'

'বেরোক।'

'ডেটল দিয়ে দেবো?'

'খবর্দার! সেপটিক হয়ে মরে মরুক।'

কুকুর যদি কুকুরের ডিউটি না করে তবে তার বেঁচে থেকে লাভ? হেরম্ব তো আর শখ করে কুকুর পুষছেনা?

হুকুম দিয়ে কুয়োতলায় চলে যায়। হাঁটু অব্দি কাদায় মাখামাখি। পেচ্ছাবও পেয়েছে জবর। কিন্তু আগে পা ধোবে, না পেচ্ছাবটা পয়সা সেরে নেবে ঠিক করতে গিয়ে চারপাশের লাউ-কুমড়ো পুঁই-নটে-পালমের দিকে চেয়ে থাকে অনিমেষ।

এই কিচেন গার্ডেনের ক্রেডিট বউয়ের। যখন-তখন সেকথা বউ শোনায়। কিন্তু কুয়োর মাটির দৌলতেই না ফলনের এত বাহার?

রাস্তা উঁচু করার জন্যে বাকি মাটিটা বরবাদ না করে যদি সামনের বাগানে ঢালত!

বারোয়ারি রাস্তা উঁচু করার তার কী দায় ঠেকেছিল? কুয়ো তো সবাই কাটালো, তার মতো আহাম্মুকি কেউ করেছে?

জলার রাজা হয়ে ছিল। ভুতুড়ে এই জলায় সে-ই প্রথম ইলেকট্রিক জ্বালায়, রেডিও চালায়—তামাম সাঁত্রাগাছিতে তা নিয়ে ধন্য ধন্য পড়ে যায়।

গত বর্ষায় জলাটা হাঁটু-জলের লেক হয়ে উঠলে কী রূপ খুলেছিল বাড়ির। লেক প্যালেস!

যেচে যেচে সবাই তারিফ করেছে। অফিসের লোকেরা দলে দলে এসে দেখে গেছে। তাদের জলখাবার জোগাতে মাসিক বাজেট বানচাল হয়ে গেলেও বুক হেরম্বর ফেঁপে উঠেছে। গর্বে মন টইটম্বুর।

আর এখন!

চারপাশে সব হাল-ফ্যাশানের বাড়ি, নতুন নতুন ডিজাইনের বাড়ি—মাঝখানে কী বিচ্ছিরি যে দেখায় এই বাড়ি! কী বেমানান যে দেখায়!

তবু টেক্কা দিতে পারত। এ-তল্লাটে ওই ফুলের গাছ নেই। অমিত তো বলে কলকাতাতেও নেই।

এটা হয়তো চালবাজি। কলকাতায় নেই এমন-কিছু ভূভারতে থাকতে পারে না। তবে কিনা কাটোয়া থেকে চারাটা যখন এনে দিয়েছে, দেশের বাড়ির বাগান নিয়ে এটুকু চাল ছোকরা মারতে পারে। কৃতজ্ঞ হেরম্বর তাতে প্রতিবাদ সাজে না।

নিজের হাতে দেড় স্কোয়ার ফুট জায়গা খুঁড়ে ঘেঁস তুলে ফেলে শেষ রাতে গাঙ্গুলি মশায়ের ভিতের মাটি চুরি করে এনে গর্ত বুজিয়ে চারা বসিয়েছিল।

দিনের পর দিন সকাল-সন্ধ্যে খেদমত করেছে। বাঁচে কি বাঁচে না—কী প্রতীক্ষা কী দুশ্চিন্তা দিনের পর দিন!

তেইশ দিন পরে পাতা ছাড়তে হাঁফ ছাড়ে। আর ভাবনা নেই। এবার লকলক করে লতিয়ে উঠবে, গেট ছেয়ে যাবে। একই গাছে দু-রঙের ফুল! আর কষ্টা-মিষ্টি গন্ধ।

বাড়ির বাহার খুলবে। গন্ধে ম ম করবে তামাম জলা।

মামুলী বাড়িটা আবার সবার চোখ কাড়বে।

আবার হেরম্ব জলার রাজা হয়ে উঠবে।

যেচে যেচে আবার সবাই তারিফ করবে।

আর একটা ছাগল কিনা—

'মরণ! কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—'

'বেশ করছি!'

'বেশ করছি? তাহলে বাচ্চুকে সেদিন মেরেছিলে কেন?'

'ডিস্টার্ব করো না—যাও।'

'জল ঢেলে এসো, নইলে ভালো হবে না বলে দিলাম।' খালি বালতিটা দুম করে নামিয়ে রেখে কমলা পেছন ফেরে। 'এক বালতি জল দিয়ে যেও।'

'বয়ে গেছে!'

আর কি অমিত চারা এনে দেবে! সোমবার কনফার্ম হয়ে মঙ্গলবারই ইউনিয়নের মেম্বার বনে গেছে যে ছোকরা, বড়বাবুকে আর কি সে খাতির করবে!

'বয়ে গেছে' বললেও কুয়ো থেকে জল তুলে হেরম্ব চাতালে ঢালে। পায়ের কাদা ধুয়ে হেঁসেলের বালতিটা ভর্তিও করে। ডিউটি!

পুলিশকে কোলে নিয়ে বাচ্চু ফোঁপাচ্ছে এবং এক হাত ভাইয়ের পিঠে রেখে আরেক হাত পুলিশের পিঠে বুলোচ্ছে রমা—হেঁসেলে বালতি পৌঁছে দিতে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে এই দৃশ্য দেখেই হেরম্ব গর্জে ওঠে, 'বললাম কী! কথা কানে যায় না! শীগগির বেঁধে রেখে আয়।'

'যাচ্ছি।'

'যাচ্ছি! এক্ষুনি যা।'

পুলিশ মুখ তোলে, পিট পিট করে তাকায়। এক কিস্তি লেজও নেড়ে দেয়।

আকাশনীল দুই চোখ। ভারী মায়াবী। এসপ্লানেডে লোকটা দিব্যি গেলে ফকসটেরিয়ার বলে পঁচিশটা টাকা হাতিয়ে নিলেও আসলে দো-আঁশলা। তবে চোখ দুটির তুলনা নেই।

কিন্তু কুকুরের চোখ ধুয়ে কি জল খাবে?

'চেনটা নিয়ে আয়।'

রমা চেন নিয়ে এলে বকলসে আটকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে পুলিশকে কয়লার ঘরে হেরম্ব বেঁধে রেখে আসে।

হেঁসেলের দরজায় এসে বলে, 'ওর মাংস আজ আমি খাব।'

'খেও।'

'দস্তুরমতো পয়সা দিয়ে কেনা—ফেলে দেবো?'

'কে বলছে ফেলতে।'

'খুব ঝাল দিয়ে কষা মতন করে—'

'ওই নাড়ীভুঁড়ি আমার কড়াইতে রান্না হবে না।'

'অ! অলরাইট! ওর হাঁড়িতেই রাঁধো—তবু খাব।'

'খেও। ওর বাটিতে খেও। ওর মতো নর্দমার পাশে বসে—'

'পারি না ভেবেছ? আমি ইচ্ছে করলে—'

'সব পারো। দেখলাম তো! পুলিশ সোনা! পুলিশ মানিক! কত আদিখ্যেতা, কত সোহাগ—'

'তাই বলে ডিউটি—'

'সেই! ভয় হয়, কবে কোন ডিউটি না করে আমরা না খুন হয়ে যাই। অমানুষ। যাও এখান থেকে।'

'খুব যে দরদ এখন! অথচ লোম উঠছে বলে কালও না কুরুক্ষেত্র করেছ?'

'বলি যাবে, না যাবে না? নইলে সব ছুঁড়ে ফেলে আমি—'

'মেজাজ!'

'মেজাজ তোমার একচেটে?'

হেরম্ব সরে পড়ে। মাসের প্রথম রোববার। ভালোমন্দ বাজার করেছে। বউ ক্ষেপলে সব মাটি।

কুকুরটাকে নিয়ে বরাবর কমলা খোঁটা দেয়। কিন্তু কুকুরের জন্যে দরদে উথলে খোঁটা তো কখনো দেয় না?

ব্যাপার কী?

ভেতরে ভেতরে হেরম্বর মতো অবস্থা হয় নি তো?

মুখে যতই বলুক 'এর চেয়ে একটা মানুষের বাচ্চা পুষলে কাজ দিত', এই বয়সে

এত ধার-দেনার মধ্যে একটা মানুষের বাচ্চা পয়দা করলেও মানুষ করে তোলা যে অসম্ভব ব্যাপার মনে মনে সেটা বুঝে গেছে বলেই কি কুকুরটাকে কোলের ছেলের মতো ভালোবেসে ফেলেছে? মুখে দূর ছাই ·দূর ছাই করলেও মনে মনে ভালোবেসেছে?

বিচিত্র না। স্বামী ভালোবাসে ছেলের মতো, ছেলেমেয়ে ভালোবাসে ভাইয়ের মতো—বউও তখন ভালো না বেসে পাবে।

রুটি আলুভাজার প্লেট নামিয়ে রেখে রমা শুধায়, 'চা খাবে তো?'

'দিলেই খাই।'

রমা চলে যাচ্ছিল, হেরম্ব ডাকে, 'কুকুরটাকে তুই অমানুষ বানিয়েছিস। বেশি আদর দিয়ে বেড়াল করে ফেলেছিস। গোড়াতেই বলেছিলাম—সব সময় বেঁধে রাখবি, বেঁধে না রাখলে কুকুরের রোখ্ হয় না—যাচ্ছিস যে?'

'তোমার চা নিয়ে আসি।'

'আমার কথাগুলো কানে গেল?'

রমা ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রোববার রোববার কুকুরটাকে রমা স্নান করায়। কলেজে যাওয়ার আগে রোজ ব্রাশ করে পাউডার মাখায়। সকালে বিকালে বাচ্চু মাঠে নিয়ে গিয়ে হাগিয়ে আনে। গজগজ করলেও আলাদা হাঁড়িতে কমলা হলুদ দিয়ে ভাত-মাংসের ছাঁট ফুটিয়ে দেয় রোজ।

কুকুরের সুস্থ-সবল হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এগুলো জরুরি। অমানুষ হওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু সব সময় ছানাছানি করা? জড়িয়ে ধরে শোয়া? পেটে কাতুকুতু দেওয়া?

উনিশ বছরের মেয়ে আর পনের বছরের ছেলেকে ছানাছানি করা, জড়িয়ে ধরে শোয়া, পেটে কাতুকুতু দেওয়া যায় না বলে বাপ না হয় দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে ওই কাজগুলি করে, মেয়ে তাই বলে বাপের পোঁ ধরবে?

হেরম্ব ডাকে, 'রমা। রমা।'

'তোমার চা করছি।'

'আগে শুনে যা—'

রমা এলে বলে, 'তুই বলতে পারিস আমিও কুকুরটাকে লাই দিয়েছি—'

'আমি তো কিছুই বলিনি বাবা।'

'কিন্তু লাই দেওয়ার কথা যদি বলিস—'

'আমি কিছুই বলব না বাবা।'

'কেন বলবি না? আমি যদি আমার ডিউটি না করে থাকি নিশ্চয় তোর বলার রাইট আছে। আর আমারও তার কৈফিয়ত দেওয়ার—'

'আমার একটা কথা রাখবে বাবা?'

"অ্যাঁ!' তেড়েমেরে কথার মাঝখানে আচমকা রমার কাতর মিনতিতে হেরম্ব যায় হকচকিয়ে।

'বাচ্চু বলছিল, আমারও মনে হয় তাই ভালো।'

'কী ভালো? বাচ্চু কী বলছিল?'

'সত্য কাকাকে দিয়ে দাও। সত্য কাকা একটা কুকুর খুঁজছে—'

'দিয়ে দেবো?'

'নইলে মরে যাবে।'

'মরে যাবে?'

'মাথাটা যেমন ফেটে গেছে—যদি সেপটিক হয়—মল্লিকার দাদাব মতো—' গলা ধরে আসে, দু-চোখ রমার ছলছলিয়ে ওঠে।

মেয়ের মুখের দিকে বাপ হাঁ করে চেয়ে থাকে। গলার এই ধরে আসা, চোখের ছলছল করে ওঠা, কুকুরটা—না মল্লিকার দাদার জন্যে?

পাত্র হিসেবে মল্লিকার দাদাটা ফ্যালনা ছিল না। তাই তার সাথে মেয়ে প্রেম শুরু করলে মটকা মেরে থাকে। করুক প্রেম। জমুক প্রেম। কিন্তু বেজাতের সাথে বিয়েতে হেরম্ব কখনো মত দেবে না।

অবশ্য লুকিয়ে বিয়ে করলে থানা-পুলিশও করবে না।

বরং বিয়ের পর মেয়েজামাইকে মাপ করে দেবে। হালচাল বুঝে সময় মতো মাপ করে দেবে।

কপালের সামান্য কাটাটা সেপটিক হয়ে রাতারাতি ছেলেটা ফৌত হয়ে গেলে হেরম্ব দমে যায় ভয়ানক।

দিন কয়েক গুম হয়ে থেকে মেয়ে সামলে নিলেও বাপের কেবলি মনে হয় তার শুধু একটা বিনে পয়সার দামী জামাই ফসকে গেল, কিন্তু মল্লিকার বাপের হয়ে গেল ডাহা লোকসান।

সাতাশ বছরের রোজগেরে ছেলের মরে যাওয়া আর সাতাশ বছর রেগুলার প্রিমিয়াম নেওয়ার পর ইনসিওরেন্স কোম্পানির লালবাতি জ্বালানোর মধ্যে ফারাক

আছে? আঁতুড়ে ছুটো মরে গেছে কমলার, সে জন্যে তেমন আপসোস নেই। কিন্তু বাচ্চুর যদি কিছু হয়ে যায়? পনের বছরের বাচ্চর।

'ডেটল লাগিয়েছিস? ডেটল? ডেটল?'

'তুমি বারণ করলে—'

'বারণ করলাম ধলে—ঈডিয়েট। শীগগির ডেটল লাগা। যা, নিয়ে আয়। আমার কাছে নিয়ে আয়। আমি লাগাব। তুই যে এমন উজবুক—'

মেয়েকে হুকুম কবলেও নিজেই হেরম্ব ডেটলের শিশি তুলো নিয়ে ছুটে যায় কয়লার ঘরে।

পাব্বা দেড়টি বছর খাওয়াচ্ছে।

সংসাবে হপ্তায় একদিন মাছ এলেও পুলিশের জন্যে রোজ আসে চার আনার কবে মাংসের ছাঁট, বেস্পতিবাব দইভাত। ছেলে মেযেবা এক ফোঁটা দুধ না পেলেও পুলিশেব জন্যে সকালে বিকালে দুধ-রুটি।

দেড় বছরে কম খবচ হয়েছে!

মরে অমনি গেলেই হলো!

ডিউটি না কবলে আবাব ঠ্যাঙানি দেবে। আবার ডেটল লাগাবে।

শক্ত মুঠোয় পুলিশের একটা কান পাকড়ে ডেটল লাগাতে লাগাতে হেরম্ব বলে, 'সোহাগ কবে করে আর মাথায় তুলে দিস না। সব সময় বেঁধে রাখবি। বেয়াদবি করলেই চাবুক।'

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আলমারি ☐ গৌরকিশোর ঘোষ

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

আমার বিশ্বাস ছিল, দৃঢভাবেই বিশ্বাস করেছিলাম, এই মুটে এই মুটিয়া সাবধান আঃ দিলে গোদরেজের আলমারিটায় টোল খাইয়ে, লোকগুলো এত অপদার্থ।

বিরক্তিটা চড়াক করে মাথায় উঠতেই চিন্তার সূত্রটা ঝট করে ছিঁড়ে গেল।

আসলে আমার করবার কিছু নেই। আমি একটি ঠুঁটো জগন্নাথ। আমি নির্বাক দর্শকমাত্র। অসহায় অবসন্ন সে মনে মনে বিলাপ করে উঠল।

এই তো কি যেন একটা ভাবছিলাম, বলতে চাইছিলাম কিছু, ওই হতভাগা চারটে মুটে গোদরেজের আলমারিটা এ ফ্ল্যাট থেকে ও ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে সিঁড়িতে ফেলে টোল খাইয়ে, পাল্লাটা খোলা যাবে তো, দিলে বারটা বাজিয়ে। আলমারিটা ঠিক গোদরেজ কোম্পানীর নয়, তবে ওই ধাঁচের তৈরি, দেখতে শুনতেও একই, একই রকম টেকসই—তার শালা তাকে বলেছিল এবং যদিও তার শালা বয়সে ছোট সে এইসব ব্যাপারে তার শালাকেই অথরিটি বলে মনে করে—তার উপর জিনিসটা তার বউ-এর খুব মনে ধরেছে, তাছাড়া জিনিসটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, তাই বেশ দাঁও-এ পাওয়া গিয়েছে, এ তার শালা আর বউ-এর সুচিন্তিত অভিমত, অবিশ্যি এটা যে গোদরেজ নয়, এরা তিনজন ছাড়া বাড়ির আর কেউ জানত না। কারণ তার মা এই সুদৃঢ় বস্তুটা তাদের বাড়িতে আনা হল সেজন্য বউ-এর উপর অকস্মাৎ প্রসন্ন হয়ে ওটাকে পাড়া প্রতিবেশী মহলে গোদরেজ বলেই গাবিয়ে বেড়ালেন। কারণ তাঁর বড়লোক বোনের বাড়িতে তিনি এই ধরনের দু'চারটে যা জিনিস দেখেছেন সবই গোদরেজের এবং শুনেছেন ওগুলো বেশ দামি। ফলে বাড়িতে প্রথম চোট পড়শীদের ভিড় হল এবং যেহেতু আসল গোদরেজ কী বা তার দাম কত তা তার মা বা বউ কারও জানা ছিল না তাই পরস্পরের বিবরণে গরমিল ঘটে তাদের সন্দেহকে

জাগিয়ে তুলল এবং সবাই খুঁটিয়ে জিনিসটাকে দেখতে লাগলেন। ওঁর বন্ধুর অফিসের এক কলিগের বাড়িতে পরশুই বউ-ভাত খেয়ে এলাম, একজন স্পষ্টই বলে ফেললেন। ওরা যেটা প্রেজেনটেশানে পেয়েছে সেটাকে দেখলেই গোদরেজ বলে চেনা যায়। যা দাম! আর জিনিসটা কি!

এ ধরনের ঘটনা তাঁর স্ত্রী আদৌ পছন্দ করবেন না, এ ধরনের মন্তব্যাদিতে তিনি ফেটে পড়বেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। ওই জন্যেই আমি তোমাদের বাড়ির কোন ব্যাপারে থাকতে চাইনে। তাঁর স্ত্রী এই ভাবেই প্রথম রাত্রে জিনিসটা ফেঁদেছিলেন। সেদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কিঞ্চিৎ মাল টেনে বাড়িতে আসায় অফিসে উপরওয়ালা উপযাচক হয়ে তাকে কয়েকটা ভাল কথা বলায় এবং স্ত্রীর পাশে শোয়ামাত্র রিরংসা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে পড়ায় দুনিয়ার রংটা তাঁর কাছে গোলাপী ঠেকেছিল। এবং সে বাধ্য ছাত্রের মত স্ত্রীর মুখ থেকে সেই দীর্ঘ অভিযোগ শুনেছিল। স্ত্রীর প্রতি তার সহানুভূতি অবিরল বর্ষিত হয়েছিল। ছোট ছোট দানায় চুমু খেয়ে স্ত্রীর উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, বউ বেচারির প্রতি বিলক্ষণ অবিচার করা হচ্ছে। মনে হয়েছিল সে যদি মানুষ হয় তবে তার উচিত বউকে প্রোটেকশন দেওয়া। স্ত্রীকে তার মনে হয়েছিল অশোক বনে বন্দিনী জানকী। এবং এই ছবিটি তাব চিত্তপটে অঙ্কিত হওয়ামাত্র তার মনটা গ্লানিতে অনুশোচনায় হু হু করে উঠেছিল। বউ-এর শিথিল বুকে মুখ ঘসে সে বলেছিল, নেশায়, ক্লান্তিতে, ঘুমে তার জিভ জড়িয়ে এসেছিল—মা আমি তোমার অধম সেবক, হনুমান, এই বন্দীদশার যন্ত্রণা থেকে তোমাকে মুক্ত করব, এই প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি। তার পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওই জন্যেই তোমাদের বাড়ির কোনও ব্যাপারে আমি থাকতে চাইনে। দ্বিতীয় আবেক রাত্রে লম্বা অভিযোগের সেই ফিরিস্তিটা পেশ করার আগে তার স্ত্রী প্রস্তাবনাটাব পুনরাবৃত্তি করলেন। সেদিন দু-তিন জনের কাছে ধার চেয়ে না পাওয়ায় বাড়ি ফেরার বাসে তার পিছনের লোকটা অসভ্যের মত কনুই-এর গুঁতোয় তাকে সরিয়ে সামনের সিটটা দখল করায় এবং মিছিলে মিছিলে ট্রাফিক জাম হওয়ার ফলে ঘণ্টাখানেক বাসে দাঁড়িয়ে বাড়ি ফেরায় মেয়েমানুষের চামড়া ছুঁতেই বমি আসছিল তার। তবু যে দ্বিরুক্তি না করে সে বউ-এর ভ্যাজর ভ্যাজর শুনে গেল, তার কারণ —সে খুব ক্লান্ত ছিল তাই আর নতুন কোন ঝামেলায় বা তর্কবিতর্কে বা কোনরকম বচসায় জড়িয়ে পড়তে চাইছিল না।

তার স্ত্রীর বক্তব্যটা এই রকম ছিল, যথা: (১) গোদরেজের ছাপ থাক চাই না-থাক, বিশ গেজ বডি আর আঠার গেজ দরজা, সত্য (স্ত্রীর ভাই) বলেছে গেরস্থ

বাড়ির পক্ষে যথেষ্ট মজবুত আলমারি, কাজেই এ নিয়ে পড়শীদের ঠোঁট উল্টোবার কোন কারণই থাকতে পারে না, (২) উনি তো যেচে কারও বাড়িতে যান না, তবে কেন আমাদের পেয়ারের পড়শীরা (আমি অধিকাংশকেই চিনিনে) বাড়ি বয়ে কথা শোনাতে আসে, (৩) যারা এত কথা বলে গেলেন তাদের বাড়িতে টিনের তোবঙ্গ ছাড়া আর কোনও তৈজস আছে কি না সন্দেহ, অন্তত তার স্ত্রী মাঝে মাঝে যে-কয়বার যে দু-একজনের বাড়ি ঘুরে এসেছে সে-সব বাড়িতে এমন কিছু লক্ষ্য করেনি, (৪) আলমারিটার দাম সত্যর পকেট থেকেই গিয়েছে, এখনও তাকে একটা পয়সাও দেওয়া হয়নি, (৫) এমন নয় যে সত্য এটা গছিয়ে দিয়ে গিয়েছে, (৬) রাখতে যদি জিনিসটা না চাই তবে সত্যকে জানিয়ে দিলেই ও লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবে জিনিসটা, লোকসান যা যায় ওর যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরেক প্রস্থ অভিযোগ মায়ের সম্পর্কে। মা-ই গোদরেজ গোদরেজ বলে চেঁচালেন। তাঁর বোনের বাড়িতে এই ধরনের যে-কটা আলমারি আছে তার প্রত্যেকটির গুণগান করতে গিয়ে গর্বে মার বুক নাকি ফুলে ফুলে উঠেছিল, আর যে মুহূর্তে পড়শীরা রায় দিয়ে গেল, এটা গোদরেজ নয়, অমনি মার সুর ঘুরে গেল এবং তিনি তাঁর বাপের বাড়ির কাঠের বাক্সের মহিমা সবিস্তারে কীর্তন করতে বসলেন। সেসব কাঠের বাক্সের কাছে এ আমলের স্টিলের আলমারি দাঁড়াতেই পারে না—বউ-এর পছন্দকরা আলমারি সম্পর্কে এই ছিল মায়ের সুচিন্তিত রায়।

ওই জন্যেই আমি তোমাদের বাড়ির কোন ব্যাপারে থাকতে চাইনে। তৃতীয় এক রাত্রে তার স্ত্রী নির্ভুল ভাবে যখন কথাটা আবার আবৃত্তি করল, যদিও সেদিন অফিসে বা পথে তার দিনটা মোটামুটি ভালই কেটেছিল এবং নেশাটেশা না করা সত্ত্বেও বিছানায় শুয়ে আর পাঁচটা বিষয় ভাববার সঙ্গে সঙ্গে আজ বউকে একটু আদর করলে মন্দ হয় না এমন চিন্তা—ব্যাপারটা খুব একটা আবশ্যিক নয়, ঐচ্ছিক মাত্র—মনে একবার ঘোরাফেরা করেছিল, তখন ভয়ে সে ফুলে ঢোল হয়ে উঠল।

কিন্তু এটা কি তার স্বার্থপরতা নয়? সে অনেকবার ভাবতে চেষ্টা করেছে। তুমিও যদি আমাকে এড়িয়ে যাও তবে আমি যাই কার কাছে বল। কে আর আছে আমার, কথা বলার লোক কে আছে বল। বাড়ির বাইরে গেলেই তুমি কথা বলার লোক পাও, আমার সঙ্গে কথা না বললেও তোমার চলে, কিন্তু আমি, আমি কার কাছে মুখ খুলি বল। দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছি জান। তোমার জন্য জান। আমি কিন্তু ছোট ছিলাম না, ভালবাসা দিতে চেয়েছিলাম, ভালবাসা চেয়েছিলাম,

আমার প্রাপ্য আমি পেয়েছি, বল? সব যন্ত্রণা বুকে পুষে পুষে রাখছি। ছোট হয়ে যাচ্ছি। একদিন দেখো, খুব শক্ত অসুখ হবে বুকে। তার স্ত্রী এইসব কথা বলে একদিন কেঁদেছিল। কাউকে না শোনাতে পারলে তার স্ত্রী ফিসফিস করে বলেছিল, একদিন কিন্তু পাগল হয়ে যেতে পারি। সেইদিন তার ভয় হয়েছিল খুব। সেদিন থেকে সে ভয়ে ভয়ে আছে।

তার স্ত্রীকে সেই তো ভালবেসে এ বাড়িতে এনেছিল। এ বাড়িতে ভালবাসা এনেছিল। মুঠো করে ধরে রাখতে চেয়েছে বউকে, কিন্তু বুঝতে পারেনি মুঠো যতই শক্ত হোক, মাখনের মত সে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়তে পারে। পড়ছে। তাই তো সে শক্ত একটা আধারের ধান্ধায় ছিল, বিশ গেজ যার বডি, আঠার গেজ পাল্লা। যার ভিতর কোন কিছু রাখলে একেবারে নিশ্চিন্ত, নষ্ট হবে না, চোরে নিতে পারবে না, আগুনে পুড়বে না।

হই হই চিৎকার শুনে সে লাফিয়ে উঠল। অল্প পরিসরে মুটেরা আলমারিটাকে নতুন ফ্ল্যাটে ঢোকাতে না পেরে সিঁড়ির রেলিং-এ তুলেছিল। স্লিপ খেয়ে বেশ খানিকটা নেমে গিয়েছে। একটা মুটের হাত ছেঁচে গিয়েছে খানিকটা। এ সময়ে বেজায় রেগে যাওয়া উচিত ছিল তার। পারলে ভাল হত। কিন্তু না, সে শুধু আকার অবয়বহীন এক ধরনের ফিকে অস্বস্তির দ্বারা পীড়িত হতে থাকল। রাগের আগুন নয়, বিচিলির গাদা থেকে যে রকম নিস্তেজ ধোঁয়া বেরোয়, সেই রকম ভোঁতা ভোঁতা একটা অনুভূতি। যে সময়ে রেগে ফেটে পড়া উচিত সে-সব মুহূর্তে সে এর আগেও লক্ষ্য করেছে কেমন যেন জুড়িয়ে পড়ে, তার মস্তিষ্ক শীতল হিসাব কষে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। সে মনে করে দেখল, কখনও কাউকে আক্রমণ করেনি, প্রাণের দায়ে তার কাছে কেউ সাহায্য চাইলে সে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

স্যর, বুড়ো এক কেরানীবাবুকে তার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখে সে চমকে উঠেছিল একদিন। স্যর বাঁচান। লোকটি পাশের ওই বোসের সেকশনে কাজ করে। স্যর আমাকে প্রোটেকশন দিন। তাকে কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছে না বুড়োটা। ভয়ে তার দুচোখ গর্তে ঢুকে গিয়েছে। কস বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। স্যর আমি লয়্যাল ওয়ারকার। কালকের স্ট্রাইকে আমি অফিস করেছি। বুড়োটাকে টালুমালু চাইতে দেখে তার মনে হল, সে গা ঢাকা দিয়ে বাঁচবার একটা জায়গা খুঁজছে। টেবিলের ড্রয়ারে, চেয়ারের নীচে, ফাইলের ভিতরে যেখানে হোক সেঁধিয়ে পড়তে চায়। স্যর আমাদের মত নেয়নি, স্ট্রাইক ডেকেছে। আর দেড়

বছর বাকি আছে রিটায়ার করতে, এর মধ্যে ব্রেক অব সারভিস হলে সারা জীবনের খাটুনি বরবাদ হয়ে যাবে। তাছাড়া আপনারা স্যর অ্যাসিওরেন্স দিয়েছিলেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। তাই পরশু থেকে বাড়ি যাইনি। অফিসেই লুকিয়ে ছিলাম। ওরা স্যর টের পেয়ে গেছে। ওরা স্যর খুঁজছে। পেলে আর আস্ত রাখবে না। মগের মুলুক নাকি। এটা সরকারি অফিস। মনে মনে সে আবৃত্তি করল। সে দেখল, বুড়োটা ভয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপছে। তার পায়ের গোড়ায় এই বাপের বয়সি লোকটা জবুথবু হয়ে বসে থরথর করে কাঁপছে আর কুঁই কুঁই আওয়াজ করছে। এমন জানলে কুঁই কুঁই বাড়িতেই থাকতাম কুঁই কুঁই কুঁই বাঁচান স্যর, এবারের মত প্রোটেকশান দিন কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই। সে টের পেল বুড়োটা ক্রমশ তার পা ঘেঁসে সরে আসছে। সে বলতে চাইল, উঠুন, কোন ভয় নেই। তার বদলে সে যখন শুনল সে বলছে, মিঃ বোস কোথায়, (সে জানত বোস আজ গা ঢাকা দিয়েছে। কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সে থাকে না। বোসটা অনেক খলিফা)। তার কাছে না গিয়ে আমার কাছে এসেছেন কেন, আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা তো তাঁরই করার কথা, আমার সেকশনের বাইরে কিছু করার এক্তিয়ার তো আমাকে দেওয়া হয়নি, আপনি বরং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে যান—তখন নিজেই খুব অবাক হল। যে-রকম অনায়াসে ফাইলে একটি নোট মেরে দায়িত্বটা আর কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, তেমনি নিপুণতায় সে যে এই রকম একটা সমস্যাও অন্যের সীমানায় চালান করে দিতে পারবে ভাবেনি।

কিন্তু তার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োটা এমন শুকনো এমন শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল যে সে হিম হয়ে গেল। আর তক্ষুনি সে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করল তার রাগ আসছে না। কোন ব্যাপারেই আর তার রাগ আসে না।

কিছুতেই সে রেগে উঠতে পারল না। অথচ তার চোখের সামনেই আলমারির হ্যানডেলটা একটু একটু করে নামতে নামতে রেলিঙে গিয়ে ঠেকল। মুটেরা প্রাণপণে আলমারির পতন রোধ করতে চেষ্টা করছে। দুজনে পিঠ দিয়ে ঠেলে ধরেছে। আরেকজন উপর থেকে টানছে, এমন কি হাত-ছ্যাঁচা মুটেটাও এই সঙ্গীন মুহূর্তে হাতের কথা ভুলে গিয়ে আলমারিটা চেপে ধরেছে। তার বউ এতক্ষণ এ ঘর থেকে ওঘরে বই গুছিয়ে রাখছিল, এবার উদ্বেগে অধীর হয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল। আলমারির হ্যানডেলটা সিঁড়ির রেলিং-এ ঘষড়াতে ঘষড়াতে কি-ই-ই-চ করে একটানা আওয়াজ ছাড়তে লাগল। হ্যানডেল হ্যানডেল হ্যানডেল! কি, তোমরা সব চোখের

মাথা খেয়ে রেখেছ, না কি ? স্ত্রীর ধমক খেয়ে মুটেরা আলমারিটার নিম্নগাত প্রাণপণে রোধ করল। তারস্বরে নিজেদের মধ্যে ঘোর বচসায় প্রবৃত্ত হল। মা-ও এই গোলমালে বিচলিত হয়ে উঠে আর কিছু না পেয়ে গোটা ব্যাপারটার (কী ঘটছে উনি জানেন না) জন্য আলমারিটাকেই দোষী করতে লাগলেন।

সেও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আলমারিটা ঠেলে ধরল। এবং ভাবতে লাগল কেউ যদি তাঁকে এখন প্রশ্ন করে, আচ্ছা বলত, আলমারির সব থেকে দরকারি জায়গাটা কী, তবে সে কী জবাব দেবে ? কোন জবাব তার মনে পড়ল না। আমার শরীরের সব থেকে দরকারি অংশ কোনটা ? এই পৃথিবীর সব থেকে জরুরি সমস্যা কী ? কোন্ লক্ষণে মানুষকে মানুষ বলে চেনা যায় ? ইত্যাদি প্রশ্ন তাকে যদি কেউ করে তবে সে যে জবাবে একটা কথাও বলতে পারবে না, সে তা বুঝতে পারল। ফলে বেশ ভয় পেল। ওই বুড়ো অসহায় কেরানীটাকে সে সেদিন আশ্রয় দিতে পারল না কেন ? ভাবতে সে ভয় পেল। আশ্রয় দেবার মুরোদ যে তার নেই সেকথা তাকে স্পষ্ট জানাল না কেন ? ভয়। প্রশ্নের মুখোমুখি হতে ভয়। সিদ্ধান্ত নিতে ভয়।

—আরে এ বাবু ছোড় দো। একেলা ঠেল ঠেলকে তু কা করব।

সে যে কখন থেকে আলমারি ঠেলছে তা বুঝতে পারেনি। মুটেদের কথায় সে সম্বিৎ ফিরে পেল।

—তুমি ওখানে কি করছ, এই শরীর নিয়ে। উঠে এস।

তার স্ত্রীর ডাক শুনে সে হাত মুছতে শুরু করল।

—যা করবার ওরাই করবে। তোমার এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার কী।

বউ ব্যাপারটা আমার মত তলিয়ে দেখছে না বা দেখতে চায় না বা দেখতে পারে না বলে বুঝতে পারছে না যে এই আলমারিটা অক্ষত অবস্থায় আমাদের নতুন ফ্ল্যাটে নিয়ে তোলার সমস্যাটা আমার কাছে জীবন মরণ সমস্যা। সে কথাটা স্বগতভাবে বলে একবার বউ-এর দিকে চাইল, তারপর আস্তে করে অবশ্য বউ যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে জবাব দিল, যাচ্ছি। তারপর নিজের দিকে চাইল এবং আবার স্বগতভাবে বলল, এখন এই আলমারিটাই ভরসা। আর কিছু নেই। এটাকে তাই অক্ষতভাবে ফ্ল্যাটে ঢোকান দরকার। কেননা ভালবাসার অপচয় নিবারণের জন্য ও রকম শক্তপোক্ত একটা আধারই চাই।

হঠাৎ স্লিপ খাওয়া আলমারিটার গুঁতোয় সে দু-তিনটে সিঁড়ি টাল খেয়ে নেমে পড়ল। অতিকষ্টে রেলিং ধরে সামলে নিয়ে সে দেখল আলমারিটাও তার গায়ের

উপর এসে পড়েছে। সে দুহাতে শরীরের সমস্ত জোর এনে আলমারিটার গতি খানিকটা রুখে দিল। বেশ ভারি। বেশ জবরদস্ত মনে হল। মুটেরা তারস্বরে ঝগড়া করতে করতে এসে আবার ধরে ফেলল আলমারি।

আলমারির ফাঁক দিয়ে সে রেলিং বরাবর চেয়ে দেখল বেশ খানিকটা নেমে এসেছে তারা। বউটাকে এই নিচু থেকে বেশ মহীয়সী বলে মনে হচ্ছে তার যেন হুকুম দিলেই আলমারিটা সুড়সুড় করে উঠে যাবে তার পায়ের কাছে।

আলমারিটাকে সে ভেবে রেখেছে তার শোয়ার ঘরে পায়ের দিকে রেখে দেবে, যাতে ভোরবেলা চোখ মেলেই ওটা দেখতে পারে। তাতে তার ধারণা প্রতিদিন সে মনে জোর পাবে। আর সোয়েটার দিয়ে যেভাবে জাপান থেকে কিনে আনা দামী ক্যামেরাটা মুড়ে ফাঙ্গাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল তেমনিভাবে ভালবাসাটাও সোয়েটারে মুড়ে ওই আলমারির ভিতরে তুলে রেখে দেবে, তাহলেই নিশ্চিন্ত।

সে শুনতে পেল বহুদূর থেকে তার বউ তাকে উঠে যেতে বলল। সে ততক্ষণে আলমারি ঠেলতে কাঁধ লাগাতে গিয়ে যেই একটু নিচু হল, অমনি সে দেখল আলমারির বডি, বাঁকানো রেলিং, তার বউ-এর পা হলদে শাড়ি পেট বুক মাথা তার উপর একটা বাল্‌ব, বাল্‌বটা জ্বলছে, বউ-এর মাথার উপর জ্বলন্ত বাল্‌ব, আলোর বলয়, তারপর একটু অবকাশ, আর তারপরই তার দৃষ্টিটা ঠিক করে সিলিং-এ ঠোক্কর খেল। একবার নিজের দিকে দেখল। তারপর আলমারিটা ঠেলতে ঠেলতে ভাবল, এই বোধ হয় তার সংসারের সীমানা। মুটেরা যখন তার চারপাশে হেঁইয়ো হেঁইয়ো বলে প্রচণ্ড সোর তুলেছে তখন সে তারই মধ্যে বলে ফেলল, আসলে আমি দাঁড়াতে চাই। আমি যে দাঁড়াতে পারি· এমন একটা বিশ্বাস আমার দরকার।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ডাক্তার এসে পৌঁছুতে পারেনি, এরই মধ্যে সব শেষ। মারা গেছে কলেরায়। মাছ খেয়ে হয়েছিল কলেরা।

ফজল আলি হাঁ করে পড়ে আছে। চোখ দুটো খোলা মাছের মতো, চোখকে খোলা রেখে যারা ঘুমায় হঠাৎ দেখলে সেরকমই মনে হয়। ঠোঁট দুটো যেন এইমাত্র একটা কথা বলে শেষ করেছে। আর সারা শরীর সিঁটিয়ে যাওয়া লতার মতো। শিরদাঁড়া ভাঙা, নেতানো। বিছানার সঙ্গে লেপটে আছে।

ডাক্তার ভেতরে ঢুকেই সটান দরজার দিকে ফেরত গেল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললো, আর দেখার দরকার নাই। এমনি কলেরার কল্ আরো তিন জায়গা থেকে এসেছে। ঐ মাছ খেয়েই কলেরা। যেতে হবে। বসলোও না, টাকাও নিলো না।

শুধু শুধু কলেরায় মরলে এতো কৌতূহল সৃষ্টি করে না। গাঁয়ের অর্ধেক লোক ভীড় করে আছে বাড়ীটায়, কেউ ভেতরে—আঙিনায়, বেশীরভাগ বাইরে, দঙ্গল করা। একজন বললো, একটু সুর করে কথা বলে সে, ছন্দের মতো দোলা না লাগলে বলতেই পারে না: মাছ খাওয়া নিষেধ, সারা গাঁয়ে গাঁয়ে তিন দিন হইল কইয়া দেওয়া হইছে—আর খাইও না মাছ। ভুঁইকাপে আসামের পানি খারাপ হইল। সেই পানি সারা দুনিয়ায় ছড়াইল, সেই পানির মাছ যাই খাব তাই শেষ। কথা তো আর শুনব না! কথাত আছে, বুদ্ধি নিও তিন মাথার কাছে। তারা কি আর না বুইঝি কিছু কয়। দেহ এলা।

ভূমিকম্পটা অকস্মাৎ! অসম্ভব ক্ষতি করেছে। আসামের মাটি চিঁরে ধাতু উঠেছে বলকিয়ে। ধসে গেছে রেল লাইন। স্রোতের গতি ফিরেছে নদীর। দুটো তিনটে

ধারা একখাতে একাকার হয়ে বইতে শুরু করেছে। কোনোটা বা ঊষর প্রান্তরকে ছাপিয়ে দিয়েছে বন্যায়। অদ্ভুত বন্যা, মাথা পাগলা বন্যা—মানুষ, পশু আর মাছ-কুমীর একস্রোতে ভেসে যাচ্ছে। পুরো একটা পাহাড়ই নাকি গেছে ধসে। সেখানকার ত্রিশ মাইল জায়গা জুড়ে এখন থৈ-থৈ জল। লোক গেছে মারা, বিরাট একদল সৈন্য ছিল পাহাড়ের চূড়ায়, তারাও নিখোঁজ। এর দোলা লেগেছে পূর্ব বাংলাতেও। তাছাড়া আসামের স্তূপ ধ্বংস-নজির ভেসে আসছে যমুনার স্রোত বেয়ে বাহাতুরাবাদ, ফুলছরিঘাট-যমুনা পারের এখানে-সেখানে আটকে আছে বিরাট দেহ মরা হাতী, বাঘ ভালুক আর গলিতদেহ মানুষের শব। ছিন্নমূল গাছ ভেসে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে কচুরী পানা যেমন জাম হয়ে ভাসে।

জলে ফর্মালিনের গন্ধের মতো তীব্রতা। ডিসেকশন করা মড়ার কাছে গেলে এরকম ঠেকে। পানি, চাপ-চাপ কাদা। আসামের মাটির নীচে সালফার রয়েছে, তাই মিশে দূষিত করেছে জল। সালফারের গন্ধ পচা ডিমের মতো। এ কিন্তু সে রকম নয়। এতে তীব্রতর ঝাঁঝ। বাতাসের বুকে বলকে বলকে উঠছে। নদীর পাড়ে বসতি যাদের, হাওয়ার ঝাপটা লাগলে দরজা জানলা বন্ধ না করে শ্বাসই টানতে পারে না তারা। ময়মনসিংহের উত্তরের দিকটায় ইতিমধ্যেই খাল, নালা, বিলঝিলের ভেতরেও ঢুকে পড়েছে এই জল। অনেকেই মনে করছে, এবারের আমন পচে যাবে। এই পচাপানি যা কিছু স্পর্শ করবে না কেন, বিষক্ত করে দেবে।

আতঙ্কে মাছ খাওয়া ছেড়েছে সবাই। জীয়ন্ত মাছের পাতলা চামড়াটুকু তুললেই পচা দগদগে মাংস বেরিয়ে পড়ে। ইসলামপুরের হাটে তিনটি বড় বাইগড় আর একটি শঙ্কর মাছ উঠেছিল এই হাটবারে। হাটের জীবনে এতো বড় মাছ একসঙ্গে এতগুলো এই প্রথম। হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখেনি কেউ। শুধু শঙ্কর মাছের একটু-আধটু নিয়ে গিয়েছিলো কেউ-কেউ ওষুধ করার জন্যে।

এই আতঙ্ক এড়িয়েও যারা তু-একটা বড়ো মাছ অতি সহজে ধরে ফেলে খাওয়ার লোভ সামলাতে পারলো না, তারাও কাণ্ড করেছে কম নয়। হয়েছে কলেরা! আর সৃষ্টি করেছে গবেষণার হৈ-চৈ শুধু। শুধু মাছ খেয়েই যে কলেরা হবে এও অনেকে মানতে চায় না। অনেকেই মাথা খুঁড়ে চালাচ্ছে তর্ক। কেউ কেউ মন্তব্যও করেছে একপেশে। আর সবারই চোখ তুটো হয়ে উঠেছে লাল। অদ্ভুত কৌতূহলে হয়েছে বড়ো বড়ো, ফাটা-ফাটা। ফজল আলির মৃতদেহটা ঘিরে অনেকেই অনেক রকম ভাবতে শুরু করে দিল।

হঁ্যা, ফজল আলি একটা মাছ ধরেছিল বটে। রশিদের নৌকা নিয়ে ঘুর-ঘুর করছিল যমুনা কিনারায়। কানের পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলো কাতলাটা। ফজল আলি কায়দা করে সমান স্রোতে নৌকাটা মাছটার পাশাপাশি ভাসিয়ে রেখে, শক্ত করে ধরে ফেলেছিল কানশাখাটা। তারপর ঠেলে পারে ভিড়িয়েছিল নৌকা আর মাছ এক সাথে। ডাকাডাকি করে কাকেও পায়নি কাছে, নৌকায় তুলতে হয়েছিল সেই মাছ অনেক কষ্ট করে তবে। মাছটা কেমন নিথর হয়ে পড়েছিল হাঁফ ছেড়ে দিয়ে। নড়েওনি চড়েওনি। কানশাখাটা কাঁপিয়ে শ্বাস টানছিল শুধু। ডাকাডাকি করে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে হন্তদন্ত বৌকে বাইরে এনেছিলো ঘরের—দেহরে, কি আনছি দেহ, দেহ। কোনঠাই গেলা? বাড়ির ঘাটে নৌকা লাগিয়ে হাঁক পেড়েছিল সে।

বৌ আর সে টানা-হেঁচড়া করে তবে মাছটা আঙিনায় ফেলতে পারে। অকস্মাৎ খুশীতে বুকটা আঁতকে উঠেছিল বৌর। ধকধক ধকধক করে কতক্ষণ, তারপর মুখটা কুঁচকে ছোট হয়ে আসে। নীল হয়ে যায় হতাশায়। বলে মাছ তো আনলা, খাওয়া ত আর যায় না। চারদিকে মানুষ মাছ ছাড়ছে; কয়, কি বলে, হৈছে মাছে।

তর যে আর কথা। কিসের আবার কি হইছে খাওয়া যাবে না। যত না, হুঁ।

নাগো না, না খাইলা। কি জানি কি আবার হয়।

বাড়াবাড়িটা থামাত তুই। সবটাতেই বাড়াবাড়ি করিস না কইলাম মাইয়া মানুষ হইয়া। জনমে ত আর কাতলা মাছ খাস নাই, জীবনেও জুটবে না। পুঁটি মাছ কপালে জুটে না, তা আবার কাতলা। খাইয়া নি খাইয়া নি, বুঝলি? বৌ চুপ করেছিল।

হঁ্যা, ফজল আলির খাওয়ার শখ ছিল বটে। যে সন্ধ্যেটা ভাতে-মাছে গেছে ওর, ওকে মনে হোত অন্য মানুষ সেদিন। কিন্তু জুটবে কেমন করে?

গ্রামে জমি আছে অঢেল; তার জমি কোন্‌টা? গ্রামে নালাজলা অঢেল, সে জাল ফেলবে কোথায়? নদী, বড়ো নালা বিল—জমিদারের দখলে। সেখানে মাছ ধরা নিষেধ। ছোট ছোট খাল জলা যা বাকী থাকে, সে-সবও বড়লোকের দাড়কি, ধুয়োর দিয়ে দখলি নেওয়া। সে জায়গা পাবে কেন?

নিজের এমন যন্ত্র সরঞ্জামও নেই যে অন্য কোথায় ও চেষ্টা করতে পারে।

জাল নেই যে ছাপ দেবে। পাচা নাই যে থাই মারবে। খেওয়াল নেই যে টেনে তুলবে।

তবু হঠাৎ পাওয়া মাছে ভাতের সম্মোটা কি অপূর্ব গেছে ওর। মনের ভেতরে দাগ কেটে গেছে।

ফিকির ফন্দী করে আধসের তেল জুগিয়ে এনেছিলো। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, এসবও জোগাড় করেছিলো। কোঁছায় করে এনে ঢেলে দিয়েছিল বৌয়ের সামনে। বেঁকে যাওয়া মনটা আর স্থির রাখতে পারেনি বৌ। লোভটা আবার চকমক করে উঠছিল চোখে-মুখে ওরও। উৎসাহে চনমন করে উঠছিলো রক্ত। বঁটি নিয়ে বসে গিয়েছিল সে।

ভীড় করে আছে সব মরা মানুষের চারিদিকে, আর বাড়ির চারিদিকে। মরার আগের দিন কি যেন বলতে চেয়েছিল ফজল আলি। বৌকে ডেকেছিল হয়তো। নতুন বিয়ে করা বৌ, কেবল ঘর-সংসার পাতা। ছেলেমেয়েও হয়নি। শেষ সময়ে কিছুতেই ভুলে থাকতে পারে না। মুখ দিয়ে অস্ফুট অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে শুধু। কিছুক্ষণ ওর দিকে ঝুঁকে থাকে সবাই, তারপর একযোগে দৃষ্টি সরিয়ে এনে বৌয়ের দিকে চায়। বৌ তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বিলাপ করছে, শেষ আশাটুকুও ছেড়ে দিয়ে ডুকরে কাঁদছে, তার মনের কথাগুলোই গানের কলির মতো সুর করে সে বলছিলো আর ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল অসহায়ভাবে কিছুটা আচ্ছন্ন হয়েই যেন চারপাশের সবার কথা মুহূর্তে একদম ভুলে গিয়ে।

আমি ক্যান আগে খাই নাই গো।

আদর কইরা আগেভাগে খিলাইলাম গো।

আমিই আগে মরলায় হনি গো।

ও হো হো হো।

অরণ্যের গাছগুলোর মতো মানুষগুলো স্তব্ধ হয়ে ছিলো। একজন টেনে দূরে সরিয়ে এনেছিল বৌকে। ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওপরটান উঠেছিল ফজল আলির। ততক্ষণে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিল বৌ।

একজন খোলা চোখ বন্ধ করে দিলো ফজল আলির। বুজিয়ে দিল ফাঁক করা ঠোঁট। সটান করলো হাত-পা। মরে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন করে না দিলে জমে যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, লাসটাকে আর সহজই করা যায় না এরপরে।

স্বাভাবিক মরা নয়।

শুধু কলেরার মরার মতো সহজ নয় এ মৃত্যু। মানুষগুলো ছোটাছুটি করছে, কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ওদের ভেতরটা ঠেলে ঠেলে উঠছে। ফজল আলি শুধু মাছ খেয়ে নিজের দোষে মরেছে বলে কেউ আর ভাবতেও পারছে না। একি

উপদ্রব এলো পৃথিবীতে? সারা ঠাঁই জুড়ে অভিশাপ। কেয়ামত নাকি অত্যন্ত কাছে এসেছে। আতঙ্কটা সবার। একজন বললো—লোকটা যুক্তিশীল। বলতে বলতে মাঝে মাঝে, নিজেই তার উত্তর দেয়। আত্ম-সমালোচনার ঝাঁঝ থাকে কথাতে। কি এক জ্বালা হইল কওত? আসামে হইছে ভুঁইকাপ, মানুষ মরছে সেনু—তাণ্ডব হইছে সেনু—তা এহেন যে মড়ক শুরু হইল এহানেও। তাও দেহ আবার মরে কারা? ঐ নেংটিখোলা আর নেংটিআলা। জানোয়ার আর মানুষ। বড় মানুষ বেবাকার সবাই। ফজল আলি মরল ক্যাঁ? না কি শালা হা-ভাইতা। পয়সা থাকলে কি, জনমে কোনদিন বড় মাছ খাইলে কি ও মরত? মরত ও? কও ত? গরীবের সুখ আর কহন? কওত কহন?

ঘরের কোণে কান্নারত বৌটির বিলাপের কথা এতক্ষণ ফুরিয়ে এসেছে। আশে-পাশের আলোচনার কিছু কিছু শব্দ তার কানে এসে বাজতেই—সে-কথার খেই ধরে সে আবার কথা খুঁজে পায়। তার রেশ ধরে আবার গীত শুরু করে সে:

কত সুখ চাইছিলরে—পায় নাই কোন দিন, কত আশা আছিলরে—পুরে নাই কোনদিন, ও-হো-হো-হো।

আর একজন বললো, কালো চিমসে মুখ, বিশ্বাসপ্রবণ, প্রতি কথার পিছনে ঘটনার উদাহরণ টেনে নিজেকে সমর্থন করে,—না! খোদায় গজব পড়ছে। সেই গজব পড়ছে খোদার। গজবের মাল যারাই নিব তারই আর রাহা নাই। গতবারের নোয়াখালির বানের কথা কই। সেই যে মানুষ আর গরু সব ভাইসা গেল একেবারে। পানিও খাইলে মরণ। মরা মানুয সব জাগা বেজাগায় পইড়া আছে। কারো গায়ে গয়না, কারো গলায় হার, টাকার খতি বাইন্দা রাইখছে কেউ কোমরে। যাই যাই সেইগুলা নিল স ব মরছে—এইডা হোল খোদার গজব—

গজবের কথাটা শুনে বৌয়ের কান্না আবার বেড়ে গেলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝিমিয়ে পড়ে আবার সে গীত করে কাঁদতে শুরু করলো:

গজবের মাল কতজন নিল গো—
তাগরে কিছু হয় নাই
কতজনের মাল কতজনে কাড়িলো গো—
তাগরে কিছু হয় নাই।
মিয়ারা কত গজবের কাঠ বান্ধিল গো
তাগরে কিছু হয় না
ও-হো-হো-হো।

ভূমিকম্প আর বন্যা যে কাঠ ভাসিয়ে এনেছে তাই উত্তেজনার সৃষ্টি করছে সবচেয়ে বেশী। অনেকে বেদম খুশিও হয়েছে। গ্রামের আলস্যে চর্বিস্ফীত লোকগুলোর তৎপরতা গেছে বেড়ে। খৈয়ের মত উত্তপ্ত ঠোঁটের উপরে ফুটছে, বিধ্বস্ত আসাম, আসামের মাছ, মানুষ আর কূপ ভাঙ্গা অজস্র কাঠের কথা। কাঠটাই সবচেয়ে বেশী আলোচ্য বিষয়।

আসাম কাঠ বন্ধ করেছিলো পাকিস্তানকে দেবে না বলে। সেই কাঠ বন্যায় ভেসে আসছে হু-হু করে পাকিস্তানের খালে বিলে। খোদা দিচ্ছে, কে বাধা দেয়! পাকিস্তানকে দিচ্ছে খোদা! উৎফুল্ল কণ্ঠে মন্তব্য করেছিলো আড়মোড়া ভেঙ্গে বড়মিয়া। তিনি নৌকা ভাড়া করে, মজুর রেখে অন্তত দশ বছরের খড়ি কাঠ আটকিয়েছেন খামারে। যারই নৌকা আছে, আছে টাকা, সেই বেঁধেছে কাঠ ইচ্ছেমত। মৌলবী সাহেব ফতোয়া দিয়েছিলেন, নিওনা চেলী। ফওতী মাল নেবে না কোনো। প্রতিবাদ করেছিলো অনেকে। তখন মৌলবী সাহেব গল্প বলেছিলেন একটা, ইমাম হানিফার বুজরগীর। কেবলা সাহেবের কলব আল্লাহ আল্লাহ করতো হরওয়াখত। একদিন হয়েছে কি—দরিয়াতে ভেসে আসা একটা নাশপাতি খেয়ে ফেললেন পেরেশা হয়ে। অমনি কি কদরত খোদার—কলব জেকের বন্ধ করে দিয়ে নিথর, হিম, ঠাণ্ডা একেবারে। গল্পে আর আর পস্তানিতে সালাশীন ছাড়লেন হজরত। ভাবলেন, যার এই নাশপাতি মাগফেরাত নিতেই হবে তার কাছ থেকে। হেঁটে হেঁটে চললেন তিনি সাত রোজ। অনেক খোঁজাখুঁজির বাদ মোলাকাত হলো মালিকের সাথে অবশেষে। হজরত বললেন, মাফ করো। মালিক তো পাথর। কানেই তুললেন না কথা, আমার মাল আমি খাব তুমি খেলে কেন? মাফ আমি করতে পারি না। হজরত কাঁদলেন, অনেক কোশেশ করলেন, বোঝালেন। এই জিন্দেগীর তামাম মেহনত তাঁর বরবাদ যাবে, গজব নাজেল হবে খোদার। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বিপরীতধর্মী মানুষের মুখোমুখি এমন অদ্ভুত মুহূর্তের উদ্ভব চিরকাল হয়ে আসছে, কিন্তু এর ফয়সালা আজতক হলো কই?

চিরদিন মানুষকে বঞ্চনা করে অভ্যস্ত যারা হয়ে উঠেছে, অথচ শাস্তি কোনদিন দেখেওনি, তাদের দুঃসাহসে বাঁধ মানলো না। আর একদল চিরদিন কিছুই না পেয়ে পেয়ে বঞ্চিত হয়ে, মানুষের চিরস্থায়ী সত্তাকে কিছুতেই আর স্বীকার করে না। তাই মৃত্যুকে ভয় না করে গজবের ও অন্যের জলমহলের ছাড়া পাওয়া মাছ, দূষিত পানিতে গলিত মাছও জনমশোধ খেয়ে নিল। আর বড় মানুষের

অনেক টাকায় ভাকা কূপ ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ছিটিয়ে পড়েছে যে অজস্র কাঠ তাই দেখে খুশীও হলো। ভাবলো সেখানে—আসামে নেংটিপরা মানুষ আর লেজওয়ালা কুকুর এক হয়ে গেছে। দাঙ্গা ভুলে হিন্দু মুসলমান একপাত থেকে খাবার কামড়াকামড়ি করে খাচ্ছে। হতভাগ্য উদ্বাস্তু মানুষগুলো যাদের ঠাঁই ছিল না কোথাও, তারা এবারে জায়গা পেয়েছে যমুনা ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বুকে, উত্তপ্ত জলের নিশ্চিত স্রোতের ভেতর। ভাসছে আর ভাসছে বিরাট বিরাট অভিজাত মাছ, কচুরী পানার মতো জাম বেঁধে কূপভাঙা ঝাঁকঝাঁক মাছ ভাসতে ভাসতে সেসব পাকিস্তানের চকমকে চোখের সামনে এসে গেছে। পাকিস্তানের শক্ত সমর্থ নিশ্চিত ডাঙ্গার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ধ্বসে যাওয়া আসামের কাঠ পেয়ে ধনী হয়ে উঠবে পাকিস্তান।

একে একে মানুষগুলো সরে যেতে লাগলো মুর্দার কাছ থেকে। দাফন করাতে হবে। স্তব্ধ সমুদ্রের বুকে ঝড় উঠলে ঢেউগুলো যেমন আকুলিবিকুলি করে তেমনি মানুষগুলো তছনছ হয়ে গেলো ভাবনায়। আতঙ্কে, অস্বস্তিতে, গায়েবী জেল্লার শিহরণে। ফজল আলীর মৃতদেহটার অস্তিত্ব ঘিরে থমথম করতে লাগলো ওদের অনুভূতি। কোন অবিমিশ্র করুণা কিংবা সহানুভূতিতে নয় নিজেদের কথা ভেবেই ওদের বুকগুলো দুলে উঠলো, শিউরে শিউরে উঠতে লাগল বারবার।

এতক্ষণে ঘরটা খালি হয়ে গেল একেবারে। মৃত স্বামীর সঙ্গে নির্জন একাকীত্বে বৌয়ের মনটা সহানুভূতিতে গলে গেলো এখন। অবধারিত প্রেমে ভরে গেলো। মোমের মতো নরম হয়ে গলতে লাগলো সে। তাই তার বিলাপের কথা গেলো কমে, কান্না উঠলো বেড়ে :

মাছ খাবার চাইছিল রে—ওহো হো হো
মাছে জিও বান্ধা আছিল রে—ওহোঁ হো হো
মড়ার মাছ এহন কত হছেরে—ওহো হো হো।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বৃষ্টি □ আলাউদ্দিন আল আজাদ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বৃষ্টি নামবে। ঈষৎ শিশির ছোঁয়া বসন্ত রাত্রে দক্ষিণ থেকে বইবে যে হাওয়া, তাতে থাকবে সমুদ্রের আর্দ্রতা, ফাটল ধরা শুকনো মাঠ আর পাতাঝরা গাছের শাখায় শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে সেই অতিদূরে পাহাড়ের চূড়ায় ঘনীভূত হবে, এর পর গর্জনে বজ্রে বিদ্যুতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সারাটা আশমান, মঙ্গলসুধার মতো অজস্র ধারায় নামবে বৃষ্টি। গাছের শুকিয়ে যাওয়া ডালপালাগুলি কচি পাতায় ভরে উঠবে, সারা খামার ছেয়ে যাবে সবুজে সবুজে। দুপুরের রোদে পাট খেতের চারা বাছতে গিয়ে শরীর থেকে হয়তো দরদর করে ঘাম ঝরবে, কিন্তু তাতে আসবে না এইটুকু ক্লান্তি। কেননা, নতুন ফসলের খোয়াব প্লাবনের মতো মিশে থাকবে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে।

কিন্তু সে বছর এসব কিছুই হল না। ফাল্গুন চলে গেল, উত্তর দিকটা কিঞ্চিৎ কালোও হল না; চৈত্র শেষ হতে চললো, আকাশে দু-একদিন গুরু গুরু আওয়াজ হল, গুমোট হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি, কিন্তু এর বেশি কিছুই নয়।

এর পর এলো বৈশাখ। আর এখনও সূর্য আগুনের ফুলকি উড়িয়ে তীব্র তেজে জ্বলতেই লাগল, মাটির বুক চিরে মাথা উঁচিয়ে ওঠা পাটের চারাগুলি আস্তে আস্তে কুঁকড়ে গেল। ওপরে খাঁ-খাঁ শূন্য, নীচে আদিগন্ত মুক্ত সুদূর, তারও নীচে বাঘবন্দী নক্শার মতো জমিগুলি রোদে-পোড়া, বিবর্ণ। দুপুর বেলা খেতের আলের ওপর গিয়ে দাঁড়ালে কল্‌জেটা সহসা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ঝলসানো তামাটে জিহ্বা বার করে সারা মাঠটা ডাইনীর মতো হাঁ করে আছে। জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে সে নিজে বুকের শিশু-শস্যকে গ্রাস করেছে, আগামী বছর যে গজব নেমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

. . কিন্তু কেন? এর পিছনে নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে। সেদিন জুম্মা নামাজের পর আলোচনা উঠল। মিম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে মৌলানা মহীউদ্দিন বলতে লাগলেন,—বেরাদরানে-ইস্‌লাম! আমি অধম বান্দা, আপনাদের খেদমতে কি বয়ান করব, আপনারা সব বিষয়েই ওয়াকিফহাল। কিতাবে আছে খোদাব গজব নামে তখনি, যখন দুনিয়া গুণাগারিতে ভরে যায়। আমরা এখন কি দেখছি? না, ছেলে বাপের কথা শোনে না, জেনানা বে-পর্দা, চুরি-ডাকাতি বদমায়েসিতে দুনিয়া পূর্ণ হয়েছে। এদিকে নামাজ নেই, রোজা নেই, হজ্‌ নেই, জাকাত নেই। আজ চলুন, আমরা তাঁর দরবারে জার-জার হয়ে কাঁদি। মাঠে গিয়ে সবাই হাত তুলে মোনাজাত করি, তিনি রহমানুর রহিম, ইচ্ছা কবলে একটু দয়া করতেও পারেন।

মৌলানা সাহেবের কণ্ঠস্বরের গুরু গম্ভীর ধ্বনি-তরঙ্গে পাকা মসজিদের ভিতরটা গমগম করতে লাগল। মুসল্লিদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লাহ্‌। থুতনিতে একগুচ্ছ সাদা দাড়ি, মাথায় কিস্তি টুপি, নামাজ পড়তে পড়তে কপালেব মাঝখানটায় দাগ পড়েছে। তিনি প্রথমে গলা খাকরানি দিলেন, পরে আবেগকম্পিত গলায় বলতে লাগলেন, মৌলানা সাহেব যা বলবেন, তা অবশ্যই আমরা পালন করব। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা সকলের মনে রাখতে হবে, কু-কর্মের বিচার চাই। এই অনাবৃষ্টি কেন হল, আপনারা ভেবেছেন কি? খোলাখুলি বলতে গেলে, নিশ্চয় কোনো মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে, তৌবা আস্তাকফোরোল্লা। এই অঞ্চলে, আশেপাশের কোনো গ্রামে অথবা আমাদের গ্রামেও হতে পারে। এদের তালাস করে বার করতেই হবে, নইলে এই আজাবের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। এদের দুর্‌রা মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে।

ডান হাতের আঙুলগুলি দাড়িতে একবার চালিয়ে গরমে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন হাজি কলিমুল্লাহ্‌, তাঁর মগজের কোষে কোষে সত্যিকারের অপরাধকে খুঁজে পাওয়ার ভাবনা।

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ফুটবল খেলার ময়দানে যেদিন 'মেঘের নামাজ' হওয়ার কথা, তার একদিন আগেই অসুখে পড়লেন সুফী মৌলানা মহিউদ্দিন।

জামাতে ইমামতি করবার জন্য হাজি সাহেবকে গাঁয়ের তরফ থেকে অনুরোধ করা হল। প্রথমে বিনয় করলেও, সকলের খেদমতে পরে রাজি হলেন।

সেদিন নামাজ শেষ হওয়ার পরে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লা, বহুদূর চাউনি বুলিয়ে দেখলেন দুনিয়াটা এখনো জিন্দেগীর অযোগ্য হয়ে

উঠেনি, এখনো ডাক দিলে আলেমুল গায়েবের দরবারে হাজিরা দিতে হাজার লোককে পাওয়া যায়। তিনি চেয়ে রইলেন, আর দেখলেন অগণিত টুপির শোভা, হোক না সেগুলি তেল চিটচিটে অথবা ছেঁড়াখোঁড়া। খোলা প্রান্তরে গালভাঙা তামাটে মানুষগুলি বসে আছে অসহায়ের মতো, সবারই মনে একটুখানি রহমের প্রার্থনা। হাজি কলিমুল্লা দু'হাত তুলে দরাজ গলায় উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া বারে খোদা, তুই চোখ তুলে চা, একটু দয়া কর তোর বান্দাদের। তুই আশমান জমিন, চান-সুরুজের মালিক, তোর অঙ্গুলি হেলনে সাগর দোলে, হাওয়া ছুটে চলে, নহর বয়, তোর একটুখানি ইচ্ছায় এই দুনিয়া ফুলে-ফসলে ভরে উঠতে পারে। মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে, শান্তি দে তুই!'

'আল্লাহুম্মা আমিন! আল্লাহুম্মা আমিন! সারা জামাত জোড়া একই কাতর আওয়াজ। হাজি কলিমুল্লার সাদা দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে গেল। কেঁদে জার-জার হয়ে তিনি দোয়া খতম করলেন, 'সোবহানাকা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতে আম্মাইয়াসসেফুন, আস্‌সালামু আলাল মুরসালিনা, আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন!'

এইভাবে একদিন, দুদিন, তিনদিন ময়দানে গিয়ে জামাতে শামিল হল ছেলে-বুড়ো-জোয়ানেরা, তাদের এক চোখ আকাশের দিকে আরেক চোখ ফসল কুঁকড়ে যাওয়া খামারের দিকে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের এক মায়ের এক পুত্রের গায়ে চুন কালি মাখিয়ে, তার মাথার কুলোয় কোলা ব্যাঙ আর বিষকাঁটালির গাছ রেখে রাতের পরে রাত মেঘখেলা খেলল, নদীর ধারে সিন্নি রেঁধে কলা পাতায় ফকির-ফাকরাকে খাওয়াল। তাদের ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল ওপরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে; কিন্তু সেই রোদ চুয়ানো কাক-চক্ষু নীল, একখণ্ড মেঘের আভাসও দেখা গেল না।

মগরেবের নামাজের পর পাটিতে বসে তসবিহ জপতে জপতে এসব কথাই ভাবছিলেন হাজি কলিমুল্লা, তাঁর চোখের পুতুলিতে অবসাদের ছায়া। গভীর ভাবনার কারণ আছে বৈকি! সুতোর চোরাকারবার থেকে যে কয়েক হাজার টাকা পেয়েছিলেন তার অর্ধেক দিয়ে একটা গুদাম কিনেছেন মেঘনার বন্দরে, বাকি অর্ধেক দিয়ে কিনেছেন দুন দেড়েক জমি। নিজে পাট কিনে মজুদ করতে না পারলে গুদাম কেনার ফায়দা নেই। মাসিক দেড়শো টাকা ভাড়ায় আর কী হয়। অথচ এ বছরও গুদামটাকে নিজে ব্যবহায় করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে সবগুলি জমি নিজে চাষ করেছেন। এখানটায়ই

হয়েছে চরম বোকামি। যদি পত্তনি দিতেন, তাহলে হাজার দেড়েক টাকা নগদ পাওয়া যেত, কিন্তু মুনি-মজুর ও জমির তদারক করতে বেরিয়ে যাচ্ছে। বীজ বোনা থেকে এক-নিড়ি পর্যন্ত পয়সা-কড়ি কম খরচ হয় নি, ভবিষ্যতে আরও হবে, অথচ এদিকে আকাশের যা হাল, তাতে ফসল পাওয়ার বিশেষ আশা নেই।

স্তোর কারবার ছেড়ে দিয়েও ভালো কাজ করেন নি। গত বছর হাওয়া-গাড়িতে চড়ে গিয়ে হজ করে এসেছেন; ভেবেছিলেন, অতঃপর সংসারের ঝামেলাতে নিজেকে এতটা জড়াবেন না, গুদামটা ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে জমি-জমা নিয়েই থাকবেন। কিন্তু টাকার অভাবে সব ভেস্তে গেল। আসলে ব্যবসা ব্যবসাই, এতে সৎ-অসৎএর প্রশ্ন নেই, নিয়ৎ ভালো থাকলে দান-খয়রাত করলেই হল।

জানালার বাইরে থেকে আমের বোলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছিল, বাঁশঝাড়ে শালিকের কিচির-মিচির অনেকটা মন্দীভূত। তসবিহর গুটিগুলি চঞ্চল হয়ে ঘুরছে হাজি কলিমুল্লার আঙুলে আঙুলে, এই সঙ্গে তাঁর মনটা ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

জৈগুন ঘরে বাতি দিতে এসে যেন চমকে উঠল। বলল,—'মিয়া সা'ব এখানে? মসজিদে যান নি?'

'না, শরীরটা খুব ভালো নয়।' হাজি সাহেব ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—'তা ছাড়া তোর গিন্নিমা বোধ হয় একখুনি এসে পড়বেন।'

দিন পনেরো হল নতুন গিন্নি বাপের বাড়ি গিয়েছিল নাইওর করতে, আজকে তাকে আনাবার তারিখ। হাজি নিজে যেতে পারেন নি, প্রথম তরফের তৃতীয় ছেলে খালেদকে পাঠিয়েছিলেন সকাল বেলায়। আসলে বৌকে বাপের বাড়িতে বেশিদিন থাকতে দিতে তিনি সব সময়ই নারাজ। প্রথম স্ত্রীকে দশদিন থাকতে দিয়েছিলেন, তাও একেবারে নতুন অবস্থায়। দ্বিতীয় স্ত্রীর বেলায় দিনের সংখ্যা আরো কিছুটা বেড়েছিল। তবে এখন পড়তি বয়েস, সব ব্যাপারে কড়াকড়ি চলে না। দু'বছর আগে দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সংসার থেকে তাঁর মন একেবারে উঠেই গিয়েছিল। কিন্তু খোদার কুদরত, কার সাধ্য তার কিনারা করে? তিনি কপালে যা লিখে রেখেছেন, তা একদিন ফলবেই। গতবার যখন হজে যাচ্ছিলেন, তার মাসখানেক আগে সবাই ধরে বসলো, এমন সোনার সংসার, একজন গৃহিণী না থাকলে কোনো কিছুই ঠিক থাকবে না।

কিন্তু পাত্রী? বয়সে ষাট পুরো হতে চলল, এখন হাতে ধরে কে নিজের মেয়ে দিতে যাবে?

'হাসালেন হাজি সাহেব, হাসালেন। আপনার কিনা পাত্রীর অভাব?' মজু প্রধান দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন,—'আপনি ক'ন যে বিয়ে করবেন, আমি পাত্রী ঠিক করে দিচ্ছি! তাও যেমন তেমন নয়, এমন কন্যা দেব, চোখে পলক পড়বে না।'

হাজি কলিমুল্লার চোখের তারা দুটো খুশিতে চক্‌চক্ করে উঠল। একটা অজানা অনুভূতিতে তাঁর হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করছিল, কিন্তু বাইরে আগাগোড়া ম্লান হয়েই রইলেন, আগেকার সহধর্মিণীদের স্মৃতি এতো শীগগির ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি একটা ঢোক গিলে বললেন,—'দেখুন, তিনকাল গিয়ে এককালে পড়েছি, এখন আমোদ-আহ্লাদ করার সময় নয়। ঘরের তদারক আর—আর আমার ফাই-ফরমাইশটা করতে পারলেই হল।'

'তাতো বুঝলাম।' মজু প্রধান যুক্তি দেখালেন,—'ভাঙা-নাওয়েও কাজ চলে, আবার নতুন নাওয়েও চলে। কিন্তু কোন্‌টা আমরা চাই! কোন্‌টা দিয়ে গাঙ পাড়ি দিতে সুখ?'

এরপর সাতকানি জমি সাফ কাওলা করে দিয়ে যে পাত্রী ঠিক হয়েছিল, সে মজু প্রধানেরই মেয়ে-ঘরের নাতনী। বয়েস একুশ-বাইশ বছর হবে। এ-দেশের মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়, সে-হিসেবে হাজি সাহেবের সঙ্গে সম্বন্ধটা মোটেই বে-মানান হয়নি!

রান্নাঘরের হাঁড়ি পাতিল গুছিয়ে জৈগুন এল। অর্থপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসলো। হাজি সাহেবের ওজিফা তখনো শেষ হয়নি। মুখের বিড়বিড় খানিকক্ষণের জন্য থামিয়ে তিনি জিগগেস করলেন,—'কিরে, কিছু খবর আছে?'

জৈগুন বলল,—'আছে।'

'কি শুনি!' তসবিহর মালায় আঙুল থেমে গেল হাজি কলিমুল্লার, তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন। কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে গোপন খবর সংগ্রহের জন্য তিনি জৈগুনকে নিযুক্ত করেছিলেন, আর সেজন্যই এই আগ্রহ।

'আমি আজ গিয়েছিলাম বাতাসীর কাছে। গিয়ে দেখি, সে তার খাসিটার জন্য আমপাতা পাড়ছে। আমাকে দেখেই সে নানান কথা বলতে লাগল, কিন্তু আমি চেয়ে রইলাম ওর শরিলের দিকে।' দরজায় একবার চেয়ে নিয়ে জৈগুন বলল,—'ওর তলপেটটা বেশ ফোলা মনে হল।'

হাজি চিন্তিতভাবে জিগগেস করলেন,—'ওর জামাই না কবে মারা গেছে?'

'তা সাত-আট মাস তো হবেই!' জৈগুন বিশেষ করে বলল, 'কিন্তু ওর পেট মনে হল চার-পাচ মাসের।'

'তাই নাকি? তাহলে তো বেশ অনেক দিনের ফাঁক?' হাজি কলিমুল্লা যেন সত্যদর্শন করেছেন, তাঁর চোখে আশার আলো ফুলে উঠল। নিচু গলায় জিগগেস করলেন,—'আচ্ছা বাতাসীর ঘরে যে লোকটা থাকে তাকে দেখলি?'

'হাঁ, দেখলাম। অসুখ এখনো সারে নি, তবে আগের চেয়ে একটু ভালো। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি সে ঘরের ভিতরে বিছানায় শুয়ে আছে।'

'তা হোক, তা হোক।' হাজি অসহিষ্ণুর মতো বললেন,—'শুয়ে থাকলে কি হবে? শুয়ে থাকলে কি আর এসব কাজ করা যায় না? নিশ্চয় যায়। তুই কি বলিস?'

'হাঁ, আপনি ঠিকই কইছেন। তা ছাড়া বাতাসীর চলাফেরা আমার ভালো মনে হয় না। রজবালি বেঁচে থাকতেই এর সম্বন্ধে কত লোক কত কথা বলেছে। নামা-পাড়ার ছমু যে ওর দরজা খুলেছিল, তা কি কেউ শোনে নি। রজবালি টের পেয়েছিল বলেই না দোষটা ছমুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। না-হলে মেয়েমানুষের চোখঠারানি ছাড়া কি অমন কাজ কেউ করতে সাহস পায়?'

'যদি এই ঠিক হয়, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। আমার বিশ্বাস, বাতাসীই এ-কাম করেছে! না হলে বৃষ্টি হবে না কেন?' হাজি আবার তসবিহ জপতে লাগলেন, খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন,—'তবু রাখ, আমি নিজে একটু পরখ করে নিই, এরপর একটা কিছু করা যাবে।'

জৈগুন চলে গেলে আবার গভীর চিন্তামগ্ন হলেন হাজি কলিমুল্লা। তাঁর কপালের বলি-রেখা আরো কুঁচকে গেলো। তসবিহর গুটিতে ঘন ঘন আঙুল চলতে লাগল। বাতাসী, বাতাসী, বাতাসী। বাতাসী ছাড়া এ-কাজ আর কারো নয়। অল্প বয়সে স্বামী মারা যাওয়ার এই দোষ! কেননা স্বামীসঙ্গ একবার যে পেয়েছে, সে সেই স্বাদ কি সহজে ভুলতে পারে? এ হচ্ছে আফিমের মতো, ভাত ছাড়া যায়, তবু ছাড়া যায় না এর নেশা। তা ছাড়া ওর এখন পুরো জোয়ানী। যেমন তেমন

দু' একজন পুরুষ ওর কাছে কিছু নয়, এক চোখের বাঁকা চাউনিতেই কাত করে ফেলতে পারবে। অথচ কথা বলার কি কায়দা। মামাতো ভাই, দিন মজুরি করত, কালাজ্বরের কবলে পড়ে বিপদ হয়েছে, কেউ নেই, না দেখলে চলে না। এসব কথা দিয়ে আর চিঁড়ে ভেজে না। আসলে লোকটাকে এনেছে এক বিছানায় রাত কাটাবার জন্য—এ বুঝতে বাকি নেই।

কিন্তু এর শাস্তি হবে কী? কিতাবের হুকুম মানলে, গলা-ইস্তক মাটিতে পুঁতে এর মাথায় পাথর মারতে হবে, যতক্ষণ না প্রাণটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু এ যুগে কি তা সম্ভব? থানা আর পুলিশ রয়েছে যে। তাহলে উপায়? জুতো মারা? একঘরে করে রাখা? গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া?

হাজি কলিমুল্লা যখন এসব ভাবনায় তন্ময় হয়ে ছিলেন, তখন খালেদ তার নতুন মাকে নিয়ে মরা-গাঙের পানির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ণিমা-চাঁদ দেখা দিয়েছিল বাড়ি থেকে রওয়ানা দেয়ার অনেক আগেই, এইবার তা বাঁশ ঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠে ঝলমল করছে। চারদিক নিঝঝুম, গাছ-পালায় বাতাসের নড়াচড়ার গরজ নেই।

মরা-গাঙে এখন হাঁটু পানি। দুই পাশে কাদা ঠেলে ডাঙার সঙ্গে যে সরু পথটার মিল হয়েছে, তার পরিষ্কার বালুর ওপর দিয়ে ঝিরঝির করে কেটে চলেছে ফোয়ারার স্রোত। পানির ভিতর থেকে গজিয়ে ওঠা বোরো খেতগুলিতে কচি ধান-পাতার জড়াজড়ি।

নীচু হয়ে জুতো-জোড়াটা ডানহাত দিয়ে খুলে ফেলল জোহরা। তার কাঁধে ছোট ছেলেটা। তার অসুবিধে হচ্ছে দেখে পিছন থেকে খালেদ পাশে এসে বলল,—'সাজুকে আমার কাছে দিন।'

ওরা দুজনে প্রায় সমবয়সী। প্রথম প্রথম 'আপনি' বলতে লজ্জা করত খালেদের, কিন্তু এখন আর সে-ভাবটা নেই।

জোছনায় আলোকিত বড়ো ছেলের মুখের দিকে চাইল জোহরা, টানা ভুরুর নীচে ওর সুন্দর চোখ দুটো আরো সুন্দর মনে হল তার, একটা অব্যক্ত অনুভূতির ছলছলানিতে বনের অন্ধকারে শিহরিত নদীর মতো দুলে উঠল বুকের ভিতরটা। আচ্ছন্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল,—'তোমার কষ্ট হবে না তো?'

খালেদ হাসলো। বলল,—'না, এ আবার কষ্ট কি?'

সাজুকে পাঁচ বছরের রেখে ওর আম্মা এন্তেকাল করেছেন দু'বছর আগে, আদর যত্ন না পাওয়ায় ওকে কান্নারোগে ধরেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। নতুন মাকে

তার এমনি ভালো লেগেছে যে, সে এক মুহূর্তের জন্যও তার কাছ-ছাড়া হয় না। জোহরা যখন নাইওর করতে যায়, তখন ও তার কোলে উঠে চলে গিয়েছিল।

অন্য কাঁধের ওপর থেকে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা ছোটো ভাইটিকে নিজের কাঁধে নিতে গিয়ে খালেদের মনে হল, কপোতের বুকের মতো উষ্ণ, প্রবালের মতো কোমল কিসের মধ্যে যেন তার বাঁ হাতের আঙুলগুলি ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ হাওয়ায় চাঁপার কলির মতো কাঁপুনি খেয়ে গেল। নিমেষে তার সমস্ত শরীরটা শির্ শির করে উঠল ভরামেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মতো। পলকের জন্য তার চোখে পড়ল, সহসা কেমন রাঙা হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, তার সারা চেহারায় রক্তের প্রবাহ বহ্নির মতো ছড়িয়ে গেল। খালেদ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না; আরেক জন্মের কোনো নিবিড় স্মৃতি অস্পষ্ট মনে পড়ার মতো কী এক অজানা বেদনায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝিরঝিরে পানির উপর দিয়ে সুমুখে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু জোহরা দাঁড়িয়েই রইল। কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে চাঁদের দিকে মুখ উঁচিয়ে চাইল একবার, আবার চাইল সামনে চলমান মূর্তিটার দিকে। এরপর সে চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই রূপালি বালুর ওপরে ফোয়ারার স্রোতে বয়ে চলা রাস্তাটায় ত্রস্ত হরিণীর মতো পা ফেলে হাঁটু পানির কাছে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছন থেকে শাড়িটা কুঁচকে এনে ডান হাতে হাঁটুর কাছে ধরা, জোছনা-উছল কালো পানির দিকে মুখ নিচু করে জোহরা দেখল, তার মূর্তিটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, এই সঙ্গে ছোটো ছোটো ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে চাঁদের চেহারাও। হঠাৎ মুখ তুলে সে ডাকল,—'খালেদ!'

'কি!'—কিছুদূর থেকে খালেদ সাড়া দিল।

'আমাকে ফেলেই চলে যাচ্ছ।'—স্বপ্নের স্বরে যেন জোহরা বলল,—'আমি চলতে পারছি না। দেখ, দেখ। পানিটা কি সুন্দর!'

খালেদ ফিরে এল। বলল,—'আপনার কি হয়েছে বলুন তো, চলুন তাড়াতাড়ি। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'ও তাইতো। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে!' পানি ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল জোহরা। ঝিলিমিলি ঢেউয়ের দিকে চেয়ে বলল,—'দেখছ, কি সুন্দর পানি! এমন পানিতে মরতেও সুখ।'

কোনো জবাব দিল না খালেদ, মুখ নীচু করে চুপচাপ এগুতে লাগল।

ওপারে কোথায় একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে—'বৌ কথা কও।'

নদী পেরিয়ে এসে চপ্‌চপ্‌ পানি থেকে পা দুটো ঝাড়া দিয়ে দিয়ে নতুন জুতো-

জোড়াটা পরার সময় জোহরার মনে হল তার বুকের ভিতরে কিছু নেই, বিবাগী হাওয়ার মতো কিসের এক রিক্ত হাহাকার গুমরে গুমরে মরছে। নিজের কথা ভাবতেই সে আঁতকে উঠল, তার শরীরটা ঝিম ধরে অবশ হয়ে এল।

খালেদ আস্তে আস্তে হাঁটছিল। পিছন থেকে সে একটা কাতর-স্বর শুনতে পেল,—'একটু দাঁড়াও!'

'আবার কি হল আপনার!'

'কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না! আমার চোখ দিয়ে এমন পানি পড়ছে কেন? জোহরা ব্যাকুলভাবে এগিয়ে গিয়ে খালেদের চোখের সামনে নিজের দুটো চোখ বিস্ফারিত করে দাঁড়াল, চাঁদের আলোয় দেখা গেল, তার টলটলে দুটো চোখ দিয়ে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে।

খালেদ আবার উচ্চারণ করল,—'কি হল আপনার?'

'তুমি কিচ্ছু জান না, কিচ্ছু বুঝ না!' কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে জোহরা অপ্রকৃতিস্থের মতো বলল,—'সাজুকে দাও আমার কাছে। চল শীগগির। লোকজন নেই, আমার বড্ড ভয় করছে।'

ওরা যখন মুখোমুখি হয়েছিল, তার কিছু আগে থেকেই কিঞ্চিৎ হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, আর যখন চুপচাপ চলতে শুরু করল, তখন এক খণ্ড ঈষৎ কালো মেঘ দক্ষিণ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে আসতে লাগল। খড়ম পায়ে উঠানে পায়চারি করছিলেন হাজি কলিমুল্লা, আকাশের দিকে চেয়ে তিনি চমকে উঠলেন। তাহলে তার আন্দাজই ঠিক?

'জৈগুন! ও জৈগুন!' তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন,—'দেখে যা, আমরা যা ভাবচি তাই ঠিক। আশমানে সাজ দেখা দিয়েছে।'

জৈগুন চৌকাটের কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বললে,—'তবু তো আপনি বলছেন আরো পরখ করতে। আমার মনে কোনে স্থবা-সন্দে নাই। বাতাসী যা ছিনাল।'

আকাশে চলমান মেঘটার দিকে চেয়ে আবার পায়চারি করতে লাগলেন হাজি কলিমুল্লা, এর বিচারটা কি হবে তিনি তার কিনারা করতে পারছেন না।

আধ ঘণ্টা পরে জোহরা যখন এল, শুয়ে শুয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতেও বার বার বার তাল কেটে যেতে লাগল, অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম এল না!

মনস্থির করে পরদিন সকালে তিনি গিয়ে উঠলেন বাতাসীর বাড়িতে, পূর্ব পাড়ার আম বাগানের ওধারে। বাঁশের চালার নীচটায় পাকালের ধারে বসে ও খুদের জাউ রাঁধছিল, হাজি সাহেবের সাড়া পেয়ে একটা চৌকি হাতে উঠানে এল। এমন

গণ্যমান্য লোক, সাত জন্মে একবার এসেছেন ওর এখানে, কি দিয়ে মেহমানদারি করবে সে ঠাহর করতে পারল না।

মাথায় কাপড় টেনে ও কি বলছিল সেদিকে হাজির মোটেই নজর ছিল না, তিনি গোপন আড়চোখে হরিদ্রাভ লাবণ্য-স্নিগ্ধ ওর দেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

এদিকে বাড়ির নাশতা-পর্বের তদারক শেষ হওয়ার পর জোহরা গুম হয়ে বসেছিল তার শোবার ঘরে চৌকির কিনারায়।

বিয়ে হওয়ার পর থেকে কিসের যেন এক আশ্চর্য মায়ায় বিনা কাজের সময়টুকু সে এখানটায় বসেই কাটিয়ে দেয়। এ কিসের জাদু? কিসের মন্ত্রণা? জোহরা তা বুঝতে পারে না। বাড়ির চেহারা বোধ হয় অনেক দিক থেকেই অদল-বদল হয়েছে, কিন্তু এ কামরাটায় কোন পরিবর্তন নেই, দিনে দিনে নতুন জিনিস যোগ হয়েছে মাত্র। আগেকার গিন্নিদের হাতের ছাপ অনেক কিছুতেই এখনও টাটকা হয়েই আছে, অন্ধকারে বসে থাকলে তাদের ঠোঁটের ফিস্‌ফিস্ আলাপ যেন সে শুনতে পায়। তখুনি ওর মনে হয়, এঘরে ঢোকবার কোনো অধিকার নেই, এখানকার সব দখল করে সে ডাকাতের কাজ করল।

'কিন্তু আমার কি দোষ? আমি তো রাজি হতে চাইনি? নানা বলল, বোন, কাঁদিসনে, দু'একটা বছর সবুর কর, বুড়োটা মরল বলে। তখন বেশ জোয়ান দেখে একটা বর জুটিয়ে দেব। এখন সম্পত্তিটা হাত করে নে।' জোহরা আপন মনে আওড়াল,—'ছাই সম্পত্তি।'

দগদগে ঘা'র ওপর দিয়ে গরম বাতাস বইতে থাকলে যেমন করে জ্বলে, তার বুকের ভিতরটা তেমনি করে জ্বলতে লাগল। দম যেন ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসছে। এক সময় সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ওর চোখের দুটো তারায় জ্বলজ্বল করতে লাগল একটা দুর্বিনীত বন্যতা।

মগজটা গিস্‌গিস্ করছিল, এলোচুলে ঝাঁকড়া মাথাটা একবার ঝাড়া দিয়ে জোহরা বাইরে চলে এল। চোখ তুলে চাইতেই ওর দৃষ্টি পড়ল কুয়ার ধারে মেহেদি গাছটার দিকে, ভিজে মাটির রসে তাতে ঘন হয়ে কচিপাতা দেখা দিয়েছে।

ক'দিন সংকল্প করেও সে এই মেহেদি গাছটা কাটতে পারে নি। কিন্তু আজকে ডান হাতটা শির্ শির্ করতে লাগল। ত্রস্ত পায়ে সে চলে গেল রান্নাঘরের ভিতরে। সেখান থেকে ধারাল বঁটিটা এনে একেক কোপে একেকটি ডাল কেটে ফেলতে লাগল।

'আহা হা, করেন কি গিন্নিমা'—জৈগুন দৌড়ে এল। বলল,—'গাছটা অনেক দিনের, মানুষের মত কাজে লাগে। কর্তা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।'

'তুই এখান থেকে যা তো। কে রাগ করবেন না করবেন, তোর চাইতে আমি ভালো বুঝি। আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি কাটবোই।'

'আমি কাম করে খাই, আমার কি? আপনার ভালোর জন্যই বলছিলাম।'

'আশ্চর্য!' জোহরা মুখ তুলে চাইল। বলল,—'আমার ভালো মন্দের চিন্তা তোকে করতে হবে? দুনিয়াতে আর লোক নেই!'

কর্তার প্রিয় গিন্নিকে ঘাঁটাতে সাহস করল না জৈগুন, মুখ কালো করে সে নিজের কাজে চলে গেল।

কেমন করে দুপুর হল, কেমন করে এল বিকেল, আর কেমন করেই বা রাত্রি এসে পৃথিবীর মুখ ঢেকে দিল, জোহরা কিছুই বলতে পারবে না। তার হৃদয়ের একটা অংশ কে যেন ঝকঝকে ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে, প্রতিদিনের উচ্ছল ঢেউ সেখানে লাগে না, সেখানে তুষের আগুনের মতো শুধু একটি জ্বালা।

এশার নামাজের পর বিছানায় শুয়ে হাজি কলিমুল্লা বললেন,—'যা ভেবেছিলাম, বাতাসীই কুকাম করছে।'

'কেমন করে জানলেন?'—জোহরা শুধাল।

'এ সব জানতে কি আর খুব বুদ্ধি লাগে? তারে ঠিকমত ঘা দিলাম আর তা বেজে উঠল। ব্যস, আর ভাবনা নেই। বিচারটা করতে পারলে বিষ্টি হবেই।' হাজি একটুখানি নীরব থেকে বললেন,—'আগামী শুক্রবারে রাত বারোটার পর বিচার বসাব। দেখা যাক কী হয়।'

জোহরা চুপচাপ শুয়ে বাইরের দিকে কান পেতে রইল। আমের বোলের গন্ধ এমন মাতাল কেন? রাত কেন এমন কালো, অন্ধকার? সূর্য যদি আর না উঠত তাহলেই ছিল ভালো, সবার চোখের আড়ালে চির দিনের জন্য সে হারিয়ে যেত, যেখানে কেউ থাকবে না।

কপালে কোমল হাতের ছোঁয়া পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকাতে শুরু করলেন হাজি কলিমুল্লা। ওই শব্দটুকু বাদ দিলে, জোহরার মনে হল, তার

পাশে শুয়ে আছে একটা মৃতলোক, বুক থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। সে কোমল হাতটা ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল। এরপর আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। অতি সন্তর্পণে খিলটা খুলে উঠানের একপাশে আমগাছ-তলায় এল।

'সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি?' খালেদ চুপি চুপি বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই সাঁ করে তার সামনে গেল জোহরা, চাপা-গলায় বলল,—'আমি আর এত কষ্ট সইতে পারব না। বাড়ি থেকে চলে যাও, চলে যাও তুমি!'

কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে ও প্রায় দৌড়ে উঠে গেল বারান্দায়, ঘরের ভিতরে গিয়ে খিল এঁটে দিল।

খালেদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তার দুই চোখ থেকে ঝর্‌ঝর্‌ করে পানি পড়ছে, কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। ভোর বেলায় অন্যেরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, নদীর ধারে ধারে জমির আলের ওপর দিয়ে মিছিমিছি সে হেঁটে বেড়াল, এর পর চলে গেল বন্দরে, তার বড় দুই ভাই সেখানে কাজ করেন, সেই গদিতে; কিন্তু কোথাও মন টিঁকলো না। শেষ পর্যন্ত কী যেন অজানা আকর্ষণে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছিল।

শুক্রবারে রাত বারোটা বেজে গেলে একে একে সবাই হাজির হল মৌলানা মহীউদ্দিনের বৈঠকখানায়। এর আগেই কানাঘুষার মারফতে ব্যাপারটা সারা গ্রামে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবার তো আর বিচারের ক্ষমতা নেই? আজকের মজলিস শুধু গ্রামের আলেম মণ্ডলী ও মাতব্বরদের নিয়ে। দরজা-জানালা বন্ধ করার পর আসামীদের মাঝখানটায় বসিয়ে তাঁরা আলোচনা শুরু করলেন।

তিনদিন তিনরাত্রি হাদিস-কিতাব ঘেঁটে একটা ফতোয়া তৈরী করেছিলেন হাজি কলিমুল্লা। মৌলানার অনুমতি নিয়ে তা পড়ে শোনালেন।

বাতাসী অনেক আগে থেকেই বিনিয়ে গুনিয়ে গুনগুন করছিল, এবারে ডুকরে কেঁদে উঠল। বিলাপ করে বলতে লাগল, 'ও মা গো, এ-ও আমার কপালে ছিল গো! আঁতুড়ঘরে কেন মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেললে না গো!'

'এই বেটি, কান্না থামা!' হাজি ধমক দিয়ে উঠলেন্। বললেন,—'সে সময় বুঝি খুব ফুর্তি লেগেছিল?'

মৌলানা মহীউদ্দিনকে বেশ চিন্তিত মনে হল। তাঁর সৌম্য মুখমণ্ডলে বেদনাতুর গাম্ভীর্যের কান্তি। ধীরে ধীরে মুখ তুলে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, —'কিগো, তোমার কিছু কওয়ার আছে?'

'কি কইব বাবা, আপনারা তো গরিবের কথা বিশ্বাস করেন না। আমরা তো মানুষ নই, কুকুর বেড়াল! আমাদের আবার ইজ্জত কি!' বাতাসী চোখ মুছে বলল,—'না হলে এমন বদনাম আপনারা আমার উপর ফেলতে পারতেন!'

'কিন্তু এসব কথা তো আর আশমান থেকে পড়ে না।' হাজি কলিমুল্লা বললেন,—'অন্য কারো নামে তো ওঠেনি?'

'সে আমার কপালের দোষ। না হলে, ও বেঁচে থাকতেই আমি কতবারা বমি করেছি, প্রতিরোজ পোড়ামাটি আর তেঁতুল না খেয়ে থাকতে পারিনি—এসব জিনিস কারো চোখে পড়ল না!'

একটা ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে বসে কোঁকাচ্ছিল বাতাসীর মামাতে ভাই রহিমদ্দি। তাকে সওয়াল করলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু।

বিচারের আলোচনা যখন এগিয়ে চলছিল, তখন দক্ষিণ দিক থেকে পালে পালে কালো মেঘ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছিল। চাঁদ বারে বারে আড়ালে পড়ছে, গাছপালা ও খামারে নদীতে আলো-ছায়ার লুকোচুরি।

এক সময় বাতাস বন্ধ হয়ে গেল, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি। ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে গুরু গুরু আওয়াজ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চমকাল বিদ্যুৎ। ঘরের ভিতর সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঠিক এমনি সময় হাজি সাহেবের বাড়ির পিছনটায় আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মানুষের ছায়ামূর্তি। পা টিপে টিপে খোলা জানালার কাছে এসে অনেকক্ষণ সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, ঘরের ভিতরে আলো নেই; নাম-না-জানা অরণ্যের ভিতর কোন প্রেতপুরীর মতো সমস্ত বাড়িটা রুদ্ধ-নিশ্বাসে ঝিম ধরে আছে।

জানালা থেকে সরে এসে মূর্তিটা ভিটির ধার ঘেঁষে চলতে শুরু করল, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একেকবার বিজলি চমকায়, আর সে যেন শিউরে ওঠে গভীর আতঙ্কে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাস বইতে শুরু করল, মেঘে মেঘে সংঘাতে গর্জনে চারিদিক তোলপাড় হতে লাগল। দরজাটা হয়তো ভেজানো ছিল, আচমকা দমকা হাওয়ায়

তা সশব্দে খুলে গেল। মানুষটা ত্রস্ত পদে এসে উঠল বারান্দায়। এদিক-ওদিক খানিক চেয়ে এক সময় মরিয়া হয়েই যেন ঘরে ঢুকে পড়ল। ওপরে নীচে কেবল শব্দ, শব্দ আর শব্দ। জোর বাতাসের তোড়ে একেবারে মোচড় খেয়ে ওঠে করগেটের চালগুলি, কাঠের বেড়ায় অবিরত ধুপধাপ আওয়াজ।

খাটের কাছে এসে ইতস্তত করতে লাগল মানুষটা, কি করবে যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। শরীরে রোমগুলি কাঁটা দিয়ে উঠেছে, ঢিবঢিব করছে হৃৎপিণ্ড, চিন্‌চিন্ করে মস্তিষ্কে রক্ত উঠে চোখ দুটো ঝাপসা করে দিচ্ছে। তার ভাবনা, কোথায় এল সে। একি জন্ম, না মৃত্যু? একি সব হারানোর হাহাকার, না মিলনের উন্মত্ত সংরাগ? কান পেতে সে যেন শুনল, চুড়ির রিনিঠিনি, একটি গভীর শান্ত নিশ্বাস, কাপড়ের মৃদু খস্‌খস্। ঘ্রাণ আসছে, একি আমের বোলের, না চুলের গন্ধ? না, না, এখানে নয়। এ তো সে চায় না, চাইতে পারে না।

এক পা দু'পা করে সে পিছিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অনুভব করল, একটা সুপুষ্ট নগ্ন মসৃণ হাত অন্ধকার থেকে উঠে এসে গানের কলির মতো পরম আশ্বাসে তার হাতকে আকর্ষণ করল।

তখন সমস্ত আকাশে মেঘেদের হুড়োহুড়ি লুটোপুটি লেগে গেছে, মন্দ্র-গর্জনে একেবারে কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা পৃথিবী। একটানা ঝড়ের তীব্র বেগে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে গাছপালা, মত্ত হয়ে কে যেন লেগেছে লুণ্ঠনের উচ্ছৃঙ্খল তৎপরতায়। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল মন্থন করে যেন এক মহাপ্রলয়ের উচ্চকিত শব্দের ভয়ঙ্কর-সুন্দর রাগিণী।

এইভাবে কতক্ষণ ঝড় চলল হয়তো কেউ বলতে পারবে না। বাতাস যখন কমতে লাগল, কখন অযুত মুক্তাবিন্দুর মতো নামল বৃষ্টি।

ধারাল হাওয়ার সঙ্গে প্রথম যখন বৃষ্টি নামল, তখন তাতে রইল শুধু নবজাতকের বিক্ষোভ, ঘর-বাড়ির ওপর দিয়ে শুধু ঝর ঝর ঝাপ্টা দিয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ এ রইল না। ধ্রুপদ সংগীতের বিলম্বিত লয়ের মতো বাতাস যতই কমতে লাগল, বর্ষণে ততই এল নিবিড়তা। এর পর শুধু ঝম্‌ঝম্ শব্দ।

এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেল জানা নেই। এক সময় খোলা দরজা পার হওয়ার পরে উঠানে নেমে বৃষ্টির মধ্য দিয়েই টলতে টলতে উত্তর ভিটির ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষটা। তার পিছনে পিছনে এসে জোহরা এলোমেলো কাপড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তার শরীর ভিজে যেতে লাগল বৃষ্টির ছাঁটে।

খানিকক্ষণ পরে একটা ছাতা মাথায় ঘাড় নীচু করে ধুঁকতে-ধুঁকতে বাড়িতে

ঢুকলেন হাজি কলিমুল্লা। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে জোহরা বলে উঠল,—'অত দেরি যে! আর এদিকে আমার বড্ড ডর লাগছে।'

'কি আর করি বল, আপদ চুকিয়ে এলাম!' ছাতাটা বেড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে হাজি বললেন,—'সে একটা পাড়-হারামজাদী, শেষ পর্যন্ত কিছুতেই দোষ স্বীকার করল না। কিন্তু বাতাসীর মতো মেয়েলোকের ফা-ফুই বুঝি আমি ধরতে পারি না? ছুটোকে দিলাম পঞ্চাশ জুতো করে, তার ওপর কালকে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। দেখলে আল্লার রহমৎ? সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল!'

'হ্যাঁ, তাইতো বড় তাজ্জব ব্যাপার!' কথাটা শেষ করে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টির মধ্যে বারান্দা থেকে উঠানে নেমে গেল জোহরা, তার অঙ্গভঙ্গি রহস্যময়।

হাজি হৈ হৈ করে উঠলেন,—'আরে, আরে করছ কি? তুমি পাগল হলে নাকি? এত রাত্রে ভিজছ, সর্দি করবে যে।'

'না, সর্দি আমার কোনো কালেই করে না।' জোহরা বারান্দার কাছে এল। চোখের উপর থেকে একরাশ চুল ডান হাতে সরিয়ে ফোটা-ফুলের মতো উচ্ছল মুখটা তুলে মধুর হাসি-ওপচানো-ঠোঁটে বললো,—'আপনি জানেন না? বছরের পয়লা বিষ্টি, ভিজলে খুব ভালো। এতে যে ফসল হবে।'

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

পুঁইশাক □ আতোয়ার রহমান

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ইস্কুল নিয়ে এতো কাণ্ড। অথচ সবাই নির্বিকার।

বাঘবন্দী খেলাটা জমে উঠেছে টুনু আর সানির মধ্যে। চারপাশে গোল হয়ে বসেছে আর আর ছেলেমেয়েরা। সানি হারছিলো বাঘ নিয়ে। দুখো খাচ্ছে এখন, ছোঃ, ও আবার একটা বাঘ নাকি? মরা কেঁদো। ছাগলের গুঁতোতেই ত্রিভুবন পার।

এরই মধ্যে একবার পেছনের দিকে চেয়ে নিয়ে হঠাৎ রাণু বলে উঠলো, ত্রিভুবন পার করাচ্ছে, দাঁড়াও! ছাগল-খেকো শাক আসছে!

চক্ষের নিমেষে ভেল্‌কি খেলে গেল। বাঘ-ছাগল এক সাথে ছিটকে দলের সবচেয়ে হ্যাংলা ছেলে রাশু ছেঁড়া 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ভাগ খুলে স্বর ধরে দিলো, হ্রস্ব-ই ট ই-ট, হ্রস্ব-উ ট উ-ট।

ফ্রকের কোণটা মুখের ভেতর গুঁজে দিয়ে মিটমিটিয়ে রাণু বললো, দিই বলে? পুঁইশাক আজ চিবিয়ে থাক তোদেরই।

সবকটি চোখ একবার ওঠা-নামা করলো। না, পুঁচকে ছুঁড়িটাকে আব জব্দ করবার সময় নেই। পুঁইশাক এখন আঙিনার মধ্যে।

পুঁইশাক অর্থাৎ জমীর পণ্ডিত এসে পড়লেন। মাছারি গোছের আধমোটা, গৌরবর্ণ মানুষটি। মুখে একরাশ সাদা দাড়ি। বড়ো বড়ো চোখ দুটি শুকতারার মতো দপ্‌ দপ্‌ করে। সাধারণত সবাই ডাকে 'পণ্ডিত সাহেব' বলে। চাষীঘরের ছেলেমেয়েরা সংক্ষেপে বলে, 'পন সাব'। এর থেকে কবে যেন ঠিক মনে পড়ে না এখন আর, কোন্‌ দুষ্টু ছেলে শ্লেটের আড়ালে মুখ লুকিয়ে উপনামটা প্রথম উচ্চারণ করেছিলো, পন সাব না, পুঁইশাক।

জমীর পণ্ডিতকে দেখে পড়তে পড়তেই উঠে দাঁড়ালো সবাই। চোখ তুলে চাইলো একবার। ভাঁজভাঙা পুরোনো কোট, ক্ষারে-কাচা সাদা লুঙ্গি। কাঁচা চামড়ার পানাইয়ের বদলে পায়ে আজ মোটর-টায়ারের স্যাণ্ডাল। চোখ আর নামতে চায়না কারো।

একবার এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে ধমকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, পিট্ পিট্ করে দেখছিস কি, উদ্‌বেড়ালের দল? দরজা খোল্। সেকেণ্ড পণ্ডিত আসেনি এখনো?

ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে রাশু সবিনয়ে বললো, চাবি, প'ন সা'ব।

চাবি দিতে গিয়ে একেবারে আঁতকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, এ্যাঁ, করেছিস কি, গাধার দল? সাকুল্যে মোটে তেরোজন? বলি, আমি কি শেয়ালপণ্ডিত যে, ইন্‌স্‌পেক্টর-কুমীরকে তিরাশিজন দেখিয়ে দেব? বেরো, হতভাগারা। বেরো এখান থেকে।

বেরুলো না কেউ। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। শেয়াল-কুমীরের গল্পের প্রসঙ্গে হাসি আসছিল ওদের। ধমক শুনে সেটাও চেপে যেতে হল।

পণ্ডিত 'হায় হায়' করেই চলেছেন, সব গেল, স-ব। নিজেও মলো, আমাকেও মারলো। ঘুণ লাগুক এমন ইস্কুলে।

রাশুই উঠে দাঁড়ালো সাহস করে, প'ন সা'ব, যাই না বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে আনিগে। টুনুও থাক আমার সাথে।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পণ্ডিত। তারপর আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরলেন রাশুকে। হাত বুলিয়ে আদরে আদরে ভরে দিলেন মাথাটা, আহা-হা বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। আমার চুল-দাড়ির মত পরমায়ু দিক তোকে আল্লা। বড়ো ভালো বুদ্ধি বার করেছিস। শীগ্‌গির যা। আঁটকুড়ের বেটা খাবার বেলা একটার মধ্যেই এসে পড়তে পারে। আর, দেখবি তো, সেকেণ্ড পণ্ডিতের কি হল?

রাশু-টুনু বেরিয়ে গেল এক দৌড়ে।

পণ্ডিত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাক দিলেন, রাণু, শীগগির বাক্স খোল্। নামের খাতা বার করিসনি এতক্ষণও?

রাণুর দোষ নেই। চাবি পায়নি। কিন্তু জমীর পণ্ডিতের আজ আর তর সইছে না। না সরবারই কথা। চল্লিশ বছরের ইস্কুল। এর প্রতিটি দিনের স্মৃতিতে স্বাক্ষর রয়েছে জমীর পণ্ডিতের। মা যেমন শিশুকে মানুষ করে তোলে,

তিনিও তেমনি তৈরী করে তুলেছেন এই ইস্কুলকে। একে কি ছাড়া যায়, না ভোলা যায়? অথচ ষড়যন্ত্র চলেছে তারই।

আইন হয়েছে নতুন, জমীর পণ্ডিত শুনতে পান,—সক্রোধে বিদ্রূপ করে বলেন, আইন নয়, পাগলা বাইন মাছ ছাড়া পেয়েছে, আঁচড়ে বেড়াচ্ছে,—ঘন ঘন পাঠশালা রাখা চলবে না, কোনো এলাকায়, যদি না ট্রেনিং পাওয়া শিক্ষক থাকে। সাহায্য করা দুঃসাধ্য, ব্যবস্থাও অনিয়ন্ত্রনীয়। সুতরাং দুটো চারটে এবার উঠিয়ে দিতেই হবে।

বাজারে গুজব,—রটিয়েছে ওই নতুন পাড়ার ছোঁড়াগুলো, যারা হুজুগ করে একটা পাঠশালা খাড়া করেছে এই সেদিন, যত রাজ্যের বোকাগুলোকে ধরে এনে বিনে পয়সায় মাস্টার বানিয়েছে,—হ্যাঁ, বাজারে গুজব, জমীর পণ্ডিতের ইস্কুল এবার উঠেই যাবে। কারণ, পণ্ডিতের মতো ইস্কুলও এখন জীর্ণ। চৈত্রের পদ্মার পাড়ির নীচে হাওয়া লেগে ঝুর ঝুর করে বালি ঝরে পড়ে, গাঙশালিকগুলো বেগতিক দেখে গর্ত ছেড়ে উড়ে পালায়। ওই উপমাটাই লোকে ইস্কুলের উপর প্রয়োগ করে। দেওয়ালের বালি ঝরছে তো ঝরছেই হাওয়ায়, হয়তো বা পণ্ডিতের বিশ্বাসেও। ছেলেমেয়েরা সরে পড়েছে একে একে। পণ্ডিত সাহেব,—গ্রামীণ সংক্ষিপ্ত রূপ প'ন সা'ব,—এবার আপনিও সরে পড়ুন,—আড়াল-আবডাল থেকে দুষ্টুলোকের কথা শোনা যায়, বাতের ব্যথাটা আর বাড়াবেন না এই বয়সে ইস্কুলে বসে থেকে। এদের নাকি ষড়যন্ত্র,—ইন্‌সপেক্টর পাঠিয়ে তদন্তের নামে একটা শাক-দিয়ে-মাছ-ঢাকা কাণ্ড করা। কিন্তু দেখে নেবেন জমীর পণ্ডিতও, কার পেটে কটা 'ক'। অমন অনেক ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁর দেখা আছে। অনেক ঘুঘু দেখেছেন তিনি। আজকালকার এরা আবার জানেই বা কি?

চিন্তায় থম্‌থম্ করে পণ্ডিতের মুখখানা। রাণু-টুনুকে আদর করতে দেখে ছেলেমেয়েরা সাহস পেয়েছিলো একটু। আবার ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। পড়াশোনায় অবধি ভুল হয়। কিন্তু জমীর পণ্ডিত সামান্য ধমকটিও দেন না।

ইস্কুলের সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। ফসল নেই এখন, চষা-মাটির বুকে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু ছোটো-বড়ো-মাঝারি ঢেলা। প্রখর দৃষ্টিতে মনে হয় বেলে পাথরের চাঁই পড়ে রয়েছে বুঝি বা। মাঝে মাঝে বাবলা আর শিমুল গাছ! দূরে, বেশ খানিকটা দূরে পদ্মার ধূ-ধূ চর। আশে-পাশে গাঁয়ের মানুষের আশাপীঠ ওই মাঠ আর চর। চাষ করে ছেড়ে দিয়ে গেছে। কি ফসল ফলাবে কে জানে।

ইস্কুল ঘরের দিকে তাকিয়ে জমীর পণ্ডিতের মনে হয়, এটাও যেন একটা মাঠ। কতদিন থেকে জ্ঞানের চাষ করে আসছেন তিনি এখানে। আশা করেছেন মানুষের 'ফলন' আনবেন। মাঠ এতদিন ফসল দিয়েছে, ইস্কুলও। কিন্তু এবার কি হবে? ইস্কুল সম্বন্ধে এবার এ-চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকেছে, বিশেষ করে ইন্‌সপেক্টর আসার পর থেকে।

: পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন?

চিন্তায় বাধা পড়লো জমীর পণ্ডিতের। চকিতভাবে পেছন ফিরে দেখলেন, জানালার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে কথা বলছে ওপাড়ার হাশিম। নতুন পাঠশালার এক নম্বর পাণ্ডা। প্রশ্নটা বিদ্রূপের মতো মনে হল তাঁর কাছে। বললেন, গরু চরাচ্ছি। ইস্কুলে আর কি করে লোকে?

হাশিম একটু অপ্রস্তুত হল; কিন্তু সামলে নিল পরমুহূর্তেই, তওবা, তওবা, কি যে বলেন আপনি। ছেলেমেয়ে কাউকে দেখছিনে কিনা। তাই ভাবছিলাম,—

একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলো, তা আজকাল আর বুঝি কেউ আসে না? সেকেণ্ড পণ্ডিত সাহেবকেও দেখছিনে।

ইন্‌স্‌পেক্টর আসার পর থেকে একটু সকাল-সকালই আসেন জমীর পণ্ডিত। আশা নেই, বেশি করে খেটে ইস্কুলটাকে ভালো করে তুলবেন। কিন্তু অবস্থা খারাপ দেখে সেকেণ্ড পণ্ডিত প্রায়ই ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকেন আজকাল। আর, ছেলেমেয়েরা আসে সেই আগের মতোই দেরী করে। পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়ে, বাড়ির কাজ-কর্ম যথাসম্ভব সেরে তবে আসে। ধমক দিয়ে লাভ হয় না, দেওয়া উচিতও নয়। সংসারের অভাব-অনটন উপেক্ষা করে, কাজের চাপ লাঘব করে ওরা যে ইস্কুলে আসতে পারে শেষ পর্যন্ত, এই-ই তো অনেক। কিন্তু এসব কথা রাগ দেখিয়ে শোনানো চলে না হাশিমকে। বললেন, আসেনি এখনো, আসবে। সময় হলে তবে আসবে। ইস্কুল চালাচ্ছো হৈ রৈ করে, আর এটুকুও জানো না।

হাশিম এবার মুখ-চোখ করুণ করে বললে সহানুভূতিতে, পণ্ডিত সাহেব, ভুল বুঝছেন কেন আমায়? আপনার চেয়ে বেশি বুঝি, এমন কথা বলে বেয়াদপি করতে চাইনে। এই ইস্কুলটা উঠে যাক, একি আমরা কামনা করতে পারি? হাজার হলেও একই গ্রামের ইস্কুল তো। ইস্কুল যতো বেশি হবে, লেখাপড়াও ততো বেশি শিখবে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা। গাঁয়েরই উন্নতি হবে।

জমীর পণ্ডিত তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন, ইন্‌স্‌পেক্টর তোমাদের ওখানে গিয়েছিলো, না?

: হ্যাঁ, আপনার এখানে কি বলে গেলো ?

: বলবে আর কি ? একি আর কানে কানে বলবার কথা ? যা বলবে, সবাই জানতে পারবে।

জওয়াব দিয়ে জমীর পণ্ডিত ভাবলেন, এ মন্দ হল না, জওয়াব দেওয়াও হল, এড়িয়ে যাওয়াও হল। ইন্‌স্‌পেক্টর যে কি বলবে, তা এখনো জানা যায়নি। ভালো কিছু যে রিপোর্ট দেবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হলেও খারাপ কিছু যে বলবে না, এমন আশা তিনি করতে পারেন। তার কারণ, ইন্‌স্‌পেক্টরটিকে অত্যন্ত ভদ্র বলে মনে হয়েছে তাঁর। কাজও জানে। যতক্ষণ ইস্কুলে ছিলো, রীতিমতো সশ্রদ্ধ এবং সহানুভূতিময় ব্যবহার করেছে তাঁর সঙ্গে। পাকিস্তানী আমলের হঠাৎ প্রমোশন পাওয়া ইন্‌স্‌পেক্টরদের মধ্যে এত গুণ তিনি এর আগে আর দেখেন নি।

অবিশ্যি, একটা বিষয়ে খটকা রয়েছে তাঁর মনে। ইন্‌স্‌পেক্টররা এসেই চা-নাশতা চেয়ে বসে এখন। সে জন্যে এবার আগে থাকতেই চা আনিয়ে রেখেছিলেন রাণুদের বাড়ি থেকে। ইন্‌স্‌পেক্টর খাতাপত্র দেখবার সময় জমীর পণ্ডিতের ইঙ্গিত মতো রাণু এগিয়ে দিয়েছিলো মিষ্টি, ফলমূল আর ফ্লাস্কের চা। কাপে মুখ লাগিয়ে অন্যমনস্কভাবে ইন্‌স্‌পেক্টর বলেছিলো, বেলের সরবৎ গরম কেন ?

রাণু মেয়েটি মুখরা। স্মিতমুখে চট করে বলে উঠেছিলো, না সার, এখো গুড়ে পানা।

এক মুহূর্ত রাণুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ইন্‌স্‌পেক্টর হেসে বলেছিলো, তাহলে তো ছোবড়া বেছে খেতে হবে। আখ মাড়াইয়ের কলটা বোধহয় ভালো ছিলো না। তুমি দেখোতো এবার, একটা ছাঁকনি পাও কি না।

বলেই সে কাজে মন দিয়েছিলো।

কাপের মধ্যে সত্যি সত্যিই চায়ের একটা পাতা ভাসছিলো। রাণু সেটা উঠিয়ে নিয়েছিলো অতি সাবধানে, সন্তর্পণে।

শুধু এই ঘটনাটির জন্যেই ইন্‌স্‌পেক্টরের মন-মেজাজের নিশ্চিত ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেন নি আজও জমীর পণ্ডিত।

হাসিম আবার সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো, ওপরে একটু খোঁজ-খবর নিলে হত না ?

জমীর পণ্ডিত কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন। রাশু এবং আরও

কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে ঢুকলো ঘরে। এই ওদের স্বভাব,—নানান দলে আসা। একা আসতে পারে না। ভালো লাগে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বন্ধু-বান্ধব একে-ওকে ডাকাডাকি করে দল বানিয়ে তবে আসে।

দেরি করে আসায় লজ্জিত বা অপ্রতিভ হল না। ছেলেমেয়েরা চুপচাপ বসে গেল নিজের জায়গায়। শ্লেট বার করে হাতের লেখা লিখতে শুরু করলো। হাতের লেখা না দেখানো পর্যন্ত পড়া নেয়া হয় না কারো।

পেছন থেকে হাশিম বললো, আচ্ছা, আসি এখন, পণ্ডিত সাহেব। আপনি পড়ান।

জওয়াব দিলেন না জমীর পণ্ডিত, ঘুরে দেখলেন যদিও। অপস্রিয়মাণ মানুষটির পিঠ থেকে তুলে নিঃসাড় দৃষ্টিটা পেতে দিলেন ঢেলা-ভরা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের ওপর।

ভেতর বাইরে মাঠ। এবার কি ফসল ফলবে কে জানে।

গুজব রটেছে গাঁয়ে, পুরনো ইস্কুলটাই উঠে যাবে, থাকবে নতুন পাড়ারটা।

জমির পণ্ডিত পাকড়াও করেন গিয়ে চৌধুরী সাহেবকে, এর একটা বিহিত করতে হবে। এতোদিনের পুরোনো ইস্কুল। গাঁয়ের যতো শিক্ষিত ছেলে সব বেরিয়েছে এখান থেকে। পুঁচকে ছোঁড়াদের জ্বালায় এখন উঠে যাবে নাকি আপনারা থাকতেই?

চৌধুরী বেশির ভাগ সময়ই শহরে পড়ে থাকেন মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে। গাঁয়ের দিকে তাকানোর অবসর কম। বললেন, কি করতে বলেন?

বলবেন আর কি? করতে যা ইচ্ছে হয় জমীর পণ্ডিতই জানেন। দোর্দণ্ড প্রতাপে ইস্কুল চালিয়েছেন প্রায় সারা জীবন। নতুন ইস্কুলের পাল্লায় পড়ে এখন তাঁর ইস্কুলে ভাঙন ধরেছে। তারই সুযোগ নিয়ে বাড়ি বয়ে গিয়ে অপমান করে আসে হাশিমের মতো মানুষ। চাপা রাগে গর্জে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, ছ্যাঁচড়াদের ধরে 'চৌদ্দো-পো' করে দাঁড় করিয়ে রাখুন সত্তর দিন, ইস্কুল বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন। আমার ছেলেমেয়ে পড়ে না ওখানে, পড়ে আপনাদেরই ছেলেমেয়ে।

চৌধুরী ভয়ে ভয়ে বললেন, কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টরের রিপোর্ট—

: রিপোর্ট বেরোয়নি এখনো, কবে বেরুবে খোদাই জানে। আপনি টাউনে খোঁজ নিন। দরকার হ'লে আমি গাঁয়ের লোককে দিয়ে দরখাস্ত করাবো।

ওই এক ভরসা আছে জমীর পণ্ডিতের। গাঁয়ের অনেক লোকই এখনো তাঁর পক্ষে। এমন কি, ইস্কুল দুটিকে কেন্দ্র করে রীতিমত দুটি দল গড়ে উঠেছে। পক্ষে-

ঘাটে তাদের ঝগড়া শুনতে পান তিনি অহরহ। জিনিসটা তাঁর ভালো লাগে না। লেখাপড়া পবিত্র কাজ। তার জন্যে ঝগড়া হবে; এ তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়। আব ঝগডা করবার আছেই বা কি? তিনি তো চান না যে, নতুন পাড়ার ইস্কুল উঠে যাক। ইস্কুল যত বাড়ে, ততোই ভালো। নতুন পাড়ার লোকেরাও কি তা বোঝে না? বোঝে, তবু আলগা ফুটোনি করে তাঁকে ঠাট্টা করে এলো সেদিন হাশিম। সরকার শিক্ষক দিতে পারবে না? সাহায্য দিতে পারবে না অতো? বয়ে গেছে তাতে। এতো দিনই বা সরকার কি করছিলো সাতটাকা করে সাহায্য দেওয়া ছাড়া? ছয় মাস, এক বছর পর পর সেই সাতটা টাকা পেয়েও যদি ইস্কুল চলতে পারে, তাহলে এমনিতেও চলবে। শিক্ষক যদি ওপরওয়ালারা দিতে পারে ভালোই। তিনি সানন্দে ছেড়ে দেবেন ইস্কুল। না দিতে পারে, দোষ নেই তাতেও। সে-রকম দুর্ঘটনা ঘটলে,—জমীর পণ্ডিত আজকাল প্রায়ই ভাবছেন,—নিজেই চালিয়ে যাবেন ইস্কুল, যতদিন বাঁচেন। আল্লার ইচ্ছে থাকলে খরচের জন্যে কাজ আটকে থাকবে না। ইস্কুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে, তাদের তিনি জানিয়েও দিয়েছেন সে কথা। এসব কি বোঝে না হাশিম? বোঝে, গাঁয়ের লোকেও বোঝে। তবু ঝগড়া করে।

এসব ঝগড়া খারাপ লাগে জমীর পণ্ডিতের। কিন্তু আবার ভরসাও আসে এরই মধ্যে থেকে। গাঁয়ের লোকের মতামত স্পষ্ট করে দিচ্ছে এই ঝগডা। জানিয়ে দিচ্ছে, তাঁর মতামতটা একেবারে খেলো নয়। ট্রেনিং বা উচ্চশিক্ষা পাননি বলেই তাঁর এতোদিনের অভিজ্ঞতাও সরকারী মাপকাঠিতে রাতারাতি কুঁচিয়ে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না। ইস্কুলে যে ছেলেমেয়ে বেশি আসতে পারে না, সেও তো তাঁর দোষ নয়। ওটা একেবারে আলাদা জিনিস। ছেলেদের ইস্কুলে দেওয়ার মতো পেটের ভাত কয়জনের বাকি রয়েছে? ছাত্রের অভাব ঘটেছে বলে যারা ইস্কুল তুলে দিতে চায়, তারাই বা কয়জন খোঁজ রাখে এসবের? আশ্চর্য,—জমীর পণ্ডিত মনে মনে বলেন,—আশ্চর্য এই মানুষগুলো!

চৌধুরী বললেন, আচ্ছা, আমার সাধ্যে যতদূর কুলোয়, তার ত্রুটি হবে না। আপনি ব্যস্ত হবেন না, পণ্ডিত সাহেব। চা খাবেন একটু? দাঁড়ান। রাণু, চা নিয়ে আয় তো মা কাপ দুয়েক।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন জমীর পণ্ডিত, একটা গোলমাল শুনে থেমে গেলেন। বাড়ির পাশেই কোথায় যেন একদল ছেলে চেঁচামেচি করছে। কান পেতে শুনতেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো ছড়া,—

পুরোন পাড়ার পাঠশালা,—
পুঁই-মাচানে আটচালা!
বেঞ্চিগুলো সরু সরু,
ছাত্রগুলো আদত গরু!

সঙ্গে সঙ্গে টিটকারী সহ আরেক দলের উত্তর এল,—

নতুন পাড়ার পাঠশালা,—
চালে খালি বারজালা,
মাস্টারগুলো বকের ঠ্যাং
ছাত্র ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাং!

খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, কি! এতদূর আস্পর্ধা! শিক্ষার নামে এতো নোংরামি শিখছে সব! এক্ষুনি দিচ্ছি ঠাণ্ডা করে।

চোখের পলকে উঠে দাঁড়ালেন হারেশ চৌধুরীও। তাঁর মোটা কোমরটা জড়িয়ে ধরে বললেন, পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন?

না, না, ছেড়ে দিন আপনি, শিগগীর ছেড়ে দিন। এ নোংরামির শাস্তি দিতেই হবে।

বুড়ো মানুষের গায়ে অসীম শক্তি। দোর্দণ্ড প্রতাপ চেহারা—দেখেই বাড়ির লোক থেকে শুরু করে ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠে, যা ফেটে আবার আকস্মিক ভাবে গড়িয়ে পড়ে স্নেহের ধারা,—অতএব যে চেহারা ভয়ঙ্কর ভাবে রহস্যময় সেই চেহারা থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ যেন সেই আগুনের শিখা। ভয় পেয়ে গেলেন হারেশ চৌধুরী নিজেও। এ-মানুষকে ছেড়ে দেওয়া চলে না কক্ষনো। প্রাণপণে কোমর টেনে ধরে বললেন, জোড় হাত করছি, পণ্ডিত সাহেব, দোহাই আপনার—

রাণু এসে পড়েছে ইতিমধ্যেই। কিছুই বুঝতে পারেনি সে। বাপের দেখাদেখি শুধু চেঁচাতে লাগলো, যাবেন না, পণ্ডিত সাহেব। নতুন পাড়ার ওদের ছড়া শুনেই তো এরা ছড়া বেঁধেছে। যাবেন না আপনি—

দোহাই শুনে থেমে গেলেন জমীর পণ্ডিত। বেগতিক বুঝে পক্ষ-বিপক্ষের সমস্ত ছেলেও ততক্ষণে সরে পড়েছে।

চৌধুরীর দিকে ফিরে তিনি বললেন, কি জঘন্য বেয়াদব! আমি ওদের মুরুব্বী নই? ওদের বাপ চাচাকে পড়াইনি?

: কাজটা ওদের নিশ্চয়ই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ছেলেমানুষ সব। অতো জানই যদি থাকবে, তাহলে আর লেখাপড়ার কি প্রয়োজন ছিল? আপনি ব্যস্ত হবেন না। ইস্কুলেও তো বলে দিতে পারবেন। কিংবা বাপ-মাকে—

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করবো। বাপ-মাকে সুদ্ধ আমি আবার টেনে আনব ইস্কুলে। দেখে নেবেন আপনি।

পেছন ফিরে চৌধুরীর দিকে তাকাতে গিয়েই চোখে পড়ে গেল রাণুকে। তখনি প্রচণ্ড ধমক লাগালেন তাকে, কি দেখছিস, হতভাগী মেয়ে? যা পড়গে যা!

হন হন করে বেরিয়ে পড়লেন তারপরই। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠলেন বাড়িতে। পুত্রবধূ উঠোনে ধানে পা দিচ্ছিল আস্তে আস্তে। নেহাৎই নতুন বউ, বিয়ের পর এই প্রথম এসেছে শ্বশুরবাড়ি। তাকেও ধমকে উঠলেন, খেলা করা হচ্ছে?

চমকে উঠে বেচারী পা চালিয়ে দিল অসংযত জোরে। উঠোনময় ধান ছড়িয়ে পড়লো।

পড়ানোর শেষে বহুদিন পর আজ গল্প বলছিলেন জমীর পণ্ডিত। সেকেণ্ড পণ্ডিত আগেই ছুটি নিয়ে চলে গেছেন। সমস্ত ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে এসে বসেছে। শুনছিল উৎসাহ ভরে। কিন্তু গল্প করবার আগে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল পেছনের বেঞ্চির দিকে। দেখলেন, রাণু ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকদিন আগে—তখন ইস্কুল নতুন খোলা হয়, সেই সময় তাঁর প্রথম অভ্যেস হয় পড়ানোর শেষে গল্প বলা, সহজ কথার ছলে কঠিন জিনিস বুঝিয়ে দেওয়া। মন তখন তাঁর স্বপ্নে বিভোর, আদর্শের উন্মাদনায় মাতাল! কান পেতে শুনতো সবাই, তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য সত্ত্বেও। ইস্কুলের প্রতি, পণ্ডিতের প্রতি তাতে টান বেড়েছিলো ছেলেমেয়েদের। কিন্তু বেশিদিন সেই গল্প বলা চলেনি। একদা আকস্মিক পরিদর্শনে এসে কোনো ইন্‌স্পেক্টর তাঁকে দেখে ফেলেছিলেন গল্প বলতে। ইস্কুলের তখন জোর সুনাম। তাঁরই মেহনতের গুণে। সুতরাং কারো কিছুই হল না, হল গল্প বন্ধ।

আজ আর এক কারণে ধমক দেওয়ার প্রবৃত্তি হল না জমীর পণ্ডিতের। সবাই শত্রুতা করেছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তাই বলে অধৈর্য হলে তো চলবে না। রাণুকে ইঙ্গিত করলেন শুধু।

রাণু চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসতেই বললেন, তোদের বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না? আচ্ছা, এবার থেকে সপ্তাহে একদিন করে ছুটি দেব ডাংগুলি খেলার জন্য।

সত্যিই নিরেট মাথা রাণুর। বিদ্রূপটা বুঝলো না। পিট পিট করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাল ছুটি প'ন সা'ব?

হাল ছেড়ে দিলেন জমীর পণ্ডিত। ছুটি দেওয়ার শেষ আয়োজনে সারাদিনের জমানো নালিশ শুনতে চাইলেন এবার, থাক ও সব, কার কি নালিশ বল দেখি এখন।

নালিশ নিয়ে এল রাশুই প্রথম, প'ন সা'ব, কাল হাটে ফরিদ আমার আধসের সিম ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছিলো।

নৈতিক দায়িত্বে ঘরে বাইরে সমস্ত বিচারের অধিকার নিয়েছেন জমীর পণ্ডিত। কিন্তু নালিশের ধারা দেখে শিউরে উঠলেন। ইস্কুল উঠে গেলে এদের কি হবে? সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করলেন, কার সিম রে, ফরিদ?

উত্তরও দিল রাশুই; আমার সিম, প'ন সা'ব। বেচতে গিয়েছিলাম।

বাজার দর যাচাই করে পণ্ডিত জরিমানা করলেন ফরিদকে, দুটো পয়সা এনে দিবি কাল।

বিচার শেষ হতেই নজরে পড়লো, কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার ওপাশে। মিটিমিটি হাসছেও বুঝি বা। গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, কে?

এগিয়ে এলো ফরিদের বাপ। মাথা চুলকে বললো, একটা কথা ছিলো প'ন সা'ব। ফরিদের—

: কি হয়েছে ফরিদের?

: জী, গেরস্থ ঘরের ছেলে,—কাজ-কর্ম বেড়ে গেছে এখন—

একমুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল জমীর পণ্ডিতের কাছে। তিক্তকণ্ঠে বললেন, এ-গাঁয়ের আর কোনো গেরস্থর ছেলে লেখাপড়া শেখেনি?

ফরিদের বাপ আবার মাথা চুলকে শুধু বললো, জী—

নিজের কাজের কথায় এসে এবার জমীর পণ্ডিত পাল্টা আক্রমণ চালালেন। হারেশ চৌধুরী তদ্বির করছে শহরে। গ্রাম থেকে একলাখ দরখাস্তও লেখা হয়েছে। সেখানা সকালবেলা ফরিদের বাপের হাতেই দেওয়া হয়েছিলো সই নেবার জন্যে। তারই ফলাফল জানতে চাইলেন এখন, সই নেওয়া শেষ হয়েছে?

ফরিদের বাপ ভয়ে বললো, জী না। দিতে চায় না। বলে—

: দিতে চায় না! কি বলে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জমীর পণ্ডিত। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো ফরিদের বাপ, ইতস্তত করে একবার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালো। তারপর মাথা নীচু করে আস্তে বলে যেতে লাগলো, বলে যে, উনি আর পড়াবেন কি করে ? বুড়ো মানুষ, মাথার ঠিক নেই। তার উপর বাতের রোগী। নামাজ পড়ার সময় সেজদা দিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসতেও পারেন না। হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সারাজীবন ছাত্রদের 'নিল ডাইন' করিয়ে এসে এখন প্রায়শ্চিত্ত করছেন—

: কি—কি বললে ?

ধমক দিলেন বটে জমীর পণ্ডিত। কিন্তু পরেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

ফরিদের বাপ কি যেন বলতে যাচ্ছিল আবার। কিন্তু বাধা দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, থাক, থাক, আর বলতে হবে না। ভুল আমারই হয়েছে। হবে না ? খন্তার কাজ নরুন দিয়ে হয় কখনো ? কোথায় সে দরখাস্ত ? বার করো, বার করো শিগগীর।

ফরিদের বাপ হাতের মুঠো থেকে একখানা মোচড়ানো কাগজ বার করে দিলো। হঠাৎ ইস্কুলের ছুটি দিয়ে জমীর পণ্ডিত বেরিয়ে পড়লেন।

ইস্কুলের সিমেণ্ট ওঠা বারান্দায় পায়চারি করছেন জমীর পণ্ডিত। পায়চারি করছেন বেলা ন'টা থেকে। এখন হয়তো বারোটা বাজে। ভাবছেন, এতো বেলা হল, তবু ছেলেমেয়েরা আসছে না কেন ? সময়-জ্ঞান আর এদের কোনোদিন হবে না দেখছি। না কি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরে আনতে হবে সকলকে ?

ভাবতে ভাবতে চকিতে একটা সন্দেহ দেখা দিলো মনে। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। তবে কি—গাঁয়ে খবর রটে গেছে, এ ইস্কুল সত্যি সত্যিই উঠে যাবে। ইন্‌স্‌পেক্টরের অফিস থেকে খোলাখুলি কোন চিঠি অবশ্য এখনো আসেনি। হারেশ চৌধুরী চিঠি দিয়েছেন কয়েকদিন আগে। তিনিও পরিষ্কার করে কিছু জানাননি। কিন্তু যা আভাস দিয়েছেন, তাও ভরসাজনক নয়। এদিকে নতুন পাড়ার ইস্কুলে নাকি খবর এসে গেছে, তাদের ইস্কুল থাকবে। তার মানেই হল—

গাঁয়ের পথে বেরুনো এখন দায় হয়ে উঠেছে তাঁর পক্ষে। নতুন পাড়ার দল তো আছেই। তারপর, যারা এতোদিন ছিলো তাঁর পক্ষে, বোধ হয় বিফল হওয়ায় তারাও সরে পড়েছে। চক্ষুলজ্জায় সই দিয়েছিলো বোধহয় তখন। কেউ

কেউ আবার নানান ছলে নতুন পাড়ার ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে শুরু করেছে। যেমন ফরিদের বাপ। কেউ কেউ বা মুখের উপরই পষ্টাপষ্টি বলে দিয়েছে, তখনই তো বলেছিলাম, প'ন সা'ব, লাভ হবে না দরখাস্ত করে।

কিন্তু লাভ যে হবে না তাই বা কে জানে! সত্যি খবর তো কেউই জানে না এখনো। যদি জানবেই, তাহলে এদিকে আট দশদিন ধরে কেন কতকগুলো লোক ছেলেমেয়েকে আসতে দিচ্ছে তাঁর ইস্কুলে? ইচ্ছে করে তো কেউ নিজের ছেলেমেয়ের মাথা খেতে চায় না।

তাহলে? তাহলে খবরটা সত্যি নয়। সিদ্ধান্তটায় পৌঁছতেই নতুন শক্তি পেলেন জমীর পণ্ডিত। নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর মনটা। ঠিক হয়েছে, ইস্কুল তাঁকে চালাতেই হবে। যারা তুলে দিতে চায় ইস্কুল তাদের দেখিয়ে দেবেন, ইচ্ছে করলেই এ ইস্কুল তুলে দিতে পারে না কেউ। গোমূর্খ সব! স্বাধীন হলে কি হবে? শিক্ষার মর্ম এরা এখনো বোঝেনি। রসুলুল্লাহকে একবার কে যে জিজ্ঞেস করছিলো, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে কতো বছর বয়েস থেকে? হজরত জওয়াব দিয়েছিলেন, তাদের জন্মের পঁচিশ বছর আগে থেকে। অর্থাৎ তাদের বাপ-মাকে আগে লেখাপড়া শেখাতে হবে। গোমূর্খরা কি আর কখনো এ হাদীসের মর্ম বুঝেছে? বোঝেনি। কিন্তু তিনি এবার বোঝাবেন।

অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাস জাগলো পণ্ডিতের মনে। আনন্দে বুকখানা ভরে উঠলো। ভাবলেন, না, কোনো ভয় নেই। ছেলেমেয়েরা আজ দেরি করছে, তাতে কি হয়েছে? এমন দেরি তো ওরা বরাবরই করে। এই তো বছর খানেক আগে একদিন কেউই আসেনি মোটে। ছেলেমানুষ সব। হয়তো বা কোনো কাজে আটকেই পড়েছে। পড়া আর কাজের চাপে কতো পারে ওরা। আবার শুনতে পান, তাঁকে দেখে ওরা ভয়ও পায়। আহা, আসুক না, আজ আর পড়াবেন না, গল্প শোনাবেন। আর, মৃদু হাসি ফুটে ওঠে পণ্ডিতের মুখে,—গোটাকতক ইঁটের কুচিও কুড়িয়ে রেখে দেওয়া যাক। ফাঁক পেলে একবার বাঘবন্দীও খেলে নেবে ওরা। প্রশ্রয়ের চোখে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো স্নেহভাজন শিশুর দুষ্টুমি দেখছেন যেন, এমনি ভাবে মুখ টিপে হাসতে হাসতে আলতো হাতে কুচি কুড়োতে থাকেন তিনি।

কুচি কুড়োনো শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় সহসা পেছন থেকে ডাক শোনা গেল, প'ন সা'ব।

পেছন ফিরে সলজ্জ চাপা আনন্দে প্রায় নেচে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, রাশু? এসেছিস? এতো দেরি কেন রে?

রাশু বিষণ্ণ মুখে জওয়াব দিলো, আমার আসা তো নয় প'ন সা'ব। তাই, সময় করতে দেরি হয়ে গেল। কপালে নেই আমার লেখাপড়া। খোদা মাথায় কিছু দেয়নি। নিজের পড়াশোনা বন্ধ হলে দুঃখ নেই। কিন্তু বাপজান বলছিলো—

মড়ার মুখের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল জমীর পণ্ডিতের মুখ। ধরা গলায় বললেন, কি বলছিল রে ?

এক মুহূর্তে তাঁর মুখের দিকে চেয়েই মুখ নামিয়ে নিলো রাশু, ওদের ইস্কুল খবর এসে গেছে, প'ন সা'ব। আমাদের শেষ দলের কয়েক জনও গিয়ে জুটেছে দেখলাম।

অর্থহীন চোখে চেয়ে পণ্ডিত শুধু বললেন, এঁ্যা ! কিন্তু রাণু, বিশু—

কথা আর শেষ করতে পারলেন না জমীর পণ্ডিত। রাশুও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

অনেকক্ষণ পর পণ্ডিত অসমাপ্ত কথাটা শেষ করলেন, রাণু, বিশুরা কি আর পড়বে না।

: রাণু নাকি টাউনের ইস্কুলে পড়তে যাবে।

: কই আমাকে তো কিছু বলেনি। একবার বলেও গেল না—ইস্কুলটা—

রাশু একবার ইতস্তত করে বললো, রাণুকে ডেকে নিয়ে আসবো, প'ন সা'ব ?

জমীর পণ্ডিত নীরবে ঘাড় নামিয়ে সম্মতি জানালেন।

বাড়ি কাছেই। অল্পক্ষণের মধ্যে রাণু এসে পড়লো। মুখখানা করুণ। বললো, কাল টাউনে চলে যাবো, পণ্ডিত সাহেব। আম্মা বলেছে, খালামাদের বাড়িতে থেকে পড়তে হবে এবার।

জমীর পণ্ডিত বহুক্ষণ সাড়া দিলেন না। তাঁর মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এক দুনিয়ায়। ইস্কুলটা একবারে চোখের সামনে ভেসে উঠলো যেন। তিরিশ বছর আগের সেই চকচকে দেওয়ালটা। চাষীঘরের তাজা তাজা, ধুলোবালি মাখা ছেলেমেয়েগুলো দল বেঁধে আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু—কিন্তু এরা যেন—এদের যেন পথ চলতে চলতে আজকেও দেখছেন, মনে হচ্ছে, আর,—আর, ইস্কুলের আঙিনাও যেন একটা নয়, দুটো, নাকি, আরো বেশি ? হয়তো। উহুঁ, ঠিকই। সারা গাঁয়েই খেলা করে বেড়াচ্ছে ওরা, পণ্ডিত শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

দলগুলো ছড়িয়ে পড়তে পড়তে এক সময় মিলিয়ে গেল। জমীর পণ্ডিত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। সাদা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে ভাঁজ-পড়া মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে উঠলো দুই একবার। সংশয়ের দৃষ্টিতে ইস্কুল ঘরটার দিকে তাকালেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ছবিটা আবার ফিরে আসতে লাগলো তারপর। আর ফিরে

এলো—স্পষ্ট হয়ে আর একটি জিনিস, যেটা এতোদিন অস্পষ্টভাবে ঘোরাফেরা করছিলো তাঁর মনের মধ্যে। নিজেকে সংযত করে এবার স্বাভাবিক গলায় বললেন, তোরা কাল কখন যাবি, মা ?

বলতে বলতেই রাণুকে কোলের কাছে টেনে নিলেন তিনি।

: নটার গাড়িতে।

: চ, আমিও যাবো তোদের সাথে।

রাশু, রাণু দুজনেই বিস্মিত হয়ে বললো, আপনি কোথায় যাবেন ?

জমীর পণ্ডিত হাসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, বেটারা ভেবেছে কি ? পুঁইশাকের কতো ডগা কেটে খায় লোকে, তাই বলে কি গাছ মরে ? এক খোঁচা খেয়েই আমি ইস্কুল তুলে দেব ? দেখে আসি, দাঁড়া, একবার ইন্‌স্‌পেক্টরের অফিসটা। আর, না হয় তো নিজেই মাইনে দিয়ে একটা মাস্টার ধরে আনি কোথাও থেকে।

ঈষৎ উত্তেজিতভাবে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে একটুখানি থামলেন জমীর পণ্ডিত। তারপর আদেশের সুরে রাশুকে বললেন, শোন, তোর বাপের ওসব বাহান। তুই পড়াশোনা নষ্ট করিসনে। নতুন ইস্কুলেই ভর্তি হয়ে যা। আর, রাণু, তুই টাউনে যা, হ্যাঁ টাউনেই—এখন বাড়ি যা—তোরা—

কিন্তু আদেশের সুর ক্রমে ভেঙে এলো, গলার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটছে। রাণুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জমীর পণ্ডিত আবার বলতে চেষ্টা করলেন, হ্যাঁ মা—যা,—তোরা—

হাতখানা এবার মাথা থেকে নেমে কাঁধের পাশে ফ্রকটা চেপে ধরলো। পণ্ডিতের মনে হল, এদের যদি একেবারে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা যেতো। নইলে যে সাদা গোঁফের তলায় ঠোঁট দুটিকে এতোক্ষণ পর আর বাগ মানানো যায় না !

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

একটি তুলসী গাছের কাহিনী □ সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ধনুকের মত বাঁকা ইট-সিমেন্টের চওড়া পুলটির একশ গজ পরে বাড়িটা। দোতলা, মস্ত, রাস্তা থেকে খাড়া উঠে গেছে। এদেশে ফুটপাথ নেই তাই বাড়িটারও একটু জমি ছাড়বার ভদ্রতার বালাই নেই। তবে বাড়িটার পেছনে কিন্তু অনেক জায়গা। গোসলখানা—পাকঘর, পায়খানার মধ্যেকার খোলামেলা পরিষ্কার স্থানটি ছাড়াও আরো ঢের জায়গা। সেখানে আম-জাম-কাঁঠালের দুর্ভেদ্যপ্রায় জঙ্গল, মোটা ঘাসে আবৃত স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ভাপসা গন্ধ আর প্রখর সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার।

অত জায়গা যখন, সামনে খানিকটা ছেড়ে একটা বাগানের মত করলে কি দোষ হতো?—সে কথাই এরা ভাবে। মতিন ভাবে, বাগান না থাক, সামনে একটু জমি পেলে ওরা নিজেরাই বাগান করে নিতো, যত্ন করে লাগাতো মরশুমী ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হাস্নাহানা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার দিকে আপিস থেকে ফিরে ওখানে বসতো। বসবার জন্য না হয় একটা হাল্কা বেতের চেয়ার নয় ক্যানভাসের আরাম কেদারা কিনে নিতো। গল্প করতো বসে-বসে। আমজাদের হুঁকোর অভ্যাস। সে না হয় বাগানের সম্মান বজায় রাখার মত মানানসই একটা নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো সন্ধ্যার বিশ্রামবিলাসের জন্য। গল্প-জমিয়ে কাদেরও ছিলো। ফুরফুরে খোলা হাওয়ায় তার গলাটা কাহিনীময়, হাস্নাহানার গন্ধের সঙ্গে মিশে মধুর হয়ে উঠতো। কিংবা, জ্যোৎস্নারাতে কোন গল্প না করলেই কী এসে যেতো? মুখ বরাবর আস্তে চাঁদটার পানে চেয়ে চুপচাপ কী বসে থাকা যেতো না?—আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকে ওঠা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে সে কথা আরো বার-বার মনে নয়।

এরা দখল করেছে বাড়িটা। অবশ্য দখল করবার সময় লড়াই করতে হয়নি, অথবা তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে কেউ এমনি হার মেনে নেয়নি। দেশ-ভঙ্গের হুজুগে এ শহরে আসা অবধি উদ্বাস্তু তারা একটা যেমন-তেমন ডেরার সন্ধানে ঘুরছিলো। একদিন দেখলো ওই বাড়িটা, মস্ত বড় বাড়ি জনমানববিহীন অবস্থায় খাঁ খাঁ করছে। প্রথমে তারা বিস্মিত হয়েছিলো। পরে সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে, বৈশাখের আমকুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনায় এমন মত্ত হয়ে উঠলো যে, ব্যাপারটা তাদের কাছে দিনদুপুরে ডাকাতির মত মোটেই মনে হলো না। মনে কোন অপরাধের চেতনা যদি বা ভার হয়ে নাববার প্রয়াস পেতো সে ভার তুলোধুনো হয়ে উড়ে যেতো তীক্ষ্ণ সে হাসির ঝলকে।

বিকেলের দিকে শহরে যখন খবরটা ছড়িয়ে গেলো তখন অবাঞ্ছিতদের আগমন শুরু হলো। মাথার উপর একটা ছাতের আশায় তারা দলে দলে আসতে লাগলো। এরা কিন্তু রুখে দাঁড়ালো। ডাকাতি নাকি? যথাসম্ভব মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বললে, জায়গা কোথায়, সব ঘর ভর্তি। বললে, দেখুন সাহেব, এই ছোট অন্ধকার ঘরেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো বিছানা পড়ে ছ ফুট বাই তিন ফুটের চারটে চৌকি, খান ছয়েক চেয়ার বা টেবিল এলে ঘরে জায়গা বলে কোন বস্তু থাকবে না। কেউ সমবেদনা করে বললো, আপনাদের তকলিফ বুঝতে পারছি। আমরা কী এ কদিন কম কষ্ট করেছি? তা ভাই আপনার কপাল মন্দ। যদি চার ঘণ্টা আগে আসতেন। চার ঘণ্টা কেন, ঘণ্টা দুয়েক আগেও তো নীচে কোণের ঘরটা অ্যাকাউণ্টস অফিসারের মোটা মত একটা লোক এসে দখল করলো। রাস্তার উপর ঘর, তবু মন্দ কী। জানালার কাছেই সরকারী আলো, কোনদিন যদি আলো নিবে যায় রাস্তার ওই আলোতেই তোফা চলে যাবে।

দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন হয়েছে বটে তবু কোন প্রান্তে সঠিক মগের মুল্লুক বসে নি। কাজেই পরে এ বে-আইনী কাজের তদারক করতে পুলিশ এসেছিলো।

পলাতক গৃহকর্তা যে বাড়ির উদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে ধর্না দিয়েছিলেন তা নয়। দখলের কথা জানলে দিতেন কিনা সন্দেহ। যিনি প্রাণের ভয়ে এতবড় একটা পরিবার দু'দিনের জন্য স্রেফ দেশ থেকে উধাও করে দিতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে সেটা আশা করা বাড়াবাড়ি! পুলিশে খবর দিয়েছিলো ওরাই যারা শহরের অন্য কোন প্রান্তে তখন ডাকাতির ফিকিরে ছিলো বলে এখানে চারঘণ্টা আগে বা

দু'ঘণ্টা আগে এসে পৌঁছুতে পারেনি। নেহাত কপালের কথা হচ্ছে, এদের কপালে মন্দ হবে না কেন। ভাগ্যের ফলে নিরীহ লোকেরাও আবার রীতিমত লেঠেল হয়ে উঠতে পারে। সত্যি সত্যি লাঠালাঠি না করলেও তার জন্য তৈরী হয়ে থেকে এরা সমগ্র ব্যাপারটা পুলিশকে এমন ভাবে বুঝিয়ে দিলো যে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর বিরক্তি না করে সদলবলে ফিরে গেলো। রিপোর্ট দেবার কথা। তা এমন ঘোরালো করে রিপোর্ট দিলে যে মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়ে তার ওপরওলার কাছে সে রিপোর্ট চাপা দিয়ে রাখাই শ্রেয় মনে হলো। তাছাড়া তাড়াতাড়িই বা কী। যারা পালিয়ে গেছে তাদের প্রতি সমবেদনার কোন কথা ওঠে না এবং বাড়ির নিরুদ্দিষ্ট মালিক যদি এসে কিছু না করে তবে কেন অনর্থক মাথাব্যথা করা। তাছাড়া, এরা কেরানী হলেও ভদ্রলোকের ছেলে, দখল করে আছে বলে জানালা দরজা ভেঙ্গে ফেলেছে বা ছাতের আস্ত আস্ত বীম সরিয়ে সোজা চোরাবাজারে চালান করে দিচ্ছে, তা নয়।

রাতারাতি সরগরম হয়ে উঠল বাড়িটা। এদের অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন, খালাসী পট্টিতে, বৈঠকখানায় দপ্তরীদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেনে তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অথবা কমরু খানসামা লেনের অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। এ বাড়ির বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাসানে দেওয়ালে মস্ত মস্ত জানালা, পেছনে খোলামেলা উঠোন, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মত আম জাম কাঁঠালের বাগান এদের কী যে ভালো লেগেছে বলবার নয়। একেকজন বেলাটের মত এক-একখানা ঘর দখল করে নেই সত্যি তবু ঘরে নির্ঝঞ্ঝাট হাওয়া চলাচল, এবং আলোর ছড়াছড়ি দেখে অত্যন্ত খুশি। এবার মনে হয় বাঁচল, ফরাগত মত থেকে আলোবাতাস খেয়ে জীবনে এবার সতেজ সবুজ রক্ত ধরবে, হাজার দু' হাজার-ওয়ালাদের মত মুখে জৌলুস আসবে, দেহ ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের জীবাণু থেকে মুক্ত হবে।

যেমন ইউনুস থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রীটে। সাহেবী নাম হলে কী হবে, গলিটার এক এক অংশ যেন সকালবেলাকার আবর্জনা-ভরা আস্ত ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের কাঠের দোতলায় কচ্ছ দেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সে থাকতো। কে কবে বলেছিলো চামড়ার গন্ধ নাকি ভালো, যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। তাছাড়া সে উৎকট গন্ধ ড্রেনের পচা ভোসকা গন্ধও বেমালুম ডুবিয়ে দিত; ঘরের কোণে দশ দিন ধরে ইঁদুর কিংবা বিড়াল মরে পচে থাকলেও নাকে টের পাবার জো ছিল না। ইউনুস ভাবতো মন্দ কী। অন্ততপক্ষে জীবাণু ধ্বংস হবার কথাটা মনে বড় ধরেছিলো। শরীরটা তার ভালো নয় তেমন; রোগাপটকা দুর্বল মানুষ। এখানে দোতলায়

দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটায় জানালার পাশে শুয়ে সূর্যালোকের সোনালী ঝলকানি ম্যাকলিওড ষ্ট্রীটের আস্তানার কথা মনে করে শিউরে ওঠে। ভাবে, এতদিনে কী হয়ে গেছে কে জানে! টাকা থাকলে বুকটা একবার দেখিয়ে আসতো ডাক্তারকে। সাবধানের মার নেই।

ভেতরে রান্নাঘরের বাঁ ধারে একটা চৌকোনে আধ হাত উঁচু ইঁটের মঞ্চের ওপর একটি তুলসী গাছ। একদিন সকাল বেলায় নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাব্বের উঠোনে পায়চারী করছে হঠাৎ তার নজরে পড়লো তুলসী গাছটি। মোদাব্বের হুজুগে মানুষ, একটু কিছু হলেই প্রাণ শীতল করা রৈ রৈ আওয়াজ উঠিয়ে দেয়। এরা সব উঠে এলো। যতটা আওয়াজ ততটা গুরুতর না হলেও কিছু তো অন্তত ঘটেছে।

এই তুলসী গাছটা। এটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা যখন এসেছি বাড়িতে কোন হিন্দুয়ানীর চিহ্ন থাকবে না।

সবাই তাকালো সেদিকে। খয়েরি রঙের আভায় গাঢ় সবুজ পাতাগুলো কেমন ম্লান হয়ে আছে। নীচে ক'দিনের অযত্নে ঘাস গজিয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, এটা এতদিন চোখেই পড়েনি, কেমন যেন লুকিয়ে ছিলো।

ওরা কিন্তু হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। যে বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছে, সিঁড়ির ঘরের দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা কটা নাম থাকলেও এমন বে-ওয়ারিশ ঠেকেছে, সে-বাড়ির চেহারা হঠাৎ বদলে গেলো। তুলসীগাছটা আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে অনেক কথা যেন বলে উঠলো।

এদের স্তব্ধতা দেখে মোদাব্বের আরেকটা হুঙ্কার ছাড়লো। ভাবছো কী? কথা নেই, উপড়ে ফেলো।

হিন্দু রীতিনীতি এদের ভালো জানা নেই। তবে কোথায় শুনেছে হিন্দু বাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। ঘাস গজিয়ে ওঠা পরিত্যক্ত চেহারার এ-তুলসী গাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারাটি বলিষ্ঠ একাকীত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, ঠিক সেই সময় ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত ধীর প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন, হয়তো বছরের পর বছর এমনি জ্বলেছে। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন-প্রদীপ নিবে গেছে, তবু হয়তো এ প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান এক দিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি।

যে গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসী তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়?

কেন চলে গেছে ? মতিন এক সময় রেলওয়েতে কাজ করতো। সে ভাবে হয়তো কলকাতায়, নয় আসানসোল, নয়তো বৈদ্যবাটি, হাওড়ায় কোন আত্মীয়ের আস্তানায়। লিলুয়াও বা নয় কেন। বিশাল রেলইয়ার্ডের পাশে মসৃণ একটি কালো চওড়া লাল পাড়ের শাড়িটা ঝুলছে হয়তো। সেটা এ গৃহকর্ত্রীরই। কিন্তু যেখানেই থাকুন, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন হয়তো প্রতি সন্ধ্যায় এ তুলসীতলার কথা মনে করে গৃহকর্ত্রীর চোখ ছল ছল করে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি সর্দি ভাব। সে কথা বললে,—থাক না ওটা। আমরা তো আর পূজো করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে একটা তুলসীগাছ থাকলে ভালোই। সর্দি কফে তার পাতার রস উপকারী।

মোদাব্বের এধার ওধার চাইলো। সবার যেন তাই মত। ওদের মধ্যে এনায়েত মৌলভী ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আছে, সকালে নাকি কোরাণ তালাওয়াতও করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় ছলছল করে ওঠা গৃহকর্ত্রীর চোখের কথা কী ওর মনে হলো ? অক্ষত দেহে তুলসী গাছটা বিরাজ করতে থাকলো। বাড়িটার আবহাওয়া ভালো কলকাতায় ঝিমিয়ে আসা নিস্তেজ ভাবটা যেন কেটে গেছে। আড্ডাও তাই জমে ভালো, দেখতে না দেখতে মুখে ফেনা-ওঠা তর্ক বিতর্ক লেগে যায়। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সবরকম আলোচনা। সাম্প্রদায়িকতার কথাও ওঠে মাঝে মাঝে।

—ওরাই তো মূল, মোদাব্বের বলে।

বলে হিন্দুদের নীচতা ও গোঁড়ামির জন্যই তো আজ দেশটা এমন ভাগ হয়ে গেল।

তারপর তাদের অবিচার-অত্যাচারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেয়। রক্ত গরম হয়ে ওঠে সবার। দলের ভেতর বামপন্থী নামে চালু মকসুদ মিঞা কখনো কখনো প্রতিবাদ করে। বলে অতটা নয়। এতটা হলেও আমরা কম কী। মোদাব্বের দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। দেখে তথাকথিত বামপন্থীর কাঁটা নড়ে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবে, কে জানে বাবা আমরাও হলফ করে বলতে পারি দোষটা ওদের, ওরাও শালা তেমনি হলফ করে বলতে পারে দোষটা আমাদের। ব্যাপারটা বড় ঘোরালো, বোঝা মুশকিল। ভাবে, হয়তো, আমরাই ঠিক। আমাদের ভুল হবে কেন ? আমরা কি জানিনা আমাদের ?

কাঁটা সংশয়ে দুলে দুলে হঠাৎ ডানে হেলে গিয়ে স্থির হয়ে গেলো। কাঁটাটি কখনো কখনো না বুঝে বাঁয়ে হেলে আসে বলেই ওর বামপন্থীর অপবাদ।

পায়খানার দিকে যেতে যেতে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটি চোখে পড়ে। কে আগাছা সাফ করে দিয়েছে। পাতাগুলো শুকিয়ে উঠে খয়েরী রং ধরেছিল, আবার যেন গাঢ় বঙের মধ্যে কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। কে তার গোড়ায় পানি দিচ্ছে। অবশ্য খোলাখুলি ভাবে, লোক দেখিয়ে দিচ্ছে না। সমাজে চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা তো আছে।

ইউনুস ভেবেছিলো ম্যাকৃলিয়ড স্ট্রীটের চামড়া-ব্যবসায়ীদের নোংরা আস্তানায় আর কখনো ফিরে যেতে হবে না—এখানে আলোবাতাসের মাঝে জীবনের জন্য সে বেঁচে গেলো। কিন্তু সে ভুল ভেবেছিল। শুধু ইউনুস কেন, সবাই—যারা ভেবেছিল এ-মন্দার দিনে ভালো করে খেতে না পাক, বাড়িতে প্রয়োজন মত জীবনের দুষ্প্রাপ্য আরামটুকু করবে—তারা প্রত্যেকে ভুল করেছিলো। তবু যাহোক সামনে জমি নেই। থাকলে ওরা আজ বাগান করতো এবং সেই সময়ে অন্য কিছু না হোক, গাঁদাফুলের গাছ বড় হয়ে উঠতো। তাহলে কী প্রচণ্ড ভুলই না হতো।

মোদাব্বের হন্তদন্ত হয়ে এসে বললো, পুলিশ এসেছে। কেন? ভাবলো, হয়তো রাস্তা থেকে পালিয়ে একটা ছ্যাচড়া চোর বাড়িটায় এসে ঢুকেছে। কিন্তু সেটা খরগোশের মত কথা হলো। শিকারীর সামনে পালাবার আর পথ না পেয়ে হঠাৎ বসে পড়ে চোখ বুজে খরগোশ ভাবে, কই আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তারাই তো চোর, কেবল গা ঢাকা দিয়ে না থেকে চোখ বুজে আছে।

পুলিশের সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর সাবেকী আমলের হ্যাট বগলে রেখে তখন দাগ পড়া কপালের ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। পিছনের বন্দুকধারী কনেস্টবল দুটোকে মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও আরো নিরীহ দেখাচ্ছে। ওরা নিস্তব্ধ ভাবে কড়িকাঠ গুনতে লাগলো। ওপরে ঘুলঘুলির খোপে এক জোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। একটা সাদা আরেকটা ধূসর। তাও দেখতে পারে তারা তাকিয়ে। হাতে বন্দুক আছে কিনা।

মতিন সবিনয়ে বললো,—

—আপনার কাকে দরকার?

—আপনাদের সবাইকে। আপনারা বে-আইনী ভাবে এ বাড়ি কব্জা করেছেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের এ বাড়ি খালি করে দিতে হবে—ব'লে অর্ডার দেখালো।

বাড়ির কর্তা তাহলে ফিরে এসেছে। ট্রেন থেকে নেমে এখানে এসে কাণ্ডটা দেখে সোজা থানায় চলে গেছে। এখন সঙ্গে এসেছে কিনা দেখবার জন্য আফজল

একবার গলা উঁচিয়ে দেখলো। কেউ নেই। পেছনে কেবল গোঁফওয়ালা বন্দুকধারী কনেস্টবল দুটো।

—কেন? বাড়িওয়ালা কী নালিশ করেছে?

—গভর্নমেণ্ট বাড়ি রিকুইজিশন করেছে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলো তারা। অবশেষে মতিন বললে,—

—আমরা তো গভর্নমেণ্টেরই লোক।

মাঝে মাঝে মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হতে হয়। কথা শুনে নিস্তব্ধ কনেস্টবল দুটো পর্যন্ত কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে তাকালো তাদের পানে, ভাবাচ্ছন্ন চোখ হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো।

বাড়িতে এরপর একটা ছায়া নেমে এলো। ভাবনার অন্ত নেই। কোথায় যাই এই চিন্তা। কেউ কেউ রেগে উঠে বলে, কোথাও যাব না, এইখানেই থাকবো। দেখি কে ওঠায়। কেউ যদি এ বাড়ির চৌকাঠ পেরোয় তবে সে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসবে। (কোথায় ছাত্ররা নাকি এমনি গায়ের জোরে একটা বাড়ি দখল করে আছে। তাদের ওঠাবার চেষ্টা করে সরকারের উচ্চতম কর্তারা পর্যন্ত নাকি নাস্তনাবুদ হয়ে গেছে। সে কথাই স্মরণ হয়।) অবশেষে রক্ত তাদের গরম হয়ে ওঠে। বলে, কখ্খনো ছাড়বো না। যে আসে আসুক, কিন্তু সে যেন একথা জেনে রাখে যে, তাকে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসতে হবে।

ক'দিন গরম রক্ত টগবগ করলো। কাজে মন নেই, খাওয়ায় মন নেই। কেবল কথা, তিক্তরসে সিঞ্চিত ঝাঁঝালো কথা। কিন্তু ক্রমশ কথা কমতে লাগলো। এবং এদের কথা থামলে রক্ত ঠাণ্ডা হতে ক-দিন।

এরা তো আর ছাত্র নয়। এরা যে কী, সে-কথা দর্প ক'রে সেদিন পুলিশকে নিজেরাই তো বলেছিলো। বাড়ি রিকুইজিশন হবার কথা শুনে কিছুক্ষণ বিমুখ থেকে বলেছিল, কেন, আমরা তো গভর্নমেণ্টেরই লোক।

একদিন তারা সদলবলে চলে গেলো। যেমন ঝড়ের মত চলে গেলো, ঘরময় ছিটিয়ে রেখে গেলো পুরোনো খবর কাগজের টুকরো, কাপড় ঝোলাবার দড়ির একটা দুর্বল অংশ, বিড়ি-সিগারেটের টুক্‌রো, বা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালীটা। নীলকুঠি-

বাড়ির ফ্যাসানে তৈরী দরজা-জানালাগুলো খাঁ খাঁ করতে লাগলো। কিন্তু সে আর ক-দিন। রঙ-বেরঙের পর্দা ঝুলবে সেখানে।

পেছনে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় আবার খয়েরী রঙ ধরেছে। যে দিন পুলিশ এসে বাড়ি ছাড়বার কথা জানিয়ে গেলো সেদিন থেকে তার গোড়ায় কেউ পানি দেয় নি। তুলসী গাছের কথা না হোক, গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও কী এদের আর মনে পড়েনি ?

কেন পড়েনি সে কথা কেবল তুলসীগাছ জানে, যে তুলসীগাছকে মানুষ বাঁচাতে চাইলে বাঁচাতে পারে, ধ্বংস করতে চাইলে এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে, অর্থাৎ যার বাঁচা বা সমৃদ্ধ হওয়া আপন আত্মরক্ষার-শক্তির উপর নির্ভর করে না।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

জিবরাইলের ডানা ☐ শাহেদ আলী

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

আজিমপুর হয়ে যে-রাস্তাটি সোজা পিলখানা রোডের দিকে চলে গেছে, তারি বাঁ-পাশে, গাছ-পালার ভেতর এগিয়ে গিয়ে একখানি ছোট্ট কুটির। ঘরের মেটে-দেয়ালগুলোর উপরিভাগ চ'লে গেছে অনেক দিন, রোদ-বৃষ্টি আর হাওয়ার অবারিত যাতায়াত এই ঘরের মধ্যে। মরচে-ধরা বহু পুরোনো টিনের সুরাখ দিয়ে দেখা যায় নীল আশমানের ছিটে-ফোঁটা।

মা ও ছেলে শুয়ে আছে চাটাই বিছিয়ে।

সন্ধ্যেবেলা হালিমা খুবই মেরেছিলো নবীকে। ছ'বছর গিয়ে সাত বছরে পা দিয়েছে নবী। হালিমা তাকে এক বিড়ির দোকানে ভর্তি করে দিয়েছে। কাজ না শিখলে দিন-গুজরানের উপায় থাকবে না। নবীকে দুধের বাচ্চা রেখেই বাপ তার ইন্‌তেকাল করেছে। একা হালিমা কীই বা করতে পারে তার জন্যে? নিজের পেট পালতেই সাত বাড়ি ঘুরতে হয় তার, কাজ না পেলে ভিক্ষে করতে হয় এবং সন্ধ্যেবেলা গিয়ে ব'সে থাকতে হয় গোরস্তানের গেটের কাছে। কবর জেয়ারত করতে এসে অনেকেই দান-খয়রাত করে, তাঁদের কাছ থেকে দু-চার পয়সা হালিমার বরাতেও জুটে যায় কখনো-কখনো। নবী অবশ্যি বিনে মাইনেতেই বিড়ির দোকানে কাজ করে, দোকানী শুধু দুপুরবেলা একবার খেতে দেয় নবীকে। এখনো সে পাকা হয়ে ওঠেনি বিড়ি বাঁধায়। কাজ সম্পূর্ণ শেখা হয়ে গেলেই সে মাস-মাস পাঁচ টাকা ক'রে পাবে দোকানীর কাছে। কিন্তু নবী ফাঁকি দিতে শুরু করেছে আজকাল, কোনো অছিলায় দোকান থেকে বেরিয়েই সে যে কোথায় চলে যায় কেউ বলতে পারে না। সন্ধ্যে পর্যন্ত আর দেখাই মেলে না তার। এ নিয়ে দোকানের মালিক তিনদিন নালিশ করেছে হালিমার কাছে, আজ তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, সে

কাজ ছাড়িয়ে দেবে নবীর, এমন দুষ্টু ছেলেকে দিয়ে দরকার নেই তার। সারাটা বিকেল গোস্বায় আগুন হয়ে ছিলো হালিমা—ছেলে যদি কোনো কাজ না শেখে, তার কি কোন ভবিষ্যৎ আছে আজকের দুনিয়ায়? অথচ, এমন মগডা যে, এদিকে মনই বসে না তার। মন বসবেই বা কেন? মা তো রয়েছে তার জন্যে ভিক্ষে করতে, বাঁদিগিরি করতে! সন্ধ্যায় নবী বাড়ি ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে হালিমা ধুম্-ধুম্ করে কতকগুলো কিল বসিয়ে দেয় নবীর পিঠে। সারাদিন কাটায় কোথায় নবী? —জানতে পীড়াপীড়ি করেছিলো হালিমা, কিন্তু নবীর কাছ থেকে জওয়াব পাওয়া কঠিন, সে শুধু ফুলে ফুলে কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে নবী।

হালিমা খেতে বসেছিলো, কিন্তু দু-এক লোকমা গিলেই সে উঠে পড়ে—তার পেটেও ভাত গেল না আজ। কতো অনুনয়-বিনয় করেছে হালিমা, কিন্তু তাতে মন গললো না অভিমানী শিশুর। শুধু দু-একবার চোখ মেলে হালিমার দিকে তাকিয়েছিলো। তারপর মুখ গম্ভীর করে সে নিজেকে সঁপে দেয় ঘুমের কোলে।

গলে যাওয়া দেয়ালের ওপর দিয়ে হালিমা তাকিয়ে আছে আশমানের দিকে। একটা হাত তার নবীর ওপর রাখা, নবীর পিঠে কঞ্চি ভেঙেও কোনদিনই খুব ব্যথা পায় না,—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, ঘুমিয়ে পড়া ছেলের ওপর হাত রেখে, তার মনটা হু হু ক'রে ওঠে দুঃখে। সত্যি, এতোটুকু ছেলে কী-ই বা বোঝে? বাপ তো মরে গিয়ে রেহাই পেয়েছে চিরদিনের জন্য, বাপ-মার যুগল দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে আছে হতভাগিনী হালিমা। যখন তখন ওকে মারপিট করা সত্যি অন্যায়। কিন্তু আজ যদি কিছুই না শেখে, ও বাঁচবে কী করে সংসারে? হালিমা তো আর চিরদিন বেঁচে থাকবে না যে, নিজের দিন গুজরানের কথা নবীর না ভাবলেও চলবে!

হালিমার চোখ আঁসুতে ভ'রে আসে, আশমান থেকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে সে চুমো খায় নবীর কপালে।

নবী আস্তে আস্তে চোখ মেলে চায়—আর হঠাৎ একবার দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই মা, এইডা কে?

—কইরে? বিস্মিত হালিমা প্রশ্ন করে।

—উই যে গেলো,—ডান হাত বাড়িয়ে নবী দেখিয়ে দেয় অপরিচিতের যাওয়ার পথটি।

—কেউ না। নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর দেয় হালিমা।

—তুমি লুকাইবার চাও? —নবীর অভিমান যেন ফুলে ওঠে—খুব সুন্দর একটা মানুষ গেছে না? রাঙা ধবধবা আর পিন্দনে সুন্দর কাপড়?

—ছুন্দর মানুষ? হালিমার বিস্ময় এবার আরো বেড়ে যায়।

—হ, চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে নবী—মিঠাই নিয়া আইছিল,—তোমার কাছে দিয়া গেছে, না মা?

—হ, দিয়া গেছে। একটা করুণ হাসিতে প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে হালিমা—তারপর একটু শান্ত হয়ে বলে, নবী, এখন তুই ঘুমা,—বিহান বেলা খাবিনে মিঠাই।

—লোকটা কোন্‌খান থে আইছিল, মা? নবী আবার প্রশ্ন করে—দুইটা পাখ্‌না দেখছো পিঠে?

—পাখ্‌না?—হালিমার আক্কেল সত্যি হার মানে এবার। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে সে তাকায় নবীর মুখের দিকে, কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারে না হালিমা।

নবী আবার বলে—হ, পাখ্‌না।—মউরের পেখমের মত ছুন্দর!

হালিমা আরো কাছে টেনে নেয় নবীকে, পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—ফিরিছ্‌তা আইছিল রে—ফিরিছ্‌তা। আজ ছবে-বরাত না! ঘরে ঘরে আইয়া খোঁজ-খবর নিছে মান্‌ছের। ফিরিছ্‌তার তো আজ ছুটি।

ফেরেশ্‌তা এসেছিলো! নবীর সারা গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক দারুণ উত্তেজনায় সে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। সুন্দর আজকের রাতটা—রূপা-গলা জ্যোছনায় ধুয়ে ঢল ঢল করছে সারা পৃথিবীর গা। সন্ধ্যেয় ঘরে ফেরবার সময় আজ সে দেখেছে মস্‌জিদে মস্‌জিদে কোরআন-তেলাওৎ-রত ছেলেমেয়েদের। রাত হয়েছে অনেক, তবু শাহ-বাড়ির মস্‌জিদ থেকে কোরআন তেলাওতের শিরীন আওয়াজ ভেসে আসছে এখনো—গোরস্তান গমগম করছে মানুষে। আজ ঘুমিয়ে নেই কেউই, ফেরেশ্‌তার সঙ্গে মৃতদের রুহের সঙ্গে আজ মোলাকাত করবে সবাই; নিজেদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার মারফত জানাবে আল্লাহ্‌র কাছে। শুধু নবী আর হালিমাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নষ্ট করেছে এ সুযোগটা। তাদেরই দুয়ারের সম্মুখ দিয়ে চলে গেছে আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা, তাদের চাওয়ার কথা—জীবনপিপাসার কথা কিছুই জেনে যায়নি—কিছুই জানানো হলো না তাকে।

বাতি ধরিয়ে হালিমা পরীক্ষা করে ছেলের হাবভাব। একবার বলে—কিরে, তোর খিদে লাগছে খুব? ভাত খাবি এখন? নবী কোনো জবাব দেয়না তার, খিদের কথা সে ভুলেই গেছে একদম। মন তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক মধুর কঠিন ভাবনায়। ফেরেশ্‌তারা খবর নিয়ে যায় আল্লাহ্‌র কাছে। তাদের খবরও কি

নিয়ে গেছে ফেরেশ্‌তা? সে কি গিয়ে বলবে না, বরাতের রাতেও সে ঘুমে দেখে গেছে নবী আর হালিমাকে—ফিরিছ্‌তারে কিছু কইয়া দিছো মা? আবার জিজ্ঞাসু হয় নবী।

কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে হালিমা।

—দুয়ারের কাছ দে' গেলো আর কিছু কইয়া দিলা না? অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে নবী, আমারে ডাকলা না ক্যান তুমি?

—আরে পাগলা! হালিমা তার জ্বালা চেপে রাখতে পারে না, ফিরিছ্‌তা আমাগো কথা ছুনব ক্যান? বড় লোকগো খোঁজখবর করবার লাই না আসছে? আমাগো দুয়ারের কাছ দে' তাগো বাড়িই হে গেছে।

নবী চুপ ক'রে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে—তুমি নামাজ পড়ো না ক্যান্ মা? অসহ্য মুরুব্বিয়ানার সুর বেজে ওঠে তার প্রশ্নে।

—কী হইবো নামাজ পইড়া? একটা পরম বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায় হালিমার কণ্ঠে।

—কী, অইবো কি? এতোটুকু নবী জ্বলে ওঠে বিরক্তিতে, যারা নামাজ পড়ে, তাগো বাড়িতেই না ফিরিছ্‌তারা আছে; আল্লা তো তাগো কতাই হোনে।

—না-রে না, হালিমা একরকম চিৎকার ক'রে ওঠে এবার, আল্লা তো ঘুমাইয়া রইছে কেঁতা গায় দিয়া। ছুনা-রুপা দিয়া ছেজ্‌দা করলেই হে চায়। গরীবের সোদা নামাজে হের মন ভিজে না।

আল্লাহ্‌র এই মহৎ গুণের কথা ভেবে একান্তভাবেই ঘাবড়ে যায় নবী। কাঙাল যারা, মিসকিন যারা, তাদের আর কোন ভরসাই নেই তা'হলে। এতো সোনা-রুপাও তারা পাবে না, তাদের দিলের আরজুও গিয়ে পৌঁছবে না খোদার কাছে। আর তাই তো গরীবদের যারা নামাজ পড়ে তাদের তো মালদার হতে দেখা যায় না; দুঃখ তাদের ঘুচছে কই? সোনা-রুপার শিরীন আওয়াজেই তাহলে ঘুম ভাঙে খোদার! সেই জন্যেই বুঝি মালদার আরো মালদার হয়, একগুণ দিয়ে পায় সত্তর গুণ!

কিন্তু খোদা তো পয়দা করেছেন সবাকেই। তিনি কেন তাঁর রহমত একতরফা বিলিয়ে দেবেন মালদারদের মধ্যে? কোনো দিন কি ঘুমের ঘোরেও দরিদ্র বান্দার দুঃখে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে না তাঁর চোখ? সত্যি কি গরীবেরা ঘুম ভাঙাতে পারে না তাঁর?

হতাশার আঁধারে হাতড়ে ফিরতে থাকে নবীর মন। দুয়ারের সুমুখ দিয়ে গেছে

ফেরেশ্‌তা, দবদবে আগুনের মতো রঙ, ময়ুরের পেখমের মতো বিচিত্র বর্ণের দুটো ডানা তার পিঠে, তার সারা গায়ে সে কী খোশবু! সাদা ধবধবে তাজী ঘোড়া কোমর নাচিয়ে চলেছে ফেরেশ্‌তাকে নিয়ে। নবী জেগে থাকলে আজ শুয়ে পডতো ফেরেশ্‌তার পথে, আর মিনতি ক'রে বলে যেতো, তার রক্তের ঢেউ-ওঠা অফুরন্ত দুঃখের কাহিনী। কথা না শুনলে সে ঝুঁকে পডতো ডানা ধ'রে—ফেরেশ্‌তার সাথে সাথে উড়ে সেও চলে যেতো একেবারে আল্লাহ্‌ব কাছে। অমনি চোখ না মেললে নবী চিৎকার করতো গলা ফাটিয়ে, খামচিয়ে রক্তাক্ত ক'রে ঘুম ভাঙাত আল্লাহ্‌র।

কিন্তু তা তো আর হলো না। অথচ সব কিছুরই চাবি রয়েছে খোদাব হাতে; তাঁর ঘুম ভাঙাতে না পারলে কেই বা আর খুলে দেবে ভাগ্যেব মণিকোঠা?

বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে নবী। রাজ্যের যতো চিন্তা এসে জটলা পাকায় তার মনে। হালিমাও বাতি নিবিয়ে গা এলিয়ে দেয় নবীর কাছে। ছেলে দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, হালিমা তা দেখছে না, শুধু বুক দিয়ে অনুভব করছে নবীর বুকভরা অস্বস্তি। একবাব পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হালিমা বলে, নবী, অনেক রাত অইছে—তুই ঘুমা।

নবী আশমানের দিকে চেয়ে থাকে চুপ ক'রে, আর একটা পথেব খোঁজের কল্পনা তার হয়রান হয়ে যায়। আকাশ ভরে পৃথিবীতে এতো জ্যোৎস্না—তবু যেন কতো অন্ধকার, চোখের সঙ্গে মনও হারিয়ে যায় সে-অন্ধকারে।

হঠাৎ একবার বিজলি ঝিলিক দিয়ে যায় তার চোখে, অকূল দরিয়ায় যেন নারিকেল কুঞ্জ-ছাওয়া উপকূলের আভাস পেয়েছে নবী। খুশিতে, আবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সারা দেহ। হয়েছে, আর ভাবতে হবে না! আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে টান দেবে সে। রশি তো হাতেই রয়েছে তার। এবার থেকে নির্বিকার ভাব ঘুচে যাবে খোদার।

পরদিন। আগের দিনকাব পানি-ভাত দুটো খেয়ে দোকানে কাজ করতে যায় নবী—যাবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না, হালিমাই তাকে পাঠিয়েছে অনেক শাসিয়ে। হালিমা বলে, নিজের হাতেই আজ গডতে হবে কপাল, আল্লার কাছে আরজি পেশ করলেই চলবে না।

কয়েকটা ছেলের সাথে নবী বিড়ি বাঁধছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে পিলখানার ওপাশে ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। দোকান পালিয়ে লোক-চক্ষুর আড়ালে ঐখানে সে রোজেই ঘুড়ি ওড়ায় আপন মনে। এ-খবর সে ছাড়া আর কেউ জানে না সংসারে। পৃথিবীকে লুকিয়ে শিশু তার কচি হাত দুটো

বাড়িয়ে দেয় আশমানের দিকে। কিন্তু হাত আর কদ্দূরই বা ওঠে? নবীকে তাই নিতে হয়েছে ঘুড়ি—ঘুড়ি উড়িয়ে উড়িয়ে সে তার বাণীকে এতোদিন অজ্ঞান্তে ওপর হতে আরো ওপরে আরশের দিকেই পাঠিয়েছে।

পেট ব্যথার অজুহাত তুলে নবী বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। মুহূর্তের জন্যেও সে স্থির থাকতে পারছে না। আজ অতি সন্তর্পণে বাড়ি পৌছে নবী। মা বাড়ি নেই। আনন্দের সীমা থাকে না নবীর। তিনটা পাতিল তচ্‌নচ্‌ করে সে বার করে দু'আনা পয়সা—ওহ! দুই আনা পয়সা তো নয়, সাত রাজার ধন। পয়সাগুলো মুঠোয় পুরে নবী ছুটে যায় নবাবগঞ্জে। সুতো কিনে আবার সে দৌড়তে শুরু করে দেয়। এক নতুন অভিযানের নেশায় বুক তার কাঁপছে। জঙ্গলের ভেতরকার এক পরিত্যক্ত ভাঙা মস্‌জিদের অন্ধকার গুহা থেকে নবী বার করে আনে একটা ঘুড়ি আর লাটাই। এই ঘুড়িই তাকে রোজ দোকান থেকে বের করে আনে কাজ ভুলিয়ে, এই ঘুড়িই তাকে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে আশমানের পথে নিয়ে যায়। আর সব ব্যাপারেই খই ফোটে নবীর মুখে, কিন্তু এই ঘুড়ির কথা কারো কাছে সে বলে না। এ যেন তার নেহাত পুশিদা খেলা, একান্তভাবেই নিজস্ব।

এক সময়ে নবী চলে যায় পিলখানার ওপাশে সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। পুরোনো সুতোটার সঙ্গে নতুন সুতোটা গেরো দিয়ে সে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আশমানে। ঘুড়ি যতোই ওপরে উঠতে থাকে উল্লাসে অধীরতায় ততোই বিচলিত হয়ে ওঠে নবী, একটা স্মিতহাস্যে তার মুখ থেকে চোখ পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে বারবার। আরশের পায়ে রশি লাগিয়ে আজ সজোরে টান দেবে নবী।

ক্রমেই ছোট হয়ে আসে ঘুড়িটা। এক সময়ে যখন হাতের সুতো শেষ হয়ে, গেল, নবীর দুঃখের সীমা থাকে না। সুতো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঘুড়ি যে দেখা যাচ্ছে এখনো। খোদা কি এতো কাছে? তাতো নয়, মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে অনেক দূরে আরশের ওপর ঘুমিয়ে আছেন তিনি। এতো কাছে হলে তো খালি চোখেই দেখা যেতো আল্লাহ্‌কে। সুতো চাই তার, আরো অনেক সুতো,—যে তার ঘুড়িকে নিয়ে যাবে মেঘের ওপারে, আরশের একেবারে কাছটিতে! কিন্তু এখানেও দরকার পয়সার। সে যে সুতো কিনবে সে পয়সাই বা কই নবীর? তাদের দুর্দশা তাহলে আর ঘুচবে না। নবী আশমানের দিকে চেয়ে নিজের ব্যর্থতায় আর্তনাদ করে ওঠে। ঘুড়ি ওড়ানো যতোদিন একটা শখ ছিলো, নেশা ছিলো, ততোদিন শুধু ঘুড়ি উড়িয়েই আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু আজ যখন ওই ঘুড়ি একটা গভীর অর্থ নিয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে, সহস্র বেদনায় সম্ভাবনার পথও অবারিত হয়ে গেছে তার জন্যে!

কিছুক্ষণ ঘুড়ি উড়িয়েই বাড়ি চলে আসে নবী। এই সুতোয় হবে না, আরো অনেক সুতো চাই। বামনের হাত বাড়িয়ে আরশের পায়া ধরা অসম্ভব। পরম যত্নে সে ঘুড়িটা লুকিয়ে রাখে ভাঙা মসজিদের নির্জন অন্ধকারে।

বেলা চলে যাচ্ছে, ঘরেও পয়সা নেই। মার কাছে পয়সা চাইতে গেলে হালিমা কঞ্চি দিয়ে তার পিঠের ছাল না তুলে ছাড়বে না। যে দু' আনা পয়সা আজ সে চুরি করেছে তার জন্যেই তার বরাতে কী আছে কে জানে? তবু লোভ সামলাতে পারে না নবী। আজকালের লিখা পাল্‌টাতে হলে কিছু খরচ—কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বইকি। মার অবর্তমানে নবী উল্টে পাল্টে দেখে ঘরের সব কটা হাঁড়ি-পাতিল—ছেঁড়া কাপড়ের খাঁজে তন্নতন্ন করে। একটা পয়সা নেই কোথাও। পয়সা থাকবেই বা কী করে? ভিক্ষে করে পরের বাড়িতে কাজ করে যা দু'চার পয়সা পায় তাতে করে মা-ছেলের আধপেটা খাবারই হয় না কোনদিন, তারা আবার জমাবে পয়সা।

হঠাৎ নবীর মনে পড়ে যায়: ইস্টিশনে গেলে দু'চার পয়সা পাওয়া যেতে পারে। তার বয়সী ছেলেদের সে কুলিগিরি করতে দেখেছে অনেকদিন। নবী আর ভাবতে পারে না, একপেট ক্ষিধে নিয়েই সে ছুটে যায় ইস্টিশনের দিকে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় তাকে। তারপর গাড়ি যখন এলো, তাজ্জব বনে যায় নবী, কতো বিচিত্র রকমের মানুষ, আর কতো রঙবেরঙের পোশাক! বাক্স, বিছানা, পেটরা প্রভৃতিতে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে লাইনের কাছটুকু। 'মুটে চাই' 'কুলি চাই' চিৎকারে হারিয়ে যায় আর সব আওয়াজ।

সবার বরাতেই একটা না একটা কিছু জুটে যায়; কিন্তু নবীর কপাল বড়ো খারাপ, 'মুটে চাই' বলে চিৎকার করতে গিয়ে আওয়াজ এলো না তার গলায়—হাত দুটো চাওয়ার ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঁচিয়ে যেন ছুটে যায় এক কামরার সুমুখ থেকে আরেক কামরার সুমুখে।- চোখ তার করুণ আঁসুতে টলোমলো। ভিক্ষুক মনে করে কেউ কেউ তাকে নসিহত করলে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে, আর অতি আধুনিক কেউ দিলে গলাধাক্কা। কারো কাছ থেকেই নবী কিছু পেলো না।

ট্রেন চলে গেছে। ইস্টিশনে বসে বসে নিজের বদ নসীবের জন্যে বেদনায় ভরে আসে নবীর মন। দুঃখটা এবার আরও বড়ো হয়ে দেখা দেয় নবীর কাছে। মায় বেটায় কোনদিন একেবারেই উপোস করতে হয় তাদের। বছরে একবার করেও যদি কাপড় কিনতে পারতো তারা! তার বাপ সেই যে ছেঁড়া শততালি দেয়া কাপড়গুলো রেখে গিয়েছিলো সেইগুলোই আরো তালি দিয়ে গেরোর ওপর গেরো দিয়ে পরছে তারা দুজনে। ঘরের মেটে দেয়াল তো প্রায় সবটাই গলে গেছে, বৃষ্টি

হলেই টিনের সুরাখ দিয়ে পানি পড়ে ঘর ভেসে যায়। দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা নেই তাদের। আল্লাহ্‌র কাছে তাদের দিলের আরজু পৌছাতে পারলেই অবসান ঘটতো দুঃখরাত্রির। কিন্তু হালিমা নামাজ পড়ে না, নবীও আরতরী সুরা এবং রাকাতগুলো শিখবার সুযোগ পায় নি কখনো। আল্লাহ্‌ কেনই বা শুনবেন তাদের কথা।

ঘণ্টাখানেক পরে আরেকটা ট্রেন যখন এলো, নবীর আনন্দ দেখে কে! ট্রেন থামবার আগেই 'মুটে চাই' 'কুলি চাই' বলে সে চিৎকার শুরু করে দেয় প্রাণপণে। ট্রেন থামলে একটা ঘড়ি-পরা বলিষ্ঠ হাতের ইশারায় নবী এসে দাঁড়ায় এক প্রথম শ্রেণীর কামরার সুমুখে। ভদ্রলোক একটা এটাচি ও হোল্ডঅল্‌ দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ওয়েটিং রুমে নিয়ে যেতে পারবি?

—ক্যান পারুম না? তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দেয় নবী, দেন আমার ঘাড়ে তুইলা। আমার বহুত পইছার দরকার—চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে উচ্চারণ করে নবী—আমনে কতো দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক এবার দৃষ্টি প্রখরতর করে নবীর মুখের দিকে তাকাল, অদ্ভুত ছেলে তো! বলেন—অতো পয়সা দিয়ে কি করবি?

—বারে, পইছার বুঝি কাজ নাই। নবী রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে, ঘুড়ির রছি কিনুম যে—অনেক রছি।

ভদ্রলোক এবার সত্যিই হেসে ফেলেন এবং হোল্ডঅল্‌টা নবীর মাথায় দিয়ে এটাচিটা হাতে করে নেমে পড়েন গাড়ি থেকে। ওয়েটিং রুমে রুমে এসে চার পয়সার জায়গায় চার আনা দিয়ে বলেন—এই নে, অনেক সুতো হবে।

নবী সিকিটা ছুঁড়ে মারে ওয়েটিং রুমের মেঝেয়—না, আমি নিমু না। চার আনায় আমি কি করুম? আমার অনেক রছি লাগবো। আমার ঘুড় আছমান ছুইবো গিয়া।

সবাই অবাক হয়ে যায় নবীর মেজাজ দেখে। ভদ্রলোক সিকিটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন—ঘুড়ি আশমান ছুঁলে তোর কি হবে?

—ক্যান্‌, আরছের পায়ায় বাজাইয়া টান দিমু। এক স্বপ্নিল নেশা আর শক্তির স্ফূর্তিতে নবী মুহূর্তে যেন বিরাট হয়ে কিছু ওঠে—আল্লা খালি আপনাগো কথাই ছুনবো, আমাগো কথা বুঝি ছুনোন লাগবো না হের?

এবার সকলে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। পরিবেশটা মুহূর্তে যেন কেমন থম্‌থমে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। রাজভক্তদের সামনে

যেন রাজদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে শিশুর মুখে। ভদ্রলোক পকেট হতে একটা আধুলি বের করে বলেন—এই নে, এখন হবে তো?

আধুলিটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় আঁখি ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে নবীর। আন্তরিকতা মিশিয়ে বলে, আমাগো যখন অনেক পইছা অইবো, আমাগো বাড়ী তখন আইয়েন —আপনের জেব ভইরা দিমু হেদিন।

নবীর কথায় হেসে ফেলে সবাই। যিনি আধুলিটা দিয়েছেন, তিনিও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হাসিতে। তাঁর আজকের এই মেহেরবাণীর কথা ভুলতে পারবে না নবী—দিন যখন ফিরবে, নবী দুই জেব ভর্তি করে পয়সা দিয়ে শোধ করবে তাঁর ঋণ। হাসতে হাসতেই বলেন, হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই আসবো, আমরা সবাই আসবো সেদিন।

নবী এসব শুনবার জন্য অপেক্ষা করে না। সে সোজা চলে যায় চকের দিকে। অনেকটা সুতো কিনে যখন বাড়ি ফিরলো তখন সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সুতোটা সে লুকিয়ে রেখে আসে মস্‌জিদে—তার ঘুড়ির পাশে।

হালিমা ভিক্ষা-করে আনা চালগুলো জাল দিচ্ছে। গাছতলা থেকে ভিজে বন কুড়িয়ে এনেছে আগুন ধরাবার জন্যে। নবীকে দেখেই চোখ কচলাতে কচলাতে বলে,—কিরে,—অতোক্ষণে কোন্‌থে আইলি?

মার দরদভরা প্রশ্নে অত্যন্ত খুশি হয় নবী, তার মেজাজ তাহলে বিগড়ে যায়নি আজ। হয়তো পাতিল তচ্‌নচ্‌ করে পয়সা নেবার খবরটি সে জানতেই পারেনি এখনো। মনে মনে আল্লাহ্‌কে সে শুকরিয়া জানায়।—দোকান তে বার অইয়া একটু ঘুইরা আইলাম মা,—মার দিকে চেয়ে সে বলে সহজভাবে।

চুলোয় বন ঠেলতে ঠেলতে হালিমার কণ্ঠে দরদ ভেঙে পড়ে—দোকান তে পালাস নে যেন! কাজটা ছিখে ফেললে অনেক পইছা আইবো ঘরে। কাজ না জানলে কি আর ভাত-কাপড় জুটে? আমাগো মা-পুতের কি এ-ছাড়া আর উপায় আছে? —এবার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হালিমা প্রশ্ন করে—হাঁরে নবী, তোর খিদে লাগছে, না?

মায়ের আন্তরিকতায় নবী একরকম ভুলেই যায় তার খিদের কথা। তাছাড়া, একদিকে রশি কেনার আনন্দ, অন্যদিকে মার স্নেহ—দুটোতে মিলে আজকের দিনটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে নবীর কাছে। হেসে সে বলে—না মা, আমার খিদে লাগছে না। দোকানে আমাগোরে খাওয়ায় কিনা দুপুরবেলা।

—তাই ভালো—হালিমা সায় দেয়—ভিক্ষার ভাত যতো কম পেটে দেয়া যায় ততোই ভালো। এ ভাতে ছেলেমাইয়া গো 'বাইড়' থাকে না।

রান্না হলে নবী ও হালিমা, দুজনেই কিন্তু ভিক্ষের ভাত পেটে ঢেলে স্বস্তিবোধ করে কিছুটা।

পরদিন দোকানের কথা বলে নবী একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। আজ আবহাওয়া খুবই অনুকূল—এবং নবীর হাতে অনেক সুতো। পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে আজ সে তার হাত পৌঁছিয়ে দিতে পারে আশমানে।

নবী ঘুড়িটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে—বুক তার ঢিপ ঢিপ করছে। কিছুক্ষণ পরেই ঘুড়ি উড়লো আশমানে,—হাওয়ায় ভরে নেচে নেচে। দুঃসাহসের দোলায় কেঁপে কেঁপে ঘুড়ি উঠে যায় ওপর হতে ওপরে—আরো ওপরে! সুতো আজকে ফুরোতে চায় না,—ঘুড়ি ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে—অই বুঝি ঘুড়ি হারিয়ে যায় দৃষ্টির ওপারে অসীম শূন্যতায়। আবেগে, ঔৎসুক্যে বড়ো হয়ে এলো নবীর চোখ দুটো। তার বুকের শ্বাস দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে আসে, ঠোঁটের বাঁধন খুলে গিয়ে একটা অদ্ভুত হাসির আমেজ লাগে তার সারা মুখে। ঘুড়ির নাচের সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব চঞ্চলতায় নাচতে থাকে তার বড়ো-হয়ে-আসা চোখের চকচকে তারা দুটো।

এক সময় টের পায় নবী—লাটাই আর ঘুরছে না। সুতো শেষ হয়ে গেছে। সেই নির্জন ফণিমনসার ঘেরা জায়গাটুকুতে নবীর চোখ পানিতে ভরে আসে। ঘুড়ি এখনো দৃষ্টিসীমার ভেতরেই।

নবী ঘুড়ি নামিয়ে আনলো। আরো বেশি রশি চাই তার, অনেক রশি। খোদা তাঁর আসন এতো দূরে পেতেছেন কেন, বুঝতে পারে না নবী। কিন্তু আসন দূরে পাতলেই কি আরশে বসে ঘুমোনো এতো নিরাপদ? সংসারে কি রশি নেই যে, তাঁর আরশ ছোঁওয়া যাবে না, টলিয়ে নেয়া যাবে না পাথায় রশি লাগিয়ে? নবীর আকাঙ্খা আরো প্রবল হয়ে ওঠে বাধা পেয়ে।

চিরদিনকার মতো মসজিদে ঘুড়ি আর লাটাই লুকিয়ে আজ সে চলে যায় ইস্টিশনে। পয়সা চাই তার, রশি কেনার পয়সা—যে রশি সে আরশের পায়ায় বেঁধে খোদাকে বেঁধে নামিয়ে আনবে মাটিব মানুষের মধ্যে!

শেষ পর্যন্ত দু'আনার বেশি আর জুটে না। কতোটুকু সুতোই বা আর কেনা যায় এ দিয়ে!

এমনি করে রোজ কিছু কিছু পয়সা আয় করে নবী—আর তাই দিয়ে সুতো কিনে পুরোনো সুতোটার সাথে জুড়ে দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আশমানে।

পিলখানার ওপাশে ওই স্থানটুকু নবী একান্ত আপন করে নিয়েছে অনেকদিন। অমন নির্জন নীরব পরিবেশে আশমান ছাপিয়ে ওঠে নবীর দুর্জয় সাহস। কিন্তু হাতের

সুতো যখন শেষ হয়ে যায়, এবং ছোট হতে হতেও ঘুড়ি যখন থেকে যায় দৃষ্টির ভেতরেই, নবীর তখনকার দুঃখ আর আক্রোশ দেখে কে? তবু মন তার ভেঙে পড়ে না—সাফল্যের নিকট সম্ভাবনা তাকে করে তোলে আরো সাহসী, আরো জেদী।

রোজ নবী দোকানের কথা ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়—কিন্তু কোথায় বা দোকান আর কোথায় বা নবী? ইস্টিশনে, বাজারে মুটেগিরি ক'রে যা দু'চার পয়সা পায় সবই খরচ করে সুতো কেনায়। দিনে দিনে সুতো দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে।

একদিন সত্যিই ঘুড়ি ছোট হতে হতে একটা কালো বিন্দুব মতো হয়ে আশমানের অসীম শূন্যতায় হারিয়ে গেলো। ডোর ধরে রেখে আশমানের দিকে চেয়ে আছে নবী! আর প্রচণ্ড কাঁপুনিতে থর থর ক'রে উঠছে তার শরীর। উত্তেজনায় কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে এলো তার, বিস্ময়ে আশঙ্কায় দম যেন বন্ধ হয়ে আসে—একটা করুণ হাসিতে মধুর হয়ে ওঠে শিশুর মুখ। আজ যেন টানাটানি পড়ে গেছে আশমান আর পৃথিবীর মধ্যে—কে হারে, কে জেতে—এবং ভারি আকর্ষণ সে অনুভব করছে হাতের রশিতে? শুধু একটা রশি টন্‌টন্ করছে আশমানের আকর্ষণে। হয়তো দৃষ্টির আড়াল থেকে কে টানছে রশিকে ধরে—আর সেই টানে ফুলে ফুলে উঠছে নবীর শিরা উপশিরা।

রশি বেয়ে বেয়ে নবীর বিস্মিত দৃষ্টিও হারিয়ে যায় আশমানে। আজকে আর ঘুড়ির রশি গুটোবে না নবী; লোকচক্ষুর ওপারে ঘুড়ি উড়ে বেড়াক আপন ইচ্ছায়—আপন ধর্মে। এক সময় হয়তো আটকে যাবে আরশের পায়ায়—আর শক্ত টান পড়বে হাতে, রশিতে টান দিয়ে নবী টলিয়ে দেবে আল্লার আরশ। ভয়-চকিত আঁখি মেলে আজ তিনি তাকাবেন মাটির মানুষের দিকে, অনিচ্ছায়ও শুনতে হবে দুঃখী বান্দার কাহিনী—তাদের ইতিহাস!

নবী চেয়ে আছে ওপর দিকে. শুধু একটা সুতো—সে-রাতের পুলের মতো সূক্ষ্ম একটা সিঁড়ি বেহেশত্ আর দুনিয়ার মাঝখানে। মাঝে মাঝে সাদা, কালো নানা রঙের মেঘ আনাগোনা করছে, আর আঁৎকা টান পড়ে পড়ে ঝন্ ঝন্ করে উঠছে সুতোটুকু—মেঘ দু' টুকরো হয়ে যাচ্ছে সে সুতোর ধারে! নবীর চোখ দুটো পানিতে ভ'রে আসে। আল্লাহ্‌র আরশ ঠিক কোনখানটিতে তা সে জানে না, কিন্তু আজ তার মনে হলো—সে যেন তার বিদ্রোহের নিশান আরশের কাছাকাছি কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। আর যেন দূর নয় বেশি!

পেটের খিধে, মা ও সমস্ত সংসার—সব কিছু ভুলে যায় নবী। সন্ধ্যের পরও অনেকক্ষণ 'ডোর' ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। কই, কোথাও তো আটকে গেলো না ঘুড়ি! এক সময়ে সে সুতো গুটিয়ে ঘুড়ি নামিয়ে আনে নীচে এবং জমিন ছোঁবার আগেই ঘুড়িটাকে চেপে ধরে তার বুকের মাঝে, ঘাড় নীচু করে সে পরশ নেয় ঘুড়ির, কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ পায় নাকে, আর ঘুড়িটাকে মনে হয় ভেজা ভেজা। আহ্—নবীর বুকে খুশি আর থামাই পায় না যেন। বহুদিন পরে খোদা তার গরীব বান্দার দুঃখে কেঁদেছেন, আর তাঁরই আঁসুর ধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছে নবীর ঘুড়ি।

আরশের পায়া ধরে টান দিতে হল না আর, এর আগেই খোদা কেঁদে ফেলেছেন তার বান্দার দুঃখে। নবী আজ সত্যি বিজয়ী—সে সার্থক হয়েছে তার অভিযানে; আজ থেকে আর কোন দুঃখ থাকবে না তাদের।

বাড়ি ফিরে দেখে, হালিমা বিছানায় পড়ে কোঁকাচ্ছে—জ্বর এসেছে তার। জোহরের সময়েই চলে এসেছিল ঘরে—আজ আর কিছুই জোটেনি কপালে। মনটা খারাপ হয়ে যায় নবীর—খোদা যদি তার বান্দার দুঃখে কাঁদবেন তো তার মার জ্বর হবে কেন আজ? তাদের ঘরে আজ ভাত জুটবে না কেন? এ তাহলে আল্লার আঁসু নয়—শয়তানের পেশাব! শয়তান চায় না যে মানুষের দিলের আরজু পৌঁছুক গিয়ে আশমানে।

নবী বুঝতে পারে, আরো অনেক সুতোর দরকার হবে তার। সাত তবক আশমান পেরিয়ে গিয়ে তবেই না আল্লাহ্‌র আরশ! সকালবেলা জ্বর নিয়েই উঠে পড়ে হালিমা। কয়েক বাড়ি ঘুরে কিছুটা খাবার যোগাড় ক'রে নিয়ে আসে নবীর জন্য। নবী বলে—তুমি খাইবা না মা?

না—হালিমা ধীরে ধীরে বলে—তুই খাইয়া দোকানে যা। নবী পিয়ে পিয়ে ফেনটা গিলে নেয়। তারপর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—তুমি চিন্তা কইরোনা মা—আল্লা আমাগো উপরে মুখ তুইলা চাইবো। এ হাল আমাগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা ছেলের দিকে চেয়ে একটু করুণ হাসি হাসে—কিছু বলে না। টলতে টলতে এক সময় সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে জানে না যে নবী দোকানে যায় না একদিনও—বাজারে ইস্টিশনে মুটেগিরি করে, আর পিলখানার ওপাশে ঘুড়ি ওড়ায়।

নবী মুটেগিরি করে করে রোজ কিছুটা সুতো কেনে। ঊর্ধ্ব হতে আরো ঊর্ধ্বলোকে পাঠিয়ে দেয় তার বিদ্রোহের নিশান। কিছুতেই থামতে পারে না নবী;

তার নূরের জেল্লিতে সিনাই পাড় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তার দিকে হাত বাড়িয়েছে দুঃসাহসী শিশু!

কিন্তু যতই সুতো জুড়ে দিচ্ছে—ঘুড়ি ততোই উপর হতে আরো উপরে উঠছে—কোন কূল কিনারাই পায় না নবী। অতোদূরে—মানুষের নাগালের বাইরে এ-ভাবে আত্মগোপন করার কী মানে থাকতে পারে, কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না।

একদিন নবী সন্ধ্যের সময় ঘুড়ি উড়িয়ে ফিরে এসে দেখে—মা আজ বড়ো খুশি। পরনে তার নতুন শাড়ি—শান্‌কি আর বাটিতে ভাত-সালুন বেড়ে বসে আছে নবীর অপেক্ষায়।

বহুদিন পর সান্‌কি-ভরা ভাত দেখে পেট জ্বালা ক'রে ওঠে নবীর। সে সোজা গিয়ে বসে পড়ে হালিমার কাছে। খেতে খেতে মাকে বলে—মা অহো ছব্‌ পাইলা কই আইজ?

আজো জ্বর ছিলো হালিমার। কিন্তু এই মুহূর্তে নবীর খাওয়া আর খুশি দেখে সে যেন সুস্থ হয়ে ওঠে হঠাৎ। ধীরে ধীরে বলে—কাহারটুলির জমিদার বাড়ির বউ মরছিল না, তারি ফাতিহা আইছে আইজ, বহুত কাপড় চোপড় আর টাহা পয়ছা দান-খয়রাৎ করছে তারা। দেখ না—তোর লাইগা একটা লুঙ্গিও আনছি চাইয়া। হালিমা উঠে পড়ে এবং একটা ছোট্ট নতুন লুঙ্গি এনে দেয় নবীর হাতে।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় নবী। আজ বুঝি সত্যি তাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন আল্লাহ্, ঘুম তাহলে ভেঙেছে তার আজ! শুক্‌রিয়ার বান ডেকে যায় তার বুকে। ছলোছলো চোখে মার দিকে চেয়ে বলে—কইছিলাম না মা—এ হাল আমাগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা নবীর এ-কথায় সায় দিতে পারতো না কোনোদিনই। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সায় না দিয়ে পারে না। নবীর চোখে যেন সে পরিচয় পেয়েছে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

জমিদার বাড়ির দেয়া পয়সা আর চালে দুদিন ভালোই যায় তাদের; আবার শুরু হয় আধ-পেটা খাওয়া আর উপোসের পালা। নবীর মন ভেঙে পড়ে—রাগে জ্বালা ধরে যায় তার সমস্ত সত্তায়। একি ছলনা—একি ছিনিমিনি খেলা বান্দার জীবন নিয়ে? তাদের আরজু তাহলে এখনো গিয়ে পৌছায়নি খোদার কাছে।

নবী রোজ ঘুড়ি ওড়ায় আর মনে মনে বলে—আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত পৌছুতে পারে এতো সুতো যদি সে কিনতে না-ই পারে এতো ফেরেশ্‌তা রয়েছে কী জন্যে তারাই তো মানুষের দিলের আরজু পৌছয় গিয়ে খোদার কাছে। আল্লাহ্‌র

কাছ হতে তারাই পয়গাম নিয়ে আসে মানুষের কাছে। আজকাল এতো নিষ্ক্রিয় কেন এই ফেরেশ্‌তারা? কেন তারা নবীর ঘুড়িকে নিয়ে যায় না আল্লাহ্‌র কাছে।

সেদিন সোমবার। নবী না খেয়েই ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকু! নবী দূর্বার ওপর বসে নতুন সুতোটাকে জুড়ে দেয় পুরোনো সুতোটার সঙ্গে। আশমান কেমন যেন মেঘ্‌লা মেঘ্‌লা। সূর্যের আলো পড়ে মেঘগুলো সাদা হয়ে গেছে। আর ফাঁকে ফাঁকে চক্‌চক্‌ করছে গাঢ় নীল আশমান। এই সময় নব ঘুড়িটাকে উড়িয়ে দেয় আশমানে,—তাতে তার লাটাই আর ঘুড়ি শন্‌শন্‌ ক'রে ধাওয়া করছে ঊর্ধ্বদিকে। নবী অপলক চোখে চেয়ে আছে ঘুড়ি পানে—আর রশিতে টান পড়ে পড়ে ঝিন্‌ ঝিন্‌ করে উঠছে তার সারা শরীর। অকারণ উল্লাসে ভরে উঠছে নবীর মন। নবী কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। মন তার আবেগ-উৎসাহে থর থর করে কেঁপে উঠছে, কল্পনা স্বর্ণ ঈগলের মতো ডানা মেলেছে আশমানে!

ঘুড়ি ক্রমেই ছোট হয়ে এলো। একসময় নবী বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলো, তার ক্ষুদ্র ঘুড়িটার চারপাশে একটা বৃহৎ পাখি উড়ছে আর ঘুরছে। মাঝে মাঝে পাখিটা হারিয়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে, আবার দেখা যাচ্ছে ডানা মেলে ঘুড়িটাকে কেন্দ্র ক'রে। আশ্চর্য, একবার ঘুড়ির রশি আটকে যায় পাখির গায়। নবীর হাতে টান পড়ে আর তাতেই সারা দেহ অজানা আশঙ্কায় দুলে ওঠে—পাখিটা ঘুড়ি নিয়েই ঘুরতে থাকে আরো দ্রুতবেগে। রশি আরো প্যাঁচ খেয়ে লাগে পাখির ডানায় আর পায়ে। হঠাৎ এক সময় নবী টের পায়, সুতো ঢিল হয়ে গিয়ে নেমে আসছে, আর ঘুড়ি ঘুরছে পাখির পিছে পিছে। নবীর এতোদিনের অহংকার মাটি হয়ে যায় আজ। আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে আরশকে টলিয়ে দেয়া আর সম্ভব হল না জীবনে।

একাকী শূন্য মাঠে ডুকরে কেঁদে ওঠে নবী। দুচোখ-ভরা অশ্রু নিয়েই সে একবার তাকায় ঘুড়ির দিকে। একটা কালো বিন্দুর মতো পাখির পিছে পিছে ঘুরছে ঘুড়ি, আর পাখিটা শুধু ঘুরে ঘুরে উপরের দিকেই উঠছে। আচম্‌কা নবীর মনে হলো—এ তো পাখি নয়—এ যে ফেরেশ্‌তা, জিবরাইল এসেছে পাখির সুরত ধ'রে তার ঘুড়িকে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। দুচোখ ফেটে এবার কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে নবীর গাল বেয়ে; তার অশ্রুধোয়া মুখে ফুটে ওঠে একটা অপূর্ব হাসি—বেদনায় আর আনন্দে ঝল্‌মল করা।

নিজের বোকামির কথা ভেবে শরম হয় নবীর। এতোদিন পর ফেরেশ্‌তা

এসেছে তার দিলের আরজু আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। আর সে কিনা কাঁদছে, পাখি তার ঘুড়ি নিয়ে গেল বলে! চোখ মুছে সে তাকায় আশমানের দিকে—পাখি ত নেই—ঘুড়িও নেই, শুধু সাদা মেঘ, আর তারি ফাঁকে চক্‌চক্‌-করা গাঢ় নীল আশমান। অনেকক্ষণ নবী চেয়ে থাকে আশমানের দিকে, আবার তার চোখ ফেটে দরদর করে বেরিয়ে আসে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আজকে সে সার্থক—আজকে সে জয়ী! আর কোনো ভাবনা নেই তার, জিবরাইল এসে নিয়ে গেছে তার ঘুড়ি—নতুন পাতা খুলবে এবার জীবনের।

আবার আশমানের দিকে চেয়ে, এক পলক হেসে নবী বাড়ি ফিরে আসে। খুশিতে তার সারা শরীর আজ নেচে নেচে উঠছে। হালিমা উঠোনে বসে শাক বাছ্‌ছিলো—'মা-মা—হুনছো'—বলে নবী ঝাঁপিয়ে পড়ে হালিমার কোলে।

হালিমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে—তারপর রাগে ঠোঁট কামড়ে টিপে ধরে নবীর ঘাড়ে—গর্‌গর্‌ ক'রে বলে—কোখে আইলিরে হারামজাদা? আইজ তোর রঙ্‌ আমি না বাইর কইরা ছাড়ুম না।

নবী তার মার রাগের কারণ বুঝতে পারে না—তবু, তার খুশির খবরটুকু সে না দিয়ে পারছে না তার মাকে,—মা, আইজ জিবরাইলেরে দেখছি—আমাগো খবর···

নবী কথা শেষ করতে পারে না—ধুম ধুম করে হালিমার শক্ত হাতের কিল পড়তে থাকে তার পিঠে।—কিলোতে কিলোতেই বলে—ওরা দিবো আর আমরা খামু বইয়া বইয়া—ঝাঁটা মার জিবরাইলের মুখে শতবার!

—মা, মা—তুমি গাল দিয়ো না, চিৎকার ক'রে ওঠে নবী—গুণা অইবো মা, আল্লা রাগ করবো।

হালিমার রাগ আরো বেড়ে যায়, গালের ফোয়ারা থামতে চায় না তার। নিরুপায় নবী কামড়ে ধরে তার মার হাত।

এবার যেন আগুন লেগে যায় হালিমার গায়। বিড়ির দোকানের মালিক আজকে ব'লে গেছে—নবী দোকানে যায় না কোনোদিনই; সুতরাং কাজ তার ছাড়িয়ে দেওয়া হলো আজ থেকে। দোকানীর কাছেই শুনেছে হালিমা—নবী নাকি কোথায় ঘুড়ি ওড়ায় সারাদিন, আর সময় সময় ছুটে বেড়ায় বাজারে, ইস্টিশনে। খবরটা পেয়ে অবধি গোস্বায় আগুন হয়েছিলো হালিমা। এমন অবাধ্য শয়তান ছেলেকে দিয়ে কাজ কি? হালিমা এবার কঞ্চি হাতে নিয়ে সপাং সপাং মারতে থাকে নবীর পিঠে, হাতে, মাথায়।—হারামজাদা, তোর ভালার লাইগাই না আমার

মাথা বিষ, আর তুই কিনা ফাঁকি দেছ আমারে। আমি মরলে জিবরাইল খাঞ্চা খাঞ্চা ভাত লইয়া আইবো না তোর লাগি।

আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় নবীর পিঠ। চিৎকার করে সে কাঁদে এবং কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে দেয় হালিমাকে। এক সময় প্রায় বেহুঁশ হয়ে সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

রাতের বেলা হালিমার গায়ে জ্বর এসে যায়। নবী তার মার দিকে একবার চায়, এবং কিছু না বলেই ঘরের এক কোণে শুয়ে পড়ে মাটির ওপর। কিছুই পেটে পড়লো না তার। শুয়ে শুয়ে কপাল কুঁচকে, ঠোঁট ফুলিয়ে সে কটমট করে তাকিয়ে থাকে হালিমার দিকে।

তারপর, কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়লো, সে নিজেই জানে না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নবী স্বপ্ন দেখলো : জিবরাইল তার ঘুড়ি নিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাকে আশমানের দিকে ধাওয়া করেছে। এক সময় নীল আশমান দুদিকে সরে গিয়ে পথ করে দিল জিবরাইলের জন্যে। ফাঁকে ফাঁকে আবার আবার যাত্রা শুরু হলো—আবার একটা আশমান ফাঁক হয়ে গেল। আবার আরেকটা আশমান খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেলো জিবরাইলের ডানায়, জিবরাইল তবু এগুচ্ছে নবীর ঘুড়ি নিয়ে। তারপর এক সময় খুলে গেলো সপ্তম আশমানের দরজা আর তারই ফাঁক দিয়ে একটা তীব্র আলোকচ্ছটা এসে ঝলসে দিলো নবীর চোখ দুটোকে। আর চাইতে পারলো না নবী—দু'চোখে হাত দিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে ঘুমের ঘোরে—মাগো, আমার চোখ দুইটা পুইড়া গেলো।

চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে নবী—গলে-যাওয়া দেওয়ালের উপর দিয়ে সূর্যের প্রখর আলো তার নাকে মুখে এসে লাগছে।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বাঙলা দেশ □ মিহির মুখোপাধ্যায়

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

কোন সকালে উঠে গোছগাছ শুরু করেছিল গীতা। স্টোভ জেলে চা করেছে। চায়ের কাপ সুবলের শিয়রের কাছে টুলটার উপর রেখে মশারী তুলতে তুলতে ডেকেছে—এই ওঠো, চা এনেছি, উঠে পড়ো এবার—

তখনো রোদ ওঠেনি। অঘ্রানের আকাশ অল্প ফর্সা হয়েছিল।

সুবলের চোখে ঘুম। ভার-ভার গলায় বলেছিল—তুমি এত সকালে উঠলে কেন—

—বাঃ, আজ আমরা যাবো না—

—সে তো যাব বেলা আড়াইটের গাড়িতে, টেবিল-ঘড়িটার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললো—এখন সাড়ে পাঁচটাও বাজেনি, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, আমি এখন উঠবো না—গায়ের চাদরটা ভাল করে টেনে পাশ ফিরতেই পিঠে খোঁচা দিয়েছিল গীতা—এই ওঠো, নয়তো আমি জল ছিটিয়ে দেব, ওঠো বলছি, ওঠো শিগগির—

অগত্যা উঠতে হয়েছিল। ব্যাজার মুখে হাই তুলে মন্তব্য করেছিল সুবল—বিয়ে করে মহা ঝামেলা হল দেখছি, স্বাধীনভাবে একটু ঘুমুতেও পারবো না, একা একা বেশ ছিলাম, এরকম হবে জানলে কোন শালা—

—এই মুখ খারাপ করবে না, বাসিমুখেই যত বাজে কথা শুরু করলে—

—বাজে কথা আর কি বললুম, ওটা হল মুখের লব্‌জ—চায়ের কাপটা তুলে নিল সুবল—রাত্তিরে ভাল ঘুমুতে দাওনি, সকাল বেলা যে একটু আরাম করে শুয়ে থাকবো—

—এই অসভ্য চুপ করো—চোখ পাকাল গীতা—আমি তোমাকে ঘুমুতে দিইনি, তুমিই তো—বলতে বলতে হেসে ফেলেছিল।

তারপর সকালের সূর্য দুপুরের আকাশে উঠে এসেছে। এখন এই শেষ দুপুরে শেয়ালদা স্টেশনের দিশেহারা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললো সুবল—অবস্থা দেখেছ—

সুবলের এক হাতে সন্দেশের বাক্স, আরেক হাতে ফলের ঠোঙা। গীতা কিন্তু ভিড়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বললো—ওই দ্যাখো, কেমন বড় বড় আপেল—

স্টেশনের গেটের পাশে ফলের দোকান। ওপাশে পানের দোকান থেকে সুগন্ধি জর্দা দেওয়া পান কিনছিল সুবল। আপেলগুলির দিকে এক পলক তাকিয়ে বললো—আপেল তো কিনলাম তখন—

যাদবপুর স্টেশন থেকে আড়াইটের গাড়ি ধরার মুখে তাড়াহুড়ো করে কয়েকটা আপেল, কমলালেবু কেনা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি তেমন পছন্দ হয়নি গীতার। দেখেশুনে বাছাবাছি করে কেনার মত সময় ছিল না। সেই কথাই বললো—ওগুলো দেখেশুনে নিলে না, খেতে কেমন হবে, কে জানে—

কোন জবাব না দিয়ে পানের খিলি মুখে দিল সুবল। সুগন্ধি জর্দা দেওয়া পান। গন্ধে ভুরভুর করছে। এই একটি মাত্র বিলাসিতা সুবলের। গীতাকে লক্ষ্য করে বললো—তুমিও নাও—পান খাওয়ার তেমন অভ্যাস না থাকলেও মিষ্টি মশলা দেয়া মিঠে পান খেতে আপত্তি নেই গীতার। কিন্তু এখন শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় একগাল পান মুখে দিয়ে ঠোঁট লাল করে যেতে ভরসা পেল না। এই প্রথম দেখা হবে। কেমন মানুষ কিছুই জানে না গীতা। যদি কিছু মনে করেন। আগের দিন সুবলের মুখে যখন শুনেছে, মা আসবেন, মায়ের সঙ্গে দেখা হবে, তখন থেকেই উদ্বেগে উত্তেজনায় মনে মনে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল।

সুবল বলেছিল—তুমি নার্ভাস হয়ে পড়েছ, আরে আমার মা সাদাসিধে ভাল মানুষ, তাকে খুশি করা খুব সোজা, তোমার কোন ভয় নেই—

—কি জানি, আমি তো সুন্দরী নই, যদি আমাকে পছন্দ না করেন—

—কে বলেছে সুন্দরী নও, তুমি তো আমার চোখে বিশ্ব-শ্রী—

—যাও, ফাজলামি করতে হবে না। এই অসভ্য, সব সময় খালি—একটু সরে বসেছিল গীতা, সুবলের অবাধ্য হাত দুখানি সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মন থেকে ভয় ভয় ভাবটা পুরোপুরি সরাতে পারেনি। ভরসা দিয়ে বলেছিল সুবল—আরে, আমি যে নিজে পছন্দমত বিয়ে করে সংসারী হয়েছি, এতেই দেখবে মা মহাখুশি, আমার মাকে তো আমি চিনি—

এখন আবার সেইরকম কথাই বললো—তুমি যে এত ফল মিষ্টি কিনছ, মা এর কিছু মুখে দেবেন না, আমার মাকে তো আমি চিনি—

—কেন মুখে দেবেন না কেন? গীতা যেন হতাশ হল।

—মা পথে বেরোলে কিছু খেতে চান না, এই যে চাঁদপুর থেকে এতটা পথ আসবেন, যাতায়াতে ধরো দুটো দিন, এর মধ্যে এক ডাবের জল ছাড়া আর কিছুই মুখে দেবেন না, উপোস দিতে মা দারুণ ওস্তাদ—বলতে বলতে একটু হাসল সুবল—আজকাল যে কথায় কথায় এত অনশন ধর্মঘট চলে, মাকে এনে এদের সঙ্গে বসিয়ে দিলে অনায়াসে মা হাঙ্গার স্ট্রাইক চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন—

গীতাও হাসল—তা হলে কি করব, নেব না, আপেলগুলি কিন্তু বেশ বড় বড় ছিল—

—নাও কিনে, তোমার যখন এত ইচ্ছে, অঞ্জু আসার কথা আছে, যদি আসে খেতে পারবে—

এক জোড়া আপেল কেনা হল। সুবলের দু হাতে আর কুলোচ্ছে না। গীতার হাতে একটা প্লাস্টিকের বালতি-ব্যাগ ছিল। তার মধ্যে মায়ের জন্য প্রণামীর কাপড, শাদা থান। তাছাড়া এক বোতল গঙ্গাজল, খানিকটা গঙ্গামাটি, কালীঘাটের পট, শালপাতায় মোড়া আশীর্বাদী ফুল, প্রসাদ। এগুলি সব মায়ের ফরমাশ।

সুবল বললো—ওই ব্যাগটা দাও, আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি—

আপত্তি করলো গীতা—নোংরা ফলের ঠোঙার সঙ্গে কালীবাড়ীর প্রসাদ রেখো না—

—আরে ফলের আবার নোংরা কি, ঠোঙার কাগজটা ফেলে দিচ্ছি, এত জিনিস হাতে নেয়া যায় নাকি—বলতে বলতে ব্যাগের মধ্যে আপেল কটা সাজিয়ে রাখল সুবল। সন্দেশের বাক্সটা পাঞ্জাবির পকেটে নিল। পানওয়ালা আরেক খিলি পান সেজে ফেলেছে। গীতা কিন্তু রাজি হল না। অগত্যা সুবলকেই নিতে হল। নেবার আগে বললো—মিষ্টি মশলা সব বাদ দাও, শুধু সুপুরি এলাচ জর্দা—

—তুমি খুব জর্দা খাচ্ছ আজকাল, দাঁতগুলি সব কালো হয়ে গেল—

গীতার অনুযোগের উত্তরে বললো—আমার তো আর কোন নেশা নেই, বিড়ি সিগারেট নস্যি কিছুর উপর লোভ নেই, এই একটি মাত্র শখ, তবে হ্যাঁ, আর একটি জিনিসের উপর লোভ আছে বলতে পারো—চোখের ইঙ্গিত করে হাসল।

একটু লাল হল গীতা—এই অসভ্য, চুপ করো—

—প্লাটফর্মে পাশাপাশি ঢুকল দুজনে। সুবলের বাঁ হাতে বালতি-ব্যাগ ডান হাতে পানের বোঁটায় চুন। সাদা পায়জামা, গেরুয়া পাঞ্জাবি কাঁধে ভাঁজ করা এণ্ডির চাদর। গীতার হাতে বাটিকের কাজ করা চামড়ার ব্যাগ, ছিমছাম ছাপা শাড়ি। মাথায়

আঁটোসাটো মস্ত একটা খোঁপা আছে বটে, কিন্তু আঁচলটা সেখানে থাকছে না। খসে খসে পড়ছে। মাস তিনেক আগেও বেণী দুলিয়ে কলেজে যেতো। মাথায় আঁচল রাখার অভ্যাসটা এখনো রপ্ত হয়নি।

কাল রাত্তিরে বলেছিল সুবল—তুমি মাথায় আঁচলটা রেখো, পায়ের ধুলোটুলো নিও, আর দেখো গঙ্গাজল গঙ্গামাটি পেলেই মা খুব খুশি হয়ে যাবে, কলকাতার কলেজে পড়া মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণা বদলে যাবে—

—মায়ের বুঝি কলেজে পড়া মেয়েদের সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই—

—ভাল মন্দ কোন ধারণা নেই, তবে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব থাকাটা অসম্ভব নয়, চিরকাল গ্রামের বাড়িতে কেটেছে, আমার বউদিরা কেউ কলেজে পড়েনি। তা ছাড়া ভাল:বসে বিয়ে আমাদের বংশে আমিই প্রথম করলুম কিনা—সুবলের চোখেমুখে চাপা গর্বের হাসি।

গীতা কিন্তু স্বস্তিবোধ করেনি। আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে আবার বলেছিল সুবল —তোমার ভাবনার কিছু নেই, কারো চালচলনে খুঁত ধরার অভ্যেস নেই মায়ের, তা ছাড়া মা তো আর আমাদের সঙ্গে থাকতে আসছেন না, তোমার মুখ দেখে ওখান থেকেই ফিরে যাবেন।

এই অদ্ভুত খবরটা শুনে অবাক হয়েছিল গীতা—সে কি, উনি আমাদের সঙ্গে আসবেন না, এখানে এসে থাকবেন না ?

—আমাদের দেশের বাড়িতে তিন পুরুষের ঠাকুর প্রতিষ্ঠা আছে, তুমি তো শুনেছো, রাধামাধবের যুগল মূর্তি, তার নিত্যপূজার ভার মায়ের উপর, রোজ মা নিজের হাতে ঠাকুরের ভোগ রান্না করবেন, তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না, ঠিক মানুষের মত সেবা করেন মা, সকালবেলা ঠাকুরের মুখ ধোয়ানো থেকে শুরু করে রাত্তিরে পরিপাটি বিছানায় পাখার বাতাস দিয়ে মশারি ফেলা পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ মা নিজের হাতে নিখুঁতভাবে করবেন, এ আমার জ্ঞান-বয়স থেকে দেখে আসছি। ওই ঠাকুর ছেড়ে মা কোথাও গিয়ে একটা দিনও থাকতে পারেন না, থাকতে চানও না। ছোটবেলায় দেখেছি জন্মাষ্টমীতে, রাস পূর্ণিমায় আমাদের বাড়িতে খুব ধুমধাম হ ত, এখন অবশ্য তেমন কিছু হয় না—

এখন শেয়ালদা স্টেশনে অসম্ভব ভিড়ের সামনে প্রায় অসহায় সুবল। গীতাও বিমূঢ়। চার নম্বর প্লাটফর্মে বনগাঁ লোকাল দাঁড়িয়ে আছে। ছাড়বে তিনটে সতেরোয়। স্টেশনের মস্ত ঘড়িটায় তিনটে বেজে পাঁচ। সুবলের হাতঘড়ি মিনিট তিনেক এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভিড় ঠেলে কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারছে না সুবল।

এইমাত্র একটা গাড়ি এসে দু নম্বরে দাঁড়াল আর সঙ্গে সঙ্গেই একরাশ মানুষ যেন উগরে দিল। পিল পিল করে মানুষ ছুটছে। একদল আসছে, একদল যাচ্ছে। একটু একটু করে যেতে যেতে বললো সুবল—অবস্থা দেখেছো। আজ যে শনিবার আমার খেয়াল ছিল না, অন্যদিন এ গাড়িটায় এত ভিড় থাকে না। বনগাঁ লোকালের প্রতিটি কামরায় ঠাসাঠাসি লোক, প্রতিটি দরজার মুখে দলা পাকানো মানুষের দঙ্গল। সুবল জিজ্ঞেস করলো—এই ভিড়ে উঠতে পারবে—

—অসম্ভব—মাথা নাড়লো গীতা।

—চলো তোমাকে বরং মেয়েদের কামরায় তুলে দিই, ওখানে অন্তত দাঁড়াবার জায়গা পাবে—

—আর তুমি—

—আমি দেখি দরজার মুখে পা রাখার জায়গা যদি পাই, দমদম জংশনে হয়তো ভেতরে ঢুকতে পারব—

—না, ওভাবে ঝুলে যেতে হবে না—

—তা হলে কি করবো?

—পরের গাড়িতে চলো—

—পরের গাড়ি এক ঘণ্টা পরে, তখন আরো ভিড় হবে—

—আমি কিন্তু মেয়েদের গাড়িতে উঠবো না, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো—

—কি করে থাকবে, অবস্থা দেখছো না—সুবলের গলায় বেশ ঝাঁঝ।

—ফার্স্ট ক্লাসে চলো, ওখানে ভিড় কম—অম্লান মুখেই বললো গীতা।

—ফার্স্ট ক্লাস!—নাকমুখ কুঁচকে তাকাল সুবল—তিনগুণ ভাড়া, তোমার তো বলতে আর গায়ে লাগলো না—

মুখভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল গীতা। হাসিমুখে বললো—তুমি আজকাল এত খিটখিট করো কেন, বিয়ের আগে তো এমন করতে না, তখন দেখতুম ট্যাকসি করে নিয়ে যাবার জন্য কত সাধাসাধি, তখন তো এত টাকার হিসেব করতে না—

অপ্রতিভ মুখে সামান্য হাসল সুবল, নিরুপায়ের মত বললো—চলো ফার্স্ট ক্লাসেই উঠি—

ফার্স্ট ক্লাসের দরজার সামনে কালো কোট, কাঁচা পাকা চুল, চশমা চোখে গোলগাল গম্ভীর মুখ চেকারবাবু অনধিকারীদের ভিড় ঠেকাচ্ছেন—আগে যান, আগে যান, এটা ফার্স্ট ক্লাস—

বাড়তি ভাড়া দিয়ে রসিদ নিল সুবল। মোটামুটি ফাঁকা কামরা। দু চারজন

বসে আছেন এদিক-ওদিক। জানালার পাশে বসার জায়গা পেল গীতা। বসতে বসতে বললো—এমা, গদি ছেঁড়া—

—গদি যে আছে এই যথেষ্ট, মাথার উপর তাকিয়ে দেখো একটাও পাখা নেই—সুবলের কথামত উপরে একবার তাকাল গীতা। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে বললো—ছিঃ, কি সব লেখা—

কাঠ কয়লার আকাবাঁকা অক্ষরে কয়েকটি অশ্লীল শব্দ। তার পাশেই আবার লাল হরফে বিপ্লবের বুলি। জয় আমাদের হবেই, বিপ্লব জিন্দাবাদ, লাল সেলাম—ইত্যাদি।

সুবল মন্তব্য করল—এ আর কি দেখলে, এর চেয়েও কত খারাপ কথা লেখা থাকে, এর নাম দেয়াল-সাহিত্য, ইদানীং আবার পাশাপাশি বিপ্লবের বাণীও লেখা হচ্ছে, স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে কলকাতার বড় রাস্তার পাশে কোন বাড়ির নতুন চুনকাম করা দেয়াল আর পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় নেই, দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লব হচ্ছে—

ততক্ষণে গদি ছেঁড়া আসন সব ভর্তি হয়ে গেছে। দু চারজন জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

—জানলার ধারে গীতা, পাশে সুবল। বালতি-ব্যাগটা মাথার উপর তুলে রেখেছে।

টঙটঙ করে গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা বাজল। বাঁশির শব্দ হল। চশমা চোখে কালো কোট গম্ভীর মুখে কয়েক পা যেতে না যেতেই হুড়মুড় করে একদল ছেলে উঠে পড়ল। কাছাকাছি এদিক-ওদিক দাঁড়িয়েছিল ছেলেগুলি। এখন ছুটে ছুটে এসে উঠতে লাগল। টুকরো টুকরো কথা শোনা যাচ্ছিল।

—এই উঠিস না, এটা ফার্স্ট ক্লাস, মামা দেখছে—

—দেখুক, তুই উঠে আয়—

—মামা ধরবে—

—আসুক না শালা, টেঙরি খুলে নেব—

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। শেষ মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে আরো অনেকে উঠল। দেখতে দেখতে ঠাসাঠাসি ভিড় দাঁড়িয়ে গেল। চাপা গলায় জানতে চাইল গীতা—ছেলেগুলি মামা বলছে কাকে ?

—টিকিট চেকার, এ লাইনের সরকারী মামা, ছেলেরা ওই নামে ডাকে—সুবলের জবাব শুনে মুখ টিপে একটু হাসল গীতা। আবার জিজ্ঞেস করল—এদের কি টিকিট আছে ?

ভিড়ের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আস্তে আস্তে বললো সুবল—ওসব কথা আর জিজ্ঞেস করো না, আমরা যে টিকিট কেটে বসে যেতে পারছি, এই আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য—

গাড়ির চাকায় চাকায় তখন নানা শব্দের ছন্দ। নারকেলডাঙ্গা শেড, বেলেঘাটার খাল পেরোবার পর গতি বাড়ল। উল্টাডাঙ্গার কাছাকাছি উঁচু উঁচু বাড়িগুলির মাথায় শেষ বেলার রোদ।

বাইরের দিকে তাকিয়েছিল গীতা। সামান্য সময় চুপচাপ থেকে আবার বললো সুবল—কি বলছিলে তখন, আমি আজকাল টাকা পয়সার খুব হিসেব করি, খরচপত্তর নিয়ে খিচখিচ করি—

—তা তো করই—হাসিমুখে এক পলক তাকাল গীতা; তারপর জানালায় চোখ রাখল।

—সে কি আর এমনি করি, কাল টিউবওয়েলের মিস্ত্রি আসবে, টাকা দিতে হবে, এদিকে রান্নাঘরটা বর্ষার আগেই পাকা না করলে তোমারই অসুবিধে হবে, এখনো অনেক কাজ বাকি, অথচ চতুর্দিকে ধার জমে যাচ্ছে।

নতুন বাড়ি তুলছে সুবল। যাদবপুরের এক বাস্তুহারা কলোনীর একপাশে কাঠা তিনেক জমির উপর একতলা ছোট ছিমছাম বাড়ি। গত এক বছর ধরে আস্তে আস্তে বাড়ি উঠছে। এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। এর জন্য কম ঝামেলা পোয়াতে হয় না। কোথায় ইঁট, কোথায় চুন, কোথায় সুরকি, কোথায় কাঠের মিস্ত্রি। স্কুলের চাকরি বজায় রেখে তু'বেলা টিউশনি করে সবদিকে ছুটে ছুটে একা এসব সামলাতে হয় সুবলের। মুখ টিপে হেসে বললো গীতা—বাড়ির ভাবনায় তোমার মাথার চুল সব উঠে গেল, কদিন পরে চকচকে টাক পড়ে যাবে।

—বাড়ির ভাবনায় নয়, তোমাকে তো বলেছি, এখানকার জলটা আমার সহ্য হচ্ছে না, পেটের গণ্ডগোল লেগেই আছে, চাঁদপুরে গিয়ে তিনটি মাস থাকতে পারলে আমার শরীর ভাল হয়ে যেত, কিন্তু তা তো হবার উপায় নেই—যেন একটা বিষণ্ন স্মৃতির মধ্যে থেমে গেল সুবল।

গাড়ি দমদম জংশন ছাড়াল। ঘটাং ঘটাং শব্দে লাইন বদল করতে করতে এবার ডানদিকে মোড় নিল। গীতা জিজ্ঞেস করল—ওই লাইনটা কোনদিকে গেছে—

—ওটা মেন লাইন—জবাব দিল সুবল—নৈহাটি-রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর হয়ে একেবারে বহরমপুর লালগোলা, আর আমরা যাচ্ছি বনগাঁর দিকে। আগে এই লাইনে সোজা খুলনা যাওয়া যেত, এখন শুধু বনগাঁ পর্যন্ত—

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর যেন স্মৃতির ভেতর থেকে কথা বললো স্ববল—পাঁচ বছর আগে যখন পাকাপাকি এদেশে চলে এলুম, তখনও এই পথে এসেছিলুম, তারপর সেই হঠাৎ যুদ্ধের সময় থেকে এই পথটা বন্ধ হয়ে গেছে। ভেবেছিলুম দেশের জমি-জায়গা বিক্রি করে, বিনিময় করে আস্তে আস্তে সবাইকে নিয়ে আসব, দাদা আমাদের ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে এখানে এসে নতুন করে শুরু করবেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি তুলবেন, আমায় এসব ঝামেলা পোয়াতে হবে না, কিন্তু হঠাৎ সেই বাইশ দিনের যুদ্ধে সব বানচাল হয়ে গেল। তারপর ভেবে দেখ গীতু, এই পাঁচটা বছর এখানে আমি সম্পূর্ণ একা, কাউকে চিনি না, কোন আত্মীয় নয়, বান্ধব নেই, একটা পরিচিত মুখ চোখে পড়ে না, কলকাতার পথঘাটও ভাল জানা নেই, কার কাছে যাব, কোথায় দাঁড়াব কিছুই ঠিক নেই, আমার সঙ্গে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকখানা সার্টিফিকেট ছাড়া আর কোন সম্বল নেই, কোন পরিচয়পত্র নেই। তারপর তোমাদের বাড়িতে টিউশনি পেলুম, তোমার সঙ্গে আলাপ হ'ল, আমি যেন একটা আশ্রয় পেলুম, তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা হ'ল, আমার সহায়-সম্বল বাড়ল—বলতে বলতে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল স্ববল।

গাড়ি ছুটছে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি ছাড়িয়ে গেল। ভিড়ের চেহারা কিছু বদল হয়েছে। তখনও যেন একটা গভীর স্মৃতির মধ্যে ডুবে রয়েছে স্ববল। বেশী-ক্ষণ কিন্তু চুপচাপ গম্ভীর থাকা গীতার স্বভাবে নেই। সহজ হবার জন্য ঠাট্টার স্বরে বললো—তোমাদের বন্ধু জীবনবাবু বলেন, তোমার ঐ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের কোন দাম নেই, তোমার নাকি উচিত, আবার স্কুল ফাইনাল থেকে শুরু করা।

আরে জীবন বোসের কথা বাদ দাও—হাত নেড়ে জবাব দিল স্ববল—আমরা ডক্টর শহীদুল্লার ছাত্র ছিলুম, ওরকম একজন অধ্যাপকের কাছে পড়ার সৌভাগ্য হয় ক'জনের, বাজে কথা বললে তো হবে না, ঢাকার সিলেবাসে বাংলায় এম-এ পরীক্ষা দিতে হলে জীবনের ইয়ে ফেটে যেত।

এই—মুখ খারাপ করবে না—স্ববলের হাতে চিমটি কাটল গীতা। তারপর চাপা হাসির স্বরে বললো—তুমি নাকি কিচ্ছু জানো না, কিছুই পড়াতে পারো না—

—জীবন বুঝি বলেছে—স্ববল গজ গজ করে জবাব দিল—পড়াতে না পারলে অতবড় স্কুলে চাকরি পেয়েছি এমনি—

—চাকরি পেয়েছো খাতিরের জোরে, তোমাদের রাখালদা'র খোশামোদ করেছো,

সেক্রেটারী মন্টবাবুর বাড়িতে দু' বেলা ধর্ণা দিয়েছ—বলতে বলতে মুখে আঁচল তুলে হাসি চাপলো গীতা।

—জীবন বুঝি বলেছে এই সব কথা, ওকে আর আমি বাড়িতেই ঢুকতে দেবো না—হাত নেড়ে বললো সুবল—জীবনের আর বলতে অসুবিধেটা কি, মামা-বাড়ির তিনতলায় তোফা আরামে থাকে, গায়ে আঁচটি লাগে না, কাজের মধ্যে দেখি টিচার্সরুমে বসে যত রাজ্যের রাজনীতি নিয়ে কুতর্ক করে, আমার মত স্ট্রাগল করতে হলে বাবাজীবনের লাল সুতো বেরিয়ে যেত—

মুখে আঁচল তুলে খুকখুক করে হাসল গীতা। হাসি চাপার চেষ্টায় ফর্সা মুখশ্রী রক্তিম হয়ে উঠল। জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসি লুকোতে হল। আশেপাশের লোকেরা কি ভাবছে কে জানে।

সুবল হঠাৎ ডাক দিল—এই পান, এদিকে—

ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। হরেকরকম ফেরিওয়ালার ডাকাডাকি। কৃত্রিম ওষুধ থেকে সুগন্ধি চন্দন ধূপ কিংবা দাঁতের মাজন থেকে শনির পাঁচালী পর্যন্ত গৃহস্থের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সব নিত্যযাত্রীদের সুবিধার্থে নামমাত্র মূল্যে বিকিয়ে যাচ্ছে। বিচিত্র কণ্ঠে বিভিন্ন দ্রব্যের গুণকীর্তন শুনতে শুনতে আবার হাসি পাচ্ছিল গীতার।

প্রায় বালক বয়সের এক পানওয়ালা এসে সামনে দাঁড়াল। বুকের সামনে ঝোলানো একটা টিনের বাক্স। খোপে খোপে নানা মসলা, মৌরী, সুপুরী, চুন, খয়ের ভেজা ন্যাকড়ায় পান পাতা, সিগারেটের প্যাকেট, বিড়ির বাণ্ডিল, দেশলাইয়ের বাক্স। ওইটুকু জায়গার মধ্যে কেমন নিপুণভাবে গুছিয়ে নিয়েছে। পরিপাটি সাজানো গোছানো কিছু দেখলেই ভাল লাগে গীতার। সারাদিন একা একা সে নিজেও ওই করে। সব সময় দু'জনের সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চায়। আলনা গোছায়, টেবিল সাজায়। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বসবার আর শোবার ঘর দু'খানি, সামনে পিছনের বারান্দা দিনের মধ্যে দু' তিনবার ধোয়ামোছা করে। সুবল ফরমায়েশ করল—সুপুরি এলাচ দিয়ে জর্দা পান লাগাও—

—তুমি আবার পান খাচ্ছ, এইতো খেলে একটু আগে—

—বাজে কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, এখন এক খিলি না খেলে আর চলবে না—

—এটা কোন্ স্টেশন—

—হৃদয়পুর, এর পর বারাসাত—

—বেশ সুন্দর নাম তো, হৃদয়পুর,—বারকয়েক বিড়বিড় করে নামটি আওড়াল গীতা। জানালায় মুখ ঠেকিয়ে পরিপূর্ণ চোখে বাইরে তাকাল। প্লাটফর্মের উলটো দিকে লাইনের কাছেই একটা পুকুর। তালগাছের গুঁড়ি ফেলা ঘাট। ঘাটের পাশে একজোড়া পাতিহাঁস মধ্যে মধ্যে জলে মুখ ডুবিয়ে কি যেন খুঁজে খুঁজে ঘুরছে। লাইনের ধারে এক রাশ আকন্দের ঝোপ। পুকুরের পাশে গেরস্থ বাড়ির মাটির ঘর। ওপারে মস্ত একটা বাঁশঝাড় ঘিরে নিবিড় বন। বাঁশঝাড়ের মাথায় শেষবেলার নরম রোদ। পুকুরের ঢালু জমিতে জলের কিনারা ঘেঁষে একটা সাদা বক পা টিপে টিপে চলাফেরা করছিল।

কয়েক মুহূর্তের বেশী দেখার সুযোগ হ'ল না। গাড়ি আবার ছুটল। বাইরের চলমান দৃশ্যাবলী প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছিল। এর পরেই মস্ত মাঠ। মাঠের মধ্যে খাপছাড়াভাবে ছোট ছোট পাকা বাড়ি উঠছে। একদল লোক বোধ হয় এই ট্রেন থেকেই নেমেছে, ওই বিশাল মাঠের উপর দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। লোকগুলির মাথার উপর অনেকদূর পর্যন্ত অপরাহ্নের আকাশে কমলা রঙের রোদ। বিকেলের সূর্য গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

গীতা জিজ্ঞেস করল—আমরা কখন পৌছব—

—সাড়ে পাঁচটা হবে বোধ হয়—হাতঘড়ি দেখে জবাব দিল সুবল।

—চাঁদপুর থেকে মা আসবেন কার সঙ্গে?

—আমার বন্ধু জিয়াউল নিয়ে আসবে—যেন একটা তৃপ্তি আর স্বস্তির সঙ্গে বললো সুবল, জিয়াউল ইসলাম আমার ছোটবেলার বন্ধু, ক্লাস ওয়ান থেকে এম-এ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি, ও পড়েছে ইতিহাস নিয়ে আর আমার বাংলা, ও থাকত সলিমুল্লা হলে, আমি ছিলুম জগন্নাথ হলে। তোমাকে বোঝাতে পারবো না গীতু, সে সব দিনগুলি কি চমৎকার কাটিয়েছি—

—সলিমুল্লা হল, জগন্নাথ হল কি?

গীতার কথার জবাবে বললো সুবল—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বোর্ডিং-এর নাম, হিন্দু ছেলেদের জগন্নাথ হল, মুসলমানদের সলিমুল্লা হল, আর মেয়েদের উইমেনস্ হল—

গাড়ি বারাসাত জংশন ছাড়ল। আবার শুরু করল সুবল—জিয়াউলের খুব ইচ্ছে ছিল আমার বিয়েতে বরযাত্রী যায়, ওর বিয়েতে আমি গিয়েছিলুম, কলেজে পড়তে পড়তেই ওর বিয়ে হয়েছিল, আমরা নৌকো করে গিয়েছিলুম, চাঁদপুরের পাশে মেঘনা—যেন একটা দূরের দৃশ্য দেখতে দেখতে কথা বলছে সুবল—কত দিন, কত

রাত মেঘনায় নৌকো নিয়ে ঘুরেছি, আমি আর জিয়াউল দুজনেই ভালো নৌকো বাইতে পারি, জ্যোৎস্না রাত্রে মেঘনার বুকে সে যে কি অপূর্ব তোমাকে বোঝাতে পারবো না—

—তুমি আবার নৌকো বাইতে পারো নাকি, বিশ্বাস করি না—মুখ টিপে হাসল গীতা।

—তুমি তো আমার কোন কথাই বিশ্বাস করো না, তোমার কাছে সব সত্যি কথা বলে এক জীবন বোস। আবার কুলকুল করে হেসে উঠল গীতা। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ সুবল।

বামনগাছি, দত্তপুকুর চলে গেল। ভিড় অনেক পাতলা হয়েছে। এখন বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়। কাছাকাছি কেউ নেই। গীতার কানের কাছে মুখ নিয়ে গুন্‌গুন্‌ করে বললো সুবল—জিয়াউলের খুব ইচ্ছে ছিল তোমাকে দেখতে আসে—

—উনিও আসবেন নাকি? সামান্য মুখ ফিরিয়ে সুবলের চোখে চোখ রাখল গীতা।

—আসবে কি করে, যাতায়াতে এক কাঁড়ি টাকা খরচ, আমার ইচ্ছে ছিল টাকাটা আমি দিয়ে দেব, কিন্তু এখন হাত টানাটানি, এই যে মা আর অঞ্জু আসবে, এর জন্যে সামন্ত মশাইয়ের হাতে দুশোটি টাকা ধরে নিতে হবে—

—সামন্তমশাই কে?

—পারাপারের দালাল, উনি মাকে নিয়ে আসবেন, আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার ওপারে জিয়াউলের জিম্মায় পৌঁছে দেবেন—প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছিল সুবল—স্টেশনে সামন্ত মশাই আমাদের নিতে আসবেন—

বনগাঁ প্লাটফর্মে যখন গাড়ি দাঁড়াল, তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচ। হেমন্তের ছোট দিন ফুরিয়ে যাচ্ছিল।

মোটাসোটা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। নমস্কার করে বললেন—এই যে মাস্টারমশাই, এসে গেছেন, বউমা বুঝি, বেশ বেশ, নমস্কার নমস্কার—

আধময়লা সাদা হাফশার্ট, রুপোর বোতাম। ধুতি, পাম্পশু, বাদামী রঙের মাফলার। গলার আওয়াজ ভারী, ভাঙা ভাঙা। কাঁচা পাকা চুলের মাঝ বরাবর লম্বা সিঁথি। ভদ্রলোকের গায়ের রঙটি দেখবার মত। দেখেই মনে হল গীতার, টেলিফোন রিসিভারের মত কালো এবং উপমাটি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক হাসি পেল। মাথায় আঁচল তুলে মুখ নিচু করে সামলে নিল।

সুবল বললো—এই যে গীতা, ইনি সামন্তমশাই—

ছোট একটা নমস্কার করল গীতা আবার চোখ নামাল। চবরচবর ক'রে পান চিবুচ্ছেন ভদ্রলোক।

পকেট থেকে ডিবে বার করে সুবলকে লক্ষ্য করে বললেন—চলবে নাকি এক খিলি—

একটু ইতি-উতি করে একটা খিলি নিল সুবল। বউ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু-কিন্তু ভাবে হাসল। সামান্য ভুরু কোঁচকাল গীতা। আরেক পকেট থেকে সোনালী রঙের চকচকে সিগারেট কেস বার করলেন সামন্ত মশাই। গীতা অবাক হয়ে দেখল তার ভেতরে পরিপাটি সাজানো এক বাণ্ডিল বিড়ি। সুবলের সামনে ধরে বললেন—এ জিনিস চলবে—

আবার হাসি পেল গীতার। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

হাত জোড় করে বললো সুবল—না দাদা, আমার ওসব চলে না—

একটি বিড়ি ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন সামন্তমশাই—আপনারা হলেন কলকাতার বাবু, এসব বিড়ি-টিড়ি কি আপনাদের পোষায়—

—আজ্ঞে না দাদা, বিড়ি সিগারেট কোন নেশাই নেই আমার, শুধু এই জর্দা পান—

—তা' জর্দা নেবেন নাকি, নিন না—এবার পকেট থেকে বেরোল জর্দার কৌটো।

গীতা ভাবছিল, ভদ্রলোকের দুই পকেটে আরো কি কি আছে, কে জানে। বুক পকেটে ভারী একটা নোট বই, দুটি কলম। যেরকম উঁচু হয়ে আছে, তাতে মনে হয় ভেতরের পকেটে নিশ্চয়ই কিছু কাগজপত্তর রয়েছে। বোধ হয় পাঁচ দশ টাকার নোটের তাড়া।

আগে আগে যেতে যেতে বললেন সামন্তমশাই—আসুন, রিকশা ঠিক করে রেখেছি—

প্লাটফর্মের বাইরে এসে হাঁক দিলেন—এই হরেরাম, হরেরাম, এদিকে আয়—

সাইকেল রিকশা ঠুন ঠুন করে সামনে এলো। হরেরাম। বাইশ-তেইশ বছরের পাকানো শরীর, মুখময় বসন্তের দাগ। সুবলকে লক্ষ্য করে বললেন সামন্তমশাই—একে তিনটে টাকা দেবেন—

টাকা বার করতে যাচ্ছিল সুবল। বাধা দিয়ে আবার বললেন সামন্তমশাই—এখন নয়, ও আপনাদের ফেরার ট্রেন ধরিয়ে দেবে, তখন দেবেন, খুব বিশ্বাসী লোক। আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না—

ওরা দুজনেই এবার হরেরামের আপাদমস্তক দেখে নিল। ক্যাম্বিসের জুতোর সঙ্গে হাঁটু পর্যন্ত সবুজ রঙের মোজা। খাকি হাফ প্যান্ট। ছাই-ছাই রঙের একটা সুতির কোটের দু'তিন জায়গায় দু'তিন রঙের তালি। মাথায় মাংকি ক্যাপ। হরেরামের রিকশায় চাপল দু'জনে। পাশে পাশে সাইকেলের সোয়ার হলেন সামন্তমশাই। শহরের দোকানপাট পেছনে পড়ে রইল। তারপর শহরতলি। টিন টালি আর মাটির ঘরের গেরস্থ বাড়ি। বস্তির চালাঘরের মাথায় মাথায় ধোঁয়ার পুঁটুলি। এদিকটায় বেশ শীত শীত শুরু হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় এখনো তেমন ঠাণ্ডা পড়েনি। সুবল জিজ্ঞেস করল—এই রাস্তাটার নাম জানো—

মাথা নাড়ল গীতা।

—যশোর রোড।

সুবলের কথা শুনে সামনের দিকে তাকাল গীতা। কালো পিচের রাস্তাটা সোজা সামনে যেতে যেতে সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। দুই পাশে বড় বড় গাছ—শিমুল, শিরীষ, সেগুন, মেহগিনী। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল গীতা—এই রাস্তাটা কি যশোর পর্যন্ত গেছে ?

—হ্যাঁ বউমা—এবার জবাব দিলেন সামন্ত মশাই। পাশে পাশে যাচ্ছিলেন তিনি—শুধু যশোর নয় একেবারে খুলনা পর্যন্ত, আমাদের দেশেও এই পথে যাওয়া যেত। স্টেশনের নাম ফুলতলা, দৌলতপুরের কাছে, ইংরেজ আমলে যুদ্ধের সময় আমি যখন মিলিটারী কনট্রাক্টের কাজ করতুম, তখন এই পথে হরদম যাওয়া আসা করেছি। এখন আর সোজাসুজি যাবার উপায় নেই। মাইলখানেক দূরেই বর্ডারের চেক-পোস্ট, আমরা এবার ডানদিকে যাব—

বলতে বলতে জোরে প্যাডেল করে সামান্য সামনে গেলেন সামন্তমশাই। তারপর ডানদিকে ঘুরে একটা মাটির রাস্তা ধরলেন। পেছন পেছন হরেরামের রিকশাও ঘুরল। এবার দুপাশে খোলা মাঠ, ফসলের ক্ষেত। মাঠের মধ্যে দু'চারটে হাড়সার ঝাঁকড়া-মাথা খেজুর গাছ। রাস্তার পাশে আকন্দের ঝোপ, দু একটা রোগা চেহারার বাবলা গাছ, কুল গাছ। মেটে মেটে জ্যোৎস্না ফুটেছে। দূরে দূরে দু একটা আলো। গীতার কেমন গা ছমছম করে উঠল। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল—আমরা কোথায় যাচ্ছি—

—আমিও ঠিক জানি না, বোধ হয় সামন্তমশাইয়ের বাড়ি, তোমার ভয় করছে নাকি—বলতে বলতে গীতার হাতখানি ধরল সুবল—ভয় কি, আমি তো তোমার সঙ্গে রয়েছি—

সুবলের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল গীতা। মাটির রাস্তায় দুলতে দুলতে যাচ্ছিল রিকশাটা।

এক মুহূর্তে মনে হল গীতার, যেন পালকি চেপে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে।

পরক্ষণেই সুবলের গলা শুনল—ওই ছাখো—

মুখ তুলে তাকাল গীতা। হাত দিয়ে বাঁ দিকটা দেখিয়ে বললো সুবল—ওই মাঠের ওপারে পাকিস্তান, এখান থেকে বোধ হয় সিকি মাইলও হবে না।

অল্প অল্প কুয়াশাময় আবছায়া অন্ধকার মাঠের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল গীতা।

ওই মাঠের ওপারে, দিগন্তলীন অন্ধকারের ওপাশে আরেকটা বাংলা দেশ। যেখান থেকে মা আসবেন। মাটির রাস্তায় মিনিট দশেক চলার পর একটা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকল হরেরাম। আগে আগে সামন্তমশাই। তেমন বড় গ্রাম নয়। কয়েক ঘর মানুষের বস্তি। দু'চারটে দোকান। পুকুর, বাঁশবাগান, বটগাছ।

রাস্তার পাশে একটা টিনের ঘরের সামনে দাঁড়াল রিকশা।

সামন্তমশাই ঘরের তালা খুলে ডাক দিলেন—আসুন সুবলবাবু—তারপর কাকে যেন উঁচু গলায় ডাকলেন—ওরে ও ফুলি, এ-ঘরে একটা আলোটালো কিছু দিয়ে যা—

টিনের ঘর হলেও মেজেটা পাকা। বেশ চওড়া বারান্দা। বারান্দায় এসে উঠল গীতা।

হরেরাম রিকশা ঘুরিয়ে খানিকদূরের একটা চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বারান্দা থেকেই আবার হাঁক দিলেন সামন্তমশাই—ওরে হরেরাম, নিকুঞ্জকে বল, দু' কাপ চা পাঠিয়ে দিতে—

—আরে না না—আপত্তির সুরে বললে সুবল—আবার এসব করছেন কেন—

—একটু চা খান, কতক্ষণ বসতে হবে কে জানে, তাছাড়া ঠাণ্ডাটাও পড়েছে বেশ—

—দাদা, ফেরার ট্রেন পাব তো, এই শীতের রাতে সঙ্গে নতুন বউ, ডোবাবেন না—

—না, না, ট্রেন ঠিক পেয়ে যাবেন—আশ্বাসের সুরে সামন্তমশাই বলেন—নিতান্ত না পেলে, আমরা আছি কি জন্যে, না হয় গরীবের ঘরে একটা রাত—

—না দাদা, বাড়ি খালি রেখে থাকতে পারবো না, আমাদের ফিরতেই হবে, মাঠের পাশে নতুন বাড়ি তুলেছি, চোরে সব ফাঁক করে দেবে—

ততক্ষণে তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ফ্রক পরা মেয়ে, নাম বোধ হয় ফুলি, একটা লণ্ঠন নিয়ে এল।

ঘরের ভেতর দু'খানি কাঠের চেয়ার, একটা টেবিল, মাদুর-পাতা তক্তাপোশ।

একখানা চেয়ার টেনে বসল গীতা। টেবিলের উপর লণ্ঠন জ্বলছে। বিষণ্ণ হলুদ আলো। টেবিলের নিচে, তক্তপোশের তলায়, আনাচে-কানাচে অন্ধকার। ওপাশে একটা কাঠের আলমারি। পাল্লার কাঁচ ভাঙা।

ভেতরে কিছু পুরনো বই, খবরের কাগজ। চায়ের দোকানের একটা ছেলে এক কাপ চা রেখে গেল।

এক চুমুক মুখে নিয়েই প্রায় আঁতকে উঠল গীতা। কেমন সোঁদা সোঁদা বিটকেল গন্ধ।

আরেক কাপ চা হাতে নিয়ে ভেতরে এল সুবল। হাসি হাসি মুখে বললো—চা খাও—

চোখ বড় বড় করে বললো গীতা—তুমি এই চা মুখে দিতে পারলে, বাড়িতে হলে তো ছুঁড়ে ফেলে দিতে—

—আরে অসময়ে যা পেয়েছি, বুঝলে না, এই ঠাণ্ডার মধ্যে পেটে যে গরম কিছু যাচ্ছে—

—কতক্ষণ বসে থাকতে হবে—

—ঠিক বলতে পারছি না, সামন্তমশাই তো গেলেন খোঁজ নিতে—

—শেষকালে ট্রেন ফেল হলে এখানে থাকতে হবে নাকি!

—অসম্ভব নয়, সামন্তমশাই তো বললেন, একটা রাত থাকতে—

—রক্ষে করো, এদের এই নোংরা বিছানায়, ম্যাগো—নাকমুখ কোঁচকাল গীতা—আমি বরং এই চেয়ারে বসে থাকবো সারারাত—

—আহা, আস্তে বলো, ওই সামন্তমশাই আসছেন বোধ হয়—আবার বাইরে গেল সুবল।

তারপর সামন্তমশাইয়ের সঙ্গে গুজগুজ করে কথা বলতে বলতে রাস্তায় নামল। কিছু সময় পরে দোকানের ছেলেটি এসে চায়ের কাপ নিয়ে গেল। আর এক চুমুকও মুখে দেয়নি গীতা। ঠায় বসে আছে।

সামনের রাস্তা দিয়ে একটা খড় বোঝাই গরুর গাড়ি চলে গেল। চারপাশ ক্রমশ কেমন চুপচাপ মনে হচ্ছিল। সারাদিনের ক্লান্তির পর বসে থাকতে থাকতে ঘুম পাচ্ছিল গীতার। পায়ের কাছে দু'একটা মশা পিন্‌পিন্ করছে। বার কয়েক হাই

তুলল। কিছুতেই আর চোখ খোলা রাখতে পারছে না। কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল। একটা পেঁচা ঘরের উপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

টেবিলের উপর মাথা রেখে কতক্ষণ তন্দ্রার মধ্যে ছিল খেয়াল নেই গীতার। হঠাৎ বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনে সোজা হয়ে বসল। পরক্ষণেই ভেতরে এসে হাসি মুখে খবর দিল সুবল—এই যে, মা এসে গেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল গীতা। সুবলের পেছনে ঘরে ঢুকলেন মা। পাতলা চেহারার ছোটখাটো মানুষটি। পরনে আধময়লা সাদা থান। অনেকটা পথ মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে হয়েছে

খালি পায়ে, পায়ের গোছে মাঠের ধুলো। মায়ের মুখে বয়সের রেখা, দীর্ঘ পথের শ্রান্তি।

হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি। টেবিলের উপর রাখলেন।

মাথায় আঁচল তুলে হাঁটু গেড়ে বসে পায়ের ধুলো নিল গীতা। পায়ের কাছে প্রণামীর জন্য নতুন থান ধুতিখানা রাখল। এই পরিপাটি প্রণামের ভঙ্গি দেখে আশ্বস্ত হল সুবল। মনে মনে তারিফও করল।

বেশ বুদ্ধিমতী, মাকে খুশি করতে পারবে। ততক্ষণে পুঁটুলি খুলে কয়েকটি ধান আর শুকনো দুর্বা বার করে গীতার মাথায় দিলেন মা। আক্ষেপের সুরে বিড়বিড় করে বললেন—আমার এমন কপাল, এইভাবে বউমার মুখ দেখতে হল, না একটা শাঁখের শব্দ, না একটু উলু—

—ওসব কথা ভুলে যাও—বললো সুবল—তোমাকে যে এনে দেখাতে পারলুম, এই আমার ভাগ্য। ওকি, তুমি কাঁদছ কেন, এত কষ্ট করে এখানে এলে কি কান্নাকাটি করার জন্যে?

মায়ের চোখে জল। সেকেলে গড়নের এক জোড়া মকরমুখী বালা বউ-এর হাতে পরিয়ে দিলেন।

গীতারও চোখ দুটি জ্বালা করে উঠল। চোখের জলে মায়ের মুখখানি ঝাপসা দেখাচ্ছে।

একহাতে ডাব আরেক হাতে ঝকঝকে একটা কাঁসার গেলাস নিয়ে দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন সামন্ত মশাই।

সুবল জিজ্ঞেস করল—দাদা, আপনি উলু দিতে পারেন—

গলার ভেতর থেকে ঘটিডোবার মতন গুবগুব শব্দ করে হাসলেন সামন্ত মশাই—আগে বলে রাখলে তেমন ব্যবস্থাও করা যেত—

গীতা তখন আঁচল দিয়ে মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছিল। একটা রুপোর সিঁদুরকৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে বউ-এর কপালে সিঁথিতে দিতে দিতে মা বললেন—রাধামাধবের পায়ে ছোয়ানো সিঁদুর, এটা তুমি যত্ন করে রেখো—

আবার মাকে প্রণাম করে হাত দুটি ধরে বললো গীতা—আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন—

—যাবার তো খুব ইচ্ছে বউমা, কিন্তু রাধামাধবকে ছেড়ে আমার কোথাও গিয়ে দু'দিন থাকার উপায় নেই, তাছাড়া তোমার ভাসুর রয়েছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে অতবড় সংসার, বড় বউমা একা সামলাতে পারবে না, ইচ্ছে তো ছিল সবাইকে নিয়ে আসবো, রাধামাধবকে তুলে এনে এখানে বসাবো, কিন্তু সে রকম কিছু ব্যবস্থা এখনো করা গেল না, দেখি ঠাকুরের যা ইচ্ছে—একটু সময় চুপ থেকে বললেন—এ যাত্রা শুধু অঞ্জুকে তোমার কাছে রেখে যাবো, এখানে স্কুলে পড়বে, ওকে দেখো, অঞ্জু কোথায়—

মায়ের কথা শুনে যেন খেয়াল হল সুবলের—আরে সত্যিই তো, এই অঞ্জন এদিকে আয়, ও বড্ড লাজুক ছেলে। বারান্দা থেকে সাত-আট বছরের রোগামত অঞ্জনের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল সুবল। হাফ-প্যান্ট হাফ শার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল, একমাথা কোঁকড়া চুল। জড়োসড়ো ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল।

—কাকিমাকে পেন্নাম করো—ঠাকুমার কথা মতো সামনে ঝুঁকল অঞ্জন। গীতা তাড়াতাড়ি কোলের কাছে টেনে নিল। একটা আপেল হাতে দিল।

সুবল বললো—মা, তুমি ডাবের জলটা খেয়ে নাও, তোমার জন্য সন্দেশ, আপেল, কমলা এনেছি।

—আমি এখন ওসব কিছু খাবো না—

—তাহলে এসব আনলুম কেন, এখন না খাও, তোমাকে নিয়ে যেতে হবে, এই ব্যাগের মধ্যে গঙ্গাজল, গঙ্গামাটি, কালীঘাটের প্রসাদ, সব রয়েছে—

—আচ্ছা, তুই থাম—সুবলকে থামিয়ে দিলেন মা। তারপর অঞ্জুকে লক্ষ্য করে বললেন—দাদুভাই, তোমার কাকিমাকে একটা কবিতা শুনিয়ে দাও তো, সেই যে মুখস্থ করেছিলে—

ঠাকুমার মুখের দিকে তাকাল অঞ্জন। তারপর একপলক কাকীমার দিকে, শেষে মুখ নিচু করে লাজুক হাসিমুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো—

আসমানীরে তোমরা সবাই দেখতে যদি চাও—
রসমুদির ছোট্ট গ্রামে তোমরা সবে যাও,

আসমানীর নয় পাখির বাসা, ভেন্নাপাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি,
একটুখানি হাওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে
তারই তলে আসমানীরা থাকে বছর ভরে—

তারপর একটু থেমে—আর মনে নেই—বলে ঠাকুমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ লুকুলো।

—ওরে ছাড়, ছাড়, আমি কি তোকে আর সামলাতে পারি। নতুন কাকীমার কাছে ভাল হয়ে থাকবি, মন দিয়ে পড়াশোনা করবি—

বাইরের বারান্দা থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন সামন্ত মশাই—সুবলবাবু, দেরী হয়ে যাচ্ছে, আটটা বাজল।

কেউ কোন কথা বললো না। ঘড়ির কাঁটা যেন অবুঝের মত দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে।

কাপড়ের পুঁটুলিটা খুলে একখানা ঢাকাই শাড়ি বার করে গীতার হাতে দিলেন মা। চমৎকার তাঁতের শাড়ি।

সুবল বললো —তুমি আবার শাড়ি আনতে গেল কেন, নিজেরই হেঁটে আসতে কষ্ট হয়—

—আমি আনিনি, জিয়াউল দিয়েছে। কিছুতেই শুনল না, জোর করে দিল, তোর বিয়েতে আসতে পারেনি বলে কি আপসোস—

সহসা কোন কথা বলতে পারল না সুবল। একটু সময় নেড়েচেড়ে শাড়িখানা দেখল। শেষে ভারি গলায় আস্তে আস্তে বললো—জিয়াউলকে বোলো আমার বাড়ির কাজ হয়ে গেলে পর ওকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবো, কয়েকটা দিন এসে থেকে যাবে—

—জিয়াউল এখন মস্ত কাজের মানুষ, ওর কি আসার সময় হবে, আমাকে খুলনা থেকে জিপগাড়িতে করে নিয়ে এল, একটুও কষ্ট হতে দেয়নি—

তারপর বালতি ব্যাগের মধ্যে আপেল, কমলা, সন্দেশের বাক্স, প্রণামীর কাপড়, গঙ্গাজলের বোতল, গঙ্গামাটি, কালীঘাটের পট, প্রসাদী ফুল বেলপাতা, সব গুছিয়ে সামন্ত মশাইয়ের হাতে দিল সুবল।

এক হাতে ব্যাগ, আরেক হাতে একটা টর্চবাতি। মাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন সামন্ত মশাই।

আবার সেই হরেরামের রিকশা। এবার তিনজন। গীতা, সুবল আর দুজনের কোলের সামনে অঞ্জন।

একবার শুধু জিজ্ঞেস করলো অঞ্জু—ঠাকুমা, আবার কবে আসবে—

গীতা জানতে চাইল—কিভাবে যাবেন, এই অন্ধকারে অসুবিধে হবে না ?

—সামান্য কিছুটা দূর হাঁটতে হবে—জবাব দিল সুবল—ওপারে গিয়ে আবাব যশোর রোড ধববে। সামন্ত মশাই পাকা লোক, ঠিক পৌছে দেবেন—

মাঠের ওপারে ওই অন্ধকারের মধ্যে আবেকটা বাঙলা দেশের সীমানায় যশোব রোডের কোথাও জীপ গাড়িতে অপেক্ষা কবছে জিয়াউল। অল্প অল্প কুয়াশার মধ্যে ম্লান জ্যোৎস্নায় মায়ের সাদা থানেব মূর্তি ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে। সামন্ত মশাইয়েব টর্চের আলো এক-একবার দেখা যাচ্ছিল। এদিকে দুলতে দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে হবেরামের রিক্শা। ডানপাশে মাঠেব দিকে মায়েব আবছায়া মূর্তির দিকে তাকিযে রয়েছে গীতা। মুখ উঁচু হয়ে দেখছে অঞ্জন। ওই যে সামন্ত মশাইয়েব টর্চের আলো এক-একবার চোখে পড়ছে। আস্তে আস্তে বললো সুবল—আমাব কি ইচ্ছে কবছে জানো গীতা, মায়ের পেছন পেছন দেশে ফিবে যাই। তুমি না থাকলে ঠিক চলে যেতুম।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

লোকটা উবু হয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর হাত-পা সামনে পিছনে সটান করে দিলো। দেখলে মনে হবে মানুষটা এই হিমেল শীতে যোগা ভ্যাস করছে। মানুষটার গায়ে জোব্বার মতো আলখাল্লা, লম্বা পকেট, পিঠের উপর টুটা-কাটা জায়গাটা দেখলে মনে হয় ভারতবর্ষের মানচিত্র পিঠে লটকিয়ে মানুষটা নিরন্তর হাঁটছে। চুল লম্বা, অযত্নে চুলে জট, চোখ লাল এবং গোলাকৃতি, আর হাত-পা বড় শীর্ণ। চোখ লাল গোল গোল, কোটরাগত চোখে অন্ধকারের মতো সামান্য উত্তাপ—কিছু দিনের ভিতরই সেটা মরে যাবে। মরে গেলে কি আর থাকে, সুতরাং মানুষটা সময় সময় হাঁকছিল, আগুন। আগুনের জ্বালা, অথবা আগুন জ্বালো! তারপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকার মতো বলত, নফর হে, নফর, তুমি তো চোর-চেচ্ছোরের বংশধর—যার কোনো ইতিহাস নেই—গোলাম ইতর জাতি, তুমি কেবল নিরীক্ষণ করো। বলতে বলতে মানুষটা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, তারপর দাঁড়াল এবং ছুটতে থাকল, হে নফর, তুমি মণিহার পরাও গলে। ফুলের মালাতে ফুল সাজাও। আর কি বলে মানুষটা, বলে অন্ধকার শরীরে উত্তাপের কল লাগাও। বলে মানুষটা ঘুরে ফিরে নাচতে আরম্ভ করল।

সামনে একটা কুন্দ ফুলের গাছ, গাছের নিচে হরিমতী ছিল। হরিমতী অনেকদিন পর আবার কুন্দ গাছটার নিচে এসে আস্তানা গেড়েছে। কোথায় কবে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় হরিমতী, কেউ জানে না; আবার একদিন এই কুন্দ গাছের নিচে হরিমতী ওর পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে ফিরে আসে; সে কাল হরিমতীকে কুন্দ ফুলের গাছটার নিচে বসে থাকতে দেখেছে, জলে ভিজে গেছে সব। ওর পোঁটলাপুঁটলি সব ভিজে গেছে। এখন নেই হরিমতী। সে ছুটে এসেছিল হরিমতীর কাছে,

হরিমতীকে পেলে সামান্য আগুন চাইত। কারণ হরিমতীর পোঁটলাপুঁটলির ভিতর গোটা সংসার। ভাঙ্গা মগ হাতা খুন্তি খুরি এবং উচ্ছিষ্ট খাবার সে কোত্থেকে কোন হেঁসেল থেকে সংগ্রহ করে বড় যত্নে রেখে দেয়। হরিমতী দয়ালু। হরিমতীর চুল শনের মতো। রাস্তার কলে চান করে টেনা-কানি পরে বসে থাকলে কে বলবে হরিমতী পাগলিনীপ্রায়! মনে হবে ওর বুদ্ধির অগম্য কিছু নেই। গরমের দিনে হাতপাখা নেড়ে সে একবার তাকে ঘুম পাড়িয়েছিল। কুন্দ ফুলের গাছটাতে তখন পাতা ছিল না। শীর্ণ গাছ, প্রখর রৌদ্রে ওলাওঠার মতো হলে হরিমতী এই গাছের নিচে বসে ওকে আলো এবং বাতাস দিয়ে রক্ষা করেছিল।

ক্রমে রাত বাড়ছে। ক্রমে হিমেল ঠাণ্ডাটা আরও শক্ত হয়ে নামছে। একটু আগুনের জন্য হরিমতীর কাছে ছুটে আসা। অথচ গাছের নিচে হরিমতী নেই। চারিদিকে তাকাল—না কোথাও নেই। কিছু দূর হেঁটে গেলে শহরের চৌরাস্তা এবং মোড়ে পাঁঠার মাংসের দোকান। দোকানী এই শীতে, হিমেল শীতে, সকাল সকাল ঝাঁপ বন্ধ করে চলে গেছে। রাস্তা-ঘাট ক্রমে নির্জন হয়ে আসছিস! শীতের দিনে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি এবং ঠাণ্ডা এই নগরীকে হিমের মতো অথবা মৃত মানুষের মতো অসাড় করে ফেলছে। একবার এই মাংসের দোকানে—কবে কোন দিন মনে পড়ে না, কেবল মনে পড়ে—সামান্য পাকস্থলীর নাল চামড়ার মতো মাংসটুকুর লোভে সে হাত জোড় করে অপেক্ষা করলে এক বাবু মানুষ অণ্ডকোষের লোভে বসে থাকার সময় প্রশ্ন করেছিল, তোমার নাম?

—আমার নাম রাজা হরিশ্চন্দ্র।

রাজা! বাবু মানুষটা চোখ উল্টে ব্যঙ্গ করেছিছল। তারপর সে প্রাতদিন দেখেছে, বাবু পাঁঠা কাটা হলেই এক জোড়া অণ্ডকোষ নিয়ে পান চিবুতে চিবুতে বাড়ি ফিরছে। কি করে দোকানীকে ফাঁসির দড়ি থেকে রেহাই দিয়েছিল। দোকানীর গোঁফ জোড়া দুলে উঠলে টের পায় হরিশ, মানুষটা একটা আস্ত মানুষকে এই দোকানের খুপরি ঘরটাতে এনে পাঁঠা কাটার দা দিয়ে কুপিয়ে কেটেছিল—লোভ ছিল কার উপর—সে একদিন শুধু হরিমতীকে দেখেছিল রাস্তা দিয়ে যেতে—হরিমতী মানুষটার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে বড় রাস্তায় ছুটে গেছে এবং হাত তুলে যেন সে এক পাখির পালক উড়াচ্ছে বাতাসে তেমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সেই থেকে কি যেন এক সম্পর্ক মনে হতো। হরিমতী বাবু এবং দোকানীর গোঁফজোড়া দুলে উঠলে কুন্দ গাছের নীচে বসে তার মানুষের জন্য কাঁদত। আর কেবল বাবু মানুষটার সঙ্গোপনে এক জোড়া অণ্ডকোষের জন্য বসে থাকা। বসে থাকতে থাকতে মহড়া দেওয়া—

আমি এক মানুষ, থানার বড়বাবু, বয়েস এই তিন কুড়ি হবে—খাতায় কলমে দুই কুড়ি দশ—ঘরে আমার যুবতী বৌ। বুঝি অণ্ডকোষ খেলে অনন্ত যৌবন মেলে তেমন মুখ করে বসে থাকত বাবু মানুষটা। অন্ধকারে যেতে যেতে হরিশের মনে হলো, এই বাবু মানুষ এবং দোকানী মিলে হরিমতীকে পাগল করে দিয়েছে। সে ভিতরে ভিতরে কষ্ট অনুভব করল। কোথায় হরিমতী। সে ফের কুন্দ গাছটার নিচে ফিরে এসে দেখল—না, এখনও হরিমতী ফিরে আসেনি। কোথায় গেল। এমন বৃষ্টি এবং হিমেল ঠাণ্ডাতে হরিমতী কোথায় গেল! ওর চোখ-মুখ ফুলে উঠেছে, হাত-পা ফুলে গেছে—আর নগরীর উপর তীক্ষ্ণ হিমেল ঠাণ্ডা অবিরাম চললে ফুটপাথের সব মানুষেরা মরে যাবে। সে আগুনের জন্য ছটফট করছে। হায়, একটু আগুন জ্বালাতে পারলে এমন শীতের রাতে অন্তত নিজেকে রক্ষা করতে পারত। হরিশ এবার একটু আগুনের জন্য কাঙ্গালের মতো ছুটতে থাকল। সহসা সহসা কোনো মানুষের ছায়া অন্ধকারে ভেসে উঠলে অনুসরণ—পোড়া সিগারেট অথবা সামান্য আগুন—কিন্তু হায়, পথ কর্দমাক্ত বলে এবং পিচ্ছিল বলে সে ছুটতে পারছে না। সে আগুন ধরতে পারছে না। পোড়া আগুন জোনাকির মতো জ্বলতে না জ্বলতেই নিভে যাচ্ছে। শীতে হরিশ ঠক ঠক করে কাঁপছিল। বাস-স্ট্যাণ্ডের নিচে অথবা পার্কের কোণে পরিত্যক্ত ভাঙ্গা টালির ঘরে হরিমতী আছে কিনা দেখল। থাকলে হয়তো কাঙ্গালের মতো এমন ছুটতে হতো না। হরিমতীর কাছে আগুন পাওয়া যেত। হরিমতী পাগলিনীপ্রায়, তবু হরিমতীর সংসারে সামান্য আগুন আছে। কারণ হরিমতীর বয়স আর কত! ত্রিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশ হতে পারে, আবার পঞ্চাশ হতে পারে। ওর নোংরা, ছেঁড়া এবং কিম্ভূতকিমাকার পোশাকের ভিতর বয়সটা কিছুতেই ধরা যায় না! একবার হরিশ, কবে যেন হরিশ দেখেছিল, হরিমতী ফুটপাতের কলে স্নান করছে। এমন শরীর হরিশ দীর্ঘকাল দেখেনি। ঐ দেখে হরিশের হাত-পা যখন শীতের দিনের মতো ঠক ঠক করে কাঁপছিল—হরিমতী ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে তখন। রাস্তায় কোনো জনমনিষ্যি সে দেখতে পাচ্ছিল না। একমাত্র জনমনিষ্যি বলতে এই হরিশ। পাগলা হরিশকে দেখেই সে লজ্জায় ভাঙ্গা মগ দিয়ে যেন বা শরীর ঢাকার চেষ্টা করে। বিয়ের পিঁড়িতে যেমন বধূ বসে থাকে, তেমন এক বধূর মতো মুখে ব্যাঙের মতো উপুড় হয়ে সে হরিশকে দেখে—যেন হরিশ তার কতকালের নাগর। হরিমতীকে স্নানের ভিতর বড় কাতর দেখাচ্ছে। এত লোক নগরীতে এবং রাজপথে আর রাজপথের কলে হরিমতী সব তঞ্চকতা গিলে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে করতে হরিশের সঙ্গে পিরীত করছে, পিরীত করার সময়

মনে হয়েছে বড় অভাবী সে, সুতরাং সারা দিনমান ঘুরে বেড়ানো। যেন পাখি ধরার মতো ঘুরে বেড়ায় হরিমতী। ঘুরে ফিরে, পায়ের উপর পা তুলে নাচতে নাচতে—পয়সা নাই, ঘোড়া নাই, সংসারে জল নাই, অন্ন নাই—কি যে নাই বলতে বলতে, হরিমতী নাচে গায়, ছেঁড়া কানি উড়িয়ে বেড়ায় এবং কোনো এক আদ্যিকাল থেকে সংসারের সব সুখ ও মোহ থেকে মাঝে মাঝে মৃত স্বামীর আহত মুখ ভেসে উঠলে কুন্দ গাছের নিচে বসে হায় হায় করে কাঁদে।

হরিশ বলেছিল, মতি তুই কান্দস ক্যান?

—নাগর, আমার নাই বইলা কান্দি আমি।

—কি নাই তর?

—আমার হাতি নাই, ঘোড়া নাই।

—আমার হাতি ঘোড়া আছে, নিবি?

—ইতর, তুমি নাগর ইতর।

হরিশ রাতের বেলাতে হাসতে হাসতে মতিকে জড়িয়ে ধরেছিল। রাতের অন্ধকারে ফুটপাথের বাসিন্দারা ঘুমোচ্ছে। হরিশ মতির কোমরে ছেঁড়া কানি-টেনা দেখে ভাবল—এই হায় দ্রৌপদীর বসন-ভূষণ। গোটা অঙ্গে কত বিচিত্র বাস। কত রকমের হিজিবিজি তালিমারা সংসারের যাবতীয় অনাচার-অবিচারের বসন-ভূষণ—অঙ্গে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে প্রায় ব্যাণ্ডেজের সামিল করে ফেলেছে। রাগে দুঃখে সে টেনা-কানির মধ্যে যে মতি, তাকে ধরতে চায়। হায় এই ঠাণ্ডা থেকে পরিত্রাণ! বস্তুত হরিশ ছিঁড়ে ফুঁড়ে অন্তরে প্রবেশ করতে চাইলে মতি তালে তাল দিতে থাকে। মতিকে সোহাগ করতে করতেই হরিশ মাদুরের নিচে হাত বাড়িয়ে দেয়। বালিশের নিচে উচ্ছিষ্ট হাড়-মাংস চোষা—শত সহস্রবার চুষে শুধু সাদা হাড় মতি কিছু সংগ্রহ করতে না পারলে দিনমানে ফুটপাথে বসে অথবা রাতের বেলায় এই নগরীর ট্রাম-বাস এবং মানুষ-জন যখন ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসে তখন তার ডেরায় শুয়ে সারারাত সেগুলো কড়মড় করে খায়। দাঁতে কি শক্তি হরিমতীর। যত অভাব বাড়ছে, অনাচার বাড়ছে, তত দাঁতে শক্তি বাড়ছে। হরিশ তালে তাল দেবার সময় মতির ভাঁড়ারে পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে দিলো। সুখে মতি যত ডুবে যাচ্ছিল, হরিশ তত সেয়ানা হয়ে উঠছিল। পিরিতের ফাঁদে আটকে সে মতির পোঁটলাপুঁটলি থেকে সব চুরি করে নিচ্ছিল। সেই মতি এখন কুন্দগাছের নিচে নেই, পার্কে নেই, ফুটপাথে নেই—কোথায় যে গেল! মতিকে না পেলে যেমন অন্যসময় চীৎকার করে ট্রাম-বাস কাটিয়ে রুমাল উড়িয়ে যায়—তেমনি সে ছুটতে ছুটতে হাঁকল, কার হাতি? কে

ঘোড়া নিয়ে যায়! বাদ্য বাজে কেন? ইতর এই সংসারে তোমার কি ইচ্ছা যুবতী! সে রাজপথে দাঁড়িয়ে সুন্দরী যুবতী দেখলে হাসত। আর ঐ মানুষটা, দারোগাবাবু—যার ঘরে তার বিবি, নাকে এখন নথ, কোমরে বিছেহার এবং ছাগলের অণ্ডকোষে যে-মানুষের প্রাণ-পাখি পোষা (শুধু কেন জানি মাঝে মাঝে সরলার চোখ ভাসতে থাকলে সে হাঁকে—কার হাতি? কার ঘোড়া? বাদ্য বাজে কেন?)—সেই দারোগাবাবু হরিশকে এখন আর চিনতে পারেন না। হরিশের বড় দাড়ি, কোটরাগত চোখ এবং গোল গোল চাউনি। পাগল হরিশ পাকস্থলীর নীল চামড়ার মাংসের জন্য বসে থাকলে কেবল শুনতে পায়—কারা যেন বাদ্য বাজায়। কিসের বাদ্য? যুবতী, কি বাদ্য বাজে? যুবতী, যবে যুবতী কলেজে যায়, সিনেমায় যায়—কি তাড়না তার ভিতরে—সে ভেবে পায় না—কেবল সেই এক দৃশ্য। সে এবার জোরে হাঁকল, মতি, মতি আছ নি! ফুটপাথে, কবরভূমির এপাশটায় এবং দালানের বড় আলোটার নিচে দাঁড়িয়ে ডাকল, মতি, মতি আছ নি! ইট্টু আগুন না হলে যে প্রাণপাখি রাখা দায়!

ফুটপাথ পার হলে নোংরা বস্তি অঞ্চল, পাশে বড় আঁস্তাকুড়—পাহাড়-সামিল আঁস্তাকুড়ে পচা ইঁদুর-বিড়ালের গন্ধ। মতি এখানে থাকতে পারে—নির্জন নিরালাতে আস্তাকুড় পেলে মতি শুয়ে থাকে। তখন বৃষ্টি ছিল না, আকাশটা ধরে এসেছিল—ছাইগাদায় পোড়া কয়লা—ঝুড়িতে বস্তিবাসীরা পোড়া কয়লা তুলে নিচ্ছিল, হরিশ সবুর করতে পারেনি, পায়ের উপরে গোটা শরীরের বোল তুলতে তুলতে বাদ্য বাজাতে বাজাতে দুটো ঝুড়ি চুরি করে যেন হরিশ যুদ্ধে যায়, দামামা বাজিয়ে যুদ্ধে যায়··· হরিশ ঝুড়ি চুরি করে পালিয়ে গিয়ে বুন্দ গাছটার নিচে মতির অপেক্ষাতে বসে ছিল। রাত হলে, হিমেল ঠাণ্ডা ক্রমে বাড়লে, সে এবং মতি খড়কুটোতে ঝুড়ির বেতে বাঁশে আগুন জেলে চুরি করে এই নগরীতে আর একটা রাত কাটিয়ে দেবে। কিন্তু কোথায় মতি, কোথায় সামান্য আগুন। সে ডাকল ফের, মতি, অ মতি, আছ নি! তিনদিন থেকে ভিজে ভিজে এখন এখন একটু আগুন না হলে প্রাণ রাখা দায়। মতি, মতি আছ নি? অ মতি। বড় বড় গাড়ি রাতের আঁধারে মুরগি গিলতে গিলতে চলে যাচ্ছে। সে ডাকল, মতি, অ মতি, মতি আছ নি! বড় বড় বাড়ি দু-পাশে স্থির, সে ডাকল, মতি, অ মতি, মতি আছ নি! বড় বড় দেয়ালে হলুদ সব ছবি রঙীন চিত্রের মতো ভিজে ভিজে তেলাপোকার সামিল। দেয়ালে ছবিগুলো বৃষ্টিতে ভিজে নড়ছে। সে ডাকল, মতি, মতি আছ নি! সে আবার সেই নির্জন জায়গাটা পার হবার সময় দেখল, অনেক উঁচুতে একটা জানালা

খোলা। সেই আলোতে সে উত্তাপ পাবে ভেবে নিচে চুপচাপ ভালো মানুষের মতো দাঁড়িয়ে ডাকল, মতি, অ মতি, মতি আছ নি। শীতে সে যত ঠক ঠক করে কাঁপছে, তত হন্যে হয়ে নগরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে—মতি, মতি আছ নি! হরিশ ছুটে ছুটে ক্রমে এক কবরখানায় পৌঁছয়। মতি এখানে গোঁসা করলে চলে আসে—ভাঙ্গা টিনের ছাউনির অন্ধকারে চুপচাপ পুঁটুলি শিয়রে রেখে শুয়ে থাকে। সে ডাকল, মতি, মতি আছ নি! অন্ধকার মানুষের মতো ছায়া ভেসে উঠল। ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর ছোট এক ছাউনির নিচে দু-বাহু বিছিয়ে মতি উপুড় হয়ে আছে—সে এতক্ষণে লক্ষ্য করল ক্রমান্বয় এই হাঁটা এবং অনুসন্ধিৎসা তাকে মতির কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে।

সে প্রথমে কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস গলায় ডাকল, মতি, মতি জাগে নি! কোনো উত্তর পেল না। মতি, তুমি আমার ভালোবাসার জীব। সে মতিকে ছুঁতে চাইল। মতির হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা। সে মতিকে জড়িয়ে ধরতে চাইল—এই মতি। সে মতিকে ঠেলা দিলো এবার—এই মতি! মতির শরীর শক্ত। কতদিন এমন শরীর শক্ত করে রেখেছে—আজ হয়তো শীতে তা আরও শক্ত হয়েছে। আবার চারা গাছটির মতো শীত পার হলে নূতন পাতা মেলে ধরবে—সুতরাং সে মতির ঠ্যাং ধরে টানতে গেলে দেখল—যথার্থই হুঁশ নেই তার। সে এবার কবরখানায় দুহাত তুলে চীৎকার করে উঠল, মতি রে! এখন কি তার করনীয় সে ভেবে পাচ্ছিল না। সে খাবলে খুবলে মতির পোঁটলাপুঁটলি খুলে আগুন খুঁজতে থাকল। মতির কত কিছু রাখার অভ্যাস। খালি সিগারেটের বাক্স, ভাঙ্গা হাঁড়ি, ছেঁড়া কানি-টেনা—যা কিছু পথের, সব মতির পোঁটলাপুঁটলির ভিতর—মায় পাখির পালক পর্যন্ত! কিছু খাদ্যদ্রব্য, মুসুরীর ডাল এবং পোড়া রুটি—কতদিনের পচা কে জানে। বাসি দুর্গন্ধ, মাছি উড়ে উড়ে জায়গাটাকে পুতিগন্ধময় করে রেখেছে। খাবলে খুবলে পোঁটলাপুঁটলি খুলে হরিশ আগুন আবিষ্কার করতে পারল না। সে হতাশায় এবং দুঃখে লম্বা হয়ে গেল, পায়ের নিচে মতি উবু হয়ে পড়ে আছে—আগুন জ্বালতে পারলে মতি বাঁচত। সে শেষবারের মতো মতি যেখানে পয়সা লুকিয়ে রাখে—প্রায় ঘাগরার নিচে, ট্যাঁকে—সেখানে হাত ঢুকিয়ে দিলো। ছোট নীল রঙের থলে, কিছু পয়সা, কানাকড়ি এবং পোড়া বিড়ির দুটো অংশ, আর ম্যাচ বাক্স। প্রায় যেন রাক্ষসের প্রাণ রুপোর কৌটায় ভ্রমরের ভিতর, মতির প্রাণ এই থলে—নীল রঙের থলে। সে এবার থলে নিয়ে দু-লাফে সদর-রাস্তায় নেমে ছুটতে থাকল। মতির প্রাণ এই রাজপুত্রের হাতে।

সে দুই ঝুড়ি এবং খড়কুটোর অনুসন্ধানে ছুটতে থাকল। আগুন জ্বালতে পারলে মতি আর একবার বাঁচবে। সে আলো-আঁধারিতে নগরীর এমন নিস্তব্ধ রাতকে ব্যঙ্গ করে হেঁকে উঠল, শহরে কে জাগে। উত্তর এলো, কারা যেন দূরে কোলাহল করে যাচ্ছে—রাক্ষসের ভাই খোক্কস জাগে। একসঙ্গে একদল খোক্কসের গলা পাওয়া গেল! সে নিজের ভয় দূর করার জন্য হাঁকল, কে জাগে! এবার যেন অন্ধকার থেকে উত্তর এলো, আমি মতি জাগি! কে জাগে। সে এবার জবাব পেল, আমি অমানুষ জাগি।

হরিশ যত সত্বর পারল খড়কুটো এনে আগুন জ্বেলে ফেলল। আগুন জ্বাললে রাক্ষস-খোক্কসের ভয়টা কমে, সে প্রথমে আগুন জ্বেলে কেমন জড় পদার্থের মতো মুখ গুঁজে বসে থাকল। তারপর মতিকে দেখতেই মনে হলো ওর হাতে মতির প্রাণপাখি পোষা, সে তাড়াতাড়ি আগুন থেকে উত্তাপ নিয়ে মতির গালে কপালে দিতে থাকল। মতিকে চিত করে শুইয়ে দিলো। জলে সব ভিজে শপ শপ করছে। সে মতির শরীর মুছে দিলো। ঠাণ্ডায় বেহুঁশ মতির চোখ দুটো শুধু সাদা সাদা, হাত পা সাদা সাদা পাণ্ডুর এবং নাকের নিচে কাটা দাগ। রক্ত গড়াতে গড়াতে বরফ হয়ে গেছে। মতির থেকে থেকে শ্বাস পড়ছে। এবং মনে হয় কিছুক্ষণ কি ভেবে ভেবে তারপর মতি শ্বাসের কথা মনে হলে একবার নিঃশ্বাস ফেলছে। সে মতিকে তাড়াতাড়ি কাত করে দিলো। পিঠের কাছে আগুন পেলে মতির ফুসফুস পরিষ্কার হতে পারে ভেবে পিঠে এবং পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুনের উত্তাপ দিতে থাকল। কিন্তু মতি যেমন অসাড় হয়ে পড়েছিল, এখনো তাই। সাদা ফ্যাকাশে চোখ যেমন ছিল, হাতে পায়ে যেমন জলের ঘা ছিল, এখনও তেমনি সাদা চোখ, পায়ের পাতায় সাদা মাংস উঠে আসছে, জলে জলে মতির পায়ে ঘা হয়ে গেছে—মতির চারপাশে মশা-মাছি উড়ছে কেবল। সে ডাকল, এই মতি, তুমি কথা কও। কথা না বললে ভয় লাগে। হায়, সর্বত্র এক নিদারুণ তৃষ্ণা, বেঁচে থাকার তৃষ্ণা—মতি বেঁচে থাকার জন্য এতদূর হেঁটে এসে জলের ঝাপটা থেকে প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন মতি জানে না, মতির প্রাণবায়ু ঠাণ্ডায় এবং শীতে অথবা অনাহারে উড়াল দিচ্ছে। সে দুই হাতে উত্তাপ এনে মতির গালে কপালে বুকে এবং পায়ে ঘসতে থাকল। পা ঘসলে গাল-কপাল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, গালে কপালে দিলে পা সাদা এবং উরুমূল বরফ হয়ে যায়। মতিকে সে আগুনের দিকে মুখ করে মরা মাছের মতো কাত রাখল। আর কাত করতেই মনে হলো মতি বুঝি প্রাণ পাচ্ছে। মতির নিঃশ্বাস পড়ছিল। থেমে থেমে, আগের চেয়ে দ্রুত। সে তাড়াতাড়ি 'মতির

ভেজা বসন-ভূষণ সব চিপে আগুনের উপর টানিয়ে দিলো। গরমে গরমে শুকিয়ে গেলে শুকনো কাপড়ে আবার মতিকে ফুলমতী মনে হবে। কিন্তু আগুন যে সামান্য। চারিদিকে জল, আর কর্দমাক্ত বন্যা—জীবনে এই নগরীতে কেবল মৃতমুখ ভেসে বেড়াচ্ছে। হরিশ আগুনের উত্তাপে বল পাচ্ছে। সে মতিকে কাঁধে নিয়ে আগুনের চারপাশে ঘুরতে থাকল—ওর কেবল নৃত্য করতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু আগুন সামান্য সময় জলে নিভে যেতে থাকলে যেমন সে মরা মাছটির মতো কাত করে রেখেছিল এবার সে তেমনি মরা মাছটির মতো মতিকে চিত করে রাখল। আগুন ক্রমে কমে এলেই নিঃশ্বাস কম-বেশি পড়ছে। সে দেখল—সব খড়কুটো শেষ, বেত-বাঁশ শেষ এখন শুধু মতির বসন-ভূষণ আছে। বসন-ভূষণ সে এক-দুই করে আগুনের ভিতর ছুঁড়ে দিতে থাকল। কারণ এই আগুন এখন প্রাণের চেয়ে মূল্যবান। ভোরের দিকে দুই আদিম নরনারী দরকার হলে সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে বসে থাকবে। এই রাত, শীতের হিম ঠাণ্ডা, ক্রমে তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আগুন নিভে গেলে সে এবং মতি মরে যাবে। ক্রমে এই আগুনের জন্য হরিশ স্বার্থপর হয়ে উঠল। মতির যাবতীয় তৈজস, মায় খালি সিগারেটের বাক্স, পাখির পালক এবং নীল-থলে আর কানাকড়ি, যদি, পারা যায় তো এমন কি মতির অঙ্গ কেটে তাজা মাংস রক্ত চর্বি আগুনের ভিতর নিক্ষেপ করতে পারলে বুঝি প্রয়োজনীয় উত্তাপ হয়। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর মতির বয়স বিশ কিংবা বাইশ, পঁয়ত্রিশ কি পঞ্চাশ ধরা যাচ্ছে না। মতির চোখের নিচটা ফুলে গেছে, হাত পা ফুলে গেছে। মতিকেও আর মতি বলে চেনা যায় না। হরিশ মতির শরীরে হাত রেখে বুঝল, এ-শরীর আর গরম হবার নয়। সে খুব সংলগ্ন হয়ে বসল। বলল, মতি, তুমি আমার ভালোবাসার জীব। বলে সে তার মতিকে নিয়ে এবং সামান্য আগুনের উত্তাপ নিয়ে কেমন জড়াজড়ি করে বাকি রাতটুকুর অপেক্ষাতে পড়ে থাকল—আশা, ভোর হলে সূর্য উঠতে পারে আকাশে।

প্রাতঃকালে সূর্য আকাশে কিরণ দেবে ভেবেছিল কিন্তু হরিশ চোখ মেলে দেখল আজও ঈশ্বর তাঁর নীল উজ্জ্বল ছায়া ছায়া আগুনের ঘর আকাশের গায়ে টানিয়ে দেননি। তার গায়ের জোব্বা—যার পিঠের দিকটা টুটা-ফাটা ভারতবর্ষের মানচিত্রের মতো এবং যা তাকে অন্ধ শীতের রাতে উত্তাপ দিতে সাহায্য করবে—সেই পরম প্রয়োজনীয় বস্তুটি—যা না হলে কাল রাতে অথবা পরশু রাতে সেও মতির মতো অস্থানে কুস্থানে মরে পড়ে থাকবে—শরীর থেকে খুলে সে মতির শরীর ঢেকে দিলো। ছেঁড়া তালিমারা পাজামা খুলে মতিকে পরিয়ে দিলো—যেন সাদা থান কাপড় অথবা

কাফনের মতো বস্ত্র ; কারণ মতির কি জাত এবং কি ধর্ম সে এ সময় আর ঠিক করতে পারছে না। কেবল ওর এখন মতির চারপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে ইচ্ছা হচ্ছে। নৃত্য না করলে, ঘুরে ফিরে না নাচলে কুঁদলে হিম ঠাণ্ডাতে তার শরীর বরফ হয়ে যাবে। সে এবার মাথায় ডান হাত রেখে, পাছায় বাঁ হাত রেখে, কোমর দুলিয়ে মতির চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচছিল আর গাইছিল—মাগো, তুই ভারতবর্ষ, টুটা-ফাটা তুর শরীর, (আমি মা) রেতের বেলা পোকামাকড়, দিনের বেলা পাগলা হরিশ।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

এক

মাহমুদ গল্প কবিতা লেখে। পেশার দিক থেকে বেকার। ওর বড় বোন পাগল হয়ে গিয়েছিলো। ডাক্তার বলেছিলো, বিয়ে না হওয়াতেই পাগল হয়েছে।

ওর বড় ভাই ট্রেনের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করেছে। এখন ও একা। একটি মেয়েকে ভালবাসতো। কিন্তু বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে পারেনি। কেননা ওব রোজগার নেই। কয়েকদিন আগে ও বলেছিলো, আমি একটা নতুন গল্প লিখছি, পড়ে দেখো, তোমার ভালো লাগবে।

গল্পটা আসলে তখনও মাহমুদ লেখে নি।

দুই

মাহমুদ যে কোন উপায়ে রোজগার করার জন্য তৈরী ছিলো। ওর একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু (হ্যাঁ, আমারও) শামিম সে সময়ে অসুখে পড়লো। শামিম যে বাঁচবে না সে কথা জানিয়েছিলো ডাক্তার।

এবং গীতি জানালো একদিন [জানালো না, বলা যায় বোঝালো] যে ওদের সম্পর্কটা নেহাৎ ছেলেমানুষী সম্পর্ক। তার মধ্যে কোন রকম বাস্তবতা ছিলো না। প্রেম করা আর ঘর-সংসার করা এক ব্যাপার নয়। জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটা বিবেচনা না করে দেখাটা বোকামি। তার চাইতে……

তার চাইতে কী, মাহমুদ আমাকে খুলে বলে নি। সেদিন ও খুব হেসেছিলো। গীতাকে ছেলেমানুষ বলেছিলো, বোকা বলে উপহাস করেছিলো এবং অন্ধকার হবার মুখে বিদায় নিয়েছিলো।

গল্পের ফর্ম সম্পর্কে নতুন কী ভাবছে তা নিয়ে কোনরকম আলোচনা করিনি সেদিন। একবার বোধ হয় বলেছিলো, আমার নতুন গল্পটা আরম্ভ করেছি, যেও কাল একবার আমার ঘরে, পড়ে দেখো।

মাহমুদের বয়স চব্বিশ। ওর কেউ নেই। সেদিন একটা বিদেশী গান গুন গুন করতে করতে রাস্তায় নেমেছিলো। মনে আছে, গানের প্রথম কলি ছিলো হ্যাভ য্যু এভার বিন লোনলি। তখন ঢাকার রাস্তায় হাওয়া বইছিলো। পথের দু'পাশের গাছে শন্ শন্ শব্দ বাজছিলো। আমি কোন কথা বলিনি। শুধু দূর থেকে দেখেছি।

তিন

সবাই তখন চুপ করেছিলো।

কৃষ্ণচূড়া গাছ, মাঠ, শিরীষের ফুল, মেঘ, সূর্যালোক এবং দীর্ঘ পথটা। সবাই চুপ করে প্রতীক্ষা করছিলো কোন শব্দ এমনি একটা স্তব্ধতার মধ্যে বিস্ফারিত হয়ে পড়ে কি না।

মানুষগুলো সবাই যেন এককেটি বিদ্যুতের বিন্দু। ওরা দ্রুতগতিতে নড়ছিলো, কিন্তু কেউ কারো অবয়বে এসে আঘাত হানছিলো না। নিসর্গের সুচতুর কোন কবি যদি অবয়বের নাম দিয়ে থাকে বিন্দু তাহলে আত্মার কোন নাম নেই। হয়তো তা চোখে এসে লাগে না। বরং বলতে পার, শুধুমাত্র অনুভূতির প্রগাঢ় অন্ধকারেই যা উজ্জ্বল হয়ে দীপ্তি পায়—সেই আলোই হয়তো আত্মা।

সবাই তখন স্তব্ধ। কান পেতে রয়েছে প্রতীক্ষু স্তব্ধতার বুকে; যদি কোন শব্দ সোনালী ভোরের লগ্নে গুন গুন মৌমাছির ধ্বনির মতো বেজে ওঠে; অথবা সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনার গীতির মতো গভীর হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু কোন শব্দ এসে বাজে নি। আমি প্রতীক্ষা করে ক্লান্ত এবং বধির। কোন শব্দ আমার চারপাশে এখন আর নেই!

কেমন করে থাকবে। ক'দিন ধরে যে আমার চারপাশ ঘিরে প্রচণ্ড প্রমত্ত করুণ আকুল কতগুলো শব্দের কোলাহল ছিলো। তা ছাড়াও তখন একটা গভীর অন্ধকার বিবরে ঢুকে পড়েছিলাম। তখনি হয়তো সেই অন্ধকারের মধ্যে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যেতাম। অনুভূতির এই স্তব্ধতা এমন আদিম এবং বন্য যে তার বুকে আমার আলো কোনদিন উজ্জ্বলরেখ অচঞ্চল শিখায় প্রতিষ্ঠিত হতো না। এখন আমি ক্লান্ত, প্রহত, এবং আত্মহত্যায় উন্মুখ। সে জন্যই [আমি শুধু কি আমি?] চুপ করে রয়েছি।

এ নিঃশব্দ অন্ধকারে একাকী পথ হাঁটছি, সেই তখন থেকে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে এসেছি। শীতল, শক্ত এবং কালো রাস্তা পায়ের নিচে, তবু এই রাস্তায় পা দিয়েও যেন কিছু স্বস্তি রয়েছে। অশেষ শূন্যতায় যে ভাসছিল…এ চেতনাটা তবু বেঁচে আছে এমনি স্বস্তির সাবলীলতায় এসে এখন আমি নিঃশব্দ অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছি। চিরকাল ধরে আমি হাঁটতে হাঁটতে গভীরতর কোন অন্ধকারে এবং নিঃশব্দতায় ডুবে যাচ্ছি। কৃষ্ণচূড়া চুপ, মাঠ চুপ, শিরীষের শাখা চুপ। কেউ কিছু বকছেনা।

অন্ধকার এবং নিঃশব্দ বেদনার বুকে কান পেতে রয়েছি সর্বক্ষণ। যদি কোন শব্দ পাওয়া যায়। ক্লান্ত, প্রহত এবং আত্মহত্যায় উন্মুখ হয়ে যে মিষ্টি শব্দের জন্যে নিরবধিকাল ধরে আমাব কান পেতে থাকা—তা আমরা কেউ শুনতে পাবো না।

অন্ধকারে বাদুড়েরা বাসা ছেড়েছে। আলোকময় দূবনগরীর চারপাশে কয়েকটা চক্রাকারে উড়ছে। কয়েকটা পেচক শিরীষের ডালে বসে ঠোঁট আর নখর ঘসে ঘসে শানিত করে রাখছে। কখন ইঁদুরের দল এক এক করে নিঃশব্দ প্রান্তরের বুকে সিঁদ কাটতে আরম্ভ করে।

আকাশ থেকে হিম ঝরতে আরম্ভ করেছে এখন। শেষ রাতে ঘাসের উপর কুয়াশার পর্দা ঘেরা থাকবে অনেকক্ষণ, পূবের আলো এসে না পড়া অবধি। তখন আলোকবিদ্ধ আমার এই নিষ্প্রাণ উপহার এবং করুণা আমার লাশের ওপব প্রতিফলিত হবে।

কিন্তু তবু সেই শব্দ থাকবে না। সেই শব্দের অমৃতধ্বনির আবহে আমি কোনদিন গিয়ে পৌছতে পারব না। মৃত্যুর আগেও না, পরেও না। এই গাছ, বাদুড়, পেচক এবং দীর্ঘ পথ—এরা সবাই এখন আমার সহোদর। ওদের নিঃশব্দ ভাষা শুনতে পাচ্ছি যেমন শুনতে পেতাম মাতৃগর্ভে। আনন্দ কল্লোলিত যৌবনের সমুদ্রে যাবার আকাঙ্ক্ষায় দেহ সরোবরের একটা পদ্মবীজ কর্দমাক্ত এবং উর্বরা গর্ভে গিয়ে পৌছেছিলো। সেইখানে নিটোল এবং গোলাপী একটি আবরণে পৌছবার জন্য যে আঘাত লেগেছিলো সেই আঘাত প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো দিনরজনী। আমি আকাশের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সেই অন্ধকারে ফুটে উঠলাম। নিঃসঙ্গ সমুদ্রে যেন ফুটলাম আঁধার-কোকনদে। আমার চারপাশের অন্ধকারে ছিলো আরো একজন, আমি তার নাম জানি না। দেখতে পাইনি কিন্তু তাকে অনুভব করতে পারছিলাম। এই এখনকার মত।

আকাশ আমার মা। মাগো, বলোনা সেদিন কে ছিলো আমার কাছে।

জারুল আমার ভাই, শিরীষ আমার ভাই।

ওরা ডাকলো, এসো ভাই।

ডাক শুনলাম মনের ভেতরে। দাঁড়ালাম চুপ করে। শিরীষের উদ্ধত নিঃশ্বাসের নিচে।

মরে কি লাভ? অন্ধকার ফিস ফিস করে আমার কানে কানে বললো।

আমি কেমন করে ওদের বোঝাই দিনের আলোয় এ মুখ ওদের কাউকে আমি দেখাতে পারবো না। কেমন করে বলি সর্বক্ষণ আমি মানুষের মুখেই ভয় দেখছি।

ওদের ভীত মুখ দেখে কতবার চিৎকার করে উঠেছি। ওদের ভয়, সবার থেকে সব রক্ত বেরিয়ে পড়ে। অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। এতো ভয়ের মাঝখানে আমার অসহিষ্ণু চিৎকার শুনে ওরা আমাকে বলে দিয়েছে, আমি অভিশপ্ত। আমি না মরলে ওরা কেউ স্বস্তি পাবে না।

দস্যু দেখে মানুষ যেমন ভয় পায়, তেমনি ওরা আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমি এখন কি করবো। কেমন করে আতঙ্ক এবং পাণ্ডুর মানুষগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াবো।

কখনো আবার ঘৃণা, হিংস্রতা এবং পিপাসা দেখে দেখে আমি ক্লান্ত। হাসবে। সমবেত সাহসের উৎসে আমার শক্তি ছিলো, সেই উৎস খুঁজে পাই না কেন?

শব্দ, শব্দ, শব্দ, যে শব্দে আমি নিরবধিকাল ধরে বিচ্ছুরিত, যে শব্দের আবহে বর্ণায়িত হয়ে আমি আদল খুঁজে পেয়েছি সেই শব্দ যে এখন আমার প্রাণের অতীত। এসে পৌঁছেছি এমন এক মৃত নগরীর মাঝখানে যেখান থেকে আমার আর নিষ্ক্রান্তি নেই।

না। তখন ভয় করছিলো না। বরং সবের ভিতরে ধীরে ধীরে অচেনা সাহস সঞ্চিত হচ্ছিলো। সেই সাহস নিয়ে বার হয়ে পড়েছি পথে।

নিশ্চয়ই এখন রাত্রি। নইলে চারিদিক এতো নিঃশব্দ কেন। ঘর থেকে বেরুবার সময় যে সাহসের সন্তটা কেঁপে উঠেছিলো মনের ভিতর এখন দেখছি সেই সাহসটা আমার শূন্য।

এখন কি করবো?

যদি সমুখের রেললাইন ধরে হেঁটে যেতে পারি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহলেও কি এই নিঃশব্দতা এবং অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে পারি না? কেন না শীতল এবং শক্ত লোহার সমান্তরাল এই পাত দুটোর ওপর দিয়ে শব্দের সেই অতুলনীয় সম্রাট যন্ত্র এবং সহচরী বিদ্যুতি আলো সগৌরবে এসে যাবে। এই নিঃশব্দতা এবং

অন্ধকারের বুক চিরে দু'টুকরো করে শব্দের জয় ঘোষণা করে এবং আলোর জয়ধ্বজা উড়িয়ে চলে যাবে। একদিক থেকে অন্যদিকে। কে জানে হয়তো তার গতির বিকিরণে আমার আত্মাও গতিবান হবে।

তখন এই দেহ?

এই টুকরোগুলো পড়ে থাকবে রেললাইনের দু'পাশে ছড়িয়ে। পাথরের টুকরো-গুলোতে দুর্গন্ধ, রস, আর পচা রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে। প্রখর দুপুরে শকুনেরা চক্রাকারে উড়বে আমার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন লাশের টুকরোগুলোর ওপর দিয়ে।

আর আমার এই আত্মা, যা দেহের সর্বত্র প্রসারিত অথচ অনুভূতির মধ্যমণিতে একটি বিন্দুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত, তখন অণু অণু হয়ে ধুলোয় শিশিরে গাছে লতায় রৌদ্রে এবং বায়ুমণ্ডলে মিশে যাবে।

আমি তখন কি করবো?

আমি কি তখন মুক্তি পেয়ে যাবো?

কে জানে এই আধ্যাত্মিক যুক্তির সত্যিকার কোন মানে আছে কি না। কিম্বা এ সবই শুধুমাত্র একটি কবিতার কয়েকটি চিত্রকল্প। যাই হোক, এসব এখন আমার অপরিচিত এবং বিচিত্র কতকগুলি অনুভূতি থেকে স্বতোৎসারিত। এই অনন্ত মুহূর্তগুলিকে চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলতে চাই না। এগুলো আমি ধরে রাখতে চাই। মানুষের আত্মা যেন এমনি অন্ধকারে আর কোনদিন এসে পথ না হারায়, সেজন্য।

অনেক দূর হাঁটলাম মুক্তি পাবো এই আশায়। জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা থেকে কবে যে মুক্তি পাবো। আনন্দ কাকে বলে? শৈশবে কি আমার আনন্দ বলে কোন সম্পদ ছিলো? মফস্বল শহর, ছায়া ঢাকা গ্রাম্য পথ—শাদা দেয়াল টিনের তালা ইস্কুল ঘর···চশমা চোখে হেডমাস্টার মশাই···কালো মোটা পণ্ডিত মশাইয়ের হাতে সপাং সপাং বেত···চ্যাংড়া ছেলে সদানন্দের মুখে হাসি। কি একটা কথায় যেন সবার একসঙ্গে হাততালি দিয়ে ওঠা··· এই কি আনন্দ?

না টুটু নামের সেই মেরুন রঙের ফ্রক পরে সলজ্জ হাসা মেয়েটার জন্যে আমার সারা বুকে অস্থির তোলপাড়, রেলোয়ে ব্রীজ থেকে বান-ডাকা, পাক-খাওয়া, নদীর বুকে ঝাঁপ দেয়া দুঃসাহসী মন নিয়ে গোরস্তানে গিয়ে সাহসের পরীক্ষা দেয়া—এ সবই কি আমার আনন্দ?

না আনন্দ আরো কিছু? যদি আরো কিছু থাকে তবে আমি তা জানি না।

যৌবন কবে এলো। আমি কি যুবক হয়েছি কোন দিনও? অন্ধকার একাকী

শয্যায় কোন সুন্দরী নারীর শরীর কল্পনা করে করে কৃত্রিম উত্তেজনায় অধীর হয়ে শেষটা ঝিমিয়ে পড়ায় কি যৌবনের কোন লক্ষণ প্রমাণিত হয় ?

কে জানে যৌবন তাহলে কি ? কেউ তো কোনদিন বলে দেয়নি আমায়। আমার অনুভূতির এই রাজ্যে যৌবন কোনদিন আসবে না। যদি কোন কামাতুরা নারীকে নিয়ে আমি এক শয্যায় শুয়ে তার উত্তপ্ত এবং অধীর শরীরকে তৃপ্ত এবং শান্ত করে দিতে পারি—তবুও যৌবন আসবে না।

কেন আমি অনন্তকাল ধরে এমন কি একটা অন্তহীন অন্ধকারের বুকে মাথা কুটে মরবো ? একটুখানি শব্দ আর এক ঝলক আলোর পিপাসায় বন্দী থাকবো ? কী জানি, আমি নিজেরই ওপর নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নিতে পারি না।

আমি কি খুঁজেছি, আমার প্রার্থনার সেই লক্ষ্য যে কী তা বলতে পারিনা। শুধু বুঝতে পারি তা এমন কিছু যা আমাকে এই দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে দেবে কিন্তু তা কী, কে বলে দেবে আমাকে ?

হঠাৎ এক ঝলক আলো পড়লো। আমি সেই আলোতে প্রতিফলিত হয়ে জ্বলে উঠলাম। সাথে এলো সেই নিঃসঙ্কোচ যন্ত্রের বিজয় ঘোষণা। মাটির ভেতরে কোথায় যেন গুম গুম শব্দ হচ্ছে। মাটি কাঁপছে। শীতল শক্ত ইস্পাতের পাত দুটো জ্বলছে, যেন সে দুটো স্বর্গে যাবার সেতু। উজ্জ্বল এবং পবিত্র।

চলো যাই, চলো যাই। শত সহস্র কণ্ঠ যেন আমায় ডাকছে। চারিদিক এই মুহূর্তে আলোয় আলোময়। আমি কি এখন মৃত্যুর দরজা অতিক্রম করে যাচ্ছি ? সেই কালো অন্ধকার, বাদুড়, পেচক, নিঃশব্দ কৃষ্ণচূড়া, তন্দ্রাচ্ছন্ন শিরীষ এবং শক্ত রাজপথ—সবাই কি আমার ফেলে আসা খোলস ?

চলো যাই, চলো যাই। ব্যগ্রকণ্ঠ আহ্বান আমার চেতনায় বিদ্যুৎশিখার মতো চমকিত হচ্ছে। এই কি তবে আমার মুক্তির আয়োজন ?

গাড়িটা চলে গেলো। অন্ধকার এবং নিঃশব্দতার বুক চিরে দু'ভাগ করে দিয়ে। এখন আমি আবার মুখোমুখি অন্ধকারে একাকী।

তারপর আবার নির্জন পথ। যে পথে আমি হেঁটে এসেছিলাম।

একটা গাড়ি চলে গেলো। মুহুর্মুহু আহ্বান জানিয়ে। কিন্তু আমি যেতে পারলাম না।

আমি মুক্তি চাই। আমি মুক্তি চাই। আমার এই তীব্র আর্তনাদ কি কেউ কোনদিন শুনবে না ?

না, শুধু নারীর স্তন এবং ঠোঁট দেখে দেখে সেই পিচ্ছিল এবং পাশব এবং

অন্ধকার অনুভূতির ভেতরে হারিয়ে যেতে পারি না, তিল, তিসি এবং যবের হিসেব করতে করতে স্থূল ও নিস্প্রাণ একটি স্বর্ণপিণ্ড হতে চাই না।

বা, অশ্লীল চাটুকারের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত নিরাশ এবং অসহায় অবস্থায় বিন্দুমাত্র আর্তনাদ না করে মরে যেতে পারি না।

নিজের ঘরে আবার ফিরে এসেছি। সেই অন্ধকারের পাথরে পার হয়ে। কিন্তু একি সেই ঘর যা মাথার ওপর আশ্রয়ের মতো চিরকাল শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি জানি থাকবে না। কেননা একটু আগে উন্মত্ত ও অস্থির কটি অনুভূতির পাকে গিয়ে পড়েছিলাম।

আমি কি এখন ঘুমোবো?

আমার ঘুমোনো উচিত। কিন্তু কেন ঘুম আসে না আমার? যদি ঘুমোতে পারতাম।

সবাই ঘুমিয়েছে এখন সুখী এবং স্থূল মানুষের পয়সা দিয়ে পুষে রাখা স্ফীতযৌবনা নারীর সঙ্গে মধ্যরাত্রির রমণের শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্ত হয়ে। সেই স্বর্ণলোভী বণিকেরা। যাদের কাছে আমি কিছু খাদ্য প্রার্থনা করেছি, তারা আরো স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছে। নারীর পাশে কুঁড়েঘরে কিছু আমারই মতো জীবিকাহীন পশু বাস করে—তারাও ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে।

শুধু আমি একাকী জেগে। আমার সম্মুখে অনন্তকাল ধরে একটা কালো শক্ত আর শীতল রাজপথ, আমার চারপাশের শূন্যতার রঙ কালো। সবকিছু চুপ। কৃষ্ণচূড়া চুপ, শিরীষ চুপ, আর গাছের অন্ধকারে ঘষে ঘষে পেচকের ঝাঁক তাদের নখ এবং ঠোঁট শানিত করে রাখছে।

অন্ধকারের ভেতরেও আমার ঘরখানাকে দেখতে পাচ্ছি। চোখ দিয়ে নয়। জাগ্রত চেতনা দিয়ে। ডাইনে হাত বাড়ালেই ভাঙা টেবিলটা ছোঁব। একটু হাতড়ালে পাওয়া যাবে সেই ড্রয়ারটা যার ভেতরে একটা কৌটো রেখেছি।

আমি হাতের কাছে ঘরের সবকিছু পেতে পারি। যদিও আমার দু'চোখের মধ্যে সমস্ত রাত্রির অন্ধকার। আমি অনুভব করছি, পেছনে রয়েছে অনেকদিনের ব্যবহৃত ঘামে ধুলোয় ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড়ের জাক। দেয়ালের ফোকরে খালি দেশলাইয়ের বাক্স, আধপোড়া সিগ্রেট, আধপোড়া মোম, কয়েকখানা আধছেঁড়া সাময়িকী, যেগুলোতে আমার লেখা গল্প ছাপা রয়েছে। সব আমি দেখতে পাচ্ছি। সেই গল্পগুলোর অক্ষর পর্যন্ত।

আমি এখন আধপোড়া মোমবাতিটা জ্বালাবো। তারপর লিখতে বসবো।

লিখবো সেই বিদ্যুৎগতি আলোর উল্লাসের কথা, সেই চিরমুক্ত গতিবান পবিত্র শব্দের কথা। লিখবো, সেই শব্দ সেই আলো আমায় ডাক দিয়ে গেছে। আমি নিজে পারিনি।

কিম্বা আমি এখন ঘুমিয়ে পড়বো, ভুলে যাবো এই অন্ধকার প্রকাণ্ড গুহার কথা, এই নিঃশব্দ গাছপালা, ফুল এবং রাস্তার কথা। ভুলে যাবো এই কথা। ভুলে যাবো অদৃশ্য বাদুড় পেচক এবং ইঁদুরের কথা। সব ভুলে আমি ঘুমোব আবার জেগে উঠবার জন্যে। জেগে উঠে আবার আমায় ছুটতে হবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। অনেকদিন ভালো করে খাইনি। জেগে উঠে আমায় যন্ত্রণায় ছটফট করতে হবে। গীতির কথা মনে পড়বে। আমার মনে ঘৃণা হবে, নিজের ওপর, পৃথিবীর মানুষের ওপর। নিজেকেই তখন অভিশাপ দেবো। এমনি দিনের পর দিন। তারপর? তার চাইতে যদি অন্য কিছু হতো। যদি এর থেকে মুক্তির পথ বলে দিতো আমায় কেউ।

চার

মাহমুদের গল্প এখানেই শেষ। একটু আগে আমি এবং আমার বন্ধু মাহমুদের ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছি! লোকজন এসেছিলো কিছু। ওরা সবাই পুলিশে খবর দিতে গিয়েছে। আমি বসে বসে লাশ পাহারা দিচ্ছি। এই অবসরে টেবিলের ওপর রাখা পাণ্ডুলিপি পড়ে ফেললাম। নতুন ফর্মে লেখা মাহমুদের গল্প। আমারই সম্মুখে মাহমুদ ভাঙা তক্তপোশের ওপর শুয়ে। কুঁকড়ে রয়েছে। বিষ খাওয়ার পর নিশ্চয়ই ওর কষ্ট হয়েছিলো। মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। অথচ কি আশ্চর্য, কেউ টের পায়নি।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আমার কিছু বলাব আছে

বলতে গেলে একটা উঁচু টুলের দবকার

ভাল গলাব দরকাব

আমাব উঁচু টুল নেই

আমার ভাল গলা নেই

টুল ধার চেয়েছি কেউ দেয়নি

ভাঙা গলা ঠিক করার চেষ্টা করেছি পারিনি

অথচ আমাকে বলতে হবে বলার আছে

আমি বলব

আমি বলব বিরুদ্ধে সবার বিরুদ্ধে সব কিছুর বিরুদ্ধে গাছের পাতা গজানোর বিরুদ্ধে ঝরে পড়ার বিরুদ্ধে যৌবনের বিরুদ্ধে বার্ধক্যের বিরুদ্ধে সূর্যের বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে মরে যাওয়ার বিরুদ্ধে সাহিত্যের বিরুদ্ধে রাজনীতির বিরুদ্ধে কাপড়ের বিরুদ্ধে প্যাণ্টের বিরুদ্ধে চুলের বিরুদ্ধে টাকের বিরুদ্ধে সাদার বিরুদ্ধে কালোর বিরুদ্ধে মানুষের বিরুদ্ধে পশুর বিরুদ্ধে সুক্তোর বিরুদ্ধে মাংসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শাস্তির বিরুদ্ধে প্রেমের বিরুদ্ধে ঘৃণার বিরুদ্ধে পেন্সিলের বিরুদ্ধে কলমের বিরুদ্ধে পেরেকের বিরুদ্ধে ক্ষুর বিরুদ্ধে হাতের বিরুদ্ধে পায়ের বিরুদ্ধে সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যার বিরুদ্ধে ফুলের বিরুদ্ধে কাঁটার বিরুদ্ধে জলের বিরুদ্ধে মরুভূমির বিরুদ্ধে মা-র বিরুদ্ধে বাবার বিরুদ্ধে স্ত্রীর বিরুদ্ধে মেয়ের বিরুদ্ধে তোমার বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে সকলের বিরুদ্ধে

আমি বলব

আমার কিছু বলার আছে
জানি আমার টুল নেই
জানি আমার গলা নেই
জানি বলতে গেলে আমার চার ফুট দেহ দেড়ফুট হয়ে যায়
জানি আমার হাত হারিয়ে যায়
জানি কাপড়ে আমার পা জড়িয়ে যায়
জানি আমার চুল ঝরে যায়
জানি আমার জিভ নাড়াতে পারি না
জানি আমার দাঁত আলগা হয়ে যায়
তবু আমাকে বলতে হবে
আমি বলব
আমার কিছু বলার আছে
আর এই তার উপযুক্ত সময়
এখন রাস্তায় অনেক লোক

এদের মধ্যে বুড়ো আছে বুড়ি আছে যুবক আছে যুবতী আছে কিশোর আছে কিশোরী আছে বালক আছে বালিকা আছে

কেউ নীল জামা পরে কেউ সাদা জামা কেউ হলদে জামা কেউ কাল জামা কেউ লাল জামা কেউ গোলাপী জামা কেউ ধুতি পরে কেউ প্যান্ট কেউ ফুলসার্ট কেউ হাফসার্ট কেউ পাঞ্জাবি কেউ ফতুয়া

কারো মাথায় চুল কারো টাক কারো দাড়ি আছে গোঁফ আছে কারো দাড়ি নেই গোঁফ নেই

কারো পায়ে জুতো কারো নেই কারো বুট কারো স্যাণ্ডেল কারো চটি কারো পাম্পসু কেউ হেঁটে যাচ্ছে কেউ দাঁড়িয়ে কেউ গাড়িতে উঠছে কেউ নেমে পড়ছে কেউ হাসছে কেউ চুপ করে আছে

এখন এই সময়
এই তার উপযুক্ত সময়
কেসে গলাটা পরিষ্কার করলাম
বন্ধুগণ
কেউ তাকাল না
বন্ধুগণ

কেউ তাকাল না
বন্ধুগণ
কেউ তাকাল না
বন্ধুগণ
কেউ তাকাল না

আমি বোধ হয় দেড় ফুট হয়ে গেছি আমার হাত হারিয়ে গেছে কাপড়ে আমার পা জড়িয়ে গেছে আমার চুল ঝরে গেছে জিভ আটকে গেছে দাঁত আলগা হয়ে গেছে

তাহলে
তাহলে কি করব এখন
অথচ আমাকে বলতে হবে
আমার কিছু বলার আছে
অবশ্য আমি লিখতে পারি লিখে সব বলতে পারি লিখে রাস্তায় পড়তে পারি
ছাপিয়ে বিলি করতে পারি
রাস্তার দেওয়ালে আঁটতে পারি
আমি লিখব
লিখেই সব বলব
আর আমার লেখার কোন অসুবিধে নেই
আমার কাগজ আছে
আমার কলম আছে
আমার টেবিল আছে

ফেরার পথে একটা লোক ধাক্কা দিল
কিছু বললাম না
ফেরার পথে একটা লোক গায়ে পানের পিক ফেলল
কিছু বললাম না
ফেরার পথে একদল মেয়ে আঙুল দেখিয়ে হাসতে হাসতে গেল
কিছু বললাম না
ফেরার পথে কারা যেন মাথায় ময়লা ফেলল

কিছু বললাম না।
আমি লিখব লিখেই সব বলব আর আমার লেখার কোন অসুবিধে নেই
আমার কাগজ আছে আমার কলম আছে আমার টেবিল আছে
ফেরার পথে কিছু খেয়ে নিলাম
ভাতে কাঁকর ছিল
কিছু বললাম না।
ডাল পোড়া ছিল
কিছু বললাম না।
মাছটা পচা ছিল
কিছু বললাম না।
ভাতের দাম বেশী নিল
কিছু বললাম না।
আমি লিখব লিখেই সব বলব আর আমার লেখার কোন অসুবিধে নেই
আমার কাগজ আছে আমার কলম আছে আমার টেবিল আছে

ঘরে ফিরে দেখি জানলা খোলা।
কিছু বললাম না।
দেখি ইঁটের টুকরো।
কিছু বললাম না।
দেখি ভাঙা গেলাস
কিছু বললাম না।
দেখি বিছানাটা ভেজা।
কিছু বললাম না।
আমি লিখব লিখেই সব বলব আর আমার লেখার কোন অসুবিধে নেই
আমার কাগজ আছে আমার কলম আছে আমার টেবিল আছে
তবে এখন নয়
আর একটু পরে
আর একটু রাত হোক
মানুষ ঘরে ফিরে যাক বিছানায় ফিরে যাক চারদিক শান্ত হোক রাস্তা ফাঁকা হোক

আমি ততক্ষণ শুয়ে থাকি বিছানায় শুয়ে থাকি ভেজা বিছানায় শুয়ে থাকি শুয়ে ভাবতে থাকি বাইরে রাত্রি বাড়ুক ঘরে রাত্রি বাড়ুক

আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকি ততক্ষণ ভেজা বিছানায় শুয়ে থাকি ততক্ষণ শুয়ে ভাবতে থাকি

পাশে টেবিল পড়ে আছে

টেবিলে ড্রয়ার আছে

ড্রয়ারে কাগজ আছে

ড্রয়ারে কলম আছে

আমার এখন শুধু উঠে বসা উঠে লিখতে শুরু করা

তবে এখন নয় আর একটু পরে আর একটু রাত হোক

আমি শুয়ে রইলাম ভেজা বিছানায় শুয়ে রইলাম শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম

তারপর রাত্রি হল

চোখে ঘুম এলেও তাড়িয়ে দিলাম

মানুষ ফিরে গেছে ঘরে ফিরে গেছে চারদিক শান্ত হয়েছে রাস্তা ফাঁকা হয়েছে

আকাশে ফর্সা চাঁদ থমকে আছে ঘর ভরে গেছে আলোয় ভরে গেছে

আমি এবার উঠব

উঠে আলো জ্বালব

আমি লিখব লিখেই সব বলব

আমি বলব

আমার কিছু বলার আছে

আমি এতকাল পারিনি আজ পারব পারতে হবে

আমি উঠব এবার উঠব

উঠতে গিয়ে দেখি শরীরটা সোলা হয়ে গেল উঠতে গিয়ে দেখি বালিশ কাঁথা পিঠের তলা থেকে সরে গেল উঠতে গিয়ে দেখি তক্তপোশ দুভাগ হয়ে গেল উঠতে গিয়ে দেখি টেবিল দুভাগ হয়ে গেল

বালিশ কাঁথা পিঠের তলা থেকে সরে গিয়ে শূন্যে ভাসতে লাগল তক্তপোশ দুভাগ হয়ে শূন্যে ভাসতে লাগল তার পায়া খসে পড়ল শূন্যে ভাসতে লাগল টেবিল দুভাগ হয়ে শূন্যে ভাসতে লাগল তার পায়া খসে পড়ল শূন্যে ভাসতে লাগল ড্রয়ার খুলে পড়ল শূন্যে ভাসতে লাগল কাগজগুলো ড্রয়ার খুলে পড়ল শূন্যে ভাসতে লাগল কলম ড্রয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ল শূন্যে ভাসতে লাগল

ওদের ধরতে গিয়ে আমার ডান হাত খসে গেল
ওদের ধরতে গিয়ে আমার বাঁ হাত খসে গেল
উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আমার দুপা খসে গেল
ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে আমার মাথা খসে গেল
সব আলাদা হয়ে গেল
সব শূন্যে উঠে গেল
সব ভাসতে লাগল
ঘরে চাঁদের ফর্সা আলো ছিল
সব ঘুরতে লাগল
ঘরে চাঁদের ফর্সা আলো ছিল
সব ঘরময় ঘুরতে লাগল

বালিশ কাঁথা ঘুরতে লাগল তক্তপোশ দুভাগ হয়ে ঘুরতে লাগল টেবিল দুভাগ হয়ে ঘুরতে লাগল তক্তপোশের চারটে পা চারদিকে ঘুরতে লাগল টেবিলের চারটে পা চারদিকে ঘুরতে লাগল ড্রয়ার ঘুরতে লাগল কাগজ ঘুরতে লাগল কলম ঘুরতে লাগল আমার দুহাত দুদিকে ঘুরতে লাগল আমার দুপা দুদিকে ঘুরতে লাগল আমার মাথা ঘুরতে লাগল আমার ধড় ঘুরতে লাগল

ঘরে চাঁদের ফর্সা আলো ছিল
সব ঘরময় ভাসতে লাগল
সব ঘরময় ঘুরতে লাগল

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

স্যুটকেসদুটো সাঁ করে তুলে নিয়ে বেয়ারা দোতলার সিঁড়ি ধরল। ওরা পেছনে যেতে যেতে একতলাটা খুঁটিয়ে দেখে নিল। দোতলায় লম্বা করিডর। দুপাশে বেশ কয়েকটা ঘর। একটা ঘরের ভেজানো দরজা দিয়ে আলো আসছিল। করিডোরের শেষে দুটো বাথরুম। দুটো দরজাই হাট করা।

বেয়ারা চব্বিশ নম্বর ঘরে স্যুটকেশদুটো রেখে বেরিয়ে গেল।

—বেয়ারা না গুণ্ডা!

—গুণ্ডা। মালিক-বেয়ারা সবাই। গুণ্ডার হোটেল।

—তাহলে?

—তাহলে আবার কি। মোটে ত একটা রাত।

—অন্য হোটেল—

—অন্য হোটেল আছে কি না কে জানে। তাছাড়া এই বৃষ্টির মধ্যে—

—আমার কেমন যেন…

মীরা ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার সামনে। শুভ মীরার দিকে পেছন ফিরে। একজন আয়নার ভেতর থেকে একজন বাইরে থেকে ঘর দেখতে লাগল। লম্বাটে ছোট্ট ঘর। দুপাশে দুটো দেড়হাতি তক্তপোশ। ওপরে নোংরা তোষক। চাদর নেই। দুটো তক্তপোশের মধ্যে হাতখানেক ফাঁকা মেঝে। মেঝেতে বালি। দেয়ালে ছোপ ছোপ ড্যাম্প্‌। ঘরের মাথার দিকে জেলখানার মত একটা জানালা।

—চল খেয়ে আসি

—চল

বলার পরেও ওরা আরও কিছুক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বেরিয়ে দরজায় তালা দিল। নিচে নামামাত্রই আটদশটা বেয়ারা ওদের দিকে তাকিয়ে কিসব বলাবলি করতে লাগল। নিচু গলায়, উঁচু গলায়, কখনো ঝগড়ার ভঙ্গিতে। শুভ, মীরা ওদের ভাষা একবর্ণও বুঝতে পারল না।

ও কোণায় বসে দুটো লোক ওদেব দিকে তাকিয়ে রুটি খাচ্ছিল। আব কোনো খদ্দেব নেই। বৃষ্টি পডছিল সমানে। শুভ আর মীরা এপাশেব দুটো চেয়ারে বসল। একটু পরে বেয়ারা এল। তাগড়া চেহারা। পরণে লুঙ্গি, গায়ে কালো কোট। মীরা ফিসফিস করে বলল—গুণ্ডা। শুভ জোরে বলল—কি আছে? বেযাবা বুঝতে পারল না। শুভ তখন ইংরেজীতে মেনু চাইল। বেয়ারা ওপাশের কালো বোর্ডের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। চক দিয়ে মেনু লেখা। হাতের লেখা আর খাবারের নাম এমনই উদ্ভট যে অনেকগুলো বোঝাই গেল না। শুভ তিন আর এগারো নম্বর অর্ডার দিল।

প্রথমে জল। তারপব এল প্লেটভর্তি কাঁচা পেঁয়াজ আর চাটনি। বেশ কিছুক্ষণ পরে ডিমের কারি আর ভাত। ভাত ঠাণ্ডা ডিমের কাবি গবম।

দুখানা হাত দুটো প্লেটে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে দিল।

—কিছুইতো খাচ্ছ না

—তুমিওতো না

—ভাল্ লাগছে না

—আমারও না

—চল ওঠা যাক

—চল

কলে জল নেই। একটা ছোট ছেলে মগে করে জল নিয়ে এল। তোবড়ানো মগ। তলাটা যাচ্ছেতাই কালো। কোনরকমে মুখ ধুয়ে মীরা আস্তে বলল—সুপুরী। শুভ জোরে বলল—সুপুরী। বেয়ারা বুঝতে পারল না। শুভ আর বোঝাবার চেষ্টা করল না। বিল মিটিয়ে ওপরে উঠে এল। নিচে আবার, নিচু-উঁচু গলায়, ঝগড়ার ভঙ্গিতে কথা শুরু হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে খিল দিতে দিতে শুভ বলল,

—এই রে।

—কি?

—খিল ভাঙা

—তাহলে!

—সবটা না, একটুখানি ভাঙা

—জোরে ধাক্কা মারলে—

—মারবে কেন?

মীরা ঘড়ি খুলে টেবিলে রাখল। তারপর ড্রয়ারে। ড্রয়ার বন্ধ করতে গিয়েও করল না। স্যুটকেস খুলল। স্যুটকেসের পকেটে নিজের আর শুভর ঘড়ি রাখল। টেবিলের পরে সাজিয়ে রাখল শাড়ি, পাজামা, চাদর, টুথপেস্ট, ব্রাস্ আর ফেস্‌ক্রিম।

শুভ প্যান্ট খুলে পাজামা পরল। মীরা শাড়ি পাল্টাল। শুভ জামা খুলল। জামার তলায় সোয়েটার! সোয়েটার খুলতে গিয়েও খুলল না। মীরা দেয়ালেব দিকে ঘুরে ব্লাউজ খুলল। শুভ দুহাতের তালু ঘসতে ঘসতে উ-উ-উ-উ করে শীত তাড়াবার আওয়াজ করল।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। 'কে?' শব্দ আরো বেড়ে গেল। 'কে——এ—এ?' কোনো উত্তর এল না। মীরা ততক্ষণ চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। শুভ দরজা খুলল। সেই কালো কোটপরা বেয়ারাটা। দুহাতে দুটো বিছানার চাদর। চাদর পেতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুভ আবার খিল দিল।

—অসভ্য

—কে?

—কে আবার! লোকটা

—কেন?

—কেমন করে তাকাচ্ছিল যেন

শুভ কি যেন উত্তর দিতে গিয়ে দিল না। তারপর বলল,

—বাথরুম যাবে?

—না

—জল খাবে?

—না

—আলো নেভাব?

—না

—তাহলে শুয়ে পড়, ভোরে উঠতে হবে

মীরা বিছানায় চাদরের পরে আরো দুটো চাদর পাতল। বালিশ দুটো একটু চাপ দিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল। পায়ের কাছে দুটো গায়ের চাদর রাখল।

—তুমি কোথায় শোবে ?

—আমি ?

পায়ের গোছায় ইলাস্টিকের মোজার দাগ পড়েছে। সেই দাগে হাত বুলোতে বুলোতে শুভ আবার বলল—আমি ?

এমনসময় দরজায় টোকা পড়ল। 'কে ?' শব্দ বেড়ে গেল। 'কে—এ—এ ?' উত্তর এল না। শুভ ইতস্তত করে দরজা খুলল। সেই কালো কোটপরা লোকটা। হাতে কাচের জাগ্‌ভর্তি জল আর দুটো গ্লাস। টেবিলে রাখল। রেখে চলে গেল। শুভ আবার দরজায় খিল দিল।

—ওজুহাত

—কিসের ?

—জল দেবার

—বাঃ, জল দেবেনা ?

—আমাদেরতো ওয়াটারবট্‌ল আছে

—জল আছে কিনা কি করে জানবে ?

—জানে

—কি করে ?

—জানে···বদমাইসী···

শুভ উত্তর দিল না। হাসল। হাসতে হাসতে হাই তুলল। তারপর শুয়ে পড়ল। মীবা কিছুক্ষণ একইভাবে বসে থাকল। উঠে গিয়ে ঠোঁটে গালে ক্রিম ঘসল। ঝুঁকে পড়ে দরজার খিল পরীক্ষা করল। তারপর শুয়ে পড়ল।

—বাসটা পেলে এতক্ষণ পৌছে যেতাম

—ভালই হয়েছে একদিক থেকে

—কেন ?

—এই ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের মাথায়

—হোলোইবা, নিশ্চিন্ত হওয়া যেত

—কিসের থেকে ?

—কিসের থেকে আবার। একটা ভাল হোটেল অন্তত

—এটা কি খারাপ ?

—খারাপ না। ভালোয় ভালোয় রাত্তিরটা

—তুমি খুব ভয় পেয়েছ ?

—মোটেই না।

—মোটেই হ্যাঁ।

মীরা হাসল। হাসতে হাসতে ঢেকুর তুলল। আঙুল দিয়ে চোখের কোণা চুলকে গায়ের চাদর গলা অব্দি টেনে তুলল। শুভ হাসল। ধাক্কায় তক্তাপোষ ক্যাচক্যাচ করে উঠল। সিগারেটের ছাই ভেঙে পড়ল বিছানার পরে।

এমনসময় আবার দরজায় টোকা পড়ল। 'কে ?' শব্দ বেড়ে গেল। 'কে—এ—এ ?' উত্তর এল না। শুভ ইতস্তত করে দরজা খুলল।

সেই কালো কোটপরা লোকটা। চৌকাঠে পা রেখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে জিগ্যেস করল—'বেড্‌টি কটায় ?' শুভ পেছনে ফিরে বলল—'কটায় বলব ?' মীরা উঠে বসেছে। 'দরকার নেই।' শোনা কথাটা ইংরেজীতে অনুবাদ করল শুভ। লোকটা বুঝতে পারল না। দরজায় ভর দিয়ে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। শুভ তখন বলল—'আটটায়, না না ঠিক সাতটায়।'

লোকটা চলে যেতেই মীরা বলল, 'ওকে বলে দাও রাতে যেন আর না আসে।' শুভ বাইরে উঁকি মারল। নেই। লোকটা চলে গেছে।

শুভ গম্ভীর হয়ে মীরার দিকে তাকাল। দরজায় খিল দিল। কেসে গলা সাফ করল। একবার শিস দিল। তিনহাত জায়গার মধ্যে পায়চারি করল। তারপর দরজার দিকে একবার তাকিয়ে শুয়ে পড়ল। মীরা কাত হয়ে শুয়ে বিনুনিটা ঠেলে দিল মাথার দিকে।

মাথার ওপরের ছোট্ট জানলা দিয়ে একঝলক হাওয়া ঢুকল। ঠাণ্ডা হাওয়া। দেওয়ালে ঝুলে থাকা শুকনো চুনের দলা, মাকড়শার জাল, লালচে বাল্‌বের ঝুল, আয়নার ধুলো, মেঝের বালি, শুভ আর মীরার মুখের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। দেয়ালের ড্যাম্প্‌ কেমন যেন শুকিয়ে এসেছে। ঘরের আলো আর একটু উজ্জ্বল। শুভ সিগারেট ধরাল। লম্বা একটা টান মেরেই সিগারেটটা মেঝেয় চেপে নিভিয়ে ফেলল। হাতটা তুলল না কিন্তু তক্ষুনি। হাতটা দুলতে লাগল দুটো তক্তপোষের মধ্যের একহাত জায়গায়। দুলতে দুলতে এক সময় উঠে এসে মীরার তক্তপোষের কোণা ধরল। কোণা ছেড়ে মীরার হাত। মীরা চাদরটা বুক থেকে গলায় টেনে তুলল।

—ঘুম পাচ্ছে না ?

—পাবেনা ! ভীষণ

—আমারও

কেউ চোখ বুজল না। পাশ ফিরল না। বিরাট হাই তুলে চোখের কোণের জল মুছল না। শুভর আঙুলগুলো খুব ফর্সা। আরও ফর্সা পাথরের একটা আংটি আঙুলে। চারপাশের লোমগুলো খুব বড় বড। মীরা লোমগুলো আস্তে আস্তে টানতে লাগল।

ঠিক এমনসময় ঘরের আলো নিভে গেল। 'কি হল?' 'আলো নিভল কেন?' সামান্য আগেপিছে দুজনেই উঠে বসল। শব্দ হল দুটো তক্তাপোষেই। ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার। মাথার ওপরের ছোট্ট জানালাটা ফ্যাকাশে। একটা উজ্জ্বল আলোর ফালি আসছিল জানালা দিয়ে তাও নেই।

শুভ দেশলাই জ্বালল। এই আলোয় মীরা জড়সড় হয়ে বসে। এই আলোয় দেয়ালের ড্যাম্প্, মাকড়শার জাল, ঝুল, আয়নার ধুলো অনেক বেড়ে গেছে। আগুনটা আঙুল ছুঁতেই শুভ কাঠিটা মেঝেয় ফেলে দিল। ঘরের অন্ধকার আরো বেড়ে গেল।

শুভ সিগারেট ধরাল। মীরা একভাবে বসে। মীরার চোখ দুটো বড। আরো বড় লাগছে। চোখের মণিটা কালো। আরো কালো লাগছে। ঠোঁটের পরে কুচি-কুচি ভাঁজ পড়েছে অনেকগুলো। কি যেন বলতে যাবে এমন সময় বারান্দায় অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। সেই ভাষা। এক বর্ণ বোঝার উপায় নেই। এলোমেলো পা-ফেলা আর গলার স্বর আস্তে আস্তে ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

শুভ উঠে দাঁড়াল। মীরাও। শুভর গা ঘেঁষে। জুতোর আওয়াজ জড়ানো শব্দগুলো দরজার সামনে এসে থেমে গেল। মীরা শুভর হাত খামচে ধরল জোরে। সিগারেটের আগুনে আঙুলে ছ্যাঁকা লাগল শুভর।

সামনের ঘরের তালা খোলার শব্দ হল। এলোমেলো পায়ের শব্দ ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল। কি যেন ঝনঝন করে মেঝেয় পড়ল। কয়েকটা তক্তাপোষ ক্যাচ ক্যাচ করে উঠল। আর কোন শব্দ শোনা গেল না। আরো কিছুক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর শুভ মীরার কাঁধে আলতো করে চাপ দিল। মীরা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল। হাতদুটো ভীষণ ঠাণ্ডা। গলার কাছে বিনুনিটা দলা পাকিয়ে ছিল। সমান করে পেছনে ঠেলে দিল শুভ। 'ঘুমোও।' মীরা শুয়ে পড়ল। শুভও।

অন্ধকার এখন আবছা। মীরার একটা হাত মাথার পেছনে। একটা না দুটো হাত ঠিক বুঝতে পারল না শুভ। না বুঝতে পেরে গলার চাদর থুতনি পর্যন্ত টেনে

তুলল হাই তুলল। তারপর চোখ বন্ধ করল। গলার কাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে। কপালের দুপাশের শিরাটা দপদপ করছে সমানে। আর শরীরটা কেমন দুলছে। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে যেমন হয়। আড়াইদিনের ট্রেন জার্নি। তারপর কাল সকালে আবার ঘণ্টাখানেক বাসে যেতে হবে। কয়েকবছর বাদে আবার পাহাড়ে ওঠা। এ পাহাড়ে আবার লেক আছে। লেকে বোট। পাশে পাইন গাছেব সারি। দূবে বরফের পাহাড়। ট্যুরিস্ট ব্যুরোর ছবিটা চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সেবাব বন্ধুবা ছিল। এবার সঙ্গে মীরা। মীরা কখনো পাহাড়ে ওঠেনি। নাকি ছোটবেলায়…কি যেন বলছিল সেদিন।

—মীরা

—ঘুমোও নি ?

—আচ্ছা তুমি কখনো পাহাড়ে উঠেছ ?

—কটা বাজে এখন ?

—কখনো সমুদ্র দেখেছ ?

—ভাল্ লাগে না ছাই। কখন ভোর হবে !

—ইচ্ছে করে পাহাড়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিই

—কি হোটেলরে বাবা…বুকের মধ্যেটা এখনো

—ইচ্ছে করে

—ঘুমোওতো

দুটো তক্তাপোষেই ক্যাচক্যাচ করে শব্দ উঠল আবার। ঠাণ্ডা হাওয়া ঘুবতে লাগল ঘরেব মধ্যে। অন্ধকার ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। মীরা দেয়ালের দিকে তাকাল। যেখানে ড্যাম্প্ সেখানে অন্ধকার বেশী। চুনের দলা জমে থাকা জায়গাগুলি সামান্য পরিষ্কার। শুভ শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর ঢাকা। চাদরের ঢেউগুলো হাওয়া আর নিশ্বাসের ধাক্কায় দুলছে অল্প অল্প। শুভ এমনিতেই লম্বা। আরও লম্বা লাগছে চাদর মুড়ি দেওয়ার জন্যে। দুটো হাত চাদর টেনে মাথার পেছনে জড় হয়ে আছে। দুটো হাত না একটা হাত ! বুঝতে না পেরে মীরা চোখ বুজল।

ঠিক তক্ষুনি নিচে কারা উঁচু গলায় কথা বলতে শুরু করল। উঁচু থেকে আরও উঁচু। ঝগড়ার মত। কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। সেই বিচিত্র ভাষা। ভারী কি একটা আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বরগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কাপ না প্লেট ভেঙে গেল খান খান হয়ে। কে যেন দৌড়ে দোতলায় উঠে এসে আবার নেমে গেল।

মীরা আর শুভ দুজনেই তক্তাপোষের ওপর উঠে বসেছে। একটু পরেই দড়াম করে একটা দরজা খুলে গেল দোতলার। চটি ঘসে ঘসে কে যেন নিচে নেমে যেতেই সমস্ত চীৎকার থেমে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দূর থেকে একটানা মৃদু শব্দ ভেসে আসতে লাগল। হয় বৃষ্টির নয় গাছের পাতার। মাঝেমাঝে বারান্দার পায়রাগুলো পাখা ঝাপটাচ্ছে। এ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই! জানলা দিয়ে একটা চৌকো আবছা আলো ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে। চৌকো জায়গায় সিগারেটের টুকরো আর দেশলাইয়ের কাঠি। বাকি সব ঝাপসা।

আয়না, টেবিল, বাল্‌ব, দেয়াল, শুভ আর মীরার ওপর দিয়ে হাওয়া ঘুরতে লাগল। ঠাণ্ডা হাওয়া। কখনো জোরে কখনো আস্তে।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

মধ্যবিত্ত □ আসাদ চৌধুরী

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

সেই নিঝুম ছিমছাম রাতে আমাব ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালাব দিকে তাকাইনি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে কোনদিন আমি তাকাইনে। জানালায় কি যেন আছে, যার অস্তিত্বের ভাবনায় আমি কাতর, তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই তার ক্ষতি হবে। কী ক্ষতি হবে আসাদ? বিশ্বাস কর, আমি জানিনে, তখনো জানা ছিল না, আমাব কী ক্ষতি হতে পারে। তাকে আমার ভয়, ভীষণ ভয়।

একটি রাতের কথা মনে পড়ে। আমার বীরত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক রাত। আমাব শৈশবের অসংখ্য হারিয়ে-যাওয়া রাতের একটি উজ্জ্বল রাত। আকাশ ভরা তাবাব আলো। তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলছিল। শোবার ঘরের স্বল্প আলোয আমি খড়মটা খুঁজছি। খালি পায়ে পেচ্ছাবখানায় গেলে আম্মা মারেন। হারিকেন হাতে আম্মা খাবার ঘর পেরোলেন। কাঠের খিল খোলার বিশ্রী শব্দে জমাট নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। কিন্তু আমার খড়ম কই? এমন সময় আমার বন্ধু এলেন। তাঁর কোনো শরীর নেই, ভাষা নেই, সময় ও স্থান নেই। তাঁকে আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম অনুভূতিতে। তিনি খড়মটা আমার পায়ে ঢুকিয়ে দিয়ে হেসে বললেন, 'আসাদ, বাইরে জ্যোৎস্না থলথল করছে (সে রাতে জ্যোৎস্না ছিল না, তোমরা বিশ্বাস কর)। টুকরো টুকরো মেঘগুলো রাজকন্যার আঁচলের মত ঢেকে দিচ্ছে চাঁদের অমল আনন। বাতাসের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে আনন্দ। চল, দেখাই।'

আমি মনে মনে বলি, যদি জানালাটা না থাকে, সেখানে সর্বনাশটা না থাকে, যদি ভরসা পাই, তবে যাই।

জানালাটা ঠাস করে খুলে গেল।

অমনি যে অলকার ফুলে রাজকন্যা চুলে মালা সাজায়—তার ম ম করা গন্ধে; যে অজানা সুরে তিনি বীণা বাজান—তার আকুল সুরে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আমার মুগ্ধ দুই চোখের সামনে চন্দ্রালোকে, কতকালের কে জানে, পুরোনো জং-ধরা তালা খুলে গেল, ফুলের নিঃশ্বাস লাগল বুকে।

ঠাস করে আম্মা আমার গালে চড় দিলেন।

ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললেন, কাণ্ড দেখ, ডর লাগে অমুক লাগে, সমুক লাগে—এখন বাঁদরামি করে জানালা খুলে আকাশের তারা দেখছে।

বড় আশা করে জননী, জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

। দুই ।

হাত থেকে ট্রে পড়ে গেলে চায়ের কাপ ডিসগুলো যেমন একই সঙ্গে ভাঙ্গে এবং চামচগুলো শুধু ভদ্রতা করে সর্বনাশের সাইরেন শোনায়, তেমনি পাশ করার পর আমার অস্তিত্ব আর অহঙ্কারের একই দশা হল। অস্তিত্বটা চায়ের কাপ, না চামচ বুঝতে পারিনি। আশৈশব যত্নে লালিত অভিমানে সিক্ত আমার অহঙ্কারের টুকরো-গুলো আমি আর খুঁজে পেলাম না। আমি ধীরে আশ্রয়হীন রাস্তার কুকুরের মত হয়ে গেলাম। তখন আমি শহরের সরকারী-বেসরকারী সওদাগরী অফিসে আত্ম-বিক্রয়ের নোটিশ খুঁজেছি—দারুণ রোদে, দারুণ শীতে, নিদারুণ বসন্তে ও বর্ষায়। এখন আমার মনে হয়েছে, আমি কুকুর হয়ে গেছি। নিজেরই নোংরা গন্ধে আমি পাগল হয়ে যেতাম। আমার দগদগে ঘাগুলো, লোমহীন খসখসে দেহ আমাকে তাড়া করেছে। ইণ্টারভিউতে আমি গলগল করে ঘামতাম, স্বরযন্ত্রের সাহায্যে কত কষ্টে নির্ধারিত ধ্বনি তুলতাম, প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে (কোন্ ব্লেড দিয়ে আপনি শেভ করেন,—এ প্রশ্নটি, এই একটি মাত্র প্রশ্ন করার সাহস আমার কোনোদিনই হল না) এমন একটি দীন ভঙ্গি করে তাকাতাম, যার অর্থ হল, হুজুর, আপনার শ্রীচরণ পাদুকা-সহ আমার মস্তকে স্থাপন করুন, আমি পুলকিত চিত্তে পদলেহন করি, ধন্য হই, প্রসন্নচিত্তে কেঁউ কেঁউ করি।

অথচ তিন বছর আমার কোনো চাকরি হল না। এক মন্ত্রী ছিলেন আমার পরলোকগত জনকের বন্ধু। তিনি চেষ্টাটেষ্টা না করেই বড় বড় আশ্বাস দিতেন, আমি সেই আশ্বাসের উপর স্বপ্ন দেখতাম। সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে কথায় ধরে রাখলে কবিতার সুন্দর পংক্তি হতে পারে। কিন্তু আমি ধরে রাখিনি। প্রতিটি

স্বপ্নের মৃত্যু আমাকে বাস্তবতা নামক সত্যের দিকে ঠেলে দিল, আমি খুব কাঁদলাম অঝোরে, স্বপ্ন হননে কাঁদলাম। তাঁর স্ত্রী, অত্যন্ত রোগা এবং শীর্ণ, কৃতজ্ঞ থাক আসাদ, তুমি তাঁকে চাচী-আম্মা বলাব সুযোগ পেয়েছিলে, একদিন চিঁ চিঁ কবে বললেন, 'এই কাপড়-চোপড়ে এলে তোমাব চাচার মান থাকে ?' চাচার মান রাখাব জন্যে নয়, কোনো আশা নেই ভেবে আমি আর ও বাসায় যাইনি। অপমানিত না হয়ে, কোনো বিকেলে ভেবেছি, ওদেব বাসায় ভালো ব্লেণ্ডের চা খাওয়া হচ্ছে এখন।

সারমেয় বিজনে হাড় পেলে যে বিজয়ী ভঙ্গি করে, মতিঝিলের পঞ্চাশ টাকার ট্যুইশানিতে সে ভঙ্গি করাব সাহস আমার কোনোদিন হয়নি। তিন তিনটি বছরে আমার গাধা ছাত্রটি তিন ধাপ উঠেছে, কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন এসেছে, সম্প্রতি তার মান অপমান বোধও এসেছে, সঙ্গে এসেছে নাকের নিচে গোঁফাভাস।

গাধাটার কথা যাক।

এই দুঃসময়ে রকীবের বাসায় গিয়েছিলাম। ওর ছেলের জন্মদিন ছিল সেদিন। একটা চাকরীর আবেদনপত্র টাইপ করার পয়সাও ছিল না আমার। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে, লৌকিকতার জালে, আমি এতদিন নিজেকে জড়াইনি।

। তিন ।

—দোস্ত হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তখন শালাব সব দোকান-পাট বন্ধ।

হ্যাঁ, এই সংলাপটিই বিভিন্ন ধ্বনি-তরঙ্গে আবৃত্তি কবে করে হেঁটে গিয়েছিলাম কাওরান বাজার।

—তাতে কি ? তাতে কি হয়েছে ? (চোয়ালে ঘুসি মেরে আদর করছ কেন আএশা রকীব ?)

বন্ধুটি দেখে ও অভ্যর্থনায় এসেছিল।

(আমি এক সময় ভালো অভিনয় করতাম। দিলীপকুমাব হবার ইচ্ছা ছিল। কলেজে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলাম। ছোটবেলায় যাত্রার অভিনয় দেখে চিত্ত ডাক্তার বলেছিল সোনার মেডেল দেবে। হঠাৎ মেডেল টেডেল না দিয়ে বউ-ঝিটি নিয়ে ইণ্ডিয়া পালিয়ে গেছে। শালা !)

—বুঝলে আএশা আমি সত্যি ভীষণ দুঃখিত। যখন মনে হল, ইট ইজ টু লেট, স্কুটারে গোটা ঢাকা খুঁজেও কোনো দোকান খোলা পেলাম না।

ওরা হাঁ করে শুনছে।

—বারবার ওকথা বলছিস ক্যান?

আএশা, রকীবের কানে কানে কি যেন বলছেন। (আমি সব কথা বুঝতে পারি। আমার অভাব ও হীনমন্যতা আমাকে অতি আত্মসচেতন করে তুলেছে। ওঁরা যা বলেছেন, যদিও আমি শুনিনি, তবু ওঁরা এসব কথাই বলছিলেন—

আহা, বলুক না। তিন বছর পাশ করে বেকার। প্লিজ কড়া কিছু বোলটোল না।

পাগল হয়েছ। মনে নেই, হাসপাতালে খোকাকে দেখতে টয় নিয়ে গেছল।)

আএশার বোন শাড়ি পরেছে বিস্কুট রঙের, মারাত্মক, সে বোন, দুলাভাই ও আমাকে,—আমাকে একটু বিশেষভাবে দেখছে। আমি যে চেয়ারে বসেছি, সেখানে আলো কম, ওর মুখে (ও বুকে) পর্যাপ্ত আলো। আমাকে নিরাপদে কুকুর বিবেচনা করে বলল, আপনি এ্যাতো দেরী করে এলেন। ভাবলাম, বুঝি আসবেনই না। আপনি না এলে এসব ফ্যাস্টিবল এতো ড্রাই লাগে।

আমি ওর বুকের দিকে তাকাতেই হেসে কাপড়টা সামলে নেয়। আমি কোনো কথা না পেয়ে বললাম, তুমি তো এবার অনার্স ফাইনাল দিচ্ছ, না?

—সেকি, জানো না, মেরী তো এবার অনার্সে ফার্স্ট কেলাস পেয়েছে। রকীব বললে, একটা তৃপ্তি তৃপ্তি মুখে। আমি খুশি হয়ে আত্মহারা হয়ে বলে ফেললাম, ঠিক হ্যায়, এবার খাওয়াও।

বলেই চুপসে গেলাম। আমার কাপড়-চোপড়ের কথা, বুকের কাঙালপনার কথা মনে পড়তেই চুপসে গেলাম। স্বামী-স্ত্রীতে ফিসফিস। এখন, ওদের গোপন কথাটি দশজনকে বলব না।

চোখের সুন্দর একটা কাজ করে মেরী বলল, বেশ ত, কী খাবেন বলুন না?

তোমাকে। না, বলিনি, শুধু গানের মত মনে মনে গেয়েছি। বললাম, উর্দু একসেন্টে, রসিকতার করুণ চেষ্টা: এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি।

মেরী হাসি গোপন করার চেষ্টা করেনি। আএশা হাসতে হাসতে বলল, ফ্রীজ থেকে বোতলটাই নিয়ে আসিস মেরী।

মেরী ফেরে এক গ্লাস পানি নিয়ে, টেবিলে আমার হাতের নাগালে রাখল। আমি নিজের আঙুলগুলোর দিকে চোরের মত তাকালাম।

—কই, কি খাবেন, বললেন না তো আসাদ ভাই। বড় বড় চোখ দুটোতে তুমি প্রশ্নবোধক চিহ্ন মাখাও কী করে।

—কোথায় তুমি ফার্স্ট কেলাস পেয়েছ, আমরা খাওয়াব, না তোমার কাছ থেকে খাব ?

নিজের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে গেছে। আন্তরিকতা এসেছে চাঁদ ? কেন ? সত্যি বলছি, আমি জানিনে।

মেরী কি বুঝেছে জানিনে, কিন্তু চুপ করে রইল। মেরী, তুমি যদি তোমার বোনেব মত অনুকম্পা করো, আমি বাঁচবো না। আএশা সময় জানতে চাইল, আমার হাতের দিকে তাকিয়ে আছ কেন আএশা, জানো না অভাবের সময় বিক্রী করেছি। সময় আমার কাছে সামগ্রী নয়, আএশা, যে হিসেব রাখব। সময় এবং যৌবন শীতেব পাতাব মত, বিদেশী সিনেমা দেখে কথাটা শিখলাম, ঝরে গেলে কেউ কাঁদবে না।

মেরী বলল, এগাবোটা দশ।

মেরী তুমি নখ খাচ্ছ কেন ? নখ খেয়ো না, ওতে পেটের অসুখ হয়, আবো জানি কি কি হয়, ভুলে গেছি, কিন্তু প্রশ্নটা আমি করিনি।

—রকীব তুমি গপপো (কেন গল্প নয়, আএশা, আমি আসাদ চৌধুরী জানতে চাই, কেন গল্প নয়, তুমি আমার সতীর্থ ও বন্ধু-স্ত্রী, তুমি দর্শনের প্রফেসার, তুমি কি জানো না, গপপো শব্দটি সময়ের অপচয়ের অর্থ বহন করে, এবং অপমানজনক) কর এদের সঙ্গে (আমাদের সঙ্গে বলতে তোমার জিভে বাধল কেন—কি হয়েছে আমার, নিজের দীনতায় কেউ যদি হতাদর করে তাতে আমি আগের মত চটি না, কিন্তু মেরীর উপস্থিতি কি আমার ব্যক্তিত্বে রূপান্তর এনেছে ?)

ধকলটায় অর্ধেকের মালিক আমি। বোসই না একটু।

আএশা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আমিও হাসলাম। সত্যি হাসলাম। শব্দ করে নয়, হ্রস্ব ই উচ্চারণ করার সময় ঠোটের যে অবস্থা হয়, সে রকম। কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। এটা যে হাসি নয়, আধুনিক পৃথিবীর সবাই স্বীকার করবেন, আমার জীবনে এরকম মিথ্যে হাসি কম ছড়াইনি, জীবনকে এই হাসি দিয়েই তো সাজিয়েছি। আসাদ, তুমি দর্শন ফলাচ্ছ কেন ? না, না—কাব্য নয়, শিল্পও নয়—সরল সত্য ভীষণ। আমি রাগ করেছিলাম, রাগ প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম, আন্তরিকতাহীন সভ্যতা, না সভ্যতা নয়—সংস্কৃতি—আমাকে দিয়ে ঠোঁটের ব্যায়াম করিয়ে নিল, আমি লজ্জিত, এই ব্যায়ামেরও অর্থ আছে, এই শ্রম আপোসের প্রতীক, যা আমি ঘৃণা করি।

আমি যখন এসব ভাবছি, রকীব মোজা খুলছে, আএশা লাইটারটা জ্বালাচ্ছে

আর নেভাচ্ছে, মেরী প্রেজেণ্টেশানগুলো দেখছে একটু ঝুঁকে, এই ভঙ্গিটি, সুন্দর ভঙ্গিটির পশ্চাতে যথেষ্ট সাধনার কথাটা মনে পড়ে গেল কেন এই মুহূর্তে, ঝি, কার যেন মা, ঠুনঠুন করে টেবিলের ওপর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। একবার লাইটারটা জ্বলতে সময় নিল, যখন জ্বলল, চমকে আমার দিকে তাকাল আএশা। আমিও। আমরা হাসলাম। সেই কোন শৈশবে কী যেন কী খেলতে গিয়ে শত্রু-মিত্রহীন সরল খেলার সরল হাসি, যা আমি আর দেখি না, আএশাকে আমার ভাল লাগল। রকীব চটেছে, কী খুট খুট করছ। রকীব লাইটার হাতে নেয়। এমন সময়.

। চার।

এমন সময় আমার বন্ধু এলেন। তার কোনো শরীর নেই, ভাষা নেই, সময় ও স্থান নেই, তার জন্যে মানব ভাষায় অদ্যাবধি কোনো স্তোত্র রচিত হয় নি। সংস্কৃত, আরবী, হিব্রু ভাষায় তার বর্ণনা তোমরা পাবে না। আমি তার বর্ণনা দেব না। আমি অক্ষম কথক। আমিই শুধু তাকে অনুভব করলাম। এবং মুহূর্তের অভিজ্ঞতার বর্ণনা মানব ভাষায় বোধ হয় সম্ভব নয়। তিনি এলেন সেই ঘরে, যে ঘরে আমরা বসেছিলাম। লাল নীল কাগজে মনোরম সাজানো ঘর। প্রত্যাশিত মেহমানদের চলে যাবার পর সেই ঘরে যেখানে দামী টেলিভিশান রয়েছে, মনোরম স্থানের কমনীয়তা ও লালিত্যবর্ধক অতিকায় রেডিওগ্রাম ইত্যাদি।

তিনি এসে চলে গেলেন, কেউ দেখল না।

রকীবের হাতে লাইটার যেভাবে ছিল, সেভাবেই আছে। মেরীর চোখ যেন গেঁথে আছে জাপানী ডলের ওপর, সেই স্বর্গীয় হাসি চোখে, ঠোটে, ছবির মত লেপ্টে আছে আএশার। গেলাসের ঝুটা পানি ঢালছিল ঝি, পানি ঝরছেই, না, কেউ তাকে দেখেনি। সেই বন্ধু আমার হাতে, চেয়ারের পেছনে রেখে গেল প্যাম্বুলেটার, যার লোভনীয় বিজ্ঞাপন সম্প্রতি কাগজে বেরিয়েছে। আএশা নিশ্চয়ই দেখেছেন, লোভী রোজগেরে মাগীর চোখ দুটো পাওয়ার আশায় চকচকে হয়ে উঠেছিল, পরে অক্ষমতার এক ফুঁয়ে নিভেও গেছে নিশ্চয়ই। এদের বড় হবার ক্রমবর্ধিষ্ণু আকাঙ্ক্ষা কোনো দিনই সম্ভব হবে না। অথচ কত ত্যাগ স্বীকার করে অভিজাত ঠাট রাখার প্রয়াস সে তো আমি জানি।

আমার হিংসুক মধ্যবিত্ত মন এদের আঘাত দেবার জন্ত পাগলা হয়ে গেল!

আমাদের সাহিত্যে আমার পরবর্তী আচরণকে মধ্যযুগীয় উদারতার দলিল হিসেবে গ্রহণ করে কি না জানিনে, কিন্তু বিপরীত আচরণ করেছি জেনে শুনেই। সুন্দর সবুজ রেশমী নদী, নরম কোমল নেভী ব্লু রঙের ঢাকনি, মখমলের মনোরম পাদানি, দুধের মতো শাদা রেশমী ঝালর, সঙ্গীতের মতো ঘণ্টি, অর্থাৎ বন্ধুর দেয়া প্যারাম্বুলেটারটা আমি আএশার হাতে দিলাম। আমি লড়াই জেতা কুকুরের মতো বগলেশে জ্যোৎস্না মাখিয়ে, শরীরে সমীরণের পরশ নিয়ে, বেদনার গন্ধকে প্রতিশোধের অগ্নিতে ঢেলে দিয়ে প্রসন্ন পুলকিত চিত্তে হেঁটে কারওয়ান বাজার থেকে তোপখানা রোডের মেসে চলে এলাম।

মিসেস আএশা রকীবের দীর্ঘশ্বাস আর মেরীর বিস্ময় আমার হাতে গোলাপ হয়ে গেল। আমি শুঁকেটুকে আকাশভরা জ্যোৎস্নার দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

দুজন মানুষ ও তিনটি গরু □ আবু জাফর শামসুদ্দিন

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

চাঁদে কলঙ্ক আছে, শুক্লপক্ষ আছে, কৃষ্ণপক্ষ আছে, অমাবস্যা আছে এবং গ্রহণ আছে।

সেতারা নিষ্কলঙ্ক। সেতারা বারো মাস উজ্জ্বল। সেতারা চিরযৌবনা উর্বশী। সেতারা কাব্যের ধ্বনি।

সেতারার সঙ্গেই শায়ের করেছিলাম। আকাশের সেতারা নয়—একজন মানবী ; কিন্তু সেতারার মতোই কালিমাহীন, কলঙ্কহীন—আপন রূপে আপনি উজ্জ্বল।

আয়না নয়—আপনি জ্যোতিষ্মান। অনেকদিন ধরে তার সঙ্গে শায়ের করছি। সে আমার নিত্য সহচরী ; কিন্তু কোনদিন কিছু বলা হয় নি। লোভ হয়েছে, সংবরণ করেছি।

সেদিন ছিল শরৎ পূর্ণিমার রাত। আকাশ পরিষ্কার, চিমনির ধোঁয়াও নেই, ইলেকট্রিকের আলাও নেই। অনুকূল—সব কিছুই অনুকূল!

কণ্ঠে রাজ্যের কোমলতা মিশিয়ে ডাকলাম : সেতারা!

উত্তরে সেতারা বললো : কি আসাদ। তার কণ্ঠ থেকে যেন অমৃত ঝরে পড়ছিল।

—তোমাকে ভালোবাসি সেতারা। কোনক্রমে বলি।

—ভালোবাসো? বেশ! তার প্রমাণ? চোখের পাতা টানটান করে সে আমার দিকে তাকায়। পাতার ভ্রূগুলোতে অশ্রু নয় শিশিরবিন্দু ছিল। চাঁদের আলো তার মধ্যে পারদের ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছিল।

—কি প্রমাণ চাও? আমি আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি! তোমাকে অদেয় কিছুই নেই সেতারা—কানে কানে বলি।

—কি দিতে পারো? সেতারা পালটা প্রশ্ন করে।

বুঝলাম সে আমার কাছ থেকেই শুনতে চায়। স্ত্রীলোকের স্বভাবই কি এই? বিদ্যুৎচমকের মতো এ প্রশ্নটাও সহসা মনে জাগে।

—কি না দিতে পারি! জেওর, কাপড়…

শেষ করতে দেয় না সেতারা আমাকে। বলে: ও তো সকলেই দেয়।

—সিল্কের শাড়ি, হীরের আংটি…

—মামুলী জিনিস। সেতারা আবার বাধা দেয়।

—গাড়ী, বাড়ী—

—তুত্তর যত সব। এবার সে ছোট করে ধমক দেয়।

—রেডিও, টেলিভিসন, টেলিফোন—

—ওগুলো যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকে।

পাশাপাশি চলছিলাম, হঠাৎ করে সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ায় সেতারা। আর কি প্রস্তাব করতে পারি। মাথা চুলকাই। হঠাৎ মনে পড়ে আসল কথাটাই এখনও বলা হয় নি। বুকে সিংহের সাহস নিয়ে বলি: দেনমোহর—আরো দেব দেনমোহর।

—কত টাকার? এবার বাধা দেয় না সে। বরং সমুখ থেকে আবার পাশে আসে এবং আমার হাতের তালুতে তার হাতের তালু লাগায়।

আমরা আবার চলতে থাকি। আশা হয় তার আসল দাবি বুঝি বা বুঝেছি। বলি: এক লাখ, দু লাখ—যত চাও, তোমার জন্য কোন অঙ্কেই আমি অরাজি নই।

—ধেৎ, তুমিও দেখছি সব পুরুষের মতোই বোকা। তুমি বীর, তুমি সংগ্রামী, তুমি বিপ্লবী, তুমি মোজাহেদ। তোমার মুখে এসব মামুলী প্রস্তাব শুনবো কে ভেবেছিল! দেনমোহর তো সকলেই দেয়। যাও—

সেতারা হাত ছাড়িয়ে নেয়। হতাশ হয়ে পড়ি। দুরু দুরু বুকে বলি: তবে তুমিই বলো কি চাও! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। বল সেতারা, বলো কি চাও তুমি?

—শোন তবে। তোমার কাছ থেকে এমন জিনিস চাই কেয়ামত পর্যন্ত যার ধ্বংস নেই, পুরুষ পরম্পরায় যার ক্ষয় নেই!

—সে কি সেতারা?

—এমন অধিকার যার মধ্যে কোন শরিক নেই।

—সে কি সেতারা?

—এমন অবস্থা যার মধ্যে কোন গোঁজামিল নেই।

—সে কি সেতারা?

—এমন প্রশান্তি যার মধ্যে কোন রব নেই।

—সে কি সেতারা?

—এমন আধিপত্য যার মধ্যে অন্য কারো দাবি নেই, কলরব নেই। দেবে এসব?

—দেবো, যা চাও তাই দেবো। কিন্তু সে কি জিনিস যার এতো গুণ?

—ডানে-বাঁয়ে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ না মাঠে কত আগাছা, আস্তাকুঁড়, কত কোলাহল, কত কলরব?

—হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি সেতাবা।

—এগুলো সাফ করো, তবেই আমাকে পাবে।

—কেমন কবে সাফ করবো? ভড়কে গিয়ে বলি।

—কেন, সড়ক বানাও—খুব লম্বা আর চওড়া সড়ক।

—সডক?

—হ্যাঁ, সড়ক, আর কিছু নয়।

—সডক দিয়ে আমরা কি করবো সেতারা? সড়ক ত অস্থাবর মাল নয়, কি কাজে লাগবে তা আমাদের? আমি প্রশ্ন করি।

—অস্থাবর নয় বলেই ত সড়ক চাইছি।

—কিন্তু সডক দিয়ে কি করবো আমরা তা ত' বললে না। আমার কণ্ঠের স্বমিয়ত দেখে আমিই বিস্মিত হই।

—তুমি একটা আস্ত গাধা আসাদ। দিনের আলোয় এবং রাত্রির গভীরে তুমি আমি—শুধু তুমি আর আমি বেড়াবো।

—কিন্তু…। আমি তবু ইতস্তত করি।

—কিন্তু? ফের কিন্তু কেন? সেতারা গরম হয়ে ওঠে।

—অত লম্বা-চওড়া সড়ক তৈরী করলে বহু জঞ্জালের সাথে যে বহু কুঁড়েও সাফ হয়ে যাবে।

—তাতে হয়েছে কি। রাণীর এক মুহূর্তের আনন্দের জন্যে কত কুঁড়ে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় জানো না কি?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেছিলাম। বললাম: জানি, কিন্তু কুঁড়ের বাসিন্দারা কোথায় যাবে?

—কোথায় কে যাবে সে-ভাবনায় তোমার কি কাজ? এ-ভাবনা যিনি ওদের তৈরী করেছেন তাঁর। চিরকাল তারা স্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়েছে, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগর-বুকের সাম্পানের মতো। বিতাড়িত হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু নতুন স্থান খুঁজে বসতি বানিয়েছে। আসলে তুমি ভয় পাও। তাই না?

সেতারা আচমকা একটা ঘুরপাক খেয়ে পথ আগলে দাঁড়ায় এবং খিল খিল করে হেসে ওঠে। তার কটি ঘূর্ণনের ক্ষিপ্রতা, বুকের দোলা এবং দাঁতের ঔজ্জ্বল্য আমাকে পাগল করে তোলে। ভীরুতার অপবাদ শুনে পৌরুষেও আঘাত লাগে।

কণ্ঠ চড়িয়ে বলি: তুমি আমাকে ভীরু বলে সন্দেহ করো সেতারা? তার চাইতে যে আমার মরণ ভালো।

—মরে কাজ নেই, তার চাইতে বরং সড়ক কেটে প্রমাণ করো তুমি ভীরু নও। সেতারা হাসতে হাসতে বলে।

—তুমি আমার হবে তো সেতারা? নিঃসন্দেহ হবার জন্য প্রশ্ন করি।

—সড়ক কেটে এসো, পরে দেখা যাবে।

তথাস্তু বলে বিদায় হই।

হাজার হাজার লোকলস্কর লাগাই। বন কেটে, পাহাড় ভেঙে, কুঁড়ে আর আস্তাকুঁড় সাফ করে, নদী নালা বন্ধ করে অথবা পুল দিয়ে সড়ক তৈরী করি।

সড়ক তৈরী হয়ে যায়।

সেতারা আবার আমার সঙ্গিনী হয়। বলি: দেখো দেখো! তোমার মনের মতো সড়ক বানিয়েছি। তুমি যেমনটি চেয়েছিলে ঠিক তেমনি লম্বা এবং চওড়া—কোথাও একটি ফাঁক নেই। খুশী হয়েছ।

—খুশী! হ্যাঁ খুশী হয়েছি। কিন্তু সেতারার নাক মুখ কুঁচকে ওঠে। আমার মুখের হাসির উপর রাহুর পাখনা পড়ে। একসঙ্গে হাজার জিজ্ঞাসা এসে ভিড় করে মনে। আবার কি শর্ত আরোপ করতে চায় সেতারা?

ভাবনার সূত্র কেটে যায়। সেতারার কথা শুনি: কিন্তু এ সড়কে যে বড় ভিড় আসাদ। সড়ক বানালে যে শহরও গড়ে উঠবে তা ত ভাবিনি।

—ভালোই তো হয়েছে শহর গড়ে উঠেছে। সাহস করে তার কথায় বাধা দেই।

—এবং শহর গড়ে উঠলে সড়কে ভিড় হবে তাও ত ভাবিনি এবং··· সেতারা আমার কথাগন্তর করে না, বলতেই থাকে।

—সড়কে ভিড় হয়েছে, ভালই ত' হয়েছে, সঙ্গী-স্বজন মিলবে, একা একা লাগবে না। আমি আবার সাহস করে বলি।

এবারও সেতারা যেন আমার কথা শোনেই না, তার মতো সে বলতেই থাকে। —এবং ভিড়ে ভিড় জমাবে হাজার হাজার যুবক যুবতী—ঠাট্টা করবে, ভাঁট করবে, বই নেবে, সই খুঁজবে; ঝোলা ঝুলাবে, পোলা ভুলাবে, সোনালী রূপালী শাড়ী লটকাবে, রঙ-বেরঙের হাওয়াই আর ট্রাউজার পরবে; খুট খুট খট্ খট্ করে নিতম্ব নাচিয়ে চলবে—না, এমন সড়কে আমার কাজ নেই।

সেতারা শেষ করে। চেয়ে দেখি তার মুখে হাসি নেই, চোখে জ্যোতি নেই।

আমার মাথার ওপর হঠাৎ যেন একটা তালগাছের ওপরের অর্ধেক বিনা ঝড়ে ভেঙে পড়ে। তার পত্রাঙ্কে তৈরী বাসায় শকুনীর তা দেয়া ডিমগুলো আমার মাথার ওপরেই খান খান হয়ে যায়।

সব কিছু এলোমেলো। শকুন-ছানাগুলো কিলবিল করছে। এতো করার পরেও আরো কি চায় আমার জানের জান, প্রাণের প্রাণ, চোখের মণি, হৃদয়ের ধন সেতারা?

—আরো কি চাও সেতারা? আশাহত স্বরে তার বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করি।

—বলেছি ত। বুঝলে না? উদাসভাবে উত্তর দেয় সেতারা।

—বোঝার চেষ্টা করছি। তুমি বরং স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দাও। আমি উত্তর দেই।

—সড়ক···

—হ্যাঁ সড়ক তো করে দিয়েছি।

—হ্যাঁ করেছ, সে জন্যে ধন্যবাদ। এখন এ-সড়ক সাফ করো!

—সাফ! সাফ তো আছেই।

—কোলটারের সাফ নয়, ভিড় সাফ করো। সব জঞ্জাল দূর করো।

—কেমন করে?

—যেমন করে সড়ক তৈরী করেছিলে।

—কিন্তু কেন? আমি হেঁটে যাই আর বলি।

—আমি পরদা পুশিদায় চলতে ভালোবাসি আসাদ। ওদের আমি ডরাই।

—ডর! কিসের ডর সেতারা?

—হ্যাঁ, ওদের আমি ডরাই। বড় গোলমেলে লোক ওরা। যখন-তখন রাস্তায় নৃত্য শুরু করে দেয়, কখন কার পরদা তুলে নেয় ঠিক-ঠিকানা নেই। না, কোন কথাই নয় আসাদ, ওদের আমি সত্যি বড় ডরাই।

—কিন্তু

—আবার কিন্তু। তুমিও ভয় পাও? তোমার গণ্ডারের মতো চামড়া আছে, হাতীর মতো দেহ আছে, সিংহের মতো থাবা আছে, এবং—

সেতারা মুচকি হেসে বলে—নামও তোমার সিংহ ত। তবু ডরাও?

—আমি আর যাই হই, ভীরু নই, আমাকে বিশ্বাস করো সেতারা।

—বিশ্বাস! ফলেন পরিচীয়তে, সেতারা হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ হাসিতে আমাকে চমকে দেয়।

—তাই করবো, কিন্তু আমার হবে ত তুমি?

—হবো।

—খাটি?

—খাটি।

সড়ক সাফ করি। হাতীর বল এবং সিংহের থাবা ব্যবহার করি। চামড়াকে ঢাল করে মশা-মাছির আঘাত প্রতিরোধ করি।

সড়ক নিঝুম নিস্তব্ধ হয়।

বসন্তে সকাল আসে। সেতারা আর আমি বেড়াতে বের হই। সেতারা এখন সম্পূর্ণ আমার, আমিও সেতারার। অবিভাজ্য আমরা। এক আত্মা, এক দেহ, এক অন্তর, এক মস্তিষ্ক। সড়ক নির্জন। কোন শব্দ নেই, কোন গোল নেই। নির্ঝঞ্ঝাট চলছি। এমন সময় লক্ষ্য করি চৌমাথার মাঝখানে তিনটি নাদুসনুদুস গরু শুয়ে আছে।

সেতারাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলি: এত করলাম, তবু কেমন করে যেন গরু তিনটে রয়েই গেলো। তাড়িয়ে দেই, কি বলো সেতারা?

—না, ওরা বোবা জন্তু। ওরা থাক। জাবর কাটুক।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

দীর্ঘায়ু শব্দ করে খুলে যায় দরোজা। আমি ধনুক হয়ে পা বাড়াই বাড়ীর ভেতরে। কেননা, বিশালাকার প্রথম দরোজা যা পুনঃ পুনঃ উন্মুক্ত করা যায় না, তার দেহ কোণে ধারণ করে আছে ক্ষুদ্র একটি পিরামিড প্রবেশ পথ। গমনাগমনে সবাই তাই নতশির। বয়স বৃদ্ধিতে অধিনতামুক্ত এবং স্ব-নাম শেষে অলংকার ধারণের অধিকার প্রাপ্ত, অনন্ত নান্দীপাঠের পর গৃহে ফিরি সময়কে আন্তর্জাতিক দিনান্তরে পাঠিয়ে। তখন পড়শীরা আমার ব্যস্ততা নিয়ে ভিন্ন জগতের বেসাতি। গোপন কৌশলে করায়ত্ত করে খিল খুলি বাইরে থেকে, নেভানো অন্ধকারে সন্তরণ মহড়ায় খুঁজে নিই রোজ রোজ আপন শয্যা।

এবং এখন গোপন সে কৌশলের পুনরাবৃত্তি করে প্রবেশ করি স্বগৃহের অভ্যন্তরে। আমি স্থির বিশ্বাসে ঘনীভূত, রক্ত-সম্পর্কিত অন্যান্য স্বজনরা, যাদের প্রতি আমার অপ্রকাশিতব্য বিরক্তিমিশ্রিত করুণা আকুল দৃশ্য দৃশ্যপট, তারা অপরিবর্তনীয়। সংসারের আমৃত্যু ক্রীতদাস-দাসী। স্ব-আবাসে নিজের বাকযন্ত্রে নিহত, বৃক্ষে হরিদ্রাভ রসাল পক্ষীকূলের ক্ষুরধার চঞ্চুতে ক্ষত, শুধু মহীরুহের ছায়ায় অশ্লীল অগ্নিকাণ্ড ঘটাই। স্বীয় নামে অলংকার প্রযুক্তির পরও আমার ফল আসে না কোন মনুষ্য উপকারে। সুতরাং স্বাভাবিক সূত্রে আগমন ঘটে, আঘাত করে পরিচিত অবয়ব নিঃসৃত সত্য শব্দাবলী। উষ্ণ, সূচ্যাগ্রধার ভরপুর বাতাস ধীরে ধীরে দু-হাতে সরিয়ে পথ পার হই, হাঁ করে থাকা নিজ কক্ষ পর্দায় প্রতিফলিত হয়। চাতালে দীর্ঘ পথ, তারপর পর পর সরল রেখায় সিঁড়ি, এক দুই তিন ডান বাঁ-পায়ে অতিক্রম করি। নিদ্রাচ্ছন্ন চিন্তার কোটরে নিশ্চিত হাই তুলে জঞ্জাল মুক্তির আনন্দে অগ্রসরমান শেষ সীমানায়। কয়েকবার পদচারণার পরই পৌঁছে

যাবো নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু সহসা বলশালী বিদ্যুত মস্তকের দু' পাশের 'তার' বেয়ে বেগবান হওয়ায় হতচকিত। বিমূঢ় অতি সেই নিষ্ঠুর আঘাতে। বজ্রাঘাতে নিহত মূর্তির মতো, প্রথমে বিস্ময়বোধক চকিত এবং পরক্ষণে স্থিরীকৃত দুটি প্রবাহ ধৈর্যবান সূক্ষ্ম শিল্প-কারিগরের নিপুণতায় ক্রমশ বারান্দার নিকট অন্ধকারের পলেস্তারা কেটে কেটে আবিষ্কার করে চেয়ারের খোপ-বদ্ধ অতি প্রাচীন একটি সম্পূর্ণ মনুষ্য প্রতিকৃতি।

পিতা আমার পিতা, জনক এ প্রাণের ; আপাদমস্তক বিস্তারিত স্ফীত শিরার অন্তর্গত প্রণালীতে প্রবাহমান নাতিশীতোষ্ণ অরণ্যরক্তিম রক্তের নিরংকুশ অধিকারী। সুপুষ্ট দেহের যাবতীয় অস্থিমজ্জা এবং সাবলীল মাংসপেশীসমূহ একমাত্র তাঁর দ্বারাই সৃজিত। তিলে তিলে সমগ্র সঞ্চয় ব্যয়িত আমার হৃদপিণ্ডে স্পন্দন সচল চলাচলে, স্ব-হৃদয়ের স্পন্দন-ধ্বনিতে এক সঙ্গীকে আমৃত্যু শোনার বাসনায় ভবিষ্যৎ ভাবনা তখন অতিদূর নির্বাসিত। বাইশ বসন্তের দ্বারে উপনীত বক্ষে ধারণরত অমিততেজা অশ্ব এবং তার কালোচুলে গ্রীবায় দৃঢ় ত্বকে আলো-হাওয়া জ্বালানি যুগিয়ে একক কৃতিত্বে, বিবর্ণ বিরল কেশ, কুঞ্চিত দৃষ্টি, শিথিল চর্মাবরণে মেছেতা আক্রান্ত, শূন্য কলাপে কুব্জ কৃশ উপস্থিত তিনি।

আমার চোখের কালো দর্পণে প্রতিবিম্বিত এক প্রাগৈতিহাসিক তরুণ বর্তমানে পদার্পণ করে হীনশক্তি, নিঃস্ব সম্রাট ; তাঁর যৌবন অপাত্রে হস্তান্তরিত, তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারী হাতে হত, পচন ক্রিয়ায় সমর্পিত শবদেহ, ভাগাড়ে নর্দমার স্রোতে গলিত অস্তিত্বে প্রাণ ধারণ করে আছে জ্বালাময়ী কীট। কীট দংশনে তিনি বিক্ষত, রুদ্ধবাক দর্শক আপন পটভূমিকার কৃষ্ণ চলচ্চিত্র দর্শনে।

তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করছেন। তাঁর দৃষ্টিতে আমি সম্পূর্ণ সমাহিত। চতুস্পার্শ্ব শব্দহীন। রাস্তায় কোন ভারী বুট খট খট আওয়াজ তুলছে না। কুকুরগুলো, যাদের একমাত্র কাজ চীৎকার করা, আজ এ সময়ে অনুপস্থিত। নিথর বৃক্ষের পাতা দালান কোঠা দেয়াল, বিদ্যুৎবাহী তার, পিলার প্রভৃতির সাজানো বাগানে শহরের মধ্যাহ্ন রজনীতে জীবিত, উন্মিলিত চোখে, মুখোমুখী, অতীত বর্তমান দুকালের দুজন শিকারী, যাদের মধ্যে একজনের অরণ্যে প্রবেশ লাভের চেষ্টা ভয়াল বাঘের থাবায় প্রতিহত, অপরজন লড়াই করে চলেছে। ফলাফল ঘোর অমাবস্যা কর্তৃক লুণ্ঠিত। কংক্রিট বাঁধানো বাতাসের কুণ্ঠিত শব্দে হেঁটে হেঁটে আমার শ্রুতি-গুহার বদ্ধ দ্বারে আঘাত করে পিতার কণ্ঠনির্গত অক্ষরবন্দী ধ্বনিসমূহ। ফিরে ফিরে ঘড়ির কাঁটার মতো একই প্রশ্ন এবং আমি অতিশয় পারদর্শী নই। ওষ্ঠ ও কণ্ঠকে

পরম কৌশলে নিয়ে যাই আপন অবয়বে। চোখে, ললাটে নিঃশব্দে প্রতিফলন করে প্রকাশ করি নিদারুণ বার্তা, ঘুরে ফিরে একই পদ্ধতির অভিনয় চলে যে কোন সময়ে, কিছুদিন অন্তর অন্তর।

সম্মুখস্থ অদৃশ্য শূন্যতায় অনুভবের রুপোলী পর্দায় দৃশ্যমান ক্রমশ দুপুরের সেই মহাপুরুষ। পর্দায় প্রক্ষেপিত দৃশ্যালোকে প্রাক্তন ঘটনার বিন্দু বিশ্লেষিত অনুবৃত্তি দর্শক দৃষ্টিসীমায় উপস্থিত। তিনি যেহেতু মহাপুরুষ, কেননা তাঁর ইচ্ছায়, অনুরাগে, বিরাগে অনায়াসে নির্ণীত হতে পারে একাধিক ভবিষ্যৎ। যেমন আজ দুপুরে তিনি আমাকে বাতিল করে দিলেন। আমার অতিশয় বন্দিত অলংকার, যা এখনও উজ্জ্বল ওজনে ফোলা-ফাঁপা নয় এবং তা তাঁর জানার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত পুষ্পউদ্যানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমি তাঁর প্রাচীরবেষ্টিত, এখানে প্রাচীর সংরক্ষণার্থে নয়, পদমর্যাদার বিজ্ঞাপন, কক্ষ অভ্যন্তরে অনুভব করি উন্মুক্ত প্রকৃতির বিপরীত মেরুতে তখন তাঁর অবস্থান। হাতে কলম নিয়ে একটা বই পঠনরত। সে কলমে লাল কালি ছিল। তিনি পড়ে পড়ে লাল কালিতে বইয়ের অংশ চিহ্নিত করছিলেন। আমার আগমন শব্দে বই রেখে আমার দিকে মনোযোগী হলেন। পূর্বে গৃহীত এবং শ্রুত কিছু ধ্বনিপুঞ্জ তাঁকে টেপরেকর্ডারে বাজিয়ে নিজে নিবেদিত হলাম। তাঁর শ্বেত ওষ্ঠের প্রত্যন্ত প্রদেশের মোহন শ্মশ্রুতে, কালীমূর্তিতে সহসা প্রলম্বিত শ্বাপদ জিহ্বা, চকচকে মসৃণ ধারালো আঙুলে বিনুনী কেটে আমার জনকের দেহ টিপে টিপে তান্ত্রিক মন্দিরের পুরোহিত এক চট করে শুইয়ে দিল উপুড় করে এবং শিরযুক্ত গণ্ডদেশকে নকসা অঙ্কিত দু ফালি কাঠের মাঝে। আমি অভূতপূর্ব দৃশ্য দর্শনের আনন্দে অবাক শিহরণ নিয়ে ছিলাম নিবিষ্ট দর্শক। বাল্যে দেখা পুতুল নাচের অবোধ্য পারদর্শিতায় গুণমুগ্ধতার নিগড়াবদ্ধ বর্তমানে তিনি আমার রুদ্ধবাক প্রশ্নে বিস্ফারিত চোখের কুঠুরীতে উন্মোচন করলেন নীল সেই নাটকের অন্তর্গত পর্দা।

অসীম সাহসে আশায় ভর করে টেপরেকর্ডার বাজাতে উদ্যোগী হলাম পুনর্বার। তিনি এবার শোনালেন সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি। মেরুদেশে অবস্থান আমার দীর্ঘতর করা গেল না এবং বাইরে রোদ ওৎ পেতে ছিল।

অচিকিৎস ক্ষত নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন হাতলহীন চেয়ারে। পারিপার্শ্বের করুণ আঁধারে সার্চলাইট নিয়ে প্রবেশ করি তাঁর দেহের পাতালে। যেখানে তিনি অশ্রুপাত করছেন এবং ঐ ক্ষরণপর্ব অমৃত পান করে আছে। কোন শব্দ নেই, তরঙ্গ অথবা স্রোত নিম্নমুখী গতি নিয়ে শুধু ফোঁটা ফোঁটা সঞ্চিত হচ্ছে নিশ্ছিদ্র

একটি পাত্রে। একদিন হয়তো তরল পদার্থ সঞ্চয়ী সেই পাত্রভাণ্ডার দুর্মর বিস্ফোরণে রক্তিম করে দেবে আয়ত্তাধীন পৃথিবীটাকে।

নিজের ঘরে আশ্রয় নিয়ে দরোজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি তখনও তিনি তেমনি বসে আছেন। প্রচুর দূরত্বে অবস্থান তাঁর এবং আমার, তবুও চোরা চোখে তাকাবার সম্বল পাই না। একটা কুয়াশা ঢাকা কাঁচ আমার চোখের মণিতে জাপটে বসে। সূত্রবিহীন ক্লান্তির সর্বব্যাপী ডানার কবলে প্রথমে বন্দী ও পরে আহতাবস্থায় ঝিমোতে ঝিমোতে গা উদোম শয্যায় মৃত মানুষের শায়িত শবের মহড়া দেই।

উর্ধ্বে, অর্ধোন্মিলিত দৃষ্টিসীমায় ছাদের কড়িকাঠ নির্দিষ্ট দূরত্বে পরস্পর সাজানো উত্তর দক্ষিণে লম্বমান। যুগান্তরেও যাদের সংখ্যা নির্ণয় হলো না। বহুবার সচেষ্ট হয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছি প্রতিবার। কড়িকাঠের খোপে খোপে ভেসে ওঠে অস্পষ্ট ঘোলাটে চিত্রাবলী। সংখ্যার আধিক্যে একটি চিত্র প্রদর্শনী যেন আয়োজিত আমার এ প্রকোষ্ঠে। কিন্তু দৃষ্টি তার তীব্রতায় কোনক্রমেই আবিষ্কার করতে পাবে না তাদের অবয়ব সমুহ। অনুভবের অণু-পরমাণু ঘোলাটে ডানায় ভর করে নিক্ষেপণ কেন্দ্রে ফিরে আসে। আন্তরিকতার অভাব অদৃশ্য বহুদূরত্বে নির্বাসিত, তবু ধরা দেয় না, ধরতে পারি না। ক্ষমতা, শক্তি বাসনা নিদারুণ পরাজিত। একতাল যন্ত্রণার অতল উদরে আহার যোগান দিয়ে দিয়ে এ-যাবৎকাল, তাকে বেগবান, অমিততেজা করে তুলেছে।

নদীর পারে ভাগাড়, সেখানে শকুনিদের চিৎকার। অপর পারে সাঁতার কাটছি। দূর থেকে তীর দেখা যায়, নদীর নিকট গমনে চোখের পলকে উধাও। কুয়োর ভেতর সাঁতার কাটার মতো, অল্পজলে। তলদেশে প্রজ্জ্বলমান বিকট একটি অগ্নিকুণ্ড অফুরন্ত প্রাণশক্তি ভরপুর। ভেতরের পানি ছান্দিক শব্দ তুলছে। ধোঁয়াচ্ছন্ন চতুস্পার্শ্ব তাতে রন্ধন প্রক্রিয়ায় নির্বাসিত। দেহের সূচ্যাগ্র বিন্দু বিন্দু রক্তিম তর-।তা ঝলসানো চর্মাবরণের অনির্ণয় সূক্ষ্ম পথে চুইয়ে চুইয়ে সঞ্চরণশীল গোলাকার ৭৬ -র ক্ষুধায়, পুরু অস্থির প্রলেপ এতকালের লালিত, ক্রমাগত প্রবল উত্তাপে খসে খসে থমথমে সমগ্র কুয়োর জল। মাংসহীন দেহের খাঁচায় আচমকা প্রবাহিত বাতাস সোঁ সোঁ শব্দ বাজায়। অকল্পনীয় রূপান্তরে এই আমি, আলমগীর রহমান নামক একটি যুবকের আকার অস্তিত্ব পরিচয় ভবিষ্যৎ কালসূচক দিনপঞ্জির বিবরে অতীত বিষয়ক তথ্যাক্রান্ত গবেষণাপত্রের নির্বাচিত বিষয় ও বস্তু।

একসময় ধ্বনিলোকে জেগে উঠি পূর্ণাবয়ব শরীর, আত্মা, হৃদয়, রক্তপ্রবাহী শিরা উপশিরা ইত্যাদির সমাহারে। এখন আমার দুঃখ আছে, সুখ, আনন্দের

আশা আছে। রৌদ্রতাপ চন্দ্রালোক মরা দহন দংশন যন্ত্রণা সর্বত্র ছড়িয়ে যায় মুহূর্তে। বোধ ও অনুভবের তীক্ষ্ণতায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় বিভাগ সতর্ক প্রহরীকে আপ্রাণ চেষ্টার পরও ফাঁকি দিতে পারে না। বর্তমানে সম্পূর্ণ জাগতিক রেখায় অবস্থান করছি।

শীতের আচ্ছাদন বোনার মতো কয়েকটা মশা লেপটানো মাংসে হুল ঢুকিয়ে পরম নির্ভয়ে ধীরে ধীরে টেনে নিচ্ছিল লৌহ-কণিকা, শ্বেত-কণিকা মিশ্রিত তরল সমষ্টি, জীবনধারণের অপরিহার্য জ্বালানী। সজাগ দেহটা হঠাৎ নড়ে চড়ে প্রতিবাদ জানালে শুরু হয় তাদের সমবেত নৃত্য।

শরীর নির্গত জলে আমি সম্পূর্ণ স্নাত। আপাদমস্তক ছড়ানো ছিটানো অজস্র চুলের মূলদেশ এক একটি ঝর্ণার উন্মুক্ত মোহানা। ঢল ঢল জল অবাধ গতি নিয়ে স্যাঁত স্যাঁত ভিজিয়ে দিল। ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ ক্রমশ রনিয়ে রনিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রধান প্রবেশ ও নির্গমন পথে পাচার হচ্ছে দেহাভ্যন্তরে।

টেবিলে আমার আহার্য ঢাকা। রোজ রোজ এমনি থাকে। দিনে বা রাতে কোনদিন আহার কালে আশেপাশে একই কর্মে নিযুক্ত কারো দর্শন লাভ আমার অতীত। সবাই ঘড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। আমি শুধু ছিটকে বেরিয়ে গেছি, সংসারে আমার একটি মাত্র কাজ; সকাল দুপুর রাত তিন সময়ে চুপচাপ আহার করে যাওয়া। এস্থানে বৈচিত্র্য সন্ধান কোন ফলবতী বৃক্ষ নয়।

খাবার আগলে রাখা ঢাকনা হাতের সঙ্গে উঠে আসে। অতি আয়েসে এবং শরীরের স্নায়ু পেশী শিরাসমূহে সহস্রখণ্ডিত সেকেণ্ড সময়ে বিক্রম বিদ্যুতের অনন্ত দাহ্য শক্তির প্রয়োগে স্তম্ভিত নিশ্চল মূর্তি। চোখ জোড়া রেডিয়াম ঘড়ির কাঁটায় টিক টিক জ্বলতে থাকে। দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী অতিকায় বেগবান ঢাকনা খোলার শব্দে সচকিত, একপলক আমাকে দেখে অতি দ্রুত পলায়ন করে প্রাণীটা, আশ্রয় নেয় মিটসেফের পেছনে। এতোক্ষণ আমার বরাদ্দ লুটতরাজরত গোপন সেই তস্কর তার প্রয়োজন অতিরিক্ত দ্রব্য বিনষ্টি সাধনে সিদ্ধসাধক প্রচলিত অর্থনীতির কূট-কৌশলে।

উদরে এবং মস্তিষ্ক কোটরে প্রবল বিস্ফোরণজনিত অগ্নিকাণ্ড ঘটে একসঙ্গে দাউ দাউ দহন ক্রিয়ার পরিণামে রাজকীয় ভোজসভায় দগ্ধ কুক্কুট, বক্ষদেশে রূপালীছুরি আমূল প্রোথিত। স্থির হাতের আঙুলে খাবারের অক্ষম ঢাকনা ক্ষমাপ্রার্থী অপরাধীর করজোড়বদ্ধ দেহের মতো স্বল্প দোদুল্যমান।

আলোর অসীম ক্ষমতায় দ্রুতগামী পলায়নপর তস্করের পিছু পিছু দৃষ্টি ধাবিত এবং তার আশ্রয় স্থলে স্থির দৃষ্টি ছুঁড়ে তাকে চুলচেরা দর্শন করতে থাকি।

অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈলাক্ত মসৃণ লোমাবৃত লোমশ দেহ, লম্বাটে অবয়বে চোখ কান নাক ও সজারু কাঁটার বিন্যস্ততায় কিছু সংখ্যক গোঁফ-আঁশ সমতল নাসারন্ধ্রের দুপাশে সম্প্রসারিত। তুলতুলে দেহের নিম্নাংশ থেকে বেরিয়ে এসেছে চারটে পা এবং পশ্চাৎ অংশে লোমবিহীন সন্ত অস্থির সুদৃশ্য নাতিদীর্ঘ একটি লেজ।

ইঁদুরটা হয়তো আমাকে দেখছে। মিটসেফের পেছনে সমান্তরাল দণ্ডায়মান বিছানো কাঠ পায়ের আঙ্গুলের নখে আঁকড়ে ধরে আছে। কুতকুতে বিষাক্ত অগ্নি-দৃষ্টি যেন আমার দিকে সরলরেখায় নিক্ষেপিত। তার অভিযান অসফল করে দিলাম, তস্করবৃত্তির আকস্মিক প্রতিকূল পরিণতি, ইচ্ছাবিরুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণার বাধ্যবাধকতা তাকে দুর্দমনীয় হিংসাতুর করে তুলেছে আমার প্রতি।

চিন্তা-ভাবনা যাবতীয় বিষয়সমূহ একটি বিন্দুতে ঘূর্ণায়মান, মস্তিষ্ক কোটর যে জন্য নিয়োজিত। তথায় দাউ দাউ প্রজ্জ্বলমান দাবানল বিরতিহীন পোড়াচ্ছে। অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড ক্রমানুক্রমিক গতিতে গ্রাস করছে আপাদমস্তক, সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জ্বলছে দুলছে অগ্নিশিখা এবং অভ্যন্তরভাগে ঘটছে প্রবেশ। শুধু আজ হঠাৎ ধরা পড়লো এ তস্কর। গতদিনগুলোতে ছিলাম কতো নিশ্চিত, আহারকাল ছিল নির্বিঘ্ন। অথচ অজান্তে আমাকে ঘিরে চলেছে হত্যা ষড়যন্ত্রের উদ্দাম বহ্নুৎসব অশেষ। বৃত্তের সংজ্ঞায় আবর্তিত। দেহের চকচকে ত্বক ঝলসানো, চতুর্দিক মমতাতে, সাথে সাথে পুড়ে ছাই উদরবৃত্তির পূর্বঘোষিত বাসনা।

সর্বময় ঝলসিত চামড়ায় টান টান বেদনা, অবয়বের আদল দুমড়ানো প্যাপিরাস, শরীর গঠন সর্বত্র কাদামাটির ভাস্কর্যকর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং দু হাতের বর্ধিত শাখারা সব প্রথম বন্ধনী।

পূর্ণিমার প্রবল জোয়ারে ভেঙ্গে গেছে লোমকূপের সমুদয় বাঁধ। ঝামরি হতে ফোঁটা ফোঁটা অসংখ্য জলবিন্দুর অবিরাম বর্ষণে আমি সম্পূর্ণ সিক্ত। তাতে শীতলতা অথবা প্রশান্তির রাসায়নিক উপাদান অনুপস্থিত, অভ্যন্তরভাগে একটা পাত্রে রক্ষিত সঞ্চিত টগবগ ফুটন্ত জলরাশির অপ্রতিরোধ্য নির্গমন।

প্রবল দোলায় দুলে ওঠে মিটসেফটা। ভেতরে ক্ষুদ্র ছিদ্র জালের পাহারায় তাকে তাকে সাজানো তৈজসপত্র; রংচটা টিনের কৌটো, আচারের বয়াম, শূন্য দুধের ডেকচি ইত্যাদি; সহসা স্থানচ্যুত, নিজেদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের বিনাশ চিন্তায় শংকিত। বিভিন্ন তরঙ্গ ধ্বনির আশ্রয়ে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করে প্রতিবাদ। ততোক্ষণে আমার দুই বাহু উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে লড়াকু ষাঁড়ের দুই শিংএ ঠেলে দিয়েছে মিটসেফ, মিটসেফের পশ্চাৎ অংশ, যেখানে আমার চিরন্তন শত্রু, জন্ম-জন্মান্তরের

শত্রু নিশ্চিত আশ্রয়ে থু-থু নিক্ষেপ করছিলো, নিকটবর্তী চুনকাম শাদা দেয়ালের শক্ত সমতল দেহে। মিটসেফ আর দেয়াল এ দুয়ের মাঝে পূর্বের সরলরেখা টানার ফেলে কতিপয় ভগ্নাংশ দূরত্ব প্রায় বিলীন।

দেহের মাংসপেশী স্ফীত, স্ফীততর। শোণিতাধার শিরাসমূহ ত্বকের দেয়াল ফুঁড়ে মুক্তি অভিলাষী। পায়ের মসৃণতল কঠিন সিমেণ্টে দশ আঙ্গুল দশটি খুঁটি পুঁততে প্রাণপণ চেষ্টায় নিযুক্ত হয়। কিন্তু তা তো মাটি নয়। শুধু, ঘর্মাক্ত পায়ের তালু মেঝেয় স্থির হয় না কোনক্রমেই। অথচ এখন প্রয়োজন প্রচুর, অফুরন্ত শক্তির। শক্তি, আসুরিক শক্তি, চির দুর্জ্জেয় শক্তি। ধূপ গন্ধ চন্দন মৃগনাভি পুষ্প অর্চনায় বন্দিত কাল কালান্তরে, বর্তমানে আমার একক বাসনা, শুষ্ক কণ্ঠে একটি বাসনা প্রার্থনা হয়ে অনুরণিত হয় বার বার। শংকাদোদুল হৃদয়ে অন্তহীন বুদ্‌বুদের আকুলি বিকুলি।

ঈশ্বর, শক্তি দাও হে ঈশ্বর। প্রবলতর কর এ হীনদেহ কর্মক্ষমতা। বিশালাকার দানব সাইক্লাশিস আকৃতি অবয়বেও আমি কৃতজ্ঞ। এখন অতি জরুরী উপস্থিতি বীর্যবলবান দেবদূতের। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাবতীয় সন্ধিস্থল শক্তিমান স্ক্রু বিদ্ধ, বিভিন্ন অংশে সন্নিবেশিত বিভক্ত নয় আর। স্বইচ্ছায়, যে দিকে ইচ্ছা হয়; পরিচালনা করা যায় না। শক্তি উত্থিত সমস্ত চাপ একটি কার্যকর লক্ষ্যবিন্দুতে ধাবমান, যেমন নদী তার স্রোতে শুধু সমুদ্রে যায়। আরাধ্য একক বর্তমান কর্ম পাখার ডানার মতো হাত দুটো মাংসময় দেহের বিপুল ভার ঠেলে দিচ্ছে, মিটসেফটা শাদা দেয়ালে যেমন ধনুক-মুক্ত তীরে সত্য সম্মুখপানে অগ্রসরমান। ঈষৎ কম্পমান আয়ত ক্ষেত্রাকার মিটসেফটা ফলে শ্রুতিতে আঘাত করছে পুনঃ পুনঃ ভেতরের কর্কশ দ্রব্যবস্তুর স্থান পরিবর্তনের শব্দ।

বিবিধ ঘটনা উদ্ভুত হতে পারে যে কোন সময়ে। কিন্তু এখন এ মুহূর্তে একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা পূরণ আমাকে অনাবিল, নির্মল উপহার দিতে পারে। দেয়ালটা গ্রাস করে নিক, সম্পূর্ণ মিটসেফটা অদৃশ্য হয়ে যাক আমার শত্রু সমেত দেয়ালের পুরু বক্ষে কাষ্ঠ নির্মিত চতুষ্কোণাকার নানাবিধ দ্রব্য সংরক্ষণ কল্পে প্রস্তুত এ বস্তু। সকালে সবাই অবাক, খুঁজবে বস্তুটাকে ঘরের একোণ ওকোণ। তখন আমি, একমাত্র আমিই বাজাতে পারবো প্রসন্নতায় প্রচুর হাততালি। কেননা, কেন এমন হলো তার কারণ জানা ব্যক্তি বিশ্বে মাত্র একটি এবং তা আমি। প্রাণ খুলে লাগামহীন হাসতে পারবো অনেকদিন পর। মা, বাবা, ভাই-বোন এবং সংসারের অন্য সবাইকে শুনিয়ে। এটা তাঁদের বিচারে বেহায়াপনা, যেহেতু তাঁরা তো জানে

না কারণ এর বিন্দু বিসর্গ। ওঁদের ভ্রূ কুঞ্চন, কিছুটা কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত চেহারা ও রক্তিম কপালের সমতলভূমিতে একাধিক ঢেউ অথবা অন্য অনুশাসন কোন ক্রমেই করতে পারবে না সংকল্প স্বভূমিচ্যুত।

স্পষ্ট শুনতে পাই ওটা দেয়াল ও কাঠের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থান হেতু দেহে প্রচণ্ড চাপ অনুভূত হওয়ায় পলায়নের বা অন্যত্র সরে যাবার আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেও পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ। পরাক্রম শক্তির আবির্ভাবে যথাস্থানে থেকে উদরে অবয়বে ও শরীরাংশের সর্বত্র নিষ্পেষণ অনুভবে, যেহেতু স্থান পরিবর্তনের সমুদয় পথ রুদ্ধ পায়ের নখে ঈর্ষা, রাগ, বিদ্বেষ, হিংস্রতায় ফুঁসে বিকট খুঁড়ছে মিটসেফের কাঠ বিচিত্র সে ধ্বনি, অকালে মৃত্যু ঘোষণায় অনিচ্ছুক একটি প্রাণীর আপ্রাণ প্রতিবাদ। তার নাতিদীর্ঘ দেহটা এখন অথবা যে কোন সময়, যা পূর্বে সঠিক ঘোষণা করা যায় না, মুহূর্তে বিদীর্ণ হতে পারে। একবার চিৎকারের পর পরই নিথর জগতে আশ্রয় নেবে নরম দেহটা। শাদা দেয়ালে সংকীর্ণ রক্তের ছাপ, তারপর আকাশের দিকে চারটে পা অসহায় নিক্ষিপ্ত সমতল মেঝের মাঝে এলায়িত লেজ, অবয়ব সংযুক্ত ঘাড় এক পার্শ্বে কাত, উদবস্থিত নাড়ি নির্গত ঈষৎ রক্ত মিশ্রিত দু-এক ফোঁটা ছিটিয়ে যেতে পারে আশেপাশে এবং মুখ থেকে বেরিয়ে ঝুলে আছে দুটো শ্বেতাভ চকচকে দাঁত।

ইঁদুরের মতো দাঁত এককালে আমার কাম্যবস্তু। সোহাগী তুষার শুভ্র সৌন্দর্য সম্মুখভাগে বসানো থাকে। ইঁদুরটা দাঁতে কাঠ কামড়াচ্ছে। আক্রোশের চরম সীমানায় উপনীত। মৃদু মৃদু ধ্বনি-তরঙ্গ কানে এসে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দেহময় হিমশীতল ভয়াবহ পরিণতি।

কুট্ কুট্ শব্দে শত্রুর ভাষা অতিশয় পরিষ্কার। আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস অতঃপর জঠরের জারক রসে জীর্ণ করা স্পষ্ট শ্রবণযোগ্য ও বোধগম্য সংকেত ভাষ্য। শৈশবে ইঁদুর তার শ্বেতকায় সরু দন্তরাজির রূপে রূপকথায় মোহাবিষ্ট ছিলাম। মিটসেফ ক্রমশ আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছে দেয়ালে, আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত বন্দী 'তার' কণ্ঠস্বর হৃদয়ের বোঁটায় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো আঘাত করে। বায়বীয় ধূসর কুয়াশা পথ খুঁজে খুঁজে স্রোতের বিপরীত দাঁড় ফেলি।

দল বেঁধে সন্ধ্যায়, সূর্যের আলো ডুবু ডুবু, হন্যে হয়ে গর্ত খুঁজছি। ছোট বড় মুখ নিয়ে অনেকগুলো গর্ত হাঁ করে থাকে। চিনে নিতে হবে আমাদের উদ্দিষ্ট প্রাণীর আবাসস্থল যদি পাই, উঠে যাওয়া আমার কদাকার দাঁতের বদলে 'ওর একটা পরিশীলিত দাঁত চাই। শুনেছি যথাসময়ে তা পাওয়াও যায়। আমাদের

সন্ধানী ভুরু ভুরু দৃষ্টি মন্থর গ্রামের পরিবেশে পথ কেটে কেটে পার হচ্ছে ঝোপ, ঝাড়, আমতলা, ঝাউতলা, গৃহস্থ বাড়ীর নিকানো উঠোন…

অসম্ভব…। সহসা নির্গত স্বচিৎকারে চেতনায় ওরা আঘাত লাগে ঘোর ঝেড়ে জাগ্রত বর্তমান চতুস্পার্শ্বে। দেহের সমুদয় বিবশ ভার নিমেষে ঢেলে দিই দেয়ালের প্রতি মিটসেফের নিষ্প্রাণ কাঠামোয়। কোন ধ্বনি আর নির্মিত হবে না এখন থেকে। কর্ণযুগলে তরঙ্গ গ্রহণকারী দেয়ালগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত অবিরাম বর্ষণে। শৈশব সম্মোহনের কাল। গোলাপ মহিলাদের, মহিলারা গোলাপ।

গোলাপ শৈশবে শ্রেষ্ঠত্বে একক অস্তিবাচক। মহিলা সমান গোলাপ সমান শৈশব। অতএব মহিলা গোলাপ ও শৈশব। সুতরাং মহিলা গোলাপ শৈশব তিন বস্তু সম্মিলিত শক্তিতে এক, জন্ম দেয় অগভীর আশ্রয়ী নিসর্গমালা। সেহেতু শৈশবের অনুর্বরা ভূমি স্থান দেয় অমসৃণ বিপুলাবীজ পক্ষে।

অতীত অতীত, বর্তমান বর্তমান। মোহনীয়, মহিলা গোলাপ শৈশব। ত্রয়ীর সমষ্টি ফল সম্মোহন এবং সম্মোহনের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী ফসল ফলায় না কোনদিন।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আসুন তার জন্য আমরা প্রার্থনায় মিলিত হই, লোকটি মরে গেছে। লোকটি মরে গেল, অথচ পাড়াপড়শীদের কোন কোলাহল নেই। এই যে গলিটা দিয়ে হরদম মানুষ আসা-যাওয়া করছে, বাড়ীটার কোণা ছুঁয়ে গলিটা এগিয়ে গেছে একজন যাত্রী রিকশা থামিয়ে পানের দোকান থেকে পান কিনলো, একা কান্নার আওয়াজে কৌতূহলী হলো, মরার খবরটি শুনলো, এবং রিকশায় উঠলো। এ কেমন কথা। একজন মানুষ মরে গেছে, সেজন্যে মানুষের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

আমি কেন দুঃখ পেলাম?—প্রকৃতির নির্দয়তাকে এখন আর ধর্তব্যের মধ্যেই টানছে না রাহুল। তার অন্তিম বসন্তের মাতলামী কার্তিকের ক্ষ্যাপাটে কুকুরের মতো চারিদিকে ঘেউ ঘেউ করে ফিরছে। সকাল থেকেই প্রচুর বাতাস টানছে, এবং ধুলো। শীত চলে গেল, এবং লোকটি মরে গেল। শীত চলে যায়, ইঁদুরগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। আরো আরো কত কি হয়। তাতে লোকটির কি?

সে সবতাতে মুখ ভ্যাঙচালো। লোকটি ত আমার মায়ের কলমা না-পড়া স্বামীটি, কোথায় গেল? স্বর্গে নিশ্চয়ই নয়। ওই তো লোকটি সটান শুয়ে আছে। একটুও নড়ছে না। রাহুলের এখন বলতে ইচ্ছে করছে, তুমি বড় বাহাদুর ছিলে। তুমি আমার মায়ের জাত নষ্ট করলে, আর সেই মায়ের ছেলে আমি, শালার অপদার্থ, কারো কিছু করতে পারলাম না। কিছুই করতে পারলাম না—বিড়বিড় করতে থাকে রাহুল। আমার মুখের উপর সটান বলে দিল। আর আমার মা লোকটিকে নিঃশেষ করে দিল।

শেষ রাত্রে খকখক করে কাশছিল লোকটা। শালার বদমায়েস। অন্তিম কাশি।—এখন কাশছো কেন বাবা চাঁদ। সারাজীবন ধরে ফুর্তি করেছ, মেয়েছেলে রেখেছ। আজকে রাতে সেই জোয়ানী কোথায় গেল?

অথচ রাহুলকে উঠতে হয়েছিল। লোকটার বিছানার পাশে দাঁড়াতে হয়েছিল। সে রাহুলের দিকে চেয়েছিল। কিছু বলবে। না বলেনি। আর আমার জননী মুখে কাপড় দিয়ে তাকিয়েছিল সেদিকে। জোয়ান ছেলের সামনে মুখ দেখাতে শরম করছিল তার। বলিহারি সরম।—তিন বছরের শিশু পুত্রকে রেখে নাগরের সাথে বের হয়ে আসতে বাঁধেনি।—

দুপুর বেলায় ইস্কুল পালালে মাথার ওপর ঝিলিক মারতো কড়া রোদ্দুর। একটুকুতেই ঘাম চুইয়ে পড়তো শরীর থেকে। এক বুক তৃষ্ণায় ছাতি যেন ফেটে যেত। রহিমা খালার ভাঙা দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াতো। পানি খেতো। বড় গরীব ছিল রহিমা খালা। বুকে চেপে ধরে আদর করতো। ঘরজামাই থাকতে এসে মরদটা রুচিবদল করতে গেছে অনেকদিন আগে। আর ফেরেনি। আশ্চর্য হাসতো রহিমা খালা। খেতে পেত না। লাউয়ের ডগার মতো হাড্ডিসার দেহটাতে আশ্চর্য দাঁতগুলো ঝকঝক করতো।

সেই রহিমা খালা কি হয়ে গেল। রাত্রিতে সেখানে নাকি লোকেরা যায়। যায় তো কি হয়। সেটা কি খারাপ কিছু? রাহুলও তো যায়।—না, রাহুল আর কখনো যাবে না সেখানে।

কেন যাবো না?

না যাবে না।

কেন যাবো না? গেলে কি হবে? সারাটা ক্ষণ মুখ ভার করে থাকে রাহুল। দাদিটা সারাক্ষণ খিটমিট করে। বুড়ি,—তেজ কমেনি এক ফোঁটা। সারাদিন রাহুলের পেছনে লেগে থাকে। লোকের কাছে আবার বলে বেড়ায়, আদুরে নাতি। আহা রে আমার আদর। রাহুলের যা খুশি তাই সে করবে। সকালে বিছানা থেকে উঠবে না। ইস্কুলে যাবে না। দিনভর রাস্তায় ঘুরবে। ক্ষিদে পেলে শুধু এসে খাবে। পড়াশোনা লোকে করে কেন? চাকরী পেতে। রাহুলের চাকরীর কোনো দরকার নেই। দাদা অনেক ধানের জমি রেখে গেছে। গোলা ভর্তি ধান হয়।

রাহুলের পৃথিবীটা ধানে ধানময় হয়ে যায়।

লোকটা ক্রমাগত কেশেই চলছে। হাঁপাচ্ছে। বুকটা বোধ করি ঝাঁঝরা

হয়ে গেছে। অসংখ্য যন্ত্রণায় লোকটা সারাজীবন কাতরিয়েছে। অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড মমতা বোধ করে রাহুল। লোকটা তার মাকে সুখ দিয়েছে অসংখ্য সুখ—লক্ষ লক্ষ সুখের বিন্দু দিয়ে তার মায়ের প্রতি রাত্রির পৃথিবী সাজিয়ে দিয়েছে। সর্বাঙ্গে সে সুখ মেখে তার মা পরিতৃপ্ত হয়েছে। লোকা একটা হাত টেনে নেয় রাহুল। মাংসহীন সে হাত—চামড়া আর হাড়ি আলাদা হয়ে গেছে।

আমি কেন এলাম, সেই বিরক্তিকর ভাবনাটা রাহুলকে ভর করলো। বাপটা মরে গিয়েছিল। আর মা-টা হয়েছে কী। মা-টা মরে গিয়েছিল অনেকদিন অবধি শুনেছে। আহারে বাপ-মা কেমন। অবশ্যি, কোবাদকে ধরে যখন তার বাপ ঠ্যাঙানি দিত, আর ব্যাটা ভেউ ভেউ কাঁদতো—তখন মনে হতো বাপটা মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে। আর যখন শুনেছে এবং বুঝেছে মা'টা হয়েছে অন্য কিছু—তখন মনে হয়েছে মা'টাও মরেছে। মরে গেছে, মরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু লোকটি আমার মাকে মরতে দেয়নি। কিন্তু মা মরে যাওয়াই ভালো ছিলো। সুখী—সুখীর কথাটা মনে হতেই রাহুলের মাথা আগুন হয়ে গেল। ও শয়তানী আমাকে মা তুলে গাল দিল। আমি জবাব দিতে পারলাম না। চোরের মতো হেরে গেলাম। সেখানে দাঁড়াবার আর সাহস হলো না। গলাটা শুকিয়ে গেল। মা তুই কেন এমন হতে গেলি। একে আমি বিয়ে করতাম। ও এসে তোর পা টিপতো। মা, তুই আমার সর্বনাশ করলি। তোর সুখের জন্য মা হয়ে আমার সুখ নষ্ট করলি।

তার এখন যাওয়াই উচিত—রাহুল সিদ্ধান্তে দাঁড়ি টানতে আগ্রহী হলো। লোকটি তো মরেই গেলো। লোকটির বিয়ে করা বউয়ের ছেলেমেয়েরা ে গেছে। আহা! ফুর্তি করতে এসে লোকটি সকাল বেলায়ই পাড়ি পে লোকগুলো চেনার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাবো। আমার কি দায় মা'টা যদি শিশুকালে আমাকে ফেলে বের হয়ে আসতে পারে, তবে কোন যুক্তিতে আমি তার পক্ষে থাকবো?

লোকটি এসেছিল। আসাটা অভ্যাস—অভ্যাসতাড়িত, কিন্তু আকর্ষণহীন নয় লোকটি চোখে ঠুলি পরেছিল। বিয়ে-করা বউটা বুড়ী হয়ে গেছে। এবং বুড়ীটি জবর দখলে খুশী হয় না। এবং অন্য যে সেটাও বুড়ী। তবে এখনো যত্নআত্তি করে। হাত ধরে বসায়। বুড়ো বয়সের হাড্ডি—বাতে ধরেছে—চাবায় হাত-পা টিপে দেয়। লোকটা খুশি হয়, হাসে। সে হাসির সরল অর্থ হলে

কলমা পড়লে তুইও আরেকটির মতোই বুড়ো আব্দুল দেখতিস। এখন বুড়ী হয়েছিস। তোর আর খদ্দের নাই। আমিও আর পারি না। কলাতলা থেকে মত্ত মেয়েগুলো জল নিয়ে যায়। তাকিয়ে থাকি আর কুৎসিত স্বপ্ন দেখি। হস হয় না নেড়ে দেখতে। ফুলবানুরও সাহস হয় না বাজিয়ে নিতে। কিন্তু ব সাহসের বাঁধ একদিন ভেঙেছিল। তুমি আসো কেন—আক্কেল নেই ার! ধানের ক্ষেতে রস লেগেছে, কিসের কারবারী তুমি। ধানের আড়ত, আর ভদ্রহাটির হাট,—মাঝে বেতবাড়ির রেল ইস্টিশান। মকিমউদ্দিনের দোকানে চা খেতে খেতে জমসের মিয়া ঘামতো। ফর্সা কাপড় গায়ে থাকে না। দুনিয়ার লো লেপটে যায়। রাহুলের দিদা ডাকে, আজকের রাতটা থাইকাই যাও ব্যাপারি। রাতগুলো বড় ভয়ঙ্কর। ফুলবানু তা জানে। বাচ্চা রাহুল কাঁদে। রাহুলের মরা বাপটাই যেন জানান দিয়ে যায়,—আমি আছি। নিজেকে বিন্দু বিন্দু ছড়িয়ে দিয়েছি। ক্রমাগত বেড়েই যাবো। এই পাহারার মাঝে ফুলবানু হাঁপাতে থাকে। —না না, এই ফাকির পাহারা আমাকে গলা টিপে মারবে।—না না, াপারী আমি ঘরে ফিরে যাবো। ঘাসে শিশির। পা জড়িয়ে যায়। গুমোট অন্ধকারে তবু লজ্জা জেগে থাকে। নির্দয় আকাশ বুকে হনহন করে আঘাত করে। বুকটায় ওর বড় জ্বালা, ঠাণ্ডা বাতাসে কমে না। কে যেন পেছনে ডাকছে।—কি জানো, রাতে হিমে মরে যাই। শন শন শন—একটানা বাতাস বিল থেকে উঠে এসে জ্যোৎস্নাহীন মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।—না না ব্যাপারী আমি ঘরে ফিরে যাবো। ঘর তো তখন শত্রুর দখলে। রাহুল কাঁদছে—মা মা মা। তার মরা বাপটাই যেন আঁকুপাকু করে খুঁজছে। সমস্ত পৃথিবীকে ঘিয়ে দিচ্ছে। শেষ রাত্রির আকাশ তখন আশ্চর্য সমাহিত। শব্দহীন স্কালয় ঘেঁসে এগিয়ে গেছে গঞ্জের সড়ক। ঘুমভাঙা পাখির সহসা চিৎকারে চকিত অন্ধকার। ফুলবানু কথা বলতে পারছে না।—ব্যাপারী, আমাকে িয়ে করবে তো! বিয়ে করবে তো? বুকটা এখন হু হু করে শূন্যে ঠংঠং জে। বুড়ী বয়সের উপসর্গ, ছেলেটা যদি থাকতো। শান্তিতে থাকতে দিলি া। ঘর বাঁধতে দিলি না। এত যখন—দড়িকলসী ছিল না! কখনো জোর করে কথা বলতে পারিনি। রাহুল তার অতিক্রান্ত বছরগুলির দিকে ফিরে তাকায়।—আসলে ওটাই বা কার জন্মা কে জানে! নষ্ট মেয়েলোক।...... ন করলেও গায়ের ঝাল মেটে না।

অপরাধ-সন্ত্রস্ত দিনগুলো ভীতিকর অবয়বে প্রতি রাত্রিতে লেহন করতো। ঐ

যন্ত্রণা কেন আমার হবে, ঘৃণিত বিবেক অনুচ্চারণে প্রশ্নটা মীমাংসা করে দিতো। আজীবন শীতে ক্লান্ত অন্ধকার অবদমনের রীতি নেই। কিন্তু নিঃসঙ্গ চারণে তার উপলক্ষ আছে। রাহুল তাই ভীষণ একাকী—ভয়ঙ্করতম নির্জনতায় আজন্ম-লালিত। মা'টা পালালো, কিন্তু তাকে ছাড়লো না। লোকের মাঝে দাঁড়ালো মা'টা তাকে আক্রমণ করতো। ফিসফিসানি শুনলেই তার স্বস্তি থাকতো না। নির্জনে মা'টা আরো উলঙ্গ হতো। সমস্ত রক্তে শিরায় বিবেকে চেপে বসতো। মা আমার কি অপরাধ। বাপটাকে দেখলাম না। মা'টাও জ্বালালো। মাগুলো ভালো। আর আমার মা'টা? চোখখোলা রেখেও যে জঘন্য দৃশ্যগুলো ভেসে ওঠে, তাকে কিভাবে বর্ণনা করা যায়। রহিমা খালার ছেলে হয়েছিল। মরা। সারা রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণায় আত্মা ছেড়ে চীৎকার করছিল রহিমা খালা।

কেউ যায়নি। বেহদ্দ বেজন্মার গোর খুঁড়তেও যায়নি কেউ।

কিন্তু পঞ্চায়েত বসেছিল গাঁয়ে সকালবেলাতেই। তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বেজন্মার জাতবিচার করেনি আগুন। টকটকে লাল সূর্যটাও করে না। সে আগুন ঘরে শুয়ে শুয়ে দেখেছিল রাহুল। কেন যাবো? গেলেই তো অসংখ্য চোখ ঠারবে—বাঁকা হাসিগুলো গাঁথবে। আমার মা'টা আজকে সকালেই আবার উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে সবার সামনে।—বলি বাহাদুর, এখন যে নড়ছ না বড়। আমার মা'টাকে ন্যাংটা করলে। আমারও সর্বনাশের কিছু বাকি রাখোনি। এবং সে সবের, কোনো সুরাহা না করেই পটল তুললে। আসলে আমার মা-টা খুব খুশি হয়েছিল। বিগত সন্ধ্যাটাকে মন ফিরিয়ে পড়তে থাকে রাহুল।—মা'টা তোর এখনো বেঁচে আছে তো আমার শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছে। আমাকে নবাব বানিয়ে ছেড়েছে। দাঁড়িয়ে আছে ফুলবানু।—আমার একটা ছেলে ছিল। হো হো করে হেসে উঠেছিল লোকটা। প্রচণ্ড হাসি।—এসে একেবারে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে। বুড়ীমার খেদ-মতে ঘাম ছুটিয়ে ছাড়বে। সে সাহস ফুলবানুরও কি আছে? ভাবতে পারে না তবু ভাবনাটা জড়িয়ে ধরে। জীবনের কাছে তারও তো অনেক দাবি ছিল দায়িত্বের প্রতারণায় বরং তা বেড়েছে। বাঁকে বাঁকে প্রচণ্ড প্রলোভন তাকে কুৎসিত করেছে। খুশিই হয়েছিল জোয়ান মরদকে দেখে। ঐ শরীর তার প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটিয়েছে। কিন্তু দাঁড়াতে পারেনি ফুলবানু। ছেলেটা তার পরাজিত সমস্ত জীবনের ইতিহাস বয়ে এনেছে। আমি ঘুমোব—ঘুমোব মা। ঘুমোতে চাই। আমার দোষ ছিল মা। অন্ধকারে অন্ধকারে আমি জমে গেছি। আমি উত্তাপ চেয়েছি

ঐীর শরীরে আগুন জ্বলে। আমার শরীরটাও আমার সাথে বেইমানি করলে। কেবল বেড়েই গেল। আর অসংখ্য কামনার ফুলকি ছড়িয়ে দিলে। কিন্তু মা, তুই যেমন শরীরটা কাজে লাগালি, আমি পারলাম না। তুই এসে দাঁড়ালি, সুখী লিয়ে গেল। মনটা আমার আরো ছোটো হয়ে গেল। মা আমি সুখীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। পীরিত করতে বাধেনি সুখীর। ভালোবাসাটা আর বিয়ে ..রাটা এক হলো! কথার ছিরি ছাখ। বিয়ের কথায় ভয় পেল সুখী। আর ...নাদিন আসবো না রে। যার মায়ের জাত নেই বড়োজোর তার সাথে ফুর্তি ..রা যায়, ঘর বেঁধে তার সঙ্গে বাস করা চলে না। সুখী দশজনের একজন হয়ে ..চতে চায়। হা হা—সুখী লোকনিন্দার কথা ভাবে!—আর আমার মা মাগিটা ..জের সুখটাই দেখল কেবল। স্বার্থপর। বলি, জননী সুখটা পেয়েছে তো। আঁচলে ..ঁধে রাখোনি! নেড়ে-চেড়ে দেখবে এপিঠ ওপিঠ। বয়সটা ক'দিন থাকে, রক্তটা?

দাদীটা কল্লা ছিল, কিন্তু রাহুলকে পাহারা দিতো। বুড়ীটা শেষ হয়ে গেলো। ..ার রাহুল জমির ধান কাটতে পারলে না। সাত গাঁয়েব মানুষ বসলো দরবারে। ..'টা বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। বাপটা মরলেও নামটা ছিল। আর রেখে গিয়েছিল ..নের জমি। সাতগাঁয়ের মোড়ল পালু শেখ, তাতে চোখ ছিল তার। বুড়ী দাদীটাকে বড়বু বলতে অজ্ঞান হয়ে যেত হারামজাদা। দরবারের মধ্যে আবার ন্যাংটো হলো মা'টা, বাপটাও। সাক্ষী আমার জননী নিজেই। স্বভাব নষ্টই ছিল, সোয়ামী মরতেই বার হলো। বাপটা ছিল না, নামটা ছিল। আমার তাও গেল। জমিগুলো গাঁয়ের মসজিদ—যার মোতওয়াল্লী ওই হারামজাদা পালু শেখ। মামলা করবো বেআইনী জবরদখলের বিরুদ্ধে, হা হা—আমার জন্য নতুন করে আইন তৈরী করতে হবে। হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ওরা রাহুলকে ধরে আনছিল দরবারে। আসতে চায়নি নিজে। এবং সে একবার করে মরেছে, আবার জীবিত হয়েছে।

লোকটিকে নিয়ে যাচ্ছে এখন। মৃতদেহটা খাটলিতে তুলেছে। নিয়ে নিল। আহা, বেচারা! দুঃখ অনুভব না করে পারে না রাহুল। ভালোই ছিল লোকটি। ..কে বের করে এনেছিল। কিন্তু বয়স ফুরতেই ঠেলে দেয়নি। মায়ের কথা মনে হতেই প্রচণ্ড মমতা জাগে রাহুলের। লোকটি মরে গেছে, মা'টা এখন আমার। শুধু আমার।

ফুলবাহু ততক্ষণে কড়িকাঠে কাপড় জড়িয়ে ঝুলছে।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □